১৮. ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে গ্রন্থকার।

জাপানে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী

এ. এম. নায়ার-এর স্মৃতিকথা

১

আমার জন্মভূমি ত্রিবান্দ্রাম

ত্রিবান্দ্রাম আমার জন্মভূমি। কেরালার রাজধানী শহর এবং বর্তমান ভারতের ছোট একটি প্রদেশ বা রাজ্য। ব্রিটিশ রাজত্বে ত্রিবান্দ্রাম ছিল রাজন্য প্রদেশ ত্রিবাংকুরের সদর দফতর বা হেড কোয়ার্টার। স্বাধীনতার পরে ত্রিবাংকুর স্বভাবতই কোচিনের সঙ্গে মিশে যায়। কোচিন হলো আরেকটি রাজন্য প্রদেশ এবং ত্রিবাং-কুরের উত্তর সীমানার সঙ্গে সংযুক্ত। ভারতের রাজ্যগুলি যখন ভাষার ভিত্তিতে পুনর্গঠিত হয় ১৯৫৬ সনে—ত্রিবাংকুর, কোচিন ও মালাবার জেলাগুলি তখন ছিল তৎকালীন মাদ্রাজ প্রেসিডেনসির অন্তর্গত এবং ঐ জেলাগুলি অতঃপর সংগঠিত হয় একটি প্রশাসনের অধীনে, অর্থাৎ কেরালার অধীনস্থ হয়। এই এলাকার সাধারণ ভাষা হলো মালয়ালম।

ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত কেরালা সরু একফালি ভূখণ্ড, ভারতের মোট আয়তনের মাত্র এক-শতাংশের কিছু বেশি পরিমাণ এলাকাবিশিষ্ট। কিন্তু জনবসতির ঘনত্বে (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৫৫০ জনের বেশি) কেরালার স্থান ভারতের মধ্যে সর্বোচ্চ। পশ্চিম উপকূলে আরব সাগরের উর্মিমুখর জলবিধৌত এবং পূর্বাঞ্চলে পশ্চিমঘাটের দুর্গম পর্বতমালা ও উপত্যকাসহ শ্যামল বনাঞ্চলে পরিবেষ্টিত কেরালা হলো ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম একটি চমৎকার এলাকা। সোনালি সমুদ্রসৈকত এবং শান্ত সমুদ্র হ্রদগুলি যেন ফুটকির মতো উপকূলরেখার সঙ্গে মিশে গেছে শ্যামল সবুজ ধান ক্ষেত আর প্রাণবন্ত নারিকেল কুঞ্জের সঙ্গে। দেশীয় নৌকোগুলি ডানা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছে সমুদ্রের খাড়ি এলাকাগুলিতে—বিস্তীর্ণ সবুজঘেরা নদীতীরে যেন হালকাচালে স্কেটিং করে বেড়াচ্ছে।

কোভালাম—ত্রিবান্দ্রামের নিকটবর্তী একটি সুরক্ষিত সমুদ্রসৈকত, দুনিয়ার আকর্ষণীয় সমুদ্রতীরবর্তী স্বাস্থ্যোদ্ধারের স্থানগুলির অন্যতম একটি মনোরম এলাকা। এর অর্ধচন্দ্রাকৃতি ও স্ফটিক স্বচ্ছ জলপূর্ণ সাঁতারের উপযোগী উপসাগর সযত্নে ধারণ করে আছে তার বর্ণবৈচিত্র্যময় গাঢ় শ্যামল উপকূলভাগ: সৃষ্টি হয়েছে এক আশ্চর্য সুন্দর নয়নাভিরাম দৃশ্য। ছোট ছোট পাহাড়ি টিলাগুলির উপর দিয়ে দেখলে নজরে পড়বে কোভালাম অশোক হোটেল—যার কাছাকাছি রয়েছে শিল্পমণ্ডিত এক প্রাসাদোপম ভবন—যেটা প্রাক্তন এক মহারাজা তৈরি করিয়েছিলেন তাঁর অবকাশ যাপনের জন্যে।

কেরালা দুনিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করে ১৯৫৭ সনে, যখন এখানকার কম্যুনিস্ট পার্টি তৎকালীন ভারতের সাধারণ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে এবং রাজ্যে কম্যুনিস্ট সরকার গঠন করে। সেই হলো দুনিয়ার প্রথম ঘটনা—যার ফলে ভারতের একটি রাজ্যে গণতান্ত্রিক ও পার্লামেণ্টারি প্রথায় ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে কম্যুনিস্টরা সরকারি ক্ষমতা লাভ করে। এটা প্রধানত সম্ভব হয়েছিল শিক্ষার ক্ষেত্রে রাজ্যবাসীর প্রভূত উন্নতির সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বৈষম্যের ফলে উদ্ভূত ক্ষোভ ও হতাশার কারণে। রাজ্যবাসী এমনই বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছিল যে, তারা ভাবতে শুরু করলো যে ভাবেই হোক পরিবর্তন আসুক; এর চেয়ে আর কী খারাপ হতে পারে! কিন্তু শীঘ্রই কম্যুনিস্টদের উদ্দেশ্য ও চালচলন দেখে রাজ্যবাসীর চমক ভাঙলো, এবং দু' বছরের মধ্যেই রাজ্যের কম্যুনিস্ট সরকারের পতন হলো। ১৯৫৯ সনের পর, নয়াদিল্লির নির্দেশে আরোপিত স্বল্প সময়ের প্রেসিডেণ্টের শাসনকাল ব্যতীত, রাজ্যে কোয়ালিশান সরকার গঠিত হয় অন্যান্য বামপন্থী শক্তির সাহায্যে—সেখানে কম্যুনিস্টদের কোনো সংখ্যাধিক্য ছিল না।

কেরালা ভূখণ্ডের উৎপত্তি কিংবদন্তির আবরণে ঢাকা। পুরনো ঐতিহ্য অনুসারে বলা হয়: এই ভূখণ্ড এক শক্তিশালী দেবতা পরশুরামের সৃষ্টি। পরশুরাম ক্ষত্রিয়দের বিরুদ্ধে ক্রমাগত অনেকগুলি যুদ্ধ করে জয়লাভ করেন। ক্ষত্রিয়রা হলো হিন্দু ধর্মানুসারে সামরিক শ্রেণীভুক্ত এবং তারাই সমগ্র ভারতবর্ষ শাসন করতো। কিন্তু যুদ্ধে ক্ষত্রিয়দের পরাজিত করেও প্রচুর লোকক্ষয়ের জন্যে পরশুরাম অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। তাই তিনি প্রতিকার হিসেবে পাহাড়ের উপর গিয়ে কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করলেন। অতঃপর তিনি তাঁর প্রিয় যুদ্ধাস্ত্র অব্যর্থ কুঠারখানি সজোরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন দূর সমুদ্রের মাঝখানে। কুঠারখানি যেখানে গিয়ে পড়লো সেখানকার জল তোলপাড় হয়ে উঠলো এবং দু' ফাঁক হয়ে ডাঙা জেগে উঠলো। এই ভূখণ্ডের নামই হলো কেরালা।

যদিও এই কাহিনী নিতান্তই গল্পকথা, তবু এই কাহিনীর মধ্যে বাস্তব সত্য হলো ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ একদা সমুদ্রজলমগ্ন ছিল—যার মধ্যে ছিল আজকের কেরালা। যাই হোক, কিংবদন্তি অনুসারে কেরালা ভূখণ্ড হলো সমুদ্রের দান এবং এই কিংবদন্তি হিন্দুদের মধ্যে বিশ্বাসের মর্যাদা পেয়েছে। তবে জীবন বেশ কষ্টসাধ্য বলে অনেকেই আন্তরিক ভাবে আশা করে, পরশুরাম এখন যেখানেই থাকুন, তিনি আবার ফিরে আসবেন; এবারও তিনি তাঁর সেই অব্যর্থ যুদ্ধাস্ত্র কুঠার চালাবেন, দৃশ্যমান সমস্ত ভূখণ্ড আবার সেই সমুদ্রতলদেশে পাঠাবেন এবং দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত দুঃখ-কষ্টের দ্রুত অবসান হবে।

কেরালার সামরিক ঐতিহ্য ও ইতিহাস প্রায় ত্রিশ শতকের পুরনো—যার সূচনা হয় ফিনিসিয়ানদের অভিযানের সঙ্গে। খ্রীস্টপূর্ব দশম শতকে, রাজা সলোমন

(King Solomon) ভারতে বাণিজ্য জাহাজ পাঠালেন ; সেই জাহাজ এসে ভিড়লো ওফির (Ophir) দরিয়ায় ; জানা গেছে, এই এলাকাই এখন ত্রিবান্দ্রাম-এর নিকটবর্তী এক ছোট্ট গ্রাম পুভার। গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডারের মিশর জয়ের পর গ্রীকরা ভারতের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করলো—এই কেরালাকেই কেন্দ্র করে। যথাসময়ে আরব বণিকরা এই বাণিজ্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হলো এবং তারা এই এলাকায় বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এক অদম্য বাণিজ্য-শক্তি হিসেবে খ্যাতিলাভ করলো। ক্রমে আরব বণিকরা প্রকৃতপক্ষে ভারতে একচেটিয়া কারবারি হয়ে উঠলো—যতদিন না এই বাণিজ্যক্ষেত্রে পশ্চিমি উপনিবেশবাদী শক্তিগুলির আবির্ভাব হয়—অন্তত অভিযানপ্রিয় জলদস্যু পোর্তুগিজদের নেতা ভাস্কো ডা-গামার পূর্ব পর্যন্ত। গামা ভারতে এসেছিলেন প্রাচ্যদেশীয় মশলাপাতির সন্ধানে, এবং কালিকটে হাজির হন ১৪৯৮ সনে। অতঃপর তাঁর সঙ্গে এখানকার অঞ্চল-প্রধানের এক বাণিজ্য-চুক্তি হয় ; সেই অঞ্চল প্রধানের নাম জামোরিন (Zamorin)। পোর্তুগিজদের দেখাদেখিই ব্রিটিশ সরকার ভারতে বাণিজ্য শুরু করে এবং ঘটনাক্রমে সমগ্র ভারত তাদের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

কেরালার মানুষ প্রধানত হিন্দু ধর্মভুক্ত। কেরালার ধর্মগুরু শংকরাচার্য (৭৮৮-৮২০ খ্রী) হলেন প্রাচীন ভারতীয় ঋষিতুল্য, গৌতম বুদ্ধের পরবর্তীকালে পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি এবং অদ্বৈতবাদের এক প্রধান প্রবক্তা। শংকরাচার্যের অদ্বৈতবাদ, মানুষের চিন্তাশীলতা ও দার্শনিকতার ইতিহাসে এক অতুলনীয় কীর্তি। এবং তার প্রবক্তা শংকরাচার্যের জন্ম এই কেরালা ভূখণ্ডেই। আবার, এই কেরালাতেই দেখা যায় হিন্দুধর্মের পাশাপাশি খ্রীস্টধর্মের ও ইসলামের সহাবস্থান। এমনকি খ্রীস্টধর্মে কোনো ভারতীয়ের ধর্মান্তরণ এই কেরালাতেই দেখা গেছে খ্রীস্টীয় প্রথম শতকে, সেণ্ট টমাসের হাতে। তাছাড়া এই কেরালাতেই দেখা যায়, সিরিয়ান খ্রীস্টীয় চার্চ ও সম্প্রদায়ের আবির্ভাব। তারাই রাজ্যের জনসমাজে শিক্ষাদীক্ষায় আলোক-প্রাপ্ত একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ বিশেষ। আবার, মালাবারের মোপলারাই সম্ভবত রাজ্যে প্রথম স্থায়ী মুসলিম বসতি স্থাপনকারী ; এরা হলো আরব বণিক পুরুষ ও কেরালী মহিলাদের সন্তান। এমনকি এই কেরালায় ইহুদি সম্প্রদায়েরও বসতি আছে, প্রধানত কোচিন এলাকায় ; তারাই সম্ভবত দুনিয়ার আদি হিব্রু অধিবাসীদের অন্যতম। বলা হয়, তারা এসেছিল রাজা সলোমনের জাহাজে চেপে।

এই সমস্ত মিত্রতা ও সহাবস্থানের নজির থাকা সত্ত্বেও কেরালা তার নিজস্ব সত্তা বজায় রেখেছে বরাবর। বিদেশি প্রভাব এখানে মিলেমিশে গেছে, অথচ স্থানীয় সংস্কৃতি অটুট ও অম্লান রয়েছে। সামগ্রিক ভাবে ভারতের ইতিহাসে রয়েছে বিচিত্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারা ; তবু তাদের মধ্যে মিলন-মিশ্রণের এক সাধারণ জোরালো ধারা সদা প্রবহমান। এবং সেই প্রবাহে অন্য যে কোনো রাজ্যের মতো

কেরালার ঐতিহ্যগত ধারাপ্রবাহও রয়েছে লক্ষণীয়ভাবে। কেরালার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যধারায় হিন্দুধর্ম ব্যতীত খ্রীস্টীয়, ইসলাম, বৌদ্ধ ও জৈনধর্মেরও বিচিত্র উপাদান রয়েছে, যদিও শেষোক্ত বৌদ্ধ ও জৈন এই দুই ধর্মীয় সংস্কৃতির স্থায়ী কোনো ছাপ নজরে পড়ে না। সংহত স্থায়ী সংস্কৃতি বলতে যা বোঝায়, তার মধ্যে আর্য ও দ্রাবিড় সভ্যতাই এখনো বিদ্যমান—যা দক্ষিণে ও উত্তরে এখনো লক্ষণীয়। পৃথক সত্তা যেখানেই বিদ্যমান, সেখানেও এক মিলনধারাও অলক্ষ্য নয়—যার ফলেই ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি সামগ্রিকভাবে ঐশ্বর্যময়ী হয়ে উঠেছে নিরন্তরভাবে। এই হলো ভারতীয় সভ্যতার বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

এই রাজ্য প্রাচীন ইন্দো-আর্য ভাষাগোষ্ঠীর পুষ্টিসাধনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে; সংস্কৃত ভাষা এবং তার বহু প্রভাবিত অন্যান্য ভাষাগুলির ক্ষেত্রেও কেরালার ভূমিকা বিশেষভাবে লক্ষণীয়, অন্তত সেই সুদূর খ্রী. অষ্টম শতক থেকে। কেরালার অবদান কেবলমাত্র দর্শনের ক্ষেত্রেই নয়, বরং জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র ও জ্যোতিষচর্চার ক্ষেত্রেও বিশেষ গৌরবজনক। জ্যোতির্বিদ্যার ওপর আর্যভট্টের বিখ্যাত গ্রন্থাবলী, কেরালারই কৃতী সন্তান ভাস্কর সহজ সরল ভাষায় সারানুবাদ করেছেন - খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতকেই। ছয় খণ্ডে সমাপ্ত, রাজা রাজবর্মা প্রণীত কেরালায় সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস ('হিস্টরি অফ স্যানসক্রিট লিটারেচার ইন কেরালা') বইখানি এক অনন্যকীর্তি বিশেষ।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অসংখ্য সাহিত্যিক-লেখক ব্যতীত শাসক রাজপরিবারের বেশ কয়েকজনের ভূমিকা রয়েছে রাজ্যে শিক্ষা-বিস্তারের ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষক হিসেবে; তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের পাণ্ডিত্য বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছে, যেমন ত্রিবাংকুরের রামবর্মা (১৭৫৮-৯৮), স্বাতী থিরুমল (১৮২৯-৪৭) এবং কোচিনের রামবর্মা (১৮২৫-১৯১৪) প্রভৃতি। সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয় ত্রিবান্দ্রামে—রাজা শ্রীমূলম থিরুনাল (১৮৮৫-১৯২৪) এবং কোচিনবাসী আরেকজনের সময়ে; স্থাপনা করেন রাজা রামবর্মা (১৮৯৫-১৯১৪)—এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন ভারতবিখ্যাত পণ্ডিত। রামবর্মা পরীক্ষিৎ থামপুরন, কোচিনের শেষ রাজা—ছিলেন আধুনিক ভারতের অগ্রণী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের অন্যতম। মোট কথা, সংস্কৃত-চর্চার ক্ষেত্রে কেরালার অবদান বিস্ময়কর। তবে, এখানে সংস্কৃত শিক্ষা ও পঠনপাঠন হয় প্রধানত মালয়ালম লিপির মাধ্যমে—উত্তরাঞ্চলের মতো দেবনাগরী লিপির মাধ্যমে নয়। ফলে, কেরালার অবদানের কথা অনেক সময় আমাদের নজর এড়িয়ে যায়।

কেরালার নায়ার সম্প্রদায় ঐতিহ্যগত ভাবে সামরিক শ্রেণীভুক্ত, এবং এই নায়াররাই হলো রাজাদের শক্ত হাত—সিংহাসনের অন্তরালে প্রকৃত শক্তি। অসীম সাহসের জন্যে বিখ্যাত এই নায়াররাই শৌর্যবীর্য আর মর্যাদার ক্ষেত্রেও সমান দৃঢ়চিত্ত আর খ্যাতির আসনে অধিষ্ঠিত। রাজাদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক, জাপানের সম্রাটের

সঙ্গে সামুরাইদের থেকে খুব বেশি একটা তফাত নয়। কেরালার গীতিকাব্যগুলি রোমান্টিক নায়ার বীরদের চমৎকার শৌর্য গাথায় পরিপূর্ণ,—যার সঙ্গে তুলনীয় একমাত্র জাপানি 'বুশিডো' (*Bushido*)। শারীরিক কসরৎ 'কালারি' (*Kalari*) অভ্যাসের ফলে নায়াররা আত্মরক্ষা ও আক্রমণাত্মক, উভয় শক্তিই অর্জন করে, ঠিক যেমন জাপানিরা যুযুৎসুর ফলে সেরা দৈহিক শক্তিলাভ করে। ঐতিহাসিক সাক্ষ্য প্রমাণে জানা যায়, নায়ারদের মধ্যেও ছিল 'শভর' বাহিনী (*Chaver*, the suicide squads)—যারা স্থলযুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল; ঠিক যেমন জাপানে ছিল আত্মঘাতী পাইলট বাহিনী (*Kami Kaze*, pilots)—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যাদের প্রাণ বিসর্জনের কথা ইতিহাসে অমরগাথায় পরিণত হয়েছে।

কেরালার সেনাধ্যক্ষদের ক্ষমতার কথা নায়ার বাহিনীর আয়তনের দৃষ্টিতেই বিচার্য। কালিকটের রাজা জামোরিনের সেনাবাহিনীতে এক সময় সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার, এবং কোচিনের রাজার বাহিনীতে ছিল প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার। ত্রিবাংকুর বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল আরো বেশি। বিগত আঠারো শতকে এবং উনিশ শতকের গোড়ায়, এইসব সেনাবাহিনী ভেঙে দেওয়া হয়। কিন্তু ত্রিবাংকুর ও কোচিনের কয়েকটি নায়ার বাহিনী রাখা হয়েছিল ব্রিটিশ প্যাটার্নের আদলে, এবং তা চালু ছিল ১৯৪৭ সনে ভারতের স্বাধীনতা লাভের কাল পর্যন্ত।

কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে নায়াররা সবাই সৈনিক। তবে, তারা ব্যাপক কর্ম-জগতের সর্বক্ষেত্রেই খুবই উদ্যোগী ও সক্রিয়। ইদানিং কালের ইতিহাসে বহুখ্যাত ব্যক্তিদের মধ্যে বিখ্যাত একজন হলেন স্যার চেটুর শংকরন নায়ার। তিনি একজন বিশিষ্ট জুরি এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি (প্রেসিডেন্ট, ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস) ছিলেন বিগত ১৮৯৭ সনে। যদিও তিনি ১৯১৫ সনে ভাইসরয়ের একজিকিউটিভ কাউনসিলের সদস্য হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি ছিলেন সর্বান্তঃকরণে একজন জাতীয়তাবাদী। ফলে, তিনি ঐ কাউনসিল থেকে শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ করেন— পাঞ্জাবের অমৃতসরে ব্রিটিশ সরকারের নারকীয় অত্যাচারের প্রতিবাদে।

আরেকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ভাপ্পালা পাংগুন্নি মেনন—সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং শেষ ভাইসরয় ও ভারতের গভর্নর-জেনারেল লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের অতি কাছের মানুষ ছিলেন। এই মেনন ভারতের স্বাধীনতা কালে একটা অত্যন্ত কঠিন কাজ দক্ষতার সঙ্গে সমাধা করেছিলেন, অর্থাৎ দেশের প্রায় ৫৬০টি রাজন্য প্রদেশকে তিনি ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যে সংহত করে ছিলেন।

আরেক মেননের কথাও কেউ ভুলতে পারবেন না,—তিনি হলেন ভি. কে. কৃষ্ণমেনন। এই মেনন ছিলেন ইংল্যাণ্ডে ইণ্ডিয়ান ইনডিপেনডেন্স মুভমেণ্ট-এর দীর্ঘকালের নেতা, ১৯৪৭ সন পর্যন্ত। ইনিই ছিলেন পেলিক্যান বুকস-এর সম্পাদক

এবং ব্রিটেনে স্বাধীন ভারতের প্রথম হাইকমিশনার নিযুক্ত হন। তিনিই ভারতীয় প্রতিনিধি দলকে রাষ্ট্রপুঞ্জে (ইউনাইটেড নেশন্‌স) পরিচালিত করেন দীর্ঘ ১৫ বছরেরও বেশি সময় যাবত এবং আপন কর্মদক্ষতার গুণে তিনি অনুন্নত দেশসমূহের একজন প্রধান প্রবক্তা হিসেবে খ্যাতিলাভ করেন। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর ব্যক্তিগত বন্ধু এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে তিনি নেহরুর ক্যাবিনেটের সদস্যপদেও ছিলেন ১৯৫৭-৬২ সময়কাল পর্যন্ত। নেহরুর তৎকালীন ক্যাবিনেটে তিনি ছিলেন দ্বিতীয় শক্তিশালী মানুষ, অর্থাৎ নেহরুর পরবর্তী ব্যক্তি হিসেবেই সুপরিচিত। যদিও ভারতে চীনা আক্রমণের পরিণতিতে মেনন পদত্যাগ করতে বাধ্য হন, তবুও নেহরুর ব্যক্তিগত স্নেহভাজন হিসেবে শেষ পর্যন্ত তাঁর খ্যাতি বজায় ছিল। বিগত ১৯৭৪ সনে মৃত্যুকালে তাঁর সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি তিনি জাতির নামে দান করেন। তৃতীয় বিশ্ব তাঁকে চিরকাল তাদের একজন খাঁটি সমর্থক হিসেবেই মনে রাখবে।

নায়ার সম্প্রদায়ের সামাজিক কাঠামো সম্পর্কে বিদেশে পর্যবেক্ষকদের মধ্যে প্রচুর কৌতূহল রয়েছে। বিশেষত সমাজতত্ত্ববিদ ও নৃতত্ত্ববিদদের মধ্যে। নায়ারদের সমাজ গঠিত হয়েছে যৌথ পরিবারের ভিত্তিতে, যাকে বলা হয় 'থারাবাদ' (*Tharavads*)। ফলে মাতৃতান্ত্রিক গোষ্ঠীপ্রথার উদ্ভব হয়। মূলত এর অর্থ হলো—বংশ পরম্পরা স্থিরীকৃত হতো মায়ের দিক থেকে,—পিতৃ পরিচয়ে নয়। প্রতিটি 'থারাবাদ' বা পরিবারগোষ্ঠী বয়োজ্যেষ্ঠ অর্থাৎ প্রবীণতম একজন পুরুষের নিয়ন্ত্রণে থাকে —বলা হয় তাঁকে 'করনাভন' (*Karanavan*)। কিন্তু এই প্রথায়ও মহিলারা বিশেষ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। প্রত্যেক 'থারাবাদ' বা পরিবারগোষ্ঠীর বিষয়-সম্পত্তি যৌথভাবে পরিবারের সদস্যরা মালিকানা ভোগ করতো, এবং স্বত্ব-স্বামিত্ব স্থিরীকৃত হতো পরিবারের কোনো সর্বজনীন মাতা বা তাঁর অন্য কোনো পূর্বসূরী মহিলার দিক থেকে। ফলে কোনো পিতার বিষয়সম্পত্তি তাঁর ছেলে বা মেয়ের নামে নয়, তা বর্তায় পিতার বোনের ছেলেমেয়েদের নামে। তবে যদি কোনো পিতার বোন না থাকে, সেক্ষেত্রে তিনি স্বভাবতই এক বা দু'জনকে দত্তক নেবেন বোন হিসেবে—যাতে ভাগ্নে-ভাগ্নী লাভ হয় এবং সেই পিতার পার্থিব বিষয়-সম্পত্তি তাঁর মৃত্যুর পর তাদের নামেই বর্তায়। ত্রিবাংকুর ও কোচিন রাজ্যে তাই দেখা যায়, সেখানকার রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী শাসকদের বংশধর নয়, তাদের বোনের বয়োজ্যেষ্ঠ ছেলেরা।

নায়ারদের মধ্যে প্রচলিত এই আপাত বিচিত্র প্রথার পেছনে বাস্তব যুক্তি এই যে, নায়ার পুরুষদের প্রায়ই বাড়িঘর ছেড়ে বহুদূরে থাকতে হতো সামরিক প্রয়োজনে, দীর্ঘকালের জন্যে; এবং তাই পারিবারিক কর্তব্যের দায়দায়িত্ব ছেড়ে দিতে হতো মহিলাদের হাতে। ফলে, পরিবারের মহিলাদের প্রাধান্য ও মর্যাদা বেড়ে গেল। নৃতাত্ত্বিকরা এই ব্যবস্থার মধ্যে অর্থাৎ প্রাচীন নায়ার সমাজে নারী

-পুরুষ ঘটিত উল্লেখযোগ্য ক্ষমতা লক্ষ্য করেছেন।

জাপানের রাজতন্ত্রেও এরকম একটি সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। জাপানে প্রচলিত বিশ্বাস, যেহেতু রাজতন্ত্রের আবির্ভাব হয়েছে সূর্যদেবী থেকে, তাই জাপানের মূল সমজব্যবস্থাও মাতৃতান্ত্রিক। অর্থাৎ জাপানি সমাজে মহিলাকে অবশ্যই মূলত প্রভাবশালী হতে হবে এবং পরিবারে তাঁর উচ্চস্থান থাকবে। আধুনিক কালের পুরুষ শাসিত জাপানি সমাজব্যবস্থা হয়েছে অনেক পরবর্তীকালে—সম্ভবত বাইরের নানা প্রভাবের ফলে।

যাই হোক, মাতৃতান্ত্রিক গোষ্ঠী বা পরিবার প্রথার ফলেই সমাজে মহিলাদের বহুপতিত্ব গ্রহণের প্রচলন হয়েছে। প্রাচীন নায়ার গোষ্ঠী বা পরিবারের এটাও একটা বিচিত্র বৈশিষ্ট্য। কিন্তু কালক্রমে, মাতৃতান্ত্রিক গোষ্ঠী/পরিবার এবং মহিলার বহুপতিত্ব গ্রহণ, এই উভয় প্রথাই ভুল বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। আচরণগত পরিবর্তন, বর্তমান শতক অর্থাৎ বিশ শতকের সূচনাকাল থেকেই লক্ষ্য করা গেছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জনমতও সংগঠিত হয়েছ্ বিগত ১৯২০ সনের কাছাকাছি সময়ে। ১৯২৫ সনে এই মর্মে ত্রিবাংকুর আইন পাশ হয় এবং কিছুকাল পরে তা ব্রিটিশ-মালাবার এলাকাতেও (ত্রিবাংকুরের একটি ছোট অঞ্চল) চালু হয়, অর্থাৎ মাতৃতান্ত্রিক গোষ্ঠী/পরিবার প্রথা নিষিদ্ধ হয়। একই সময়ে বহুপতিত্ব গ্রহণ প্রথাও নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়।

২

ছোটবেলার দিনগুলি

আমাদের পূর্বপুরুষের বাড়ি ছিল যৌথ পরিবারভুক্ত, নাম তার উট্টিচাক্কোনাথ ভালিয়া ভিড়ু (Oottichakkonath Valiya Veedu)—ত্রিবান্দ্রাম থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে ছোট শহর নিয়াট্টিংকারায় (Neyyattinkara) অবস্থিত। সেই এলাকায় আমাদের পরিবার অভিজাত বলে পরিচিত ছিল এবং নামেই প্রকাশ—তা ছিল আয়তনে সুবৃহৎ। আমার মা লক্ষ্মী আম্মা, প্রায় ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত সেখানে ছিলেন এবং তারপর তিনি আমার পিতাকে বিবাহ করেন, বিগত ১৮৭৪ সনে। আমার মা অসবর্ণ বিবাহ করেছিলেন। আমার পিতা আরামুডা আয়েঙ্গার ছিলেন কুম্বকোনামের উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ; এই অঞ্চল ছিল তখন মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত, এখন তামিলনাড়ু নামে পরিচিত।

নায়ারদের মধ্যে যৌথ পরিবার প্রথায়, করনাভন (পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ

প্রবীণতম পুরুষ) সাধারণত মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে দেবার কথা বলে থাকেন। অধিকন্তু, হবু স্বামীকে পছন্দ অর্থাৎ মনোনীত করা হয় পাত্রীর পিতামাতার দিক থেকে, অথবা পাত্রীর খুড়োদের দ্বারা। এরকম যোগাযোগের বিয়ের ক্ষেত্রে পাত্রীর পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদি বা অন্য কোনো বিষয়ে তেমন কিছু বলার সুযোগ থাকে না। যেখানে অসবর্ণ বিবাহের ঘটনা হয়, অর্থাৎ যদি কোনো নায়ার পাত্রী কোনো নিম্নবর্ণের পাত্রকে বিয়ে করে, তখনি সেই ঘটনাকে শাস্ত্রীয় নির্দেশ ভঙ্গের ঘটনা বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু পাত্রী যদি অসবর্ণ পরিণয়ের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ/কায়স্থকে বিবাহ করে, তবে তা পাত্রী এবং পাত্রীর পরিবার, উভয়ের ক্ষেত্রেই সম্মানের বিষয় বলে গণ্য হবে। তাই আমার মায়ের বিবাহের ক্ষেত্রে, কেবলমাত্র মায়ের পরিবারই নয়, গোটা (নিয়াট্টিংকারা) শহরটিই গর্ববোধ করলো ; কেননা আমার পিতা কেবল একজন উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণই ছিলেন না, তিনি পেশার দিক থেকে অতি মর্যাদাপূর্ণ একজন প্রতিভাবান এনজিনিয়ার হিসেবে ঐ এলাকায় পরিচিত ছিলেন। তিনি তখন ত্রিবাংকুরে এসেছিলেন তৎকালীন শাসক আইল্যাম থিরুনাল এবং তাঁর দেওয়ান (মুখ্যমন্ত্রী) স্যার টি. মাধব রাও—এই দু'জনের কাছ থেকে যৌথ আমন্ত্রণ পেয়েই। ঐ শাসকও তাঁর মুখ্যমন্ত্রী, উভয়েই ছিলেন বিশেষ শিক্ষিত ও আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তি, এবং তাঁরা উভয়েই রাজ্যের উন্নতি ও রাজ্যবাসীর কল্যাণে নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন। রাজ্যের জনকল্যাণমুখী কাজকর্ম সর্বদাই তাঁদের কাছে অগ্রাধিকার পেত। আমার পিতা, নিজগুণে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই চিফ এনজিনিয়ারের পদে উন্নীত হয়েছিলেন, এবং রাজ্যের গৃহনির্মাণ ঘটিত সমস্ত কাজেই ছিলেন শাসকের পছন্দসই এক নম্বর ব্যক্তি।

আইল্যাম থিরুনাল এবং মাধব রাওয়ের প্রগতিশীল নীতিসমূহ তাঁদের উত্তরাধিকারী বিশাখাম থিরুনাল এবং নাণু পিল্লাই প্রমুখরাও মেনে চলতেন এবং তা বজায় রেখেছিলেন। শেষোক্ত এই থিরুনাল ও পিল্লাই উভয়েই আমার পিতাকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়েছিলেন, যার ফলে আমার পিতার পক্ষে একই সঙ্গে বহু কাজ উল্লেখযোগ্য স্বল্প সময়ের মধ্যেই সমাধা করা সম্ভব হতো। আমার পিতার বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজগুলির মধ্যে আছে—ত্রিবান্দ্রাম জেনারেল মিউজিয়াম, ফাইন আর্টস মিউজিয়াম, সিটি পাবলিক লাইব্রেরি, সেনট্রাল জেল বিল্ডিং, ভারকালা ব্যাকওয়াটার ক্যানাল ইত্যাদি শিল্পমণ্ডিত ভবনগুলি এবং সারা রাজ্যব্যাপী বিস্তৃত এলাকা যুক্ত পরিবহন ও যোগাযোগের রাস্তা।

বিবাহের অব্যবহিত পরেই আমার মা-বাবা একটা নতুন বাড়িতে চলে আসেন। বাড়িটি আমার বাবা তৈরি করিয়েছিলেন ত্রিবান্দ্রামে। বাড়িটি বেশ বড় ছিল, কিন্তু হেঁয়ালি করে বলা হতো 'কুন্‌জু ভিড্‌' যার আক্ষরিক অর্থ—ছোট্ট বাড়ি। আমার বাবা বেশ কয়েক একর ধানী জমি এবং নারিকেল বাগান করেছিলেন—যা ছিল আমাদের পারিবারিক আয়ের প্রধান উৎস। আমার মা-বাবার ১০টি সন্তান,

তাদের মধ্যে আমি সর্বকনিষ্ঠ। আমার জন্ম হয় মালয়ালম সন ১০৮১ সালের দ্বিতীয় মাসের চতুর্থ তারিখে (Kanni, মাসের নাম কান্নি), অর্থাৎ ইংরেজি ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯০৫ তারিখে। প্রতিবেশীদের আলোচ্য বিষয় ছিল আমার জন্মনক্ষত্র রোহিণী,—যা ছিল ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরও জন্মনক্ষত্র। আমার এই জন্মনক্ষত্রের ব্যাপারটা কোনো রকম তাৎপর্যপূর্ণ ছিল কিনা, তা জানিনে। কিন্তু যা আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে জানতে পারলাম তা হলো, আমার জন্মের পূর্বেই মা-বাবার চার সন্তানের মৃত্যু হয়। তাই, আমার স্মরণ আছে কেবল আমার দুই দাদা আর তিন দিদির কথা।

সমস্ত দিক থেকেই আমার বাবা ছিলেন একজন দয়ালু চিত্তের মানুষ। কিন্তু কর্তব্য কর্মের ক্ষেত্রে ছিলেন কঠিন এবং যেকোনো কাজ সুন্দর ও নিপুণ ভাবে করবার বিষয়ে দারুণ দৃঢ়চিত্ত। তিনি ছিলেন মনেপ্রাণে নতুনের সন্ধানী এবং বাস্তববাদী হিসেবে সুপরিচিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলতে পারি, নবনির্মিত রাস্তার মান পরীক্ষা করতে গিয়ে প্রচলিত প্রথা বাদ দিয়ে তিনি তাঁর ঘোড়ার গাড়ি চালিয়ে সেই খোয়া বাঁধানো নতুন রাস্তায় একাধিকবার এপার-ওপার করছেন দেখেছি। এবং ঘোড়ার গাড়ি চলাকালে রাস্তার কোনোদিকে যদি গাড়ি অস্বাভাবিক হেলে যেত, তখনি তিনি রাস্তার সেই অংশ ভেঙে আবার নতুন ভাবে তৈরি করতে কড়া নির্দেশ দিতেন। আমার বেশ ভালোই মনে আছে, বাবার সময়ে তৈরি কয়েকটি রাস্তা এইভাবে নতুন করে তৈরি হয়। অথচ সেসব রাস্তার মান এখনকার তৈরি রাস্তার চেয়ে অবশ্যই বহুগুণ ভালো ছিল। তার অর্থ এই নয় যে, আমাদের এনজিনিয়ার-দের দক্ষতা কমে গেছে; প্রকৃতপক্ষে ইদানিং কালে আমাদের কর্মীরা (পুরুষ ও নারী) আগের চেয়ে আরো উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জ্ঞানের অধিকারী। আমাদের হাতে রয়েছে আগের চেয়ে আরো উন্নত ও সূক্ষ্ম ধরনের যন্ত্রপাতি—আমার যৌবনে ভারতে যা অজ্ঞাত ছিল। তবু আমাদের আজকের কাজের মান অনেক নেমে গেছে। কারণ কাজ চলাকালীন এবং কাজের পরে পরীক্ষামূলক পরিদর্শনের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ যেমন শিথিল হয়ে গেছে, তেমন কাজের প্রতি নিষ্ঠা ও মমত্ববোধও এখন আগের চেয়ে অনেক হ্রাস পেয়েছে।

যখন আমি ত্রিবান্দ্রামে যাই ১৯৮০ এপ্রিল মাসে, সংবাদপত্রের এক সাংবাদিক আমার ছোটবেলার কেরালা সম্পর্কে কিছু জানতে চান, এবং বর্তমান কেরালার অবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করতে বলেন। কিছুক্ষণের জন্যে আমার মনে হয়েছিল, আমাকে এ প্রশ্ন না করলেই ভালো হতো। কারণ, প্রশ্নের জবাবে আমার মনে যে চিন্তার উদয় হয় তা মোটেই সুখপ্রদ বা আনন্দের কথা নয়। কিন্তু জিজ্ঞাসা যখন করা হয়েছে, আমি আমার নিরপেক্ষ বক্তব্য জানাতে মনস্থ করলাম।

প্রথমেই জানালাম, এই প্রশ্নে আমি খুবই বিব্রত বোধ করছি। আমাদের

অনেকে কঠোর পরিশ্রম করেছে, অনেক ত্যাগস্বীকার করেছে, স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্যে আমরা প্রত্যেকের সাধ্যমতো কাজ করেছি। স্বাধীনতার প্রথম যুগে আমরা স্বপ্ন দেখেছি, আমাদের মাতৃভূমিকে মহান ও সম্পদশালী দেশ হিসেবে গড়ে তুলবো —দুনিয়ার সামনে যা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। কিন্তু স্বাধীনতার তিন দশক পরেও বাস্তবে আমরা কী দেখছি? উন্নতি-অগ্রগতি নিশ্চয়ই হয়েছে। কিন্তু কেন তা এত সামান্য আর ধীরগতি? মনে হয় আমরা অনেক বিষয়েই, অনেক ভাবেই আমাদেরকে ঢিলে দিয়েছি, নিচে নেমে যেতে দিয়েছি, অথচ আমাদের ক্ষমতা ও দক্ষতাকে কাজে লাগাই নি। রাজনীতিকরা দেশের উন্নতি-অগ্রগতির চেয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি করে সোরগোল তুলেছেন, আর সময় নষ্ট করেছেন। এবং সরকারি আমলারা বসে বসে তাদের রাজনৈতিক নেতাদের এইসব অকাজের সাফাই গেয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে, আমাদের নাগরিক কর্তব্যবোধ উধাও হয়ে গেছে। বাতাস-দূষণের অসহ্য অবস্থার সঙ্গে আমরা যেন আওয়াজ-দূষণের বিস্তার করতে সংকল্প করেছি। লাউড-স্পিকার সারা দিনরাত অবিরাম বেজে চলে ব্যস্ত কাজের এলাকায়, এবং আমাদের কাজ আর ঘুম দুইই নষ্ট হয়। বহু লোক ইতিমধ্যেই হয় শ্রবণশক্তি হারিয়েছে, নয়তো শুনেও-শোনে না এমন অবস্থায় এসেছে। আবার বেশ কিছু লোক হয়তো শীঘ্রই শ্রবণশক্তি হারাবে, যদি-না এই অসহ্য অবস্থার কোনো প্রতিকার হয়। আমাদের মন্দিরগুলিতেও দেবতারা ঐ একই শাস্তিভোগ করছেন। দেবতাদের উদ্দেশে নিবেদিত আমাদের ভক্তিগীতিগুলিও এইভাবে আমরা বিষাক্ত করে তুলেছি—রক-এন্‌-রোল'এর মিশ্রণে। আমাদের জনস্বাস্থ্য বিভাগের কাজকর্ম বিশ্রী অবস্থায় এসে পৌঁচেছে। আরো এমন সব বিষয় আছে যা কখনোই এরকম হওয়া উচিত নয়; তা শীঘ্রই এরকম হয়ে যাবে এবং দূষিত জিনিসের তালিকা শীঘ্রই দীর্ঘ হয়ে পড়বে।

বিগত ১৯২০-র দশকে ত্রিবান্দ্রামে এক জনসভায় গান্ধীজী আমাদের কেরালার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। অর্থাৎ আমাদের রাজ্যবাসীর শাদা পোশাক এবং সাজানো গোছানো ছিমছাম পরিবেশে আমাদের সরল জীবন ও উচ্চচিন্তার মানস প্রকৃতিগত পবিত্রতা ও অভ্যাসের প্রকৃত প্রতিফলন ঘটেছিল। ভাবতে আমার অবাক লাগে, গান্ধীজী এখন যদি আমাদের রাজ্যের বর্তমান অবস্থা দেখতে পেতেন, তাহলে কী ভাবতেন! কেননা, আমাদের রাজ্যের জনস্বাস্থ্যগত পরিবেশের বিশ্রী অবস্থা হয়েছে। তাহলে কি স্বাধীনতার পরেই আমাদের মানস প্রকৃতিই এমনটা বিশ্রী হয়ে গেছে? অথচ পরিবেশ সুশ্রী রাখতে, কোনো বড় রকমের ত্যাগ স্বীকার করতে হয় না। তা যে কোনো রাজ্যেই হোক, আর গোটা দেশেই হোক। কিন্তু দেশ পরিচ্ছন্ন রাখলে স্বাস্থ্যসম্মত ও সুন্দর হয়ে ওঠে। আমাদের পৌরসভাগুলিকে অবশ্যই কাজ করতে হবে। পৌরসভাগুলির কর্তৃপক্ষরা

স্বদেশের বাইরের দেশগুলির দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখুন সিঙ্গাপুরের দিকে—এই ছোট্ট দেশটি অত্যন্ত জনবহুল, কিন্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় সর্বদাই ত্রুটিশূন্য। কেন এমন হলো যে, আমাদের প্রশাসকরা তাঁদের স্থানীয় এলাকাগুলিকে পরিচ্ছন্ন রাখতে কোনোরকম গ্রাহ্যই করেন না ?

আমার এইসব অভিজ্ঞতা ও বক্তব্য আমার সাংবাদিক প্রশ্নকর্তাকে বলেছিলাম এবং এজন্যে আমার কোনো রকম গর্ব হয়নি। একজন প্রবাসী ভারতীয় হিসেবে আমি প্রস্তাব করেছিলাম, আমার ক্ষুদ্র শক্তি অনুযায়ী আমাদের শহরগুলিকে পরিচ্ছন্ন রাখতে যথাসাধ্য করবো—ভারত সরকার যদি প্রবাসী ভারতীয়দের কাছ থেকে সহযোগিতার প্রত্যাশা নিয়ে কোনো পরিকল্পনা অনুযায়ী আহ্বান জানান। সরকারি সংস্থাগুলির যদি কঠোর পরিশ্রমের ইচ্ছা ও আগ্রহ থাকে এবং দেশবাসীর সহযোগিতা গ্রহণের ও আদায়ের সক্রিয় ক্ষমতা থাকে, তবে অবশ্যই আমরা আমাদের রাজ্য এবং গোটা দেশকে এই ধরণীর স্বর্গে পরিণত করতে পারি।

যা বলছিলাম, আমার ছোটবেলার দিনগুলির কথায় আবার ফিরে আসি। আমার পিতা সরকারি কাজ থেকে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই অবসর নিলেন এবং অন্যান্য বহু সংস্থায় কাজ করেন। বেশ কয়েক বছরের জন্যে তিনি ছিলেন বরোদা রাজ্যের চিফ এনজিনিয়ার। তিনি যখনি যেখানে কাজে গেছেন, সঙ্গে নিয়ে গেছেন সমগ্র পরিবারকে। তাছাড়া,আমার কয়েকজন কাকা ও অন্যান্য আত্মীয়রাও পিতার সঙ্গে ছিলেন। অতএব কর্মক্ষেত্রের সর্বত্রই এক 'থারাবাদ' বা পরিবারের প্রতিপালন করতে হতো তাঁকে। এবং গোটা বাড়ি বা বাসস্থান হয়ে উঠতো বিরাট এক 'উট্টুপুরা' (Oottupura)—বা অবৈতনিক মেস বা বোর্ডিং-এর মতো। আমার জ্যেষ্ঠ ভাই অর্থাৎ বড়দাদা কুমারন নায়ার ছিলেন পিতার কাছে এক সমস্যা স্বরূপ। বড়দা ছিলেন চমৎকার একজন খেলোয়াড়, কিন্তু শাসনের বাইরে অবাধ্য এক যুবক : তাঁর সমবয়সী, এমনকি বয়স্কদের সঙ্গেও তিনি নানা সমস্যা ও ঝামেলা সৃষ্টি করতেন। বড়দাকে সংযত রাখতেই বাবা সাধ্যমতো বাইরে থাকাকালে প্রায়ই তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে রাখতেন। আমার বাবাকে কখনো কখনো ঘোড়ায় চেপে বাইরে ঘুরতে হতো। দেখা যেত, বিরাট ঘোড়ার পিঠে বাবার পাশে পাশে ছোট আরেকটি ঘোড়া চলেছে চেলাপ্পানকে (বড়দার ডাক নাম) নিয়ে—যাতে বড়দা বাবার নজরের মধ্যে থাকেন এবং কোনো রকম বদমায়েশি করতে না পারেন।

আমার ছেলেবেলার সবটাই কেটেছে ত্রিবান্দ্রামে। আমার বাবা প্রায়ই বাইরে বাইরে থাকতেন, তাই যখনি সময় পেতেন আমাদের দেখতে আসতেন। কিন্তু প্রায়ই তাঁকে বাইরে থাকতে হতো বলে আমাকে দেখতে আসার মতো যতটা প্রয়োজন ততটা সময় দিতে পারতেন না। ফলে আমার দাদারা ও দিদিরা

যতটা বাবাকে কাছে পেয়েছে, আমার ততটা সৌভাগ্য হয়নি। আমার ছেলেবেলায় অধিকাংশ সময় কেটেছে তাই মাকে কেন্দ্র করেই। ফলে মা'র প্রভাবই আমার জীবনে খুবই বেশি। এবং আমার মানসিক গঠন-প্রকৃতি ও স্বভাবচরিত্র বলতে গেলে তাঁরই প্রভাবে গড়ে উঠেছে। আমি আমার মাকে একজন অসম সাহসী এবং মানসিক ভাবে ধীরস্থির দৃঢ়চেতা প্রকৃতির মহিলা বলে মনে করি। মায়ের শিক্ষাদীক্ষা ছিল হিন্দু ঐতিহ্যানুসারী : তাঁর শিক্ষাদীক্ষায় ধর্মীয়, দার্শনিক ও নৈতিক মূল্যবোধই ছিল সবকিছুর ওপর। সংস্কৃত ও মালয়ালম সাহিত্যে তিনি ছিলেন পারঙ্গম ; পুরাণ এবং দুই মহাকাব্য রামায়ণ-মহাভারতেও তাঁর বেশ পারদর্শিতা ছিল। তাঁর সাংসারিক অন্যান্য কাজকর্মের দায়দায়িত্ব বা যত চাপই থাকুক, মা তাঁর ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার প্রতি গভীর আগ্রহ দেখাতেন, যে আগ্রহ ছিল তাঁর নিজের শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে। আমার মা ছিলেন সনাতনপন্থী। কিন্তু তাঁর চিন্তায় ও কাজকর্মে ছিল যথেষ্ট অগ্রগামিতা, অর্থাৎ তিনি যেন সময়ের আগেই চলতেন।

আমাদের বাড়ি ছিল দার্শনিক ও ধর্মীয় আলোচনার অবাধ ক্ষেত্র। প্রত্যেক সময় শ্রোতার সংখ্যা হতো প্রায় ৫০-৬০, এবং প্রতিবার আলোচনার শেষে প্রত্যেককে চর্বচুষ্যভাবে জলখাবার দিয়ে আপ্যায়ন করা হতো। আমাদের বাড়িতে সমস্ত হিন্দু উৎসবের অনুষ্ঠান হতো। এমনকি সমান গুরুত্বের সঙ্গে খ্রীস্টান সন্ন্যাসিনীরা এসে খ্রীস্ট বন্দনাগীতি গাইতেন, বাইবেলের ব্যাখ্যা করতেন। আবার মুসলিম ধর্মগুরুদের অনেকেই আসতেন, কোরানপাঠ করতেন এবং ইসলামের শিক্ষাদীক্ষা নিয়ে আলোচনা করতেন। আমি এই মিশ্র সংস্কৃতির নিদর্শন উপভোগ করতাম শান্তভাবে, বিশেষত সমাগত এই বিচিত্র শ্রোতাদের আমি মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করতাম। এঁদের মধ্যে অধিকাংশেরই আন্তরিক মনোযোগ ছিল আলোচনার দিকে, আর সামান্য অংশের দৃষ্টি ছিল লোভনীয় আহার্যের দিকে।

সমাগত দর্শক-শ্রোতাদের অনেকেই প্রশংসা করতেন আমাদের বাড়ির বৈশিষ্ট্য ও সাজসজ্জার ; অন্যেরা পছন্দ করতেন এ বাড়িতে অবাধে থাকা-খাওয়ার সুবিধার জন্যে। প্রতিবেশীদের অনেকেই আমার মায়ের সংস্কারমুক্ত আচরণ খোলা মনে বা অসন্তোষের দৃষ্টিতে দেখতো। তারা ভাবতো, বিধর্মী প্রচারকদের বাড়িতে এনে সাদর আপ্যায়ন করে আমরা আমাদেরই ধর্মীয় মর্যাদাকে ছোট করে ফেলছি। কিন্তু আমার মা আন্তরিকভাবে যা ভালো বলে বুঝতেন তাই করতেন, অন্যের প্রশংসা বা নিন্দা-সমালোচনা গ্রাহ্য করতেন না। কিন্তু তাঁর সাহসী সিদ্ধান্ত কখনো ভুল হতো না। আমি বিশ্বাস করি, সেদিনের এইসব ঘটনা আমার মনে একটা স্থায়ী ছাপ রেখে গেছে। যদিও আমার নিজের বিশ্বাস, তবু বাস্তবে দেখা গেছে, পরবর্তী জীবনে নানা উপলক্ষে ও বহু প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়েও আমি খুব কম ক্ষেত্রেই ঘাবড়ে গেছি বা সমস্যায় ভুগেছি। যদি এই অবস্থায় কোনো ভালো দিক

বা ফল থাকে, তবে আমি অবশ্যই তা পেয়েছি আমার মায়ের কাছ থেকে।

আমার ছোটবেলার বিদ্যালয়ের দিনগুলি, এবং আমার সমষ্কার ত্রিবাংকুরের উচ্চ-মধ্যবিত্ত ঘরের অন্যান্য ছেলেদের জীবনের সঙ্গে খুব বেশি তফাত ছিল না। স্বভাবতই আমার বছর দুয়েকের মতো প্রাথমিক শিক্ষালাভ হয়েছিল—অংশত বাড়িতে এবং অংশত কাছাকাছি এক শিশু বিদ্যালয়ে। ১৯১৩ সনে, যখন আমার বয়স প্রায় আট, আমাকে ভর্তি করা হয় ত্রিবান্দ্রামের মডেল ইস্কুলে (Model School) ১৯১১ সনে মহারাজা শ্রীমূলম থিরুনাল রাজবর্মার পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপিত এই ইস্কুলটি রাজ্যের ভালো ইস্কুলগুলির অন্যতম। এই ইস্কুলটির সর্বভারতীয় খ্যাতি ছিল। মিঃ সি. এফ. ক্লার্ক (Mr. C.F. Clarke) একজন স্কটল্যাণ্ডবাসী, ছিলেন এই ইস্কুলের হেডমাস্টার।

আমার ইস্কুলের শিক্ষকরা ছিলেন খুবই কৃতী এবং পেশায় ছিলেন উৎসর্গীকৃত প্রাণ। তাঁরা নিয়ম শৃংখলা মানতেন এবং ছাত্রদের দিয়ে মানিয়ে নিতেন কড়া হাতে। একই সঙ্গে তাঁরা ছাত্রদের দেখতেন আপন পরিবারের মানুষ হিসেবে। সেকালের দিনগুলিতে শিক্ষক-ছাত্রের মধ্যে ছিল ঐতিহ্যময় গুরু-শিষ্যের মধুর সম্পর্ক। আমার ইস্কুলের প্রথম ছ'বছর ছিল উল্লেখযোগ্য ঘটনাহীন শাদামাটা। আমি ইস্কুলের লেখাপড়া করতাম এবং স্বাভাবিকভাবে ধরাবাঁধা ক্লাসে যাতায়াত করতাম অন্য যে কোনো ভালো ছেলের মতো। খেলাধূলায় আমি ছিলাম ফুটবলে আগ্রহী, এবং ছোটদের টিমের ক্যাপটেন হতাম। অতঃপর আমার ১৪ বছর বয়সের সময় যখন আমি উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করি, তখন সেখানকার বিতর্ক-সভা ছিল আমার লেখাপড়ার বাইরেকার প্রধান আকর্ষণ। কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গে, আমি সেই বিতর্ক-সভায় বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাপক আলোচনায় অংশ নিতাম। শিক্ষকরা স্বভাবতই জ্ঞানার্জনমূলক ও সামাজিক বিষয়ের ওপর এইরকম আলোচনায় উৎসাহ দিতেন, কিন্তু রাজনৈতিক বিষয়ে কখনোই নয়। যেহেতু আমি এবং অন্য কয়েকটি ছাত্র ছিলাম রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনায় আগ্রহী এবং ভারতে বিদেশি শাসনের নানা অসাম্যের বিরুদ্ধে আলোচনা করতাম, তাই কোনো কোনো শিক্ষক সেই আলোচনা থামিয়ে আমাদের বসিয়ে দিতেন। আবার, শিক্ষকদের একাংশ আমাদের নীরবে উৎসাহ দিতেন, এবং গভীর আগ্রহ নিয়ে সেই আলোচনা শুনতেন।

সেই মডেল ইস্কুলের বয়স এখন ৭০। আমি ছিলাম দ্বিতীয় বা তৃতীয় ব্যাচের ছাত্র। ইস্কুলের এগারো ক্লাসের মোট ছাত্র সংখ্যা তখন ছিল প্রায় ৮০০। ইদানিং যখন আমি ত্রিবান্দ্রামে কিছুটা অবসর পেয়েছিলাম, সেই মডেল ইস্কুল দেখতে যাবার সুযোগ হয়েছিল—১৯৮১ এপ্রিলে। আমি এখনকার হেডমাস্টার মিঃ মাধবন পিল্লাই এবং তাঁর সহকর্মী অন্য কয়েকজন শিক্ষকের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তাঁরা খুবই সদাশয় এবং আমাকে নিয়ে ইস্কুলের সমস্ত এলাকাটি ঘুরিয়ে দেখালেন—তার মধ্যে ইদানিংকালে তৈরি হোস্টেলটিও আমি দেখলাম। ইস্কুলটির প্রতিষ্ঠা-

কালের সময়ের তুলনায় একালের স্থানাভাবের তেমন কোনো সুরাহা না হওয়া সত্ত্বেও এখন ইস্কুলের ছাত্রসংখ্যা প্রায় ২৮০০। এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, বেশ কিছু অসুবিধা ও প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ ইস্কুলের সুনাম বজায় রেখে চলেছেন। এমন একটা বছর দেখা যায় না যে-বছর এই ইস্কুল অসংখ্য ট্রফি না জেতেও এর দ্বারা ইস্কুলের ছাত্রদের উচ্চমানের দক্ষতা ও কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

আমি নিম্ন মাধ্যমিক ক্লাসের পড়াশোনা যখন শেষ করি, তখন আমার বয়স প্রায় ১৩। অতঃপর আমি মডেল ইস্কুলের ম্যাট্রিকুলেশান ক্লাসে ভর্তি হই, ১৯১৯ সনে। যাই হোক, সেই ১৯১৯ সনটি আমার শিক্ষাজীবনে এক ক্রান্তিকাল হিসেবে চিহ্নিত। এমনকি ত্রিবাংকুরের ইতিহাসেও বছরটি গুরুত্বপূর্ণ।

৩

ক্রান্তিকাল

ব্রিটিশ শাসনের হাত থেকে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রাম শুরু হয় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে,—মোটামুটি আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে। ব্যতিক্রম—কয়েকটি বিচ্ছিন্ন প্রতিরোধের ঘটনা। কিন্তু ত্রিবাংকুর ছিল দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশ শতকের প্রথম পর্বেও বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ, দলছাড়া। প্রকৃতপক্ষে, দলগতভাবে রাজন্য প্রদেশগুলির ক্ষেত্রেও একথা সমান প্রযোজ্য। রাজন্যবর্গের অধিকাংশই দেখলেন স্বভাবতই তাঁদের স্বার্থ ছিল ভিন্ন,এবং দেশবাসীর অধিকাংশেরই স্বার্থ ছিল স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জন। তাই, রাজন্য প্রদেশগুলির শাসকবর্গ এবং তাঁদের প্রভাবে প্রজারাও ছিলেন ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে। তাঁদের অনেকেই ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী শাসনের পক্ষে, কারণ এই ব্যবস্থারই তাঁদের ব্যক্তিস্বার্থ আর খেয়ালখুশি চরিতার্থ হতো। ব্রিটিশ সরকারও তাঁদের এই স্বার্থ পূরণে সজাগ ছিল আপন সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে। এমনকি এইসব রাজন্য প্রদেশগুলিতে যাঁরা ব্রিটিশ সরকারের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে কথা বলতেন, তাঁরাও ব্রিটিশ শাসনের তেমন বিরোধী ছিলেন না। ত্রিবাংকুরেও এই অবস্থার খুব একটা তফাত ছিল না।

কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষদিকে জাতীয় জাগরণ দেশের প্রায় সর্বত্রই লক্ষণীয়-ভাবে দেখা দেয়। অতঃপর গান্ধীজীর দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ১৯১৫ সনে ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর দেশে স্বদেশী ভাবের সাড়া পড়ে যায়। তখন এই কেরালা রাজ্য

আর চুপ করে থাকতে পারেনি। চারদিকে প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনা জেগেছে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একটি শাখা অফিসও খোলা হয়েছে ত্রিবান্দ্রামে, সেই ১৯১৯ সনে। উদ্দেশ্য ছিল—রাজ্যের রাজনৈতিক মুক্তি ও সামাজিক সংস্কারের নামে সংগঠিত আন্দোলনগুলির সঙ্গে কংগ্রেসের কার্যকলাপের সমন্বয় সাধন করা। কংগ্রেসের ঘোষণা ছিল ঐ দুই বিষয়ের আন্দোলনকে স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বার্থেই অগ্রাধিকার দেওয়া—যাতে মূল লক্ষ্য স্বাধীনতা সংগ্রামই আরো শক্তিশালী ও জয়যুক্ত হয়।

রাজ্যের এই নতুন সংগঠিত কংগ্রেস শাখার অধীনে পৃথক একটি বিভাগ (অ্যাকশান কমিটি) খোলা হয়। যার উদ্দেশ্য—রাজ্যের সামাজিক অন্যায়-অবিচারের প্রতিকারের জন্যে কর্মসূচি স্থির করা। এক্ষেত্রে বহু প্রতীক্ষিত একটি লক্ষ্য ছিল—অস্পৃশ্যতার অভিশাপ দূর করা। সমাজের উচ্চবর্ণের হিন্দুরা তথাকথিত নিম্নবর্ণের ওপর এই অবিচার করে আসছে সুদীর্ঘকাল যাবত। সমাজের অন্যান্য সামাজিক ও আর্থিক অসামাজনিত অবিচারও ছিল ঐ অস্পৃশ্যতা ঘটিত আচরণের ফলশ্রুতি।

হিন্দুদের জাতিভেদ প্রথা সারা ভারতের একটা অভিশাপ বিশেষ। কিন্তু ভারতের মধ্যে কেরালার মতো জাতিভেদ প্রথা আর কোথাও এমন জটিল নয়। দেশের সর্বত্রই উচ্চবর্ণের হিন্দুরা মনে করেন, নিম্নবর্ণের কোনো লোকের সংস্পর্শে এলেই তিনি 'অপবিত্র' হয়ে যাবেন। কিন্তু কেরালার উচ্চবর্ণের হিন্দুরা আরো জঘন্য ধরনের অস্পৃশ্যতার প্রথা মেনে চলতেন—যাকে বহু নৃতত্ত্ববিদরা বলেন—অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকার প্রথা বা নীতি (distance pollution)। অর্থাৎ একজন নিম্নবর্ণের লোকের (*pulaya*) সংস্পর্শে এলেই, এমনকি যথেষ্ট দূরত্ব থেকেও তাকে দেখলেই উচ্চবর্ণের মানুষ অপবিত্র হয়ে পড়বেন। এর থেকে জঘন্য প্রথার কথা আর ভাবা যায় না।

শ্রীনারায়ণ গুরুর মতো, বিখ্যাত মানুষ, কুমারন আসনের মতো কবি-সাহিত্যিক, এবং নায়ার সার্ভিস সোসাইটির মতো সংস্কার কাজকর্মের ফলে এই অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে রাজ্যবাসীর চেতনা কিছুটা জাগ্রত হয়েছে। কিন্তু জাতিভেদের এই জঘন্য প্রথা এবং অন্যান্য কুপ্রথার বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রচার ও সংগ্রাম শুরু হয় প্রকৃতপক্ষে রাজ্যে জাতীয় কংগ্রেসের শাখা স্থাপনের পর নানা আন্দোলনের ফলে। রাজ্যের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় বিখ্যাত মানুষও একাজে অগ্রণী হয়েছিলেন—এই সংস্কার আন্দোলনকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। এইসব মানুষদের মধ্যে ছিলেন দুটি সংবাদপত্রের সম্পাদকদ্বয়—সি. কৃষ্ণান ও টি. কে. মাধবন; জর্জ জোসেফ—গান্ধীজীর ঘনিষ্ঠ এক শিষ্য; মান্নাথ পদ্মনাভ পিল্লাই, চাঙ্গানেশ্বরী পরমেশ্বরন পিল্লাই, কে. পি. কেশব মেনন, এম.এন. নায়ার, সি ভি. কুনজিরামান, আলুম্মুটিল গোভিন্দন চান্নার, কে. কেলাপ্পান, কৃষ্ণস্বামী আয়ার এবং আরো অনেকে।

এই সমস্ত মানুষের সংস্কার আন্দোলন ও তাঁদের চিন্তাধারা আমার মনের ওপর

গভীর প্রভাব ফেলেছিল। আমার মায়ের প্রেরণায় আমাদের বাড়ির ধর্মীয় উদারতার ফলে, আমি ইতিমধ্যেই দেশের যে কোনো স্থানের জাতিভেদ প্রথার বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলাম। আমার কয়েকজন বন্ধুর ক্ষেত্রেও একথা খাটে। যদিও প্রকাশ্যে সংস্কার আন্দোলন ও প্রচারের ক্ষেত্রে কোনোরকম নেতৃত্ব দেবার পক্ষে আমরা ছিলাম খুবই তরুণ, তবু আমরা এবিষয়ে খুবই বিচলিত বোধ করলাম এবং সংশ্লিষ্ট সংস্কার আন্দোলনের পক্ষে আমাদের সমর্থন জানাতে ও যথাসাধ্য কাজ করতে মনস্থ করলাম। আমরা এই আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে প্রায়ই স্বেচ্ছাসেবীর কাজ করে সাহায্য করতাম—যেমন আন্দোলন উপলক্ষে সমাগত ভিন্ন এলাকার মানুষদের দেখাশোনা করা, স্থানীয় সভা-সমিতি সংগঠিত করা, এবং অন্যান্য বহুভাবে নেতাদের সাহায্য করা। অনেক অব্রাহ্মণরা আমাদের উৎসাহ দিতেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ-শাসিত সংস্থাগুলি, স্বভাবতই যার মধ্যে সরকারি প্রশাসন যন্ত্রও আছে—তারা খোলাখুলি ভাবেই আমাদের কাজকর্মে অসন্তোষ প্রকাশ করতো।

আমার শিক্ষাক্রমের বাইরেকার এই জাতীয় কাজের ফলে, আমাকে অভাবিত মূল্য দিতে হয়েছিল। এবিষয়ে সঠিক অভিজ্ঞতার অভাবে, এবং সামাজিক কাজকর্মে আমার জড়িত থাকবার ফলে, আমার নিয়মিত লেখাপড়ার পথে যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হলো। ফলে ক্লাসের পড়াশোনার জন্যে প্রয়োজনীয় মনোযোগ ও সময় দিতে পারলাম না। এবং হাই-স্কুল পরীক্ষার প্রথম বছরের পরীক্ষায়, আমি কয়েকটি বিষয়ে ফেল করলাম। ভালো ছাত্র হিসেবে আমার বরাবরের সুনামের ক্ষেত্রে বিপর্যয়ের ফলে, আমি বেশ একটা ধাক্কা খেলাম। কিন্তু যে চিন্তা আমাকে আরো ধাক্কা দিল তা হলো, আমার ইস্কুলের পরীক্ষার ফলাফলে আমার মা খুবই হতাশ হয়ে পড়েছেন। যদিও আমার মায়ের মধ্যে হতাশা সহ্য করার শিক্ষা ছিল, অর্থাৎ বাইরের আচরণে তা কখনো ফুটে উঠতো না। তাছাড়া, লেখাপড়ার বাইরেকার এই সমস্ত কাজকর্মের জন্যে আমার কোনো দুঃখ বা অনুতাপ প্রকৃতপক্ষে ছিল না, কিন্তু মায়ের কথা চিন্তা করে আমি বিব্রত হয়ে পড়লাম। আমি ঐ মডেল ইস্কুল ছেড়ে দিয়ে অন্য কোনো ইস্কুলে ভর্তি হতে মনস্থ করলাম—যেখানে আমি শিক্ষাজীবনের নতুন অধ্যায়ের শুরু করতে পারবো। অতঃপর আমি ভানচিয়ূরের শ্রীমূলবিলাসম ইস্কুলে ভর্তি হলাম, সাধারণত যাকে বলা হতো ভানচিয়ূর ইস্কুল।

অবশ্য আমার ব্যর্থতার জন্যে অজুহাত খুঁজে লাভ নেই, এবং আমি তা করতেও চাইনে। তবু বহুদিনের কথা হলেও এখনো আমার মনে হয়, সত্যিই ঐ মডেল ইস্কুলের পরিবেশ ও ভাবধারা থেকে আমি সেদিন সরে গিয়েছিলাম। এর একটাই মাত্র কারণ হতে পারে: হেডমাস্টার মশায়ের আচরণগত ধরনধারণ এবং তার বিরুদ্ধে আমার নীরব অথচ কড়া মনোভাব। মিঃ ক্লার্কের মধ্যে ছিল ঠিক সেই একই ধরনের উদ্ধত গরম মেজাজ—যা প্রায় অধিকাংশ শাদা-চামড়ার মানুষরা

দেখিয়ে থাকে ভারতীয়দের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে। এটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, কিংবা নির্দিষ্ট কোনো অভিযোগের ঘটনাও নয়, গোপনও কিছু নয়। বরং এটা একটা সাধারণ ও প্রকাশ্য ঘটনা—শাদা চামড়ার মানুষদের মধ্যেকার জাতিগত প্রাধান্যের হামবড়া মনোভাব জাত। তাই মিঃ ক্লার্ক ইস্কুল চালাতেন যেন একটা উপনিবেশের অংশবিশেষ চালানোর মতো মনোভাব নিয়ে। এবং তাঁর এই মনোভাবের নীরব ও আন্তরিক প্রতিবাদ করেছি আমি—অন্যায়ের প্রতিবাদ করায় আমার প্রকৃতিগত বোধ থেকে।

বিপরীতভাবে, ভানচিয়ুর ইস্কুলের পরিবেশ ও ভাবধারা ছিল নিয়মকানুনের অযথা কড়াকড়ি মুক্ত, ঘরোয়া এবং উপভোগ্য ভাবেই বন্ধুত্বপূর্ণ। এর ফলে আমার অন্তর্গত সুপ্ত নীতিবোধ জেগে ওঠে। এমনকি আমার মনে একটা চিন্তার উদয় হয়—মনে হতে থাকে, যেন এই ইস্কুল বদলের ব্যাপারটা অনিবার্য ছিল, এবং প্রয়োজনও ছিল। ফলে, শীঘ্রই আমার আগেকার পরাজিত মনোভাবটা কেটে গেল এবং মনটা প্রফুল্লভাবে পূর্ণ হয়ে উঠলো। কেবলমাত্র ক্লাসের কাজেই নয়, আগের চেয়ে আরো বেশি করে আমি সামাজিক কাজকর্মে উৎসাহিত হয়ে উঠলাম।

কংগ্রেস সংগঠনের নেতৃত্বে সামাজিক কাজকর্মের চাপ যখন ব্যাপকভাবে বেড়ে গেল, অর্থাৎ তার মধ্যে আমি আরো বেশি করে জড়িয়ে পড়লাম, তখন একটা নতুন পরিস্থিতি প্রচণ্ডভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। সেটা দেখা গেল বিশেষভাবে যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে। এই পরিস্থিতির ফলশ্রুতিই হলো ১৯২২ সনের ছাত্র-ধর্মঘট—যার মধ্যে আমার কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর এবং আমারও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

বর্তমান শতকের প্রথম দু'দশকে ত্রিবাংকুরে এক অদ্ভুত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। একদিকে ছিলেন মহারাজা শ্রীমুলম থিরুনাল রামবর্মা—ইনি পছন্দ করতেন যেখানেই সম্ভব সর্বাপেক্ষা সংস্কার ব্যবস্থা চালু করা। অন্যদিকে ছিলেন তাঁর দু'জন দেওয়ান—সংকীর্ণচিত্ত, প্রতিক্রিয়াশীল ও আমলাতান্ত্রিক মনোভাব যুক্ত। এঁদের একজন হলেন—পি. রাজাগোপালাচারি, যিনি ছিলেন ক্ষমতালোভী। তিনি কোনোরকম বিরোধী সমালোচনা—যে কোনো দিক থেকেই হোক—বরদাস্ত করতেন না। তাঁর কোনো কোনো কাজকর্মে এমন আচরণ ও মনোভাব প্রকাশ পেত, যা উপনিবেশবাদী শাসকদের মধ্যেই দেখা যেত—উপনিবেশের মানুষদের যারা তথাকথিত 'নেটিভ' বলে মনে করতো। তিনি কোনো রকম স্বদেশি ভাবধারার প্রকাশ একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না। জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র 'স্বদেশাভিমানী'র সম্পাদক ছিলেন রামকৃষ্ণ পিল্লাই; ইনি পূর্বোক্ত দেওয়ানের নীতির সমালোচনা করে তাঁর পত্রিকায় একটি নিবন্ধ লেখেন। কিন্তু দেওয়ান রাজাগোপালাচারি তাতে ভীষণ রেগে গেলেন এবং পত্রিকা সম্পাদক পিল্লাইকে ত্রিবাংকুর

থেকে বের করে দেবার এবং তাঁর সংবাদপত্রের অফিস বন্ধ করে দেবার হুকুম দিয়ে প্রতিশোধ নিলেন।

সম্পাদক পিল্লাই কিন্তু দেওয়ান রাজাগোপালাচারির এরকম উদ্ধত আচরণে দমলেন না, বা নতি স্বীকার করলেন না। এমনকি দীর্ঘকালীন অসুস্থতা সত্ত্বেও পিল্লাই ঐ দেওয়ানের স্বেচ্ছাচারী কার্যকলাপের তীব্র প্রতিবাদ ও সমালোচনা করে গেছেন মৃত্যুকাল পর্যন্ত। রামকৃষ্ণ পিল্লাই-এর মৃত্যু হয় ১৯১৬ সনে, উত্তর মালাবারের কান্নানোরে। এই ঘটনাটি আমি এখনো ব্যক্তিগত ক্ষোভের সঙ্গে স্মরণ করি। কেননা, পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ পিল্লাই-এর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও বিশ্বস্ত কর্মী সি. পি. গোবিন্দ পিল্লাই আমার এক দিদিকে বিয়ে করেন। যদিও গোবিন্দর ওপর রামকৃষ্ণের মতো ত্রিবাংকুর থেকে বহিষ্কারের আদেশ ছিল না, কিন্তু গোবিন্দ স্বভাবতই তাঁর বন্ধু রামকৃষ্ণ পিল্লাই-এর ওপর বহিষ্কারের আদেশে রীতিমতো বিক্ষুব্ধ ছিলেন। গোবিন্দ পিল্লাই ছিলেন ভানচিযুর ইস্কুলে মালয়ালমের একজন খ্যাতিমান শিক্ষক এবং কয়েকখানি বইয়ের লেখক; তাঁর রচনার মধ্যে ছিল একটি প্রাচীন মালয়ালম 'গীতি সংগ্রহ'। যাই হোক, রামকৃষ্ণ পিল্লাই-এর বহিষ্কারের সময় তিনিও ছিলেন পূর্বোক্ত 'স্বদেশাভিমানী' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের সঙ্গে যুক্ত।

আরেক অত্যাচারী দেওয়ান ছিলেন দেওয়ান রাঘবায়া। তাঁর জনবিরোধী প্রশাসনের বিরুদ্ধে রাজ্যবাসীর অসন্তোষ ক্রমশই তীব্র আকার ধারণ করছিল। ছাত্রসমাজ বহুদিন থেকেই দাবি জানিয়ে আসছিল—শিক্ষাগত সুবিধা-সুযোগের বৃদ্ধি এবং ইস্কুলের বেতন হ্রাস—যাতে আরো বেশি ছেলেমেয়ে, বিশেষত সমাজের দুর্বল শ্রেণীর ছাত্ররা লেখাপড়ার সুযোগ পায়। এই জনপ্রিয় দাবির প্রতি কোনো-রকম সহানুভূতির পরিবর্তে, দেওয়ান রাঘবায়া ১৯২২ সনে এক আদেশ জারি করে কলেজের ছাত্রদের বেতন বাড়িয়ে দিলেন।

আমাদের অনেকেই বুঝলাম, এই ঘটনা হলো ছাত্র সমাজের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ বাধানো, এবং স্থির করলাম এর তীব্র প্রতিবাদ করতে হবে। বেতন বৃদ্ধির নির্দিষ্ট দিনের প্রাক্কালে, আমি এবং আমার চারজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছাত্র মিলিত হলাম থামবানুর রোডে একটি পুকুরের (Manjalikkalam) কাছে; এটা ছিল আমাদের খুশির মেলামেশার জায়গা—যেখানে আমরা প্রায়ই মিলিত হতাম তাস খেলার জন্যে। ঐ পুকুরটি এবং সংলগ্ন জায়গাটি পরে দখল করে নেওয়া হয়, এখন সেটি খেলার মাঠ হয়েছে। যাই হোক, পুকুরের কাছে মিলিত হয়ে আমরা আসন্ন বেতন বৃদ্ধির বিষয়ে অনেক আলোচনা করলাম এবং স্থির করলাম—যে ভাবেই হোক, দেওয়ান রাঘবায়ার এই বেতনবৃদ্ধির উদ্যোগ বন্ধ করতেই হবে।

পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, পরদিন আমরা ইস্কুল খোলার নির্দিষ্ট সময়ের এক ঘণ্টা আগেই ইস্কুলে গিয়ে হাজির হলাম। পিওনদের বের করে দিয়ে (তারা কোনো প্রতিরোধ করেনি) আমরা ইস্কুলের প্রবেশপথ বন্ধ করে দিলাম এবং ইস্কুল

এলাকার তদারকি দায়িত্ব হাতে নিলাম। অতঃপর আমরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গেলাম এবং ইস্কুলে সমাগত ছাত্রদের উদ্দেশে আমাদের বক্তব্য বোঝাতে লাগলাম : কেন আমরা ক্লাস বয়কট করতে চাই, এবং তারা যেন এই বয়কটের ডাকে সাড়া দিয়ে আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়। আমাদের এই ডাকে যে সাড়া পাওয়া গেল তা সম্পূর্ণ আমাদের অনুকূলে, এবং ক্লাসে ছাত্রদের অনুপস্থিতির সংখ্যা দাঁড়ালো ষোলো আনা। এইভাবে আমাদের ইস্কুলে যে ধর্মঘট হলো তা সারা ভারতে প্রথম ছাত্র-ধর্মঘট হিসেবে খ্যাতিলাভ করলো। কোনো কোনো পর্যক্ষবেক সেই ঘটনাকে সম্ভবত সারা দুনিয়ায় প্রথম ছাত্র-ধর্মঘট বলে মনে করেন।

ভানচিয়ুর ইস্কুল থেকে আমরা প্রায় সমস্ত ছাত্রই মার্চ করে গেলাম সেন্ট জোসেফ ইস্কুলে। ঐ ইস্কুল কর্তৃপক্ষের দিক থেকে সামান্য কিছু প্রতিরোধের পর সেখানে ছাত্রদের এক বিরাট জমায়েত হয়, এবং এই উভয় ইস্কুলের ছাত্ররা মিলিত হয়ে চললাম—মহারাজা রামবর্মার কলেজের দিকে। সেখানেও ছাত্ররা আমাদের সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা করলো। এই সময়ে ছাত্র সমাবেশ বিশাল জনতার আকার ধারণ করলো। আমাদের পরবর্তী লক্ষ্য হলো মডেল ইস্কুল—যে ইস্কুল ছেড়ে গত বছর আমি বর্তমান ভানচিয়ুর ইস্কুলে এসেছি। আমাদের মধ্যে কয়েকজন যেমন ভেবেছিলাম—ঝামেলা দেখা গেল, যখন আমার প্রাক্তন ইস্কুলের হেডমাস্টার মিঃ ক্লার্ক তাঁর ইস্কুলের প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে পড়ে আমাদের ছাত্র-সমাবেশের পথরোধ করতে চাইলেন। তাঁর এই তথাকথিত সাহসী প্রচেষ্টা ছিল যেমন অবাস্তব, তেমনই অগৌরবের—যার জন্যে তাঁকে প্রচুর মূল্য দিতে হয়েছিল। আমি এবং কয়েকজন সহযোগী নেতা বাধা দেওয়া সত্ত্বেও অন্য কয়েকজন ছাত্র মিঃ ক্লার্ককে প্রচণ্ডভাবে ধাক্কা দিল। ভাগ্যক্রমে ইস্কুলের একজন পিওন কোনো রকমে তাঁকে ধরে ফেলে নিরাপদে অন্যত্র নিয়ে যায়।

ত্রিবান্দ্রামের এই আন্দোলনের খবর শীঘ্রই চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। সারা ত্রিবাংকুরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি আমাদের এই আন্দোলনে সামিল হলো এবং তারা সহানুভূতিসূচক ধর্মঘট করলো। ফলে, দেওয়ান রাঘবায়া ধর্মঘটকারীদের সঙ্গে কোনোরকম আলাপ-আলোচনার পথে না গিয়ে, প্রশাসনকে কড়া প্রতিরোধের আদেশ দিলেন। ফলে ছাত্র ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটলো, এবং উভয়পক্ষে বেশ কিছু হতাহত হলো। রাস্তায় ইংরেজদের ওপর আক্রমণের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটলো—যার ফলে এই আন্দোলনকে ব্রিটিশ-বিরোধী বলে চিহ্নিত করার ঝোঁক দেখা গেল।

এমনকি আন্দোলনের একটা স্তরে জনৈক ইংরেজ ডেপুটি রেসিডেন্ট—মিঃ ক্লার্কের মতো সমান উদ্ধত ভাবাপন্ন—তিনি ভাবলেন একাই 'ছাত্রদের উপযুক্ত শিক্ষা' দিতে পারবেন। তিনি ঘটনাস্থলে হাজির হলেন ঘোড়াচাবুক নিয়ে একেবারে মডেল ইস্কুলের সামনে—যেখানে তখন সংঘর্ষ চলছিল। এসেই তিনি

ধর্মঘটকারীদের ওপর বেপরোয়া চাবুক চালিয়ে নিলেন। মুহূর্তের মধ্যে আন্দোলন-কারীদের মধ্যেকার কয়েকজনের নিক্ষিপ্ত পাথরের আঘাতে ঘায়েল হয়ে তিনি পড়ে গেলেন। বিক্ষুব্ধ জনতার মধ্যে প্রচণ্ড বিদ্বেষের ঢেউ উঠলো, যার ফলে তাঁর মৃত্যুও হতে পারতো, কিন্তু আমার নির্দেশে কিছু ছাত্রের সাহায্যে ঘটনাস্থল থেকে তাঁকে যথাসময়ে সরিয়ে দেবার ফলে তিনি সেযাত্রা প্রাণে বেঁচে যান। তবে আরো হিংসাত্মক ঘটনা ঘটলো, ত্রিবান্দ্রামে এবং অন্যান্য কয়েকটি শহরে বেশ কয়েকদিনের জন্যে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিঘ্নিত হলো। ঘটনাক্রমে শাসক সরকার তার পাশবিক শক্তির জোরে সেই আন্দোলন ভেঙে দিতে সমর্থ হলো।

দেওয়ান রাঘবায়া পুলিশকে নির্দেশ দিলেন আমাকে গ্রেফতার করতে। কিন্তু তাঁর সেই মনোবাসনা ব্যর্থ হলো। কারণ, আমার পারিবারিক নির্দেশে আমি আশ্রয় নিলাম আমার এক দাদা কুমারন নায়ারের কাছে। আমার এই দাদা ছিলেন সেনাবাহিনীর মেডিক্যাল অফিসার এবং তিনি থাকতেন সেনাবাহিনীর কোয়ার্টারে; এখানে পুলিশের পক্ষে অবাধ প্রবেশের অধিকার ছিল না। অতঃপর সরকার আমার ও আমার কয়েকজন সহযোগী নেতার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেবার আয়োজন করেন—পাবলিক প্রসিকিউটারের মাধ্যমে; তাঁর নাম মান্নু ভিলা অচ্যুতন পিল্লাই। অদৃষ্টের পরিহাসে তিনি আমার এক আত্মীয়, অর্থাৎ আমার বড় শ্যালকের ভাইপো। তাঁর মা এবং আমার মা ছিলেন বন্ধুর মতো, এবং এই দুই মহিলা ছিলেন বহু সামাজিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত: বিশেষত ত্রিবান্দ্রামের বিখ্যাত হিন্দু পূজার্চনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থান পদ্মনাভস্বামী টেম্পল-এর কার্যকলাপের সঙ্গে। এই পদ্মনাভস্বামীর মন্দিরের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মহারাজা রাম বর্মা স্বয়ং। ফলে এই সমস্ত ঘটনার ভিত্তিতে যে কেউ ভাবতে পারেন, ঐ পাবলিক প্রসিকিউটার ভদ্রলোক আমার প্রতি সদয় হবেন। কিন্তু ঘটনা দাঁড়ালো অন্যরকম। আমার কোনো দোষ না থাকা সত্ত্বেও সেই পাবলিক প্রসিকিউটার—অচ্যুতন পিল্লাই আমার বিরুদ্ধে সন্দেহ পোষণ করতে লাগলেন।

এই অচ্যুতন পিল্লাই-এর প্রথম স্ত্রী—যাঁর অকালে মৃত্যু হয়—তিনি ছিলেন আমাদের পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। পিল্লাইকে আমি খুড়ো বলে ডাকতাম এবং আমি নিজেকে তাঁর একজন প্রিয়পাত্র বলে ভাবতাম। এমনকি তাঁর দ্বিতীয় বিবাহের পরও (এই দ্বিতীয় স্ত্রী ছিলেন চারুভিলা পরিবারভুক্ত, তাঁরাও আমাদের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠ পরিচিত), আমাদের পারিবারিক সম্পর্ক আগের মতোই ভালো ছিল। গোলমালটা শুরু হলো ঠিক ছাত্র-ধর্মঘটের সময় থেকেই এবং সেটা হলো একান্তভাবেই পিল্লাই-এর দিক থেকে অযথা ভুল বোঝার দরুন। এক রাত্রিতে যখন তিনি তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর বাড়ির দিকে হেঁটে যাচ্ছিলেন, পথের মধ্যেই তিনি আক্রান্ত হন সম্ভবত তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ কোনো ছাত্রের দ্বারা। তাঁর হাতে আঘাত করে হারিকেন লণ্ঠন ফেলে

দেওয়া হয়, তখন তিনি থামবাম্বুর-এর কাছে আম্মান কয়েল-এর (ঐ নামের একটি মন্দির) মোড় পার হচ্ছিলেন। তখন পিছন দিক থেকে তাঁকে দারুন আঘাত করা হয়।

এই আক্রমণে আমার আদৌ কোনো রকম হাত ছিল না। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক, অচ্যুতন পিল্লাই ভাবলেন আমিই তাঁর আক্রমণকারী। আমাদের দীর্ঘকালীন পারিবারিক সম্পর্কের ভিত্তিতে এই সন্দেহ ছিল নিতান্তই অযৌক্তিক। এবং এক্ষেত্রে আমি এইমাত্র বলতে পারি যে, নিছক অকারণেও কিছু লোক হঠাৎ উন্মাদের মতো আচরণ করতে পারে। এই ঘটনার নিট ফল হলো এই যে, পাবলিক প্রসিকিউটার হিসেবে পিল্লাই-এব সঙ্গে সঙ্গে উচ্চপদস্থ সরকারি কর্তৃপক্ষও আমার রক্তপিপাসু হয়ে উঠলো। আমি যে কোনো সময়েই গ্রেফতারি পরোয়ানার আশংকা করছিলাম, কিন্তু আশ্চর্য সেরকম কিছু ঘটলো না। আমি বুঝতে পারলাম না কেন এমন হলো।

কিন্তু আমি অনেক পরে জানতে পেরেছিলাম—রেসিডেন্ট বা দেওয়ান, কিংবা পাবলিক প্রসিকিউটার পিল্লাই-এর কোনোরকম দয়ামায়ার জন্যে এরকম আশ্চর্য কাণ্ড হয়নি। ঘটনাটা হলো—নিউ দিল্লিস্থ ভারত সরকারের পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্ট বুঝেছিল আইনঘটিত এমন কোনো দুর্বলতা রয়েছে, যার ফলে এরকম ক্ষেত্রে নিছক আনুমানিক ভিত্তিতে কারো বিরুদ্ধে কোনো রকম কড়া ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না। ফলে, আগেকার ছাত্র-ধর্মঘট বা অন্য কোনো ঘটনায় আমার বিরুদ্ধে আদালতে কোনো রকম যুক্তিগ্রাহ্য মামলা দায়ের করতে ব্যর্থ হয়ে, রাঘবায়া এবং রেসিডেন্ট সাহেব সরকারের কাছে অনুমতি চাইলেন—আমাকে এবং আমার কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে আটক-আইনে কারারুদ্ধ করে রাখতে; সরকারি দৃষ্টিতে যেহেতু আমরা ছিলাম অবাঞ্ছিত এবং ভয়ংকর প্রকৃতির লোক। কিন্তু এ যুক্তিও নিউ দিল্লিস্থ সরকারি পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্ট খারিজ করে দিলেন। সুতরাং নিতান্ত বাধ্য হয়েই ত্রিবান্দ্রমের সরকারি কর্তৃপক্ষ আমাদের ব্যাপারে কোনো রকম ব্যবস্থা নেওয়ার মতলব পরিত্যাগ করে চুপচাপ হয়ে যায়।

বরং ইতিমধ্যে ডেপুটি রেসিডেন্ট সাহেব আমাদের ছাত্র-ধর্মঘট ভাঙতে গিয়ে বেপরোয়া চাবুক চালিয়ে যে হঠকারিতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তার ফলে রাজ্যবাসীর মধ্যে দারুণ ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব গড়ে উঠলো। এবং রাজ্যের যেকোনো স্থানে সংঘটিত সরকারি পীড়নমূলক ব্যবস্থা, বিশেষত রাজ্যের এইসব জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দমনের নামে উপনিবেশবাদী সরকারের অত্যাচার-নির্যাতনের খবর জানাজানি হওয়ার ফলে, রাজ্যের প্রায় সর্বত্রই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট সরকারি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধী মনোভাব যেন ক্রমবর্ধমান হয়ে উঠলো।

৪

সমাজ সংস্কার আন্দোলন

ছাত্র-ধর্মঘটের বেগ যত কমে আসতে লাগলো এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ক্রমশ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলো, ততই কিন্তু কংগ্রেস পরিচালিত অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আন্দোলন জোরদার হতে লাগলো। ১৯২৪ সনে ত্রিবাংকুরে এ বিষয়ে অর্থাৎ অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড আন্দোলন সংঘটিত হলো—যাকে বলা হয় 'ভাইকম সত্যাগ্রহ' (Vaikkom Satyagraha)। এই ভাইকম সত্যাগ্রহকে ঘিরেই আমার ছোটবেলার বেশ কিছু স্মৃতি জড়িয়ে আছে।

ভাইকম হলো মধ্য-ত্রিবাংকুরের একটা ছোট শহর। শিব মন্দিরের জন্যেই শহরটি বিখ্যাত। এখানে একটি বিশেষ আপত্তিকর প্রথা বা লোকাচার প্রচলিত ছিল—স্থানীয় ব্রাহ্মণ সমাজের একটি অংশের ইচ্ছায় আর নায়ারদের সহযোগিতায় প্রথাটি চালু হয়েছিল। প্রথাটি হলো—উক্ত শিব মন্দিরে যাবার রাস্তাটিই সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্ণের কাছে বন্ধ বলে ঘোষিত হয়েছিল। আমাব কয়েকজন ছাত্রবন্ধু এবং আমি এ বিষয়ে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। কিন্তু তাতে বাস্তবে কোনো ফল হয়নি। বোঝা গেল, একমাত্র বড আকারে সংগঠিত আন্দোলনই এ ব্যাপারে কিছু করতে পারে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের এই জঘন্য প্রথার দমন করতে পারে। এবং দেখা গেল কুপ্রথার বিরুদ্ধে ঘটনার গতিও ক্রমশ জোরদার হতে লাগলো।

স্বভাবতই স্থানীয় কংগ্রেস শাখা এই বিষয়ে নজর দিল এবং এর বিরুদ্ধে বড আকারে প্রচার অভিযান করার সিদ্ধান্ত নিল। অতঃপর এ বিষয়ে একটা বিশেষ কমিটি গঠিত হলো, তার মধ্যে ছিলেন—এ. কে. পিল্লাই, হাসান কয়া মোল্লা, কুরুর নীলকান্তন নামবুদিরিপাদ ও কে. পি. কেশব মেনন। এই দলটি ভাইকমে আসেন ১৯২৪ এর ফেবরুয়ারিতে এবং সভা-সমিতি করে জনমত গড়ে তুললেন--প্রস্তাবিত অস্পৃশ্যতা-বিরোধী আন্দোলনের পক্ষে। এইসব সভা-সমিতির অনুষ্ঠানে কেশব মেনন ছিলেন প্রধান বক্তা। কয়েকজন সহযোগী-ছাত্র এবং আমি স্থির করলাম ঐসব সভা-সমিতিতে উপস্থিত থাকবো—ক্লাস কামাই করে। এইসব সভা-সমিতিতে জন-সমাবেশ হতো বিশাল—আগে কখনো ত্রিবাংকুরে এমন সমাবেশ হয়নি। এরকম একটি সভায় প্রকাশ্যেই সিদ্ধান্ত করা হয়—একটি সত্যাগ্রহ আন্দোলন করে ঐ মন্দির কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হবে—যাতে তাঁরা জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত হিন্দুকেই ঐ মন্দিরমুখী রাস্তা ব্যবহার করার অধিকার দিতে বাধ্য হন, এবং এমনকি ঐ মন্দিরে পূজা দেবার স্বাধীনতাও তাদের থাকে।

অতঃপর ১৯২৪ মার্চে, তিনজন সত্যাগ্রহী কুনজাপ্‌পি (পুলাইয়া), বাহুলেয়া (এজাভা সম্প্রদায়ভুক্ত) এবং গোবিন্দ পানিক্‌কার (নায়ার সমাজভুক্ত)—এক বিরাট শোভাযাত্রা পরিচালনা করেন ঐ মন্দিরের দিকে। সমস্ত রাস্তা জুড়ে বিশাল জনতার সমাবেশ হলো, ফলে সরকার শক্তিশালী পুলিশ বাহিনী পাঠালো সেই জনসমাবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে। অতঃপর শোভাযাত্রা সেই মন্দিরমুখী নিষিদ্ধ এলাকার সামনে গিয়ে থেমে গেল। কিন্তু সেই তিনজন সত্যাগ্রহী এগিয়ে গেল নিষিদ্ধ এলাকার মধ্যে। পুলিশ ঘোষণা করলো— নায়ার সমাজের লোক হিসেবে গোবিন্দ পানিক্‌কার নিষিদ্ধ এলাকায় যেতে পারবে, কিন্তু নিম্নবর্ণের অপর দু'জন—কুনজাপ্‌পি ও বাহুলেয়া—সেখানে তাদের কোনো মতেই যেতে দেওয়া হবে না—তাদের থামতেই হবে। পানিক্‌কার প্রতিবাদ করলেন, এবং পুলিশকে বললেন—তাঁরা তিনজনে একসঙ্গে দল গঠন করেছেন এবং তাঁদের মধ্যে এরকম বিভেদ বা পার্থক্য করা চলবে না। অবিলম্বে ঐ তিনজন সত্যাগ্রহীকেই গ্রেফতার করা হলো গণবিশৃংখলা ঘটানোর অভিযোগে, এবং হাস্যকর লোকদেখানো সামান্য বিচারের পরই তাঁদের জেলবন্দী করা হলো।

জনতার মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ দেখা গেল। কিন্তু সেই আন্দোলনের সংগঠকদের ধৈর্য আর বুদ্ধিকে ধন্যবাদ—আন্দোলনকারীরা যথেষ্ট শান্তভাবে চুপচাপ রইলো। প্রায় দু' সপ্তাহ পরে টি. কে. মাধবন এবং কে. পি. কেশব মেনন গ্রেফতার হলেন—অস্পৃশ্যদের মধ্যে শিব-মন্দিরে যাবার নিষিদ্ধ রাস্তা ব্যবহার করতে উত্তেজনা ছড়ানোর অভিযোগে। তাঁদের নিয়ে যাওয়া হলো ত্রিবান্দ্রামে এবং ছ' মাসের কারাদণ্ড দিয়ে রাখা হলো সেনট্রাল জেলে। পরবর্তী কয়েকদিনের মধ্যেই আরো কয়েকজনকে জেলবন্দী করা হলো। এইসব ঘটনার তিক্ত স্মৃতি সর্বদাই জুড়ে থাকতো আমার মনে, এবং যখনই ত্রিবান্দ্রামে যেতাম তখনই আমার সারা মন তীব্র এক তিক্ততায় ভরে উঠতো। এই ত্রিবান্দ্রামেই ছিল আমার বাড়ি ('জানকীবিলাস' আমার স্ত্রীর নামে) এবং এখান থেকে পাহাড়ি এলাকা বেষ্টিত ত্রিবান্দ্রাম সেনট্রাল জেল বেশি দূরে ছিল না—যেখানে কেশব মেনন এবং অন্যান্য জাতীয়তাবাদীরা বন্দী হয়ে আছেন, এবং দেশবাসীর জন্যে ন্যূনতম মানবিক অধিকার দাবি করার জন্যে জেলখানায় তাঁরা অমানুষিক নির্যাতন ভোগ করছেন। এটা একটা আশ্চর্য পরিহাস, এই কারাগারটি নির্মিত হয়েছিল আমার বাবার তত্ত্বাবধানে—যখন তিনি ত্রিবাংকুরে চিফ এনজিনিয়ার ছিলেন।

যাই হোক, যতই আন্দোলনের নেতাদের প্রতি শাস্তি আর নির্যাতন বাড়তে লাগলো, ততই আন্দোলন জোরদার ও শক্তিশালী হতে লাগলো। জনমতও ক্রমশই অনিবার্য ভাবে দানা বাঁধতে লাগলো সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সপক্ষে। ইতিমধ্যে শ্রীমূলম থিরুনালের মৃত্যু হলো এবং রাণী সেথু লক্ষ্মীবাই অন্তর্বর্তীকালের জন্যে প্রতিনিধিরূপে রাজপদে অধিষ্ঠিত হলেন। পরলোকগত শাসকরাজের স্মৃতির উদ্দেশে

সম্মান প্রদর্শনের জন্যে সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া হলো, এবং তার মধ্যে ছিলেন মাধবন ও কেশব মেনন। রাণী সেথু লক্ষ্মীবাই ছিলেন অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীলা।

যাই হোক, এই আন্দোলন আরো শক্তিশালী হলো—ঐ একই বছরে যখন গান্ধীজী এলেন ভাইকমে। রাণী সেথু লক্ষ্মীবাইয়ের নির্দেশে গান্ধীজীকে রাজ-অতিথি হিসেবে অভ্যর্থনা জানানো হলো। ব্রিটিশ সরকার বিব্রত বোধ করলো, কিন্তু রাজ্যবাসী আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। গান্ধীজী এবং রাজ্যের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে কথাবার্তার ফলে একটা বোঝাপড়ায় পৌছানো গেল। সাময়িকভাবে সেই মন্দিরমুখী নিষিদ্ধ রাস্তায় জাতি-বর্ণভেদগত সমস্ত বাধা উঠে গেল, কিন্তু সেই শিব-মন্দিরে পূজার্চনা করার অধিকার সম্পর্কে মতভেদ রয়ে গেল কিছুকালের জন্যে। স্থির হলো মন্দিরে পূজার্চনার অধিকার কেবল ঐ শিব-মন্দিরের জন্যেই নয়, রাজ্যব্যাপী সমস্ত মন্দিরের ক্ষেত্রেই এই অধিকার আদায়ের জন্যে ব্যাপক আন্দোলন করতে হবে।

শেষ পর্যন্ত, বেশ কয়েক বছর ধরে সংগ্রাম চললো—চাঙ্গানেশ্বরী পরমেশ্বরন পিল্লাই, মন্নাথ পদ্মনাভন পিল্লাই এবং অন্যান্য কয়েকজনের নেতৃত্বে। অতঃপর মহারাজা শ্রীচিত্তিরা থিরুনাল ১২ নভেম্বর ১৯৩৬ তারিখে এক সরকারি আদেশ-বলে অস্পৃশ্যতা প্রথাকে বেআইনি ঘোষণা করলেন : জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী সকল মানুষকেই ত্রিবাংকুরের সমস্ত হিন্দু মন্দিরেই পূজার্চনার পূর্ণ স্বাধীনতা ও অধিকার মঞ্জুর করা হলো। গান্ধীজী এই ব্যবস্থাকে 'আধুনিক যাদু' (modern miracle) বলে স্বাগত জানালেন।

কিন্তু এটা একটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, সমস্ত ভালো কাজ বা জিনিসের মধ্যেই কিভাবে যেন একটা মন্দভাবের বীজ বা সূচনা দেখা যায়। আমাকে বলা হলো, রাজ্যের বর্তমান প্রচলিত অসংখ্য শ্রেণী-বিভাগ অনুযায়ী সরকারি চাকুরিতে 'কোটা' বা সংরক্ষণ প্রথা এবং অন্যান্য সুবিধা-সুযোগ দানের ক্ষেত্রে 'এজাভা' (Ezavas) সম্প্রদায়কে অনুন্নত হিসেবে দেখা হয়। এই ব্যবস্থা চালু রাখা সম্ভব হয়েছে সমাজের কিছু কায়েমি স্বার্থবাদী লোকের কারসাজির ফলে। অথচ হিন্দু সমাজের আরো কয়েকটি সম্প্রদায়ের মানুষকে সামাজিক ও আর্থিক দিক থেকে উন্নত করার জন্যে 'এজাভা' সম্প্রদায়ের মতো বিশেষ সংরক্ষণ প্রথা চালু রাখার এখনো প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু 'এজাভা' সম্প্রদায়ের লোকেরা এখন আর অনুন্নত নয়। তাছাড়া, বিশেষ সুবিধা-সুযোগ দানের জন্যে তাদের যতট অনুন্নত মনে করা হতো, এখন আর তারা আদৌ ততটা অনুন্নত নয় : এখন তারা সমাজের উন্নত অংশের মতোই সমান আধুনিক ও প্রগতিশীল।

অস্পৃশ্যতা যেমন কেরালার হিন্দু সমাজে দীর্ঘদিনের জঘন্য অভিশাপ স্বরূপ ছিল, এখানকার নায়ারদের মধ্যে প্রচলিত মাতৃতন্ত্র এবং যৌথ পরিবার প্রথাও ছিল স্থানীয় সামাজিক কাঠামোর অংশবিশেষ এবং তারও সংস্কারের প্রয়োজন ছিল। দীর্ঘদিনের প্রচলিত এই প্রথার এমন অবনতি ঘটেছিল যে, প্রকৃতপক্ষে এই পরিস্থিতি ক্রমশ স্বৈরতন্ত্রে পরিণত হয়েছিল। যৌথ পরিবারের করনাভনরা (Karanavans) গার্হস্থ্য ব্যাপারে তাদের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছিল ; যৌথ সম্পত্তি অপচয়ের ফলে এবং নানারকম দুর্নীতিমূলক উচ্ছৃংখল আচরণের জন্যে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। কয়েকটি যৌথ পরিবার ক্রমশ কার্যত ভেঙে যাচ্ছিল। কিন্তু মাতৃতন্ত্রের নানা উপসর্গ এবং তজ্জনিত বিরূপ পরিবেশ পরিস্থিতি পুরোপুরি ভাবে দূর করা যায় একমাত্র বৈধ আইনের দ্বারা ঐ প্রথার অবসান ঘটাতে পারলে।

এই প্রথা বড় বেমানান হয়ে ওঠে, বিশেষত যখন দেখা যায় উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ এবং নায়ারদের মধ্যে বেশ জমকালো আত্মীয়তার সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণরা, বিশেষত নামবুদিরি সমাজের মানুষরা অনুসরণ করে জ্যেষ্ঠের উত্তরাধিকার লাভের বিধি ; অর্থাৎ পরিবারের কেবল জ্যেষ্ঠতম পুরুষই বিবাহ করবে তার স্বগোত্রীয় কোনো মেয়েকে, এবং অবশিষ্টরা হয় বিয়ে করবে কিংবা নিছক 'সম্বন্ধম্' sambandham, liason) রাখবে নায়ার সমাজের কোনো মেয়ের সঙ্গে : অথচ তাদের কিংবা তাদের ঔরসজাত কোনো ছেলেমেয়ের ভরণ-পোষণের কোনোরকম বৈধ দায়দায়িত্ব থাকবে না। এটা রীতিমতো একটা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ এবং নিছক আচরণমূলক প্রথাগত সংস্কার। আমার সমভাবাপন্ন কয়েকজন ছাত্র এবং আমি আমাদের সমাজের এই বিচিত্র বিধি-বিধানের দিকে নজর দিলাম এবং এর বিরুদ্ধে প্রচার অভিযান শুরু করে দিলাম—বক্তৃতামূলক বিভিন্ন সভা-সমিতির মাধ্যমে। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, এই মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং আন্দোলনের সপক্ষে জনমত গড়ে তোলা—যাতে নায়ার সমাজে মাতৃতন্ত্রের পরিবর্তে পিতৃতান্ত্রিক প্রথার প্রবর্তন হয়।

এই ধরনের গ্রহণযোগ্য কোনো পরিবর্তনের পথে খোদ শাসক পরিবারের দিক থেকে বাধাই হলো অন্যতম প্রধান বাধা। আমার কোনো কোনো পাঠক হয়তো বিখ্যাত আট-নায়ার সামরিক নেতাগোষ্ঠীর গল্প (Ettuveettil Pillamar) শুনে থাকবেন ; এঁরাই ছিলেন ২৫০ বছর আগেকার ত্রিবাংকুর সেনাবাহিনীর গর্ব স্বরূপ। সেকালের শাসক রাম বর্মা (King Rama Varma, 1721-29) ছিলেন রাজা মার্তণ্ড বর্মার কাকা ; তাঁর এক নায়ার স্ত্রীর গর্ভজাত দুই ছেলে ছিল। রাজা রবি বর্মার মৃত্যুর পর রাম বর্মার ছেলেরা—পদ্মনাভন থাম্পি ও রামন থাম্পি—তাদের দাবি জানালো সেই সিংহাসনের ওপর, মার্তণ্ড বর্মার দাবি অগ্রাহ্য করে। পূর্বোক্ত আট-নায়ার সামরিক নেতাগোষ্ঠী পদ্মনাভন ও রামনের এই দাবি সমর্থন করলেন এবং এইভাবে নায়ার সমাজে মাতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে

পিতৃতন্ত্রের পক্ষে সর্বপ্রথম বিদ্রোহী হিসেবে তাঁরা খ্যাতিলাভ করেন। এমনকি তাঁরা বিভিন্ন মহল থেকেও এই দাবির সপক্ষে সাহায্য সহযোগিতা অর্জন করতে সমর্থ হন। কিন্তু মার্তণ্ড বর্মা এবং তাঁর অনুগামীরা এই অবস্থায় পড়ে বিশেষ বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। মার্তণ্ড বর্মা ও তাঁর দলবল অবশেষে ঐ আট-সামরিক নেতা-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনলেন এবং বিদ্রোহী নেতাদের সকলকেই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। কিংবদন্তি আছে যে. ঐ বিদ্রোহী বীর নেতাদের প্রেতাত্মা শাসক মার্তণ্ড বর্মার পরিবারের পেছনে লাগলো এবং অবশেষে তাদের শান্ত করা হয় বিরাট এক তামার পাত্রে বন্দী করে; একাজে সাহায্য করে ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা, এবং তাদের পাঠিয়ে দেয় চাঙ্গানেশ্বরীতে—নায়ার সমাজের এক বিশেষ শক্তিশালী ঘাঁটিতে।

আমার ছেলেবেলায় দেখেছি, ঐ আট-সামরিক নেতাগোষ্ঠীর সপক্ষে কোনো কথা বলাই ছিল অপরাধ। কিন্তু ক্রমশ সামাজিক পরিবেশের পরিবর্তন হয় এবং দেখা গেল, বহু নায়ার পরিবার ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় বেশি করে পিতৃতান্ত্রিক প্রথার প্রতি স্বেচ্ছায় আগ্রহ ও সমর্থন জানাতে লাগলেন। ১৯২০ সনের কাছাকাছি সময়ে পিতৃতন্ত্রের সপক্ষে আইন প্রণয়নের জন্যে প্রবল জনমত গড়ে উঠলো এবং সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি হলো। এই আন্দোলন যুব সম্প্রদায়ের নেতৃত্বেই পরিচালিত হলো—যার মধ্যে আমার মতো ছাত্র এবং তার সমর্থনও ছিল। ফলে শ্রীমুলম অ্যাসেম্বলিতে ১৯২৫ সনে এক সরকারি আইন পাশ হলো—যা 'নায়ার রেগুলেশান' (Nayar Regulation) নামে খ্যাত এবং যার ফলে কেরালায় মাতৃতন্ত্রের অবসান হলো—সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন সামন্তপ্রথার চিহ্ন পর্যন্ত বিলুপ্ত হলো। এটা একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা যে, ১৯২৫ অকটোবরে কেরালা সরকার বিখ্যাত আট-সামরিক নেতার গোষ্ঠীকে স্বীকৃতি জানালেন 'সাহসী বিপ্লবী বীর' হিসেবে--মার্তণ্ড বর্মার কথিত বিশ্বাসঘাতক হিসেবে নয়; এবং তাঁদের প্রেতাত্মাকে বন্দী করে রাখার জন্যে বিরাট যে তামার পাত্রটি ছিল, সেটি এখন প্রত্ন-নিদর্শন হিসেবে শোভা পাচ্ছে! প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, যে নায়ার রেগুলেশান-এর জন্যে এসব সম্ভব হলো, তার কৃতিত্ব অনেকখানি প্রাপ্য রাণী সেথু লক্ষ্মী বাইয়ের; তাঁর শিক্ষাদীক্ষা ও সমাজ সংস্কারে প্রবল আগ্রহ এবং তাঁর আমলে রাজ্যের দক্ষ প্রশাসনের ফলে।

উক্ত নায়ার রেগুলেশান যখন পাশ হলো, তখন আমার বয়স মাত্র ২০ বছর। এতদিন আমি যা প্রচার করছিলাম, এখন তা কাজে খাটানোর জন্যে আমি প্রস্তাব করলাম—আমাদের নেয়াট্টিংকারার যৌথ পরিবারের সম্পত্তি ভাগাভাগি করে নেওয়ার। আমার মা একটু বিব্রত বোধ করছিলেন, কেননা পরিবারের (থারাবাদ) প্রধান হিসেবে যৌথ ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে তাঁকেই এই ভাগাভাগির কাজে নেতৃত্ব দিতে হবে। কাজটা সুখের নয়। কিন্তু অনেক আগেই তিনি

সময়ের পরিবর্তনকে মেনে নিয়ে বলেছিলেন, যৌথ পরিবার-প্রথা তার উদ্দেশ্য হারিয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। মা ও আমি দু'জনেই গেলাম নেয়াট্টিংকারার বাড়িতে, এবং সম্পত্তি ভাগাভাগির প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সমাধা করলাম। যৌথ পরিবারের সম্পত্তি ভাগাভাগির কাজটা সর্বদাই অস্বস্তিকর। এক্ষেত্রে অসংখ্য অভিযোগ দেখা দেয়, কারণ সবাইকে খুশি করা কখনো সম্ভব নয়। তবে, মামলা-মোকদ্দমার ঘটনা এড়ানো যায় যদি আদান-প্রদানের মনোভাব নিয়ে কাজ করা যায়। ভাগাভাগির কাজ সমাধা করে আমি যেন স্বস্তি পেলাম—যখন দেখলাম এক্ষেত্রে অশান্তির ঘটনা খুব সামান্যই ঘটেছে। আমার মনে হলো, এটাই হচ্ছে প্রশাসনিক দক্ষতার পরিচয়।

তবুও এ ব্যাপারে আমার মনে দারুণ একটা দুঃখ ছিল। দুটি গরিব 'পুলাইয়া' পরিবার ছিল আমাদের যৌথ পরিবারের (থারাবাদ) ওপর দীর্ঘকাল যাবৎ নির্ভরশীল। আমি চেয়েছিলাম তাদের নামেও কিছু জমিজমার ভাগ দিতে—আমাদের পরিবারভুক্ত সকলের মতো সমান ভাগে। কিন্তু আমার কাকারা আপত্তি করলেন, এবং যখন আমি একাজে আইনগত কোনো সুরাহা করতে পারলাম না, আমি দমে গেলাম এবং সেই পরিকল্পনা ত্যাগ করলাম। আমার এই ব্যর্থতার প্রতিকার কল্পে, আমি একটি 'পুলাইয়া সংগম' (association) প্রতিষ্ঠা করলাম,—আমাদের নেয়াট্টিংকারায়। ফলে, ঐ এলাকার বয়স্কদের মধ্যে দারুণ আতঙ্ক লেগে গেল, এবং তারা আমাকে ঝামেলা সৃষ্টিকারী গোলমেলে লোক বলে মনে করলো। কিন্তু একাজে আমার মা কোনোরকম আপত্তি করেন নি। পূর্বেই বলেছি, আমার মায়ের চিন্তাধারা চলতো সময়ের আগে আগে। তিনি সর্বদাই প্রগতিবাদী যেকোনো সামাজিক কাজকর্ম পছন্দ করতেন। ঐ পুলাইয়া-সংগমের অধিবেশন হতো প্রায়ই। এরকম এক অধিবেশনের শেষদিকে, আমি এক বিরাট ভোজসভার আয়োজন করেছিলাম এবং আমি ঐ পুলাইয়াদের সঙ্গে বসেই একত্রে খেয়েছিলাম। তখনি একথা শহরের সবারই একটা আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠলো। ঐ এলাকার সংরক্ষণশীল মানুষদের কাছে আমি আরো অসন্তোষের কাজ করলাম, কিন্তু আরো অনেকেই ছিলেন যাঁরা আমার কাজে যথেষ্ট আগ্রহ উৎসাহ প্রকাশ করলেন।

৫

সংকট মুহূর্তে

১৯২৪ সনটা ত্রিবাংকুরের সামাজিক-অর্থনৈতিক ইতিহাসে একটা উল্লেখযোগ্য বছর। কিন্তু আমার পারিবারিক জীবনে বছরটা মর্মান্তিক বলে গণ্য হতে পারে। গভীর দুঃখের বিষয়, আমার বাবা-মা প্রায় ৫০ বছরের সুখী বিবাহিত জীবনযাপনের শেষে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। জানা যায়, আমার বাবা জ্ঞানত নিজে অন্য এক স্ত্রীলোকের ফাঁদে ধরা দিয়েছিলেন—এই মহিলার নিশ্চয় বাবার উচ্চপদ, সামাজিক মর্যাদা ও ধনসম্পদের প্রতি স্বার্থপরের মতো লোভাতুর দৃষ্টি ছিল। তৎকালীন সামাজিক ব্যবস্থায় এরকম ঘটনা এমন কিছু নতুন ছিল না, কিংবা তেমন কোনো বিশেষ কুনজরে দেখা হতো না। বহু স্ত্রীলোকই হয়তো এরকম ঘটনা এড়িয়ে যেতে বা উপেক্ষা করতে পারেন, কিন্তু আমার মা এই দুঃখে অভিভূত হয়ে গেলেন এবং বিচ্ছেদব্যথা একেবারেই সহ্য করতে পারলেন না। আমার মা এই ঘটনাকে চরম হীনতা ও অপমানজনক বলে মনে করলেন।

যদিও আমাদের ঘর-সংসারে আর আগের অবস্থা কখনো ফিরে আসবে না, তবে আমার বাবা আবার আগের মতো সমস্ত ছেলেমেয়েদের কাছেই অনুকূল হবার চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রায়ই আমাদের দেখতে আসতেন, আমাদের মঙ্গলামঙ্গলের খবর নিতেন এবং আমাদের জন্যে নানারকম উপহার ইত্যাদি আনতেন। তবু তাঁর দিক থেকে আমার মা'র সঙ্গে বিবাহবন্ধন ছিন্ন করার ঘটনাটি ছিল আমাদের সমস্ত চিন্তাভাবনার পক্ষে অসহ্য। কিন্তু জীবনের অনেক ঘটনাই যেমন দুর্জ্ঞেয় থেকে যায়, আমরাও ঘটনাটিকে সেই-ভাবে দেখেছিলাম এবং অবশ্যই নীরবে সহ্য করতে হয়েছিল।

আমার বাবা তাঁর দীর্ঘ জীবনে শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে বেশ সক্রিয় ছিলেন। তাঁর সক্রিয় পেশাদারি জীবন থেকে অবসর নেবার পর, জাতীয়তা-বাদী আন্দোলনের অগ্রগতি সম্পর্কে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে নজর রাখতে শুরু করলেন; এ বিষয়ে তাঁর পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। তিনি প্রায়ই ভারতে ব্রিটিশের শোষণ বিষয়ে ঠাট্টা-তামাশা করতেন, এবং কয়েকটি প্রকাশ্য অনুষ্ঠানেও মন্তব্য করেছিলেন: শাদামুখো শাসকরা এদেশের বহু মেধাবী যুবকের বিজ্ঞান প্রতিভাকে নষ্ট করে দিচ্ছে—শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থেকে এবং অন্যান্য ভাবেও তাদের প্রয়োজনীয় উন্নত শিক্ষাদীক্ষার সুবিধা-সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে।

ভারতের স্বাধীনতা যখন ঘোষিত হয় (১৫ আগস্ট ১৯৪৭), আমার বাবা আবেগে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর বয়সোচিত বাধার কথা ভুলে গিয়ে এক

দীর্ঘ শোভাযাত্রার নেতৃত্ব দিয়ে, হাতে বিরাটাকার এক জাতীয় পতাকা নিয়ে তিনি চললেন সেই ঐতিহাসিক ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখতে। অতঃপর বাড়ি ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি অচৈতন্য হয়ে পড়লেন এবং তাঁর মৃত্যু হলো। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৮ বছর। এটা এমনভাবে ঘটলো, যেন তিনি এই পৃথিবী ছেড়ে যাবার আগে ভারতের পুণ্য স্বাধীনতার ঘটনা প্রত্যক্ষ করার জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন।

১৯২৪ সনেও আমার ক্ষেত্রে এরকম একটা ঘটনা হয়েছিল। সেই বছর আমি গ্রাজুয়েট হলাম। অতঃপর আমার ইচ্ছে হলো বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেবো। কিন্তু তখনি আবার মনে একটা উচ্চভাবের আবেগ এলো—রাজনৈতিক ও সামাজিক কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত হবো। দেশের চারদিকে তখন ঐ ধরনের কার্যকলাপ বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। আমি স্থির করলাম, কলেজ ক্যাম্পাসের বন্দীজীবন থেকে এবার নিজেকে মুক্ত করতে হবে—যাতে করে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে ঠিকভাবে নিজেকে যুক্ত করতে পারি। এবং এসব আন্দোলনের ক্ষেত্রে নিজে একটা নেতৃত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবার কথাও চিন্তা করলাম—নিতান্ত নিষ্কর্মা একজন অনুগামী হিসেবে থাকতে মন চাইল না, বরং উপায় চিন্তা করতে লাগলাম, কিভাবে সেই অবস্থায় পৌঁছনো যায়।

যাই হোক, ১৯২৫ সনে আমাদের যৌথ পরিবার ভাগাভাগির পর আমি কিছু-কালের জন্যে কৃষিকাজে মন দিই। কিন্তু শীঘ্রই বুঝতে পারলাম, সাধারণত টুকরো-টুকরো স্বল্প পরিমাণ জমির ফলে—আমার জমিরও সেই অবস্থা—কৃষিকাজ আর্থিক দিক থেকে তেমন লাভজনক হবে না। একটা প্রস্তাব ছিল, আমি পাহাড়ি এলাকায় গিয়ে বিরাট আকারে চাষবাস করবো। বিশাল এলাকা জুড়ে বড় মাপের জমি নেবো, ফলে উর্বরা জমি পাবো, ফসলও ভালো হবে—তাড়াতাড়ি নগদ পয়সা ঘরে আসবে—যেমন চা, এলাচ, রবার ইত্যাদি চাষের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। এসবের অধিকাংশ চাষবাসের ক্ষেত্রেও ইংরেজরাই ছিল একচেটিয়া কারবারি—যারা অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো এখানেও ভারতীয়দের শোষণ করতো, মজুরদের সামান্য পয়সা দিয়ে নিজেরা মোটা টাকার লাভ করতো। আমি এরকম বিদেশিদের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে গিয়েছিলাম তাদের কলা-কৌশল জানতে,—যদিও তারা সাধারণত এবিষয়ে ভারতীয়দের কিছু জানাতে চাইত না।

সেই পরিকল্পনা কার্যকরী করতে পারলে ফলবতী হতো। কিন্তু আমি সেই চিন্তা পরিত্যাগ করি—মায়ের কড়া আপত্তির ফলে। তাঁর মতে আমার এই পাহাড়ি তরাই এলাকায় বসবাসের পরিকল্পনা আদৌ সংগত নয়; কারণ ঐ এলাকায় বসবাসের ফলে সর্বদাই আমাকে—ম্যালেরিয়া, বিষাক্ত সাপের কামড় আর বুনো জীবজন্তুর আক্রমণ ইত্যাদি নানা ঝামেলায় ভুগতে হবে। অবশ্য এ বিষয়ে আমার নিজের কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না। কিন্তু মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও কিছু

করার ইচ্ছা আমার ছিল না—বিশেষত তাঁর বিবাহিত জীবন ছিন্নভিন্ন হবার পরে ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে অন্তত কিছুটা সাহায্য-সহযোগিতা পাবার তাঁর একান্তই প্রয়োজন ছিল। ফলে, আমার পরিকল্পনা ত্যাগ করে আমি আবার পুরনো চিন্তায় ফিরে গেলাম।

আবার আমি রাজনৈতিক জীবনের দিকে আকর্ষণ বোধ করলাম। আগের চেয়ে এখন আরো পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, এক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা নেবার ক্ষমতা অর্জন করতে হলে, আমাকে আরো ব্যাপক অভিজ্ঞতা লাভ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রথম প্রয়োজন হলো, দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস আরো ভালো করে জানতে হবে, এবং এজাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে, দেশের যেখানেই এরকম ঘটনা ঘটুক না কেন, তার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকতে হবে বিশেষত অসহযোগ আন্দোলন এবং অন্যান্য স্বাধীনতা সংগ্রাম, তা প্রবল আকারেই হোক আর প্রাথমিক ভাবেই হোক, এবং যদি তা রাজন্য প্রদেশগুলিতে হয়, এমনকি ত্রিবাকুংরে হলেও সেই এক কথা।

কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ, এবং বাড়িতে আরো পড়াশোনার ফলে আমি বেশ বুঝতে পারলাম—ব্রিটিশ শিক্ষাবিদরা কিভাবে আমাদের শিক্ষাক্রমের মধ্যে দেশীয় ইতিহসের বিকৃতি ঘটিয়ে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের কৌশলে ভুলপথে পরিচালিত করে। আমাদের ইস্কুলের পাঠ্য বইপত্রে ভারতীয় বিষয়ে যেসব উপকরণ উপাদান থাকে, তা যেমন নির্ভরযোগ্য নয়, তেমন সঠিকও নয়; সেসব উপকরণ সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজনে নতুন করে বানানো। বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা চেপে দেওয়া হয়েছে, এবং বহু ঘটনার ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ক্লাসের পাঠ্য-তালিকায় ছাত্রদের ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অহেতুক গুণকীর্তন করা হয়, কিন্তু দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন সময়ে ব্রিটিশ শসেনের বিরুদ্ধে যে গণপ্রতিরোধ ঘটেছে, সে বিষয়ে কিছুই বলা হয় না; এমনকি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী যে শক্তিশালী প্রতিবাদের ঢেউ উঠেছিল, সে বিষয়েও একটা কথাও বলা হয়নি।

কখনো বলা হয়নি আমাদের দেশীয় বীরদের কথা, এমনকি কেরালার বীরদের কথা—যাঁরা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, এ দেশের কোনো পাঠ্যপুস্তকেই তার কোনো বিবরণ নেই। কেরালার ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনের নেতা ভারমা পাঝাশি রাজা (Varma Pazhassi Raja)—১৮০৫ সনে প্রাণ বিসর্জন দেন। ঐ একই সময়ে, ত্রিবাংকুরে নায়ার যোদ্ধারা দেওয়ান ভেলু থামপির নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে—ব্রিটিশ রেসিডেন্টের দমননীতির বিরুদ্ধে। কিন্তু ভিনসেন্ট স্মিথের প্রণীত ইস্কুলপাঠ্য ভারতের ইতিহাসে (Oxford History of India) ঐ ঘটনাকে 'অফিসারদের বিদ্রোহ' বলে অস্বীকার করা হয়। এর মধ্যে সত্য হলো এই যে, এই বিদ্রোহ ছিল কেরালা রাজের ওপর আমাদের স্বার্থ বিরোধী ব্রিটিশের চাপানো নতুন এক সান্ধিচুক্তি। স্বদেশপ্রেমিক দেওয়ান, ভেলু থামপি এর তীব্র প্রতিরোধ করলেন এবং দারুণ সংগ্রাম করলেন। তাঁর পরাজয় ও

মৃত্যুর কারণ—ব্রিটিশের হাতে ছিল সেরা অস্ত্র, কিন্তু থামপি দেখালেন জনগণের জাতীয়তাবাদী ভাবের চরম প্রকাশ। পরাজয়ের গ্লানির ফলে ভেলু থামপি তাই আত্মহত্যা করেন ১৮০৯ সনে—তাঁর অসংখ্য সমর্থকরা দারুণ দুঃখে বিমর্ষ হলো। বিদেশি ইতিহাসকার ভিনসেন্ট স্মিথ এই ঘটনাকে মাত্র একটি কথায় শেষ করে দিলেন—থামপিকে 'উন্মাদ বিদ্রোহী' বলে। ইস্কুল-পাঠ্য বইগুলিতে এইভাবেই ব্রিটিশরা আমাদের মগজধোলাই করতো। আমার কাছে এটা পরিষ্কার হলো যে. কোনো ঘটনার প্রকৃত চিত্র পেতে হলে আমাদের যা শেখানো হয়েছে তা ভুলে যেতে হবে এবং অন্যান্য সূত্র থেকে সেই ঘটনাকে নতুন করে জানতে হবে।

ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের বিরোধিতা শুরু হয় প্রকৃতপক্ষে ভারতকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করে নেবার প্রচেষ্টা থেকে। একাজ শুরু করেন রবার্ট ক্লাইভ, বিগত ১৭৫৭ সনে পলাশির যুদ্ধের পর থেকেই। ফলে বিদ্রোহ হয় এবং চলতে থাকে প্রায় ১৫০ বছর ব্যাপী দেশের বিভিন্ন স্থানে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, দাক্ষিণাত্য ইত্যাদি অঞ্চলে। ইতিমধ্যে আমি কেরালার মাত্র দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ করেছি। বিগত ১৮৫৭ সনে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে গণবিদ্রোহ ছিল ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবের চরম প্রকাশ এবং তা ছড়িয়ে পড়লো দেশের প্রায় সর্বত্র : যদিও পক্ষপাতদুষ্ট ইংরেজ ইতিহাসবিদরা এইসব বিরোধিতা নিছক 'সিপাহি বিদ্রোহ' বলে ব্যাখ্যা করতে লাগলো।

চারদিকে বিভিন্ন অঞ্চলে নেতারা স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে তুলতে লাগলেন এবং জনসমাবেশে তারা স্বাধীনতার বাণী শোনাতে লাগলেন। এই অবস্থা চললো বেশ কয়েক দশক যাবৎ। এইসব নেতাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম রীতিমতো উল্লেখযোগ্য—গোপালকৃষ্ণ গোখেল. বালগঙ্গাধর তিলক, অরবিন্দ ঘোষ, লালা লাজপত রায়. সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, মদনমোহন মালব্য প্রমুখ। তারাই দেশে জাতীয় ভাবের জোয়ার আনলেন—যা অধিকাংশ ভারতীয়ের মনে প্রদীপ্ত হয়ে উঠলো। জাতির চৈতন্য উদয়ে তিলক প্রভূত সাহায্য করলেন ১৯০৬ সনে, তাঁর বিখ্যাত শ্লোগান তুলে—'স্বরাজ' (স্বাধীনতা) আমার জন্মগত অধিকার। অরবিন্দর বাণীও কম রোমাঞ্চকর ছিল না। বহুমুখী প্রতিভাধর রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠা করলেন তাঁর স্বদেশি ভাবধারায় রঞ্জিত চমৎকার গদ্য-পদ্যের মাধ্যমে। বঙ্কিমচন্দ্র দেশবাসীকে চরম উত্তেজনার স্বাদ দিলেন তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস আনন্দমঠের সঞ্জীবনী মন্ত্রতুল্য বন্দেমাতরম গান শুনিয়ে। দেশবাসী ব্রিটিশের সমস্ত বাধানিষেধ উপেক্ষা করে চারিদিকে জনসমাবেশ ঘটাতে লাগলো।

গান্ধীজী যখন এই দৃশ্যপটে আবির্ভূত হলেন ১৯১৫ সনে তাঁর দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর, দেশে তখন যেন জাতীয়তার ঢেউ লেগেছে এবং একটা

অদম্য ক্ষমতা হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে। ব্রিটিশের দমননীতি চললো কঠোর ভাবে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী যোদ্ধারা চরম দুর্দশা ভোগ করতে লাগলেন বীরের মতো এইরকম অসংখ্য আত্মোৎসর্গকারী বীর ও নেতাদের মধ্যে আছেন – মতিলাল নেহরু, জওহরলাল নেহরু, চিত্তরঞ্জন দাশ, বল্লভভাই প্যাটেল, চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারি, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, সুভাষচন্দ্র বসু এবং আরো অনেক। তাঁদের মধ্যে অনেকের সঙ্গেই গান্ধীজীর মতভেদ ছিল – দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে সংগ্রাম কৌশল প্রসঙ্গে। কিন্তু লক্ষ্য অর্জন তথা স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁরা ছিলেন অভিন্ন। দেশের মুসলিম সম্প্রদায়ও এ ব্যাপারে পিছিয়ে ছিল না, তাদের মধ্যে ছিলেন অদম্য আলি ভাইরা – মহম্মদ ও শৌকত, এবং আবুল কালাম আজাদ, আবদুল গফফার খান (ভালোবেসে বলা হয় সীমান্ত গান্ধী) এবং অন্যান্যরা। মহম্মদ আলি জিন্না প্রথমদিকে কংগ্রেসের সঙ্গেই ছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় সম্পর্ক ছিন্ন করে তিনি চলে গেলেন মুসলিম লিগের নেতৃত্ব দিতে। তার ফলেই শেষ পর্যন্ত দেশভাগ হলো এবং এটাই হলো ব্রিটিশের কুখ্যাত ভেদনীতির পরিণাম।

কার্জনের সময়ে ভাইসরয় থাকাকালে (১৮৯৯-১৯০৫) এবং তাঁর পরবর্তীকালে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন বাংলায় এবং অন্যত্র – পূর্বভারতে এবং উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের কয়েকটি জায়গায় – এই আন্দোলন সশস্ত্র বিপ্লবের আকার ধারণ করলো। তাদের অধিকাংশই গুপ্ত কার্যকলাপ চালাতে লাগলো – যেহেতু ব্রিটিশ সরকার প্রকাশ্য জনসমাবেশের বিরুদ্ধে চরম দমননীতির পথ ধরলো। তাই বেশ কয়েকটি গোঁড়া জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের আবির্ভাব হলো। এইসব পত্রিকার শক্তিধর স্বদেশি লেখকদের প্রকাশিত জোরালো রচনাগুলিতে ব্রিটিশ সরকারের নৃশংসতা ও আমলাতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারী মনোভাবের কড়া প্রতিবাদ হতে লাগলো – দেশবাসী/পাঠকদের মনে এক তীব্র আবেগের সঞ্চার করলো। সংবাদপত্রের ছাপাখানা থেকে যেন আগ্নেয়গিরির আগুন বেরোতে লাগলো। সরকারি আদেশবলে ম্যাজিস্ট্রেটরা বন্দেমাতরম ধ্বনি বা শব্দের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দিলেন – এশব্দ তাদের কানে যেন সাম্রাজ্যবাদের মৃত্যুঘণ্টার মতো শোনালো, বিশেষত বাংলায় এবং অন্যত্র। কিন্তু দমন-পীড়ন নীতি চালিয়ে ব্রিটিশ সরকার তেমন সুবিধে করতে পারেনি। বন্দেমাতরম মন্ত্রের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র যে স্বদেশিভাবের জোয়ার বইয়ে দিলেন, সরকারি দমননীতি তার মুখে প্রায় অচল।

ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সহিংস কার্যকলাপ চলতে লাগলো এক গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠনের মাধ্যমে। এই সংস্থার কয়েকজন সদস্য প্রাণঘাতী সাংঘাতিক বোমা তৈরির কলাকৌশল গোপনে শিখে নিলেন। এই বিপ্লবী আন্দোলনের বেশ কয়েকজন নেতাকে সন্দেহবশে গ্রেফতার করে সরকার থেকে তাদের দোষী সাব্যস্ত করা হলো। এই ধরনের গুপ্ত বিপ্লবীদের গ্রেফতার করার জন্যে সরকারের বহু

প্রচেষ্টা সত্ত্বেও রাসবিহারী বসুর জন্যেই তারা পেরে উঠছিল না। কিন্তু একসময় দেখা গেল রাসবিহারী নিজেই বিপদগ্রস্ত এবং বাধ্য হয়েই তিনি পালিয়ে গেলেন জাপানে—সেখান থেকেই ভারতের স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন বলে। পরবর্তীকালে, যেন অনিবার্যভাবেই আমি তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠরূপে যুক্ত হলাম—একই স্বাধীনতা সংগ্রামের উদ্দেশ্য নিয়ে—সেকথা ক্রমশ এ বইয়ের যথাস্থানে বলা হবে।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্যে বিদেশে সংগঠিত সংস্থা থেকে ভারতীয় যুবকদের সংগঠনের জন্যে প্রাথমিক ভাবে উল্লেখ-যোগ্য কাজ হয়েছে। এসব সংস্থার শাখাকেন্দ্র ছিল আমেরিকা, ইয়োরোপে চীন, বর্মা ও দাক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, জাপান ইত্যাদি দেশে। বিদেশে অবস্থিত এরকম সংস্থাগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো আমেরিকার গদর পার্টি—ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া কয়েকজন ভারতীয় ছাত্রের দ্বারা সংগঠিত, ১৯০৭ সনে। সংগঠনের কাজ শুরু হয় বাংলার উৎসাহী যুবক তারকনাথ দাস কর্তৃক এবং তা ক্রমে শক্তিশালী হয়ে ওঠে পাঞ্জাবের অদম্য হরদয়াল সিং-এর হাতে। প্রবাসের অবস্থান থেকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আমেরিকা এবং কানাডার শিখ সম্প্রদায়ের একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

১৯০৯ সনে ব্রিটিশের তৈরি বিভেদ সৃষ্টিকারী আইন 'এশিয়াটিক ইমিগ্রেশান অ্যাক্ট'-এর ফলে আমেরিকার ভারতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দারুণ ক্ষোভের সৃষ্টি করলো। এই আইনের জবাবে অনেকেই স্থির করলেন, বিপ্লবী আন্দোলনের সংগঠনকে আরো জোরদার করতে হবে। এই সব প্রচেষ্টার ফলে সৃষ্টি হলো: আমেরিকায়—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশান অফ দি প্যাসিফিক কোস্ট, ইণ্ডিয়ান ইনডিপেণ্ডেন্স লিগ, জার্মানিতে ইণ্ডিয়ান ইনডিপেণ্ডেন্স কমিটি এবং এই জাতীয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। এই সংস্থা-গুলিই বিভিন্ন দেশে গুপ্ত-বিপ্লবী কার্যকলাপ চালাতো এবং পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ রাখতো। ভারতের গুপ্ত-বিপ্লবী কার্যকলাপের সঙ্গেও এদের সক্রিয় যোগাযোগ ছিল, বিশেষত বাংলা এবং পাঞ্জাবের গুপ্ত সংস্থাগুলির সঙ্গে। বিদেশের এরকম সংস্থার উল্লেখযোগ্য নেতাদের মধ্যে ছিলেন ইয়োরোপের কৃষ্ণ ভার্মা, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (সরোজিনী নাইডুর ভাই), চম্পক রমন পিল্লাই এবং বরকতউল্লা; তুর্কির মহম্মদ-অল হাশান, এবং আফগানিস্থানের আবদুল্লা সিন্ধী ও মহেন্দ্রপ্রতাপ।

ব্রিটিশ সরকারের মদতে আমেরিকা ও কানাডায় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের যথেষ্ট দুঃখকষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করতে হতো। কানাডার সংগ্রামীদের ইতিহাসে একটা চরম দুঃখজনক অধ্যায় হলো ১৯১৪ সনের কোমাগাতামারু পর্ব (Komagata Maru, 1914)। ভাংকুভারের শিখ সম্প্রদায়, হংকং-এর এক এজেন্টের মাধ্যমে ব্যবস্থা করে—'কোমাগাতামারু' নামে এক জাপানি জাহাজে করে সহ-যোদ্ধাদের নিয়ে আসবে পাঞ্জাব থেকে কানাডায়। কিন্তু কানাডিয়ান কর্তৃপক্ষ

তাদের কোনো বন্দরে এরকম জাহাজ আসার অনুমতি দিতে অস্বীকার করে এবং বেশ কয়েকটি অবাঞ্ছিত ঘটনার পর জাহাজটিকে সিঙ্গাপুর হয়ে কলকাতায় ফেরৎ পাঠানো হয় – জাহাজের যাত্রীদের অশেষ দুঃখকষ্টের মধ্যে পড়তে হয়। যাত্রীদের এই দুঃখকষ্ট আরো বেড়ে যায় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের অমানুষিক আচরণের ফলে। সিঙ্গাপুরে ব্রিটিশের জনকয়েক এজেন্ট তাদের ওপর বন্দুক উঁচিয়ে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করলো এবং ভারতে জাহাজ থেকে মাল ওঠানামা করানোর ব্যাপারে নানারকম কড়াকড়ি শুরু করে দিল। ব্রিটিশের এইসব কার্যকলাপ খুবই নিন্দনীয় হয়ে উঠলো।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে, ভারত সক্রিয়ভাবেই ব্রিটেনের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সমর্থন করছিল এবং ভারতীয় সেনারা বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে সংগ্রাম করে মৃত্যুবরণ করছিল তাদের ঔপনিবেশিক প্রভুর জয়লাভের জন্যে। মোটামুটি ৮ লক্ষ ভারতীয় সেনা, বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে ও অন্যান্য স্থানে ব্রিটিশের পক্ষে কাজ করছিল। এবং প্রায় ৭০ হাজার সেনা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করে, দারুণ এক অমানুষিক দুঃখকষ্ট চাপিয়ে দেয় উপনিবেশবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শাসক তার সাম্রাজ্যভুক্ত এক দেশের নিরীহ মানুষদের ওপর। ভারতের ন্যূনতম প্রত্যাশা ছিল বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেনের প্রতি ভারতের এই সমর্থন-সহযোগিতা বিফলে যাবে না, অন্তত তার নিজের স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে যোগ্য স্বীকৃতি পাবে। কিন্তু যুদ্ধের পর দেখা গেল, ব্রিটেনের মতিগতি ও আচরণে ভারতের স্বাধীনতা দানের প্রতি বিন্দুমাত্র সমর্থন ও সহযোগিতার লক্ষণ দেখা গেল না। ফলে ভারতবাসীব মধ্যে চরম হতাশার ভাব দেখা গেল, এবং ব্রিটেনের কার্যকলাপকে আন্তরিক বিশ্বাসের প্রতি ঘোর বিশ্বাসঘাতকতা বলে গণ্য করা হলো। সারাদেশে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব চরম আকার ধারণ করলো। বিপ্লবী দলগুলি সারাদেশে সংগঠিতভাবে ছড়িয়ে পড়লো এবং ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে সক্রিয়ভাবেই সংগ্রামী আহ্বান জানিয়ে প্রত্যাঘাত শুরু করে দিল।

অথচ জনগণের দাবিদাওয়া যা সাধারণত কংগ্রেসের মাধ্যমে ধ্বনিত হয়ে থাকে – তা হলো শান্তিপূর্ণ। কংগ্রেসের মাধ্যমে তারা চাইলো আপোষরফা ও আবেদন-নিবেদনের দ্বারা একটা মীমাংসা। কিন্তু উপনিবেশবাদী শাসক সরকার ক্রমাগত একের পর এক দমনপীড়ন নীতি চালিয়ে গেল – ক্রমবর্ধমান গণ-আন্দোলনগুলি বিচূর্ণ করার উদ্দেশ্যে। প্রথমেই এলো 'রাওলাট বিল' – যে কোনো সন্দেহজনক রাজনৈতিক কর্মীকেই সরকারি নিরাপত্তার স্বার্থে আটক রাখার ঢালাও ক্ষমতা দেওয়া হলো; বিশেষত পাঞ্জাবের আন্দোলনগুলি দমন করার জন্যে। গান্ধীজী এই বিল বা আইনকে 'ব্ল্যাক বিল' বা কালা-কানুন বলে আখ্যা দিলেন – ভাইসরয়কে পাল্টা আহ্বান জানালেন এই বিলে তাঁর সম্মতি প্রত্যাহার করে নিতে। কিন্তু

যখন তাঁর কথায় কোনোরকম কর্ণপাত করা হলো না, তার প্রতিবাদে গান্ধীজী এক হরতালের ডাক দিলেন—৬ এপ্রিল ১৯১৯ তারিখে।

অতঃপর শীঘ্রই, অর্থাৎ ১০ এপ্রিল তারিখে ঘটলো অমৃতসরের সেই মর্মান্তিক ঘটনা। দু'জন সম্মানিত কংগ্রেস নেতা—ডক্টর কিচলু ও ডক্টর সত্যপালকে কোনো যুক্তিসংগত কারণ ছাড়াই অমৃতসরের ডিসট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট আটক করলেন। যখন এই গ্রেফতারের কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো, জনতা মিছিল করে গেল পুলিশ ও নগর কর্তৃপক্ষের সদর দফতরগুলিতে, জোরালো দাবি জানালো—উক্ত দুই কংগ্রেস নেতার অবিলম্বে মুক্তি চাই। পুলিশ যখন এই মিছিলের পথ অবরোধ করলো, দেখতে দেখতে হাতাহাতি আর মারামারি লেগে গেল এবং সরকারি পক্ষে বেশ কিছু হতাহতের ঘটনাও ঘটলো। পাঁচজন ইংরেজ নিহত হলো। স্বল্প সময়ের মধ্যেই এখানে-সেখানে এ রকম ঘটনা আরো ঘটলো। অমৃতসরের কয়েক জায়গায় কারফিউ জারি হলো। শিখরা উত্তেজিত হয়ে উঠলো। অতঃপর ১৩ এপ্রিল তারিখে, হিন্দু নববর্ষের দিন, পাঞ্জাবে তথা সারা দেশের জনসাধারণের মধ্যে আবেগ ও উত্তেজনা চরম আকার ধারণ করলো—ভারতে ব্রিটিশ অত্যাচারের ইতিহাসে হলো সবচেয়ে জঘন্য দিন: ব্রিটিশ বর্বরতার এই ঘটনাই ইতিহাসে জালিয়ানওয়ালা বাগের ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রইলো।

আনুমানিক ২০ হাজার লোকের সমাবেশ ঘটেছিল অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালা বাগ নামে পরিচিত সেই পার্কে। এই বাগে যাতায়াতের একটিই মাত্র গেট বা পথ এবং সেই পথে মাত্র কয়েকজন একসঙ্গে যাতায়াত করতে পারে, অর্থাৎ তেমন প্রশস্ত নয়। আচমকা হঠাৎ সেখানে এসে হাজির হলো দুশো সৈন্য, একজন ব্রিগেডিয়ারের নেতৃত্বে—নাম তাঁর ডায়ার সাহেব (R. E. H. Dyer)। তিনি এসেই হুকুম দিলেন সেই বাগের জনসমাবেশের উপর তখনই গুলী চালাতে—তিনি আগে থেকে জনতাকে কোনোরকম সাবধান করেও দিলেন না—যাতে তারা চলে যাবার সময় পায়। এমনকি বাগে যাতায়াতের একটিমাত্র সংকীর্ণ পথও সেই সৈন্যরা আগলে রইলো—যাতে কেউ বেরোতে না পারে কোনোক্রমে। ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট গিয়ে বিদ্ধ করলো প্রায় ৪০০ নিরীহ নির্দোষ নিরস্ত্র ভারতীয়কে এবং দারুণভাবে আহত হলো প্রায় ১২০০ জন। রক্তপিপাসু ব্রিগেডিয়ার ডায়ার সেদিন চেয়েছিলেন, সারা পাঞ্জাবের মানুষকে একটু শিক্ষা দিতে; এবং একমাত্র যে কারণে সেদিন হতাহতের সংখ্যা তেমন বেশি হয়নি বলে ডায়ারের আফশোষ তা হলো ঐ সময়ে তাঁর গুলী-গোলা ফুরিয়ে গিয়েছিল। এই অত্যাচার ছিল ইতিহাসের অবর্ণনীয় পাশবিক ঘটনা। এমনকি উইনস্টন চার্চিল, যিনি কোনোক্রমেই ভারতের মিত্র নন—তিনিও জালিয়ানওয়ালা বাগের ঘটনাকে একটা দানবিক ঘটনা, ইংরেজের ইতিহাসে জোয়ান-অফ আর্ককে পুড়িয়ে মারার ঘটনার পর এক জঘন্য কলঙ্ক হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

অমৃতসরের এই ঘটনার ফলে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সারা দেশে এক তিক্ত বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়লো। জওহরলাল নেহরু সেদিন ঘৃণায় জ্বলে উঠেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও ঘৃণায় ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত তাঁর 'নাইট' উপাধি বর্জন করলেন। চারিদিকেই কেবল ব্রিগেডিয়ার ডায়ারের কড়া শাস্তির প্রবল দাবিই শুধু নয়, পাঞ্জাবের প্রশাসন থেকে লেফটেনাণ্ট গভর্নর মাইকেল ও'ডায়ার এবং ভাইসরয় লর্ড চেমসফোর্ডের প্রত্যাহারের দাবিও জানালো। বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ যথা-- বিঠলভাই প্যাটেল, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, তেজবাহাদুর সাপ্রু, মিসেস অ্যানি বেসান্ত এবং অন্যান্যরা জোরালো দাবি জানালেন-- জরুরি তদন্ত চাই। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার ক্রুদ্ধ জনসাধারণের সেই দাবির জবাবে চুপচাপ রইলো। আগে থেকেই রাজ্যে সামরিক কর্তৃপক্ষের দ্বারা যে কারফিউ জারি করা ছিল, তার মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়া হলো। সরকারের এই নিষ্ঠুর ও জঘন্য আচরণের প্রতিবাদে স্যার সি. শংকরন নায়ার, যাঁর কথা আগেই বলা হয়েছে, তিনি ভাইসরয়ের কার্য-নির্বাহী পরিষদ থেকে পদত্যাগ করলেন।

জালিয়ানওয়ালা বাগের এই ঘটনার ফলে সারা দেশে যে আবেগ-উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল, তা আরো বেড়ে গেল যখন আরো একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটলো: ১৯২১ সনের খিলাফত আন্দোলন। এই খিলাকত আন্দোলন শুরু হয়েছিল ভারতীয় মুসলিমদের দিক থেকে এক ধর্মীয় প্রতিবাদের মাধ্যমে— অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুর্কিদের পরাজয়ের ঘটনার অনুসরণে। তারই প্রতিক্রিয়া হিসেবে, ব্রিটিশ সরকার স্থির করলো খলিফার অফিস গুঁড়িয়ে দেবে এবং অটোমান সাম্রাজ্য ভেঙে টুকরো করে দেবে; এই খলিফা হলেন মুসলিম দুনিয়ায় সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। ব্রিটিশের সিদ্ধান্তের ফলে দুনিয়ার মুসলিমরা চরম অপমানবোধ করলো, এবং ভারতে মুসলিম নেতারা ব্রিটিশ বিরোধী প্রবল এক আন্দোলন গড়ে তুললেন। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসও সমর্থন করলো এই খিলাফত আন্দোলনকে; এমনকি হিন্দু সম্প্রদায়ও সমর্থন জানালো এবং তার ফলেই ব্রিটিশ বিরোধী সংযুক্ত হিন্দু-মুসলিম আন্দোলনের সূত্রপাত হলো।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই আন্দোলন উপলক্ষে উভয়পক্ষের মধ্যে যে সম্প্রীতি গড়ে উঠলো, তা ছিল ক্ষণস্থায়ী। এই সাম্প্রদায়িক সখ্যতা পরিণামে শীঘ্রই ক্ষণভঙ্গুর ও মেকি বলে প্রমাণিত হলো। সমস্ত ব্যাপারটাই ওলট-পালট হয়ে গেল, সারা ভারতে আন্দোলন শুরু হয়ে গেল— যখন কামাল আতাতুর্ক ইস্তানবুল নিয়ন্ত্রণ ভার নিজের হাতে তুলে নিলেন এবং খবর রটে গেল যে, খলিফার দফতর বিলুপ্ত হয়ে নতুন এক অসাম্প্রদায়িক ও নিরপেক্ষ ব্যবস্থার অধীনে যাবে। ভারতীয় মুসলিমরা হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তাঁদের আন্দোলনের তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ কারণ নেই, কিংবা নতুন গঠিত হিন্দুদের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্কেরও আর কোনো প্রয়োজন নেই। আন্দালনের গতি আবার পিছনপানে ফিরলো, অর্থাৎ আবার সেই

সাম্প্রদায়িক মতপার্থক্য আর বিদ্বেষ মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো।

মালাবার জেলায় বহু সংঘর্ষে হিংসার প্রকাশ ঘটলো—যার পরিণতিতে দেখা গেল ১৯২১ সনের 'মোপলা বিদ্রোহ'। কোনো কোনো সংঘর্ষে দেখা গেল, উভয় পক্ষেরই মাথা লজ্জায় নিচু হয়ে গেল। মাদ্রাজ সরকার গুর্খা সৈন্যসহ হাজার হাজার সৈন্য পাঠালেন এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থামাতে। উভয় পক্ষের হতাহতের সংখ্যা সরকারি হিসেবেই কিন্তু বিপুল: প্রায় ২৮০০ নিহত, ১৬০০ আহত, এবং ৩৯ হাজার বন্দী হিসেবে ধৃত, যার মধ্যে অন্তত ২৪ হাজার বিভিন্ন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত। এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার পরিণাম হলো পুরোপুরি সামরিক অভিযান, এবং এর ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তিক্ততা হলো দীর্ঘস্থায়ী—অন্তত যতদিন না ঘটনার সম্পূর্ণ পরিসমাপ্তি ঘটলো।

সৌভাগ্যক্রমে খিলাফত আন্দোলনের এই অবসানের কথায় কেরালার ত্রিবাংকুর-কোচিন এলাকায় তেমন কোনো প্রভাব দেখা যায়নি। সেখানকার সামাজিক-অর্থনৈতিক সংস্কারের কাজ কোনোরকম ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক প্রভাব ছাড়াই চলতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে, এই এলাকায় সকল ধর্মের মানুষের মধ্যে ছিল উল্লেখযোগ্য একটা একতাবোধ। বিশিষ্ট যুবনেতাদের একজন হিসেবে আমি বেশ আন্তরিকভাবেই বলতে পারি যে, স্থানীয় ছাত্র-সম্প্রদায় এই এলাকার সাম্প্রদায়িক একতা সখ্যতা বজায় রাখতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ফলে, এমনকি ১৯২ সনের ছাত্র-ধর্মঘট (Students' strike, 1922) এবং ১৯২৪ সনের ভাইকম সত্যাগ্রহ Vaikom Satyagraha, 1924)—কোনোরকম সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনোভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়নি। মালাবার এলাকা যখন মোপলা বিদ্রোহের কবলে, ত্রিবাংকুর তখন প্রস্তুত হচ্ছে বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে আইন-অমান্য আন্দোলনের জন্যে, এবং ব্রিটিশের তৈরি জিনিস বয়কট করে স্বদেশি জিনিস ব্যবহারের জন্যে। উভয় ক্ষেত্রেই ছাত্র-নেতারা প্রবীণদের সঙ্গে হাতে-হাত মিলিয়ে কাজ করেছে।

ব্রিটিশের তৈরি জিনিসপত্র বিক্রির দোকানের সামনে পিকেটিং ব্যবস্থা সংগঠনের জন্যে আমি এবং আরো কয়েকজন সহপাঠী ছাত্রের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এই বয়কট আন্দোলন দাবানলের মতো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো, এবং যার বিশেষ প্রকাশ দেখা গেল ত্রিবান্দ্রামে ১৯২৫ সনে, অর্থাৎ গান্ধীজীর ত্রিবাংকুর পরিদর্শনের পরে। প্রকৃতপক্ষে এটা সম্ভব হয়েছিল ছাত্র-নেতাদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার ফলেই। ব্রিটিশের তৈরি অসংখ্য কাপড়ের বাণ্ডিল ত্রিবান্দ্রামের সমুদ্র-তীরে তৈরি অগ্নিকুণ্ডে এনে জড়ো করা হলো যেন অন্তহীন মনুষ্যরূপী কনভেয়ার লাইনের সাহায্যে, তার মধ্যে ছিলেন: হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান, বৃদ্ধ, যুবক, পুরুষ, স্ত্রীলোক, শিশু; তাদের মধ্যে যেন হুড়োহুড়ি পড়ে গেল: কে কত বিদেশি কাপড় এনে সেই অগ্নিকুণ্ডে ফেলতে পারে: যে আগুন জ্বেলেছিলেন গান্ধীজীর

পুত্র। উপযুক্তভাবে পরিচালিত হলে সাধারণ মানুষ, এমনকি জাতি-বর্ণ-ধর্মের প্রশ্ন ভুলে কী করতে পারে—এটা তার একটা সুন্দর নিদর্শন।

৫

জাপান অভিমুখে

আমার বড়ভাই, ডাক্তার কুমারন নায়ার ছিলেন আমার চেয়ে প্রায় ১৪ বছরের বড়। সমগ্র পরিবার তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা করতো। সেনাবাহিনীতে চিকিৎসার কাজ ছাড়াও বেসরকারি ক্লিনিক ও হাসপাতালের চিকিৎসা সংক্রান্ত কাজে তাঁর পসার ও প্রতিপত্তি ছিল রমরমা। কিন্তু তাঁর পেশাগত ব্যস্ততার ফলে তিনি ব্যক্তিগত কাজকর্মে সময় পেতেন খুবই কম। সন্দেহ নেই যে তিনি আমাদের সবাইকে খুবই ভালোবাসতেন, কিন্তু স্ত্রী এবং তিন ছেলেমেয়েকে দেখাশোনা করে স্বভাবতই তিনি ভাইবোনদের সঙ্গে ইচ্ছেমতো দেখা সাক্ষাতের তেমন সময় পেতেন না।

সুতরাং আমার চেয়ে পাঁচ বছরের বড় নারায়ণন নায়ারের সঙ্গেই আমার বেশি ঘনিষ্ঠতা হলো। তিনি একজন দারুণ মেধাবী ছাত্র, বিশেষত তাঁর আগ্রহ ছিল বিজ্ঞান বিষয়ে। ১৯২০ সনে যখন তিনি ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, আমার বাবা ঠিক করলেন এই দাদা যাবেন টেকনিক্যাল লাইনে—তখনকার দিনে যা ছিল মোটামুটিভাবে নতুন বিষয়। কিন্তু তিনি তাঁর বন্ধুবান্ধবকে অবাক করে দিয়ে পাঠ্যবিষয় হিসেবে পছন্দ করলেন 'ফিশারি'। অবাক কাণ্ড, কারণ উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণের পক্ষে পাঠ্যবিষয় হিসেবে ফিশারি আদৌ স্বাভাবিক ছিল না—বিশেষত নিরামিষাশী ব্রাহ্মণের পক্ষে—খাদ্য হিসেবে মাছ বা মাংসের চাষবাস করা, এমনকি অন্যের প্রয়োজন হলেও তা অস্বাভাবিক। কিন্তু আমার বাবার দূরদৃষ্টি ছিল—ফিশারি শিল্পে কেরালার প্রচুর সম্ভাবনার বিষয়ে। তাই তিনি এই দাদার পছন্দকেই উপযুক্ত বলে সমর্থন করলেন: দাদা একজন অভিজ্ঞ মৎস্যচাষী হিসেবেই শিক্ষিত হবেন। আমার মনে পড়ে দাদা আমাকে বলেছিলেন, তিনি যতদূর জানেন তখনকার দিনে এ বিষয়ে সেরা প্রতিষ্ঠান হিসেবে এবং যারা এ বিষয়ে ডিগ্রি প্রদান করে, সেই প্রতিষ্ঠান হলো জাপানের ইমপিরিয়াল ইউনিভারসিটি (Imperial University) হোক্কাইডোর সাপ্পোরো অঞ্চলে অবস্থিত। আমার বাবা ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের

প্রিন্সিপালকে চিঠি লিখে দাদার জন্যে বি. এস-সি. ডিগ্রি কোর্সে ভর্তির ব্যবস্থা করলেন ; ১৯২১ সনের গোড়া থেকেই ক্লাস শুরু।

সেই সময়ে আমার বাবা-মার সাংসারিক জীবন ছিল সুখের। আমার বাবা এই দাদাকে পড়ার জন্যে হোক্কাইডোতে পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন, এবং দাদার ডিগ্রি পাওয়া পর্যন্ত লেখাপড়ার সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করলেন। অতঃপর দুর্ভাগ্যক্রমে আমার বাবা-মার মধ্যে দ্বন্দ্ব-বিচ্ছেদ দেখা দেয়, এবং আমার বাবা শেষ পর্যন্ত দাদার বাড়ি ফেরার জন্যে আর টাকা পাঠান নি। এজন্যে প্রয়োজনীয় প্রায় দু'হাজার টাকা পাঠিয়েছিলেন আমাদের বড়ভাই কুমারন নায়ার। কিন্তু তার ফলে তাঁর বিরুদ্ধে বহু বিরূপ সমালোচনা হয়েছিল। জানা গেল, তিনি নাকি তাঁর এক বন্ধুর কাছ থেকে দর-কষাকষি করে ঐ টাকাটা নিয়েছেন এই শর্তে যে, নারায়ণন নায়ার দেশে ফিরে ঐ বন্ধুর মেয়েকে বিয়ে করবেন।

যদিও আমি বড়ভাইকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতাম, কিন্তু আমার মনে হলো এক্ষেত্রে তাঁর কাজ হয়েছে অত্যন্ত গর্হিত ও অসংগত, এবং নারায়ণনের পক্ষেও কুরুচিকর; তাছাড়া, এ ব্যাপারে কথা দেওয়ার আগে তার সঙ্গে আমার দাদা কোনোরকম আলোচনাও করেন নি। যদিও ঐ সময়ের পক্ষে এধরনের ব্যাপার কিছু অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু আমার মতে এটা একটা খুবই বিশ্রী ব্যাপার। নৈতিক দিক থেকে অসংগত আপত্তিকর ছাড়াও, এমনকি আর্থিক দিক থেকেও বড়ভাইয়ের পক্ষে ছোট ভাইকে এভাবে 'মর্টগেজ' রাখার কোনো প্রয়োজন ছিল না। নারায়ণন গ্রাজুয়েট হবার পর কেবল আংশিক সময়ের বৃত্তিধারী গবেষক হিসেবেই যথেষ্ট রোজগার করছিল উক্ত জাপানি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে : উদ্দেশ্য ছিল বাড়ি ফেরার খরচ জোগাড় করা। সেই নারায়ণনও বড়ভাইয়ের এই ব্যবস্থায় খুশি হয়নি, কিন্তু সেও এ বিষয়ে সানন্দে সম্মতি দিয়েছিল বড়ভাইয়ের তথা পারিবারিক মর্যাদা বজায় রাখতে। তাছাড়া, এই পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার মতো তার যথেষ্ট বিবেচনাজ্ঞান ছিল—যাতে এরকম 'জবরদস্তি' বিয়েটাকে সার্থকতায় পরিণত করা যায়।

যাই হোক, দেশে ফিরে নারায়ণন ত্রিবংকুর সরকারের কৃষি দফতরের চাকুরিতে ছিল—ফিশারি ইন্‌সপেকটার হিসেবে। অতঃপর যখন নতুন ফিশারি দফতর খোলা হলো, তখন নারায়ণন তার ডিরেকটার পদে নিযুক্ত হলো। কিছুকাল পরে সে কানাডায় গেল এবং সেখান থেকে মৎস্যচাষ সংক্রান্ত ব্যাকটেরিওলজিতে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করলো। এবং তখনকার দিনে মৎস্যচাষের ক্ষেত্রে একজন সেরা বিজ্ঞানী হিসেবে সে স্বীকৃতি পেল।

ইতিমধ্যে আমাদের পরিবার খোদ আমার ভবিষ্যৎ নিয়েই চিন্তিত হয়ে পড়লো। আমার ইস্কুলের কার্যকলাপ ইতিমধ্যেই কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছে। তার ওপর আমি যদি আবার পুরো-সময়ের জন্যে রাজনৈতিক কর্মী হয়ে যাই—যেদিকে আমার আগ্রহের কথা অনেকেই বুঝতে পেরেছিলেন—তাহলে শেষ পর্যন্ত

আমাকে জেলবন্দী হতে হবে একজন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকারী হিসেবে— একথাও তাঁরা জানতেন। এতএব নারায়ণনই আমাকে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ার হাত থেকে নিবৃত্ত করার ভার নিল। তাই ১৯২৭ সনে, আমাদের নিকটবর্তী একটা গোলমেলে এলাকায় আন্দোলনের মধ্যে যাতে আমি জড়িয়ে না পড়ি, তাই সে আমাকে উচ্চতর পড়াশোনার জন্যে চাপ দিল। বিষয় হিসেবে সে ঠিক করে দিল এনজিনিয়ারিং, সে বিষয়ে আমি হয়তো ডিগ্রি পেতে পারি এবং যাতে আমি এক্ষেত্রে নিশ্চিত একটা চাকুরি পেতে পারি - ঠিক যেমন ফিশারিতে — ডিগ্রিলাভ তার চাকুরির ক্ষেত্রে সাহায্য করেছিল। এবং যেহেতু জাপান ও সেখানকার শিক্ষার উচ্চমানের সঙ্গে নারায়ণনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও পরিচয় ছিল, তাই সে স্থির করলো আমার উচ্চতর শিক্ষার জন্যে জাপানে যাওয়াই ভালো। এক্ষেত্রে নজির ছিল, আমাদের এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় নীলকান্ত পিল্লাই, জাপানের কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯১৫ সনে এনজিনিয়ারিং হিসেবে গ্রাজুয়েট হয় এবং আমাদের ত্রিবাংকুর সরকারে উচ্চপদে নিযুক্ত হয়। এই কথা মনে রেখে, নারায়ণন জাপানের ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে চিঠিপত্র লিখে আমার জন্যে ১৯২৮ সনের শুরুতেই এনজিনিয়ারিং ডিগ্রি কোর্সে ভর্তির ব্যবস্থা করে।

আমার খুবই ইচ্ছে ছিল কংগ্রেসের অধীনে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাজে সক্রিয়ভাবে যোগ দেবো, তাই আমার ভাইয়ের এই নতুন প্রস্তাব আমি যথেষ্ট মানসিক ধৈর্য ও স্থিরতার সঙ্গে চিন্তা করলাম। শেষ পর্যন্ত ভাইয়ের প্রতি আমার ভালোবাসা এবং তার সদিচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধার ফলে আমার ব্যক্তিগত রুচি-পছন্দ টিকলো না। আমি আশ্বস্ত হলাম এই ভেবে যে, জোর না করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার আমার ওপরেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, ফলে মনের দিক থেকে নিজেকে প্রস্তুত করলাম টেকনিক্যাল শিক্ষা গ্রহণের জন্যে বিশেষত পেশার কথা চিন্তা করে।

অতঃপর আমি দেখলাম, আমাকে এখন উচ্চতর গণিত শিখতে হবে — ইস্কুলে যা শিখেছিলাম তাতে চলবে না; তাই এবিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রিধারী এক গৃহ-শিক্ষকের সাহায্য নিলাম। এবিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞানলাভের পর নারায়ণন আমার জাপান যাত্রার পাকাপাকি ব্যবস্থা করলো। কলম্বো থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮ তারিখে আমি জাপানি জাহাজে (সুয়া মারু) যাত্রা করলাম। ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আমি সিংহল (শ্রীলংকা) ত্যাগ করলাম; ঐ পর্যন্ত নারায়ণন আমার সঙ্গেই ছিল, আমার জাপানযাত্রা দেখবে বলে।

জাহাজে আমার ভাই নারায়ণন ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেয়। ক্যাপ্টেনের সঙ্গে তার বহুক্ষণ কথাবার্তা চলে জাপানি ভাষায়। জাপানি ভাষার উচ্চারণ আমার কাছে অচেনা অদ্ভুত মনে হয়েছিল। কিন্তু ক্যাপ্টেনের আচরণে আমার ভাইয়ের প্রতি একটি মর্যাদার ভাবভঙ্গি ছিল, কেননা জাপানি ভাষায় নারায়ণনের বেশ ভালোরকম দখল ছিল। কিছু পরে নারায়ণন ঐ ক্যাপ্টেনের

সঙ্গে তাদের কথাবার্তার অনুবাদ করে আমাকে শুনিয়েছিল। নারায়ণন আমার বিষয়ে তাকে বলেছিল : এই হলো আমার প্রিয় ভাই, সে যাচ্ছে পড়াশোনা করতে জাপানে; দয়া করে আপনি দেখবেন জাহাজে যেন তাকে জাপানি খাবারই দেওয়া হয়, যাতে সে ঐ খাবারের সঙ্গে পরিচিত হয় এবং জাপানে গিয়ে কোনো অসুবিধে বোধ না করে—যা আমি প্রথম জাপানে গিয়ে ভোগ করেছিলাম। তাছাড়া, ঐ ক্যাপ্টেনকে ব্যক্তিগতভাবেও আমার প্রতি নজর রাখতে এবং বিশেষ কোনো প্রয়োজনের দিকেও খেয়াল রাখতে নারায়ণন বিশেষভাবে অনুরোধ করে।

জাহাজের ক্যাপ্টেন নারায়ণনের বিশেষ অনুরোধে আমার দিকে সর্বপ্রকারে নজর রাখতে রাজী হয় এবং সত্যি সত্যিই তিনি তাঁর কথা রেখেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত তদারকিতে জাপানি কেতা ও খাবার-দাবারের সঙ্গে প্রাথমিক ভাবে পরিচিত হলাম। ক্যাপ্টেন আমাকে মাঝে মাঝে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় জাপানি আচার-প্রথা এবং জীবনযাপনের ধারাধরন সম্পর্কেও বুঝিয়ে দিলেন। আমিও তাঁর কথা-বার্তা থেকে নতুন ভাষার মোটামুটি কিছু শিখে নিলাম, যাতে জাহাজের মধ্যে বিশেষত জাহাজ থেকে নেমে কোনোরকমে কাজ চালিয়ে নিতে পারে।

জাহাজে প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের মধ্যে ছিলেন ডাক্তার ফুকুদা, চিকিৎসা জগতের একজন বিখ্যাত অধ্যাপক। তিনি তখন কলকাতায় অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল মেডিসিন কনফারেন্সে (International Medicine Conference) যোগ দিয়ে জাপানে ফিরছিলেন। তাঁর সঙ্গেও আমার ভাই নারায়ণন আমার বিষয়ে বলে রেখেছিল। ফলে, ডাক্তার ফুকুদা আমাকে ঠিক ছোট ভাইয়ের মতোই স্নেহের চোখে দেখেছিলেন এবং আমাকে এই নতুন পরিস্থিতিতে নিজের বাড়ির মতোই ঘরোয়া পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন। যেমন, খাবার টেবিলে আমাকে দেওয়া হতো ভাতের সঙ্গে সয়াবিনের সুপ (miso, মিসো) এবং অন্যান্য জাপানি খাদ্য. যার প্রত্যেকটিই আমার কাছে কোনোরকম স্বাদগন্ধবিহীন। তাছাড়া আমার একটু সামুদ্রিক দুর্বলতা বোধ হলো, এবং সাময়িক বমির ভাব দেখা গেল। একবার মনে হলো দেশে ফিরে যাওয়াই ভালো, কিন্তু তা আর সম্ভব নয়। বরং আমাকে সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে। তাছাড়া মনে মনে নিজেকে বোঝালাম, ফিরে যাওয়া যদি সম্ভবও হয় তাহলে সেটা হবে কাপুরুষতা। অধিকন্তু এটা আমার কাছে অভাবনীয়, যে ভাই আমার লেখাপড়ার জন্যে এত কিছু করছে, আমি মাঝপথে দেশে ফিরে গিয়ে তাকে লজ্জায় ফেলবো।

জাহাজে থাকাকালে দেশ থেকে বা অন্য কোনো সূত্র থেকে কোনোরকম খবর পাবার উপায় ছিল না। দুনিয়াব্যাপী খবর প্রচারের ব্যবস্থা তখনো তেমন ব্যাপক হয়নি। যেভাবেই হোক, আমাদের এই জাহাজের রেডিওর অয়্যারলেস-সেট

এমন জোরালো ছিল না যাতে করে দূরের কোনো দেশ থেকে শর্ট-ওয়েভে কোনো খবর পাওয়া যায়।

আমার ভারত ত্যাগের অল্পকিছু আগেই বাংলার এবং উত্তরের প্রদেশগুলিতে বহু দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটছিল, বিশেষত হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষের মতো সাম্প্রদায়িক ঘটনা—যা ব্রিটিশের বিভেদনীতির অনিবার্য পরিণতি। জাতীয় ফ্রন্টে কংগ্রেস ভাইসরয় ও ব্রিটিশ সরকারকে বেকায়দায় ফেলার জন্যে আরেক দফা প্রস্তুতি চালাচ্ছিল। ১৯২৭ সনে কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে, জওহরলাল ভারতের জন্যে পূর্ণ-স্বরাজের (পূর্ণ স্বাধীনতা) পক্ষে যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন, তাই পাকাপাকি ভাবে গৃহীত হয়। দেশবাসীর ক্রমবর্ধমান ক্ষোভের কথা বুঝে ব্রিটেন থেকে ১৯২৭ নভেম্বরে একটি স্ট্যাটুটরি-কমিশন নিয়োগের কথা ঘোষণা করা হলো—কয়েকটি সংস্কার প্রস্তাব করে; উদ্দেশ্য, ভারতের ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবকে একটু উপশম করার চেষ্টা। সেই কমিশনের নাম হলো সাইমন-কমিশন (Simon Commission)—চেয়ারম্যান স্যার জন সাইমনের নামানুসারে চিহ্নিত; তিনি ছিলেন একজন সাংবিধানিক জুরি এবং হাউস-অফ কমন্‌স-এর ব্রিটিশ লিবার্যাল পার্টির সদস্য।

সাইমন যেভাবে গঠিত হয়েছিল, তার মধ্যে ব্রিটিনের দিক থেকে ভারতের হাতে শাসনক্ষমতার বিন্দুমাত্র ভাগ ছেড়ে দেবার কোনোই সদিচ্ছা ছিল না। কমিশনের সদস্যরা সবাই ছিলেন ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সদস্য। কমিশনের মধ্যে ভারতীয় সদস্য না থাকায় ভারতীয় নেতৃবৃন্দ তৎক্ষণাৎ তীব্র প্রতিবাদে জানালেন। ভারতীয় নেতৃবৃন্দ কিছুতেই মেনে নিতে পারলেন না যে, ভারতবাসীর ভাগ্য নির্ধারণ করবে একমাত্র সুদূর বিদেশের শাসক লণ্ডন পার্লামেণ্ট। তাই, ১৮ ফেবরুয়ারি ১৯২৮ তারিখে সাইমন-কমিশনকে বয়কটের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো দিল্লি আসেমব্লিতে: ঘোষণাকারী লালা লাজপত রায়কে তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে সমর্থন জানিয়ে অভিনন্দিত করা হলো। আশ্চর্য যোগাযোগ, এই ১৮ ফেবরুয়ারি তারিখেই আমার জাহাজ ছাড়লো কলম্বো থেকে।

পরে আমি জেনেছিলাম, সাইমন কমিশনের সদস্যরা ভারতে বহুদিন যাবৎ ব্যাপক ভাবে ঘুরেছিলেন, কিন্তু তাঁদের কালো-পতাকা দেখানো হয়েছিল বিক্ষুব্ধ মিছিল-কারীদের দ্বারা। কমিশনের কাজকর্ম এবং রিপোর্ট ইত্যাদিতে প্রায় ৮ বছর লেগে গেল, তাদের কাছ থেকে কিছু পাওয়া তো দূরের কথা। অতঃপর তার ফলাফল যখন ১৯৩৫ সনে আইন হিসেবে পাশ হলো, দেখা গেল কমিশনের এতদিনের বিরাট ধুমধাম করা কাজের পরিণতি হলো কুণ্ঠিতচিত্ত কৃপণের মতো পরীক্ষামূলক স্বায়ত্ত-শাসন দান। এবং এই পরীক্ষামূলক স্বায়ত্ত-শাসন দানের সঙ্গে নানা ঝুট-ঝামেলা জুড়ে দেওয়া হলো—ফল হলো প্রকট সাম্প্রদায়িক বিভেদ। যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলো ১৯৩৯ সনে, ব্রিটেন দেখলো এই ফাঁকে ভারতে কিছু পরিমাণে

সংবিধান সংস্কার চালু করে দেওয়া এবং মুসলিম লিগের পক্ষে পৃথক দাবিদাওয়া মূলক আন্দোলন ইত্যাদিতে মদত দেওয়াই সুবিধাজনক। এটা করতে করতেও আরো দুশ্চিন্তাময় ৮ বছর কেটে গেল। তারপর ভারত স্বাধীন হলো। এবং তখন দেখা গেল, এই উপমহাদেশের সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানের সৃষ্টি।

যাই হোক, আমাদের জাহাজ (Suwa Maru, সুয়া মারু) কোবে বন্দরে পৌঁছলো ১২ মার্চ ১৯২৮ তারিখে। ইমিগ্রেশান অফিসাররা বিস্মিত হয়ে দেখলেন, আমার পাশপোর্টে নাগরিকত্বের ঘরে লেখা আছে কেবল 'ন্যাশনাল স্ট্যাটাস'—এতে পরিষ্কার কিছুই বোঝা যায় না। আমি তাঁদের বোঝালাম এই বলে—আমি ত্রিবাংকুরের নাগরিক—ব্রিটিশ আশ্রিত ব্যক্তি। অফিসারদের মধ্যে দ্রুত কানাঘুষো আলোচনা লেগে গেল। একজন ইংরেজি-জানা জাপানি সহযাত্রী আমাকে শান্তভাবে জানালেন তিনি কি শুনতে পেয়েছেন ঐ অফিসারদের কথাবার্তা থেকে। ঐ ইমিগ্রেশান অফিসারদের কয়েকজন 'ত্রিবাংকুর' নামে কোনো দেশের কথা জানতোই না। তাঁদের মধ্যে কেতাদুরস্ত একজন চটপট ভেবেচিন্তে বলে ফেললেন, ত্রিবাংকুর বোধ হয় ভারতের কোনো জায়গা হবে। কিন্তু তাঁরা ভেবে পেলেন না কি করে আমি খোদ ভারতের নাগরিক না হয়ে ভারতের অন্তর্গত একটি জায়গার নাগরিক হলাম : এ যেন ঠিক জাপানের কোনো নাগরিককে জাপানি বলার পরিবর্তে জাপানের কোনো অংশের নাগরিক বলার মতো ঘটনা।

দেখেশুনে মনে হলো, ঐ অফিসারদের মধ্যে কারোই ভারতের ইতিহাস বিষয়ে তেমন বিশেষ কোনো জ্ঞান ছিল না, ফলে তাঁরা বুঝতে পারলেন না কিভাবে ভারতের মধ্যেই অন্তত ৬০০টি ক্ষুদে ভারত তৈরি হয়েছে—যাদের ব্রিটিশরা বলতো 'রাজন্য প্রদেশ' বা নেটিভ স্টেট', এবং এইসব প্রদেশের সঙ্গে ব্রিটিশরা পৃথক চুক্তি/সন্ধি ইত্যাদি করেছিল, তাদের বিশেষ বিশেষ সুবিধে দিয়েছিল, তাদের আনুগত্য আদায় করার জন্যে ; উদ্দেশ্য বিভেদ নীতির দ্বারা দেশ শাসন করা। এসব বুঝতে হলে বিশেষ মনোভাব ও জানাশোনা থাকা দরকার, যা ঐ কোবে বন্দরের অফিসারদের ছিল না, তাই তাঁরা বুঝতেই পারেননি কিভাবে দমন-পীড়ন-বিভেদ নীতি চালিয়ে ব্রিটিশ সরকার ভারতে তাদের উপনিবেশবাদী থাবা গেড়ে বসে দেশটাকে পুরোপুরি কবজা করে রেখেছিল। যাই হোক, ঘটনাক্রমে মুখ্য ইমিগ্রেশান অফিসার ঘোষণা করলেন, আমি যেহেতু পুরোপুরি ভারতীয়দের মতোই দেখতে, অতএব অবশ্যই একজন ভারতীয় ; পাশপোর্টে যা লেখা আছে তা নিশ্চয়ই কোনো রকম ভুলচুকের ফলেই ঘটেছে। এইসব আলোচনার সময়ে আমি একেবারে চুপচাপ ছিলাম এই বিশ্বাসে যে, নীরব থাকাই যেখানে সুবিধাজনক, কথাবার্তা বলে বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া সেখানে চরম বোকামি। অতঃপর ঐ অফিসাররা আমাকে বন্দরে

নামার অনুমতি দিলেন। আবার আমার সেই ইংরেজি জানা জাপানি সহযাত্রীটি জানালেন, ঐ অফিসাররা বলেছেন আমার পাশপোর্টের নাগরিকত্ব বিষয়ে যা লেখা আছে তাকে ভুল বলে উপেক্ষা করতে, বিশেষত আমার কাছে যখন কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির লিখিত অনুমতিপত্র আছে—সেই চিঠিখানিকেই তাঁরা পাশপোর্টের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও যুক্তিসংগত বলেই মনে করলেন।

পরবর্তী কালে আমার এক বন্ধু বলেছিলেন, এখন যদি আমার কাছে ঐ পাশপোর্ট থাকতো তাহলে আমাকে একজন ভিআইপি. বলে গণ্য করা হতো। এমনকি সম্ভবত ঐ ডকুমেন্টের কাগজখানি অ্যান্টিক জিনিসপত্র সংগ্রাহকদের কাছে চড়া দামেও বিক্রি করতে পারতাম। কিন্তু হায়, আমি সেই মূল্যবান ডকুমেন্টের কাগজখানি হারিয়ে ফেলেছি হয় জাপানে, অথবা গত বিশ্বযুদ্ধের সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোথাও। আসলে এর প্রকৃত মূল্য না বুঝে আমি সেটিকে সংরক্ষণের কথা খেয়াল করিনি বা যত্ন করে রাখিনি। এবং সত্যি কথা বলতে গেলে, এই ক্ষয়ক্ষতির জন্যে আমার মনে কোনো আফশোষ নেই।

যাই হোক, কোবে বন্দর থেকে আমি সেইদিনই কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। এই সময়ে একদিন আমি এক জাপানি সরাইখানায় গিয়েছিলাম। দেখলাম, জাহাজে থাকাকালে আমি যা কিছু জাপানি শিখেছিলাম তার প্রায় সবই ভুলে গেছি। বেশ বুঝতে পারলাম, আমি তেমন কিছু শিখতে পারিনি। পরে আমি জাপানি ভাষা শেখার ক্লাসে ভর্তি হই এবং বোতাম টিপে কাজ চালাতে শিখলাম—অনেকেই তাই করে আনন্দের সঙ্গে। কেননা, দেখলাম জাপানি না শিখে জাপানে কিছুই করা যাবে না। এমনকি আমার পড়াশোনাও তেমন কিছু এগোবে না, যেহেতু জাপানিরাও তাদের ভাষা ছাড়া আর কিছুই জানে না।

জাপানি সরাইখানায় আমার প্রথম খাবার ছিল ভাতের সঙ্গে নেট-ব্রয়েলড ব্রিম (net-broiled bream)। এই ব্রয়েলড ব্রিম এক প্রকার বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরি বিশেষ খাদ্য। সত্যি বলতে কি, প্রথম যখন আমি তার স্বাদ নিলাম আমার তা পছন্দ হয়নি অর্থাৎ ভালো লাগেনি। কিন্তু তবু আমি ভদ্রতা করে বলতে চাইলাম, এটা সুন্দর হয়েছে এবং আমার খুব ভালো লেগেছে। কিন্তু তখনি আমি শান্ত ভাবে সেই সরাইখানা থেকে বেরিয়ে পড়লাম এবং কাছাকাছি আরেকটি দোকানে গিয়ে কিছু বিন-জ্যাম মাখানো রুটি কিনলাম এবং বেশ পরিতৃপ্তি করে খেলাম প্রকাশ্যে, অথচ অন্যেরা যাতে বুঝতে না পারে এমন অন্যমনস্ক ভাবে তা করলাম। তারা নিশ্চয়ই বেশ অবাক হয়ে গেছে। কেননা, তারা প্রকাশ্য রাস্তায় এমন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্ষুধার্তের মতো কাউকে কখনো খেতে দ্যাখেনি। কিন্তু বলা প্রয়োজন, কালক্রমে সাধারণত জাপানি খাবার খেতে আমার বেশ অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল,

বিশেষত প্রথম দিককার সেই নেট-ব্রয়েলড ব্রিম খাদ্যটি। শেষ পর্যন্ত এটা আমার প্রিয় খাবার হয়ে উঠেছিল।

জাপানিরা আমাদের মতো হাত ও আঙুলের সাহায্যে খায় না; তারা খায় একজোড়া চপস্টিকের সাহায্যে (জাপানি ভাষায় hashi, হাসি)। জাহাজে থাকাকালেই আমি এটা অভ্যেস করে ফেলেছিলাম, যদিও প্রথমে খুবই অসুবিধে হয়েছিল। সেই জাহাজের একজন ওয়েটার আমার ওপর করুণাবশে পশ্চিমি কায়দার কাঁটাচামচ এবং অন্যান্য আনুষাঙ্গিক জিনিসপত্র নিয়ে এসেছিল আমার সুবিধের জন্যেই। কিন্তু যেহেতু আমি জাপানি বা পশ্চিমি কায়দার কোনোটাই জানতাম না। মনে মনে ভাবলাম, জাপানি কায়দাটা (হাসি) আগে পরীক্ষা করে দেখা যাক কী হয়; যাই হোক আমাকে তো শেষ পর্যন্ত এসবের সঙ্গে পরিচিত হতেই হবে। কালক্রমে আমি দেখলাম জাপানি চপস্টিক ব্যবহার করা খুবই সহজ এবং কাযকরী — যেমন সহজ ও কার্যকরী হাতের আঙুল অথবা কাঁটাচামচ দিয়ে খাওয়া। এটা খুবই আশ্চর্য যে, জাপানি চপস্টিকের সাহায্যে ঠিক কাঁটাচামচের মতোই খুশিমতো ব্যবহার করা যায় — এমনকি মুরগির হাড় থেকে মাংস ছাড়ানো কিংবা অন্যান্য মাংসের টুকরো করা। অবশ্য অভিজ্ঞতার জন্যে আমাকে বেশ কিছুকাল অভ্যেস করতে হয়েছিল। কিন্তু এই তুলনায় প্রথমদিকে চপস্টিকের সাহায্যে মোটা নুডল এবং ডিম খেতেও আমাকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। তবে আমার চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত তা কার্যকরী হয়েছিল।

৭

কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ে

সারা দিনরাত সেই জাপানি সরাইখানায় কাটিয়ে, পরদিন সকালেই আমি খবর দিলাম কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমার প্রথম পরিচয় হলো ড. তাকাশাহির সঙ্গে, তিনি হলেন ব্রিজ এনজিনিয়ারিং-এর অধ্যাপক, তাছাড়া তাঁর ওপর অতিরিক্ত দায়িত্ব ছিল বিদেশি ছাত্রদের ভর্তির ব্যাপারটা দেখাশোনা করা। আমি অধ্যাপকের মর্যাদাবোধ দেখে বিস্মিত হলাম। তাঁর মুখশ্রী শান্ত সমাহিত, কিন্তু তাঁর গভীর নিবদ্ধ চোখ দুটি তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল ও পরিষ্কার, এবং মনে হলো যেন তিনি আমার গভীর অন্তরপ্রদেশ পর্যন্ত দেখছেন — আমার ভিতরে কোথায় কি আছে তা

আবিষ্কার করার জন্যে। আমার ধারণা হলো, তিনি একজন বেশ দয়ালু প্রকৃতির এবং বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি। আমি শুনেছিলাম, তিনি এক জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পি-এইচ-ডি ডিগ্রিধারী – একজন উচ্চস্তরের দক্ষ শিক্ষক এবং তাঁর নিজস্ব ক্ষেত্রে একজন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী।

ভর্তি সংক্রান্ত প্রাথমিক কর্তব্যাদি শেষ হলে, ড. তাকাশাহিকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এরপর আমার করণীয় কি। তিনি বললেন সর্বপ্রথমেই আমাকে দু' একটি কাজ করতে হবে ; আমাকে অবশ্যই পড়াশোনার পক্ষে অনুকূল পরিবেশে থাকার ব্যবস্থা করতে এবং তারপরই জাপানি ভাষা শেখার ব্যবস্থা করতে হবে অবিলম্বে। তিনি সহকারি অধ্যাপক তাগুচিকে সংক্ষেপে কিছু বুঝিয়ে দিলেন। তখনি ঠিক হয়ে গেল, আমি এই সহকারি অধ্যাপক তাগুচির বাড়িতেই 'গেস্ট' হিসেবে থাকবো পড়াশোনার জন্যে। তাঁর এই সদয় ব্যবহারে আমি অভিভূত হয়ে গেলাম এবং যথাসাধ্য কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম।

ঐদিন বিকেলেই আমার ভিন্ন রকমের এক অভিজ্ঞতা হলো। বলতে গেলে, সকাল বেলাকার সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটনা। ড. তাকাশাহির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি আমার আগের সেই সরাইখানায় ফিরে গিয়ে আমার জিনিসপত্র নিয়ে সহকারি অধ্যাপক তাগুচির বাড়িতে যাবার ব্যবস্থা করলাম। যদিও সেটা ছিল বসন্তকাল, তবু সেদিন সকালেই বরফ পড়ছিল, আবহাওয়া দারুণ ঠাণ্ডা ছিল। অতএব ড তাকাশাহির ঘর থেকে বেরিয়েই আমি ওভারকোট গায়ে চাপিয়ে নিলাম এব কাছাকাছি ট্রাম পয়েন্টে গেলাম সেই সরাইখানায় যাওয়ার জন্যে। যাবার সময় যতক্ষণ আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানার মধ্যে ছিলাম, ততক্ষণ মনে হলো কেউ যেন আমাকে অনুসরণ করছে, এবং হঠাৎ মনে হলো কেউ যেন পিছন দিক থেকে আমার কাঁধে হাত দিয়ে ডাকছে। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি দীর্ঘদেহী এক বয়স্ক ভদ্রলোক গায়ে বর্ষাতি ও হাতে ছাতা। নিখুঁত ইংরেজিতে তিনি বললেন 'আমার সঙ্গে আসুন' এবং এই বলার মধ্যে অভ্রান্ত আদেশের সুর। আমি একটু অস্বস্তি বোধ করলাম আকস্মিক এরকম আদেশে। কিন্তু স্থির করলাম – এখনি কোনো বিতর্কের মধ্যে যাবো না, অন্তত সেই মুহূর্তেই। আমাকে নিয়ে সেই লম্বা মানুষটি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কাছাকাছি একটি বড় ঘরে গিয়ে ঢুকলেন এবং তিনি নিজে বিরাট এক ডেস্কের পিছনে বসে, আমাকে ঠিক তাঁর সামনাসামনি বসতে বললেন। অন্তত ২-৩ মিনিট ধরে তিনি শুধু তাকিয়েই রইলেন আমার দিকে ; প্রায় অপলক দৃষ্টিতে। তারপর হঠাৎ তাঁর ডান হাত তুলে তর্জনি সংকেতে আমাকে তীব্রভাবে জিজ্ঞাসা করলেন – তুমি কি একজন গোয়েন্দা ?

আমি এরকম পরিস্থিতি ও অবস্থার জন্যে একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। সম্ভবত আমার জবাবের ধরনে তিনি এমন কিছু লক্ষ্য করেছিলেন, বা অন্য কিছু হয়তো, যা আমার জানা ছিল না। ফলে তাঁর কঠিন ভাব একটু যেন নরম হলো, এবং

হঠাৎ একটু মৃদু হাসি দেখা গেল তাঁর মুখে। পরে সম্পূর্ণ ভিন্ন সুরে, কিন্তু মৃদুভাবে তিনি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন তুমি ভারত থেকে এসেছ, কিন্তু কোন এলাকা থেকে? আমি তাঁর মুখের দিকে সোজা তাকিয়ে ছিলাম কোনোরকম চিন্তা না করে—মনে মনে অন্য নানাচিন্তার উদয় হচ্ছিল, কিন্তু তার প্রকাশ না করে সংযত থাকবার চেষ্টা করছিলাম। অতঃপর তিনি হঠাৎ আবার প্রশ্নবাণ ছুঁড়লেন, যা আমি একেবারেই আশা করিনি। তিনি বললেন : ত্রিবান্দ্রাম থেকে আসছো? গণপতি শাস্ত্রী কেমন আছেন?

আমি এই ভদ্রলোকের সম্বন্ধে কি ধারণা করবো তাই ভাবছি, কেননা তিনি একটু আগেই জিজ্ঞাসা করছিলেন আমি গোয়েন্দা কিনা, এবং এখন আবার জিজ্ঞাসা করছেন ত্রিবান্দ্রামের গণপতি শাস্ত্রী কেমন আছেন। আমি অবশ্যই জানতাম গণপতি শাস্ত্রী কে : তিনি ত্রিবান্দ্রামের মহারাজার কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক। আমি প্রায়ই তাকে কলেজের রাস্তায় যাতায়াত করতে দেখতাম, কিন্তু কখনো তেমন খেয়াল করিনি। সত্যি বলতে কি, গোপনে তাঁর প্রতি আমার একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষ ছিল। যদিও তা অযৌক্তিক বলে আমার মনে হতো, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হতো তিনি ছিলেন আমার শ্যালক সি. পি. গোবিন্দ পিল্লাই-এর প্রতিদ্বন্দ্বী : গোবিন্দ পিল্লাই ছিলিন মালয়ালম্-এর অধ্যাপক। এই উভয় শিক্ষকই ছিলেন পণ্ডিত ও লেখক হিসাবে সুপরিচিত। যদিও শাস্ত্রীজী সম্পর্কে আমার উদাসীনতা বা বিদ্বেষের কোনো যুক্তিসংগত কারণ ছিল না, কিন্তু সংস্কার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যাখ্যার অতীত এবং সংগতিহীন। আমার মনে হয়, এই মনোভাব আমার হয়েছে যেহেতু আমার শ্যালককে আমি ভালোবাসি এবং তাই অচেতনভাবেই তার প্রতিদ্বন্দ্বী শিক্ষক শাস্ত্রীজীর বিরুদ্ধে আমার একটা বিদ্বেষ ভাব গড়ে উঠেছে। এইসব চিন্তা ভাবনা করতে করতে আমি একটা জবাবের জন্যে তৈরি হচ্ছিলাম, এমন সময় সেই লম্বা মানুষটি বিরক্তির সুরে আবার জিজ্ঞেস করলেন : কেমন আছেন গণপতি শাস্ত্রী?

আবার আমি একটু ইতস্তত করছিলাম, এবং সম্ভবত অনিচ্ছাবশত প্রশ্নটাকে এড়িয়ে যেতে চাইছিলাম বলে মৃদুভাবে উচ্চারণ করলাম : কেমন আছেন তিনি··· ইত্যাদি। আমার এই আচরণে সেই লম্বা মানুষটি বিস্ময়ের ভঙ্গিতে বেপরোয়া ভাবে বলে উঠলেন : কি? তুমি জানো না গণপতি শাস্ত্রী কেমন আছেন? তুমি কি তাঁর নাম শোনোনি? তুমি কি জানো না তিনি ভারতের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এবং বিশ্বের সেরা তিন পণ্ডিতের একজন?

বলা বাহুল্য, আমি বেশ বিব্রত এবং অস্বস্তি বোধ করলাম। গণপতি শাস্ত্রী সম্পর্কে অবশ্যই আমি কিছু জানতাম, কিন্তু বুঝে উঠতে পারলাম না তাঁর সম্পর্কে আমাকে এখানে বসে জিজ্ঞাসাবাদ করার মতো ব্যাপারটা কি, এবং যিনি জিজ্ঞাসা করছেন তাঁরই বা কি। অবশ্যই জেনে ভালোই লাগলো, এখানে এই কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর একজন গুণগ্রাহী আছেন। কিছুক্ষণের জন্যে আমি যেন

আমার বিদ্বেষের কথা ভুলে গেলাম এবং এজন্যে গর্ববোধ করলাম। পরে আমি জেনেছিলাম, উক্ত তিনজন বিশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের মধ্যে অন্য দু'জনের একজন ছিলেন ইয়োরোপিয়ান (জার্মান বা ফরাসি, নাম ভুলে গেছি), অন্যজন হলেন ডকটর সাকাকিবারা (Dr. Sakakibara)—সামনেই বসে আমার প্রশ্নকর্তা স্বয়ং : তিনি হলেন কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারততত্ত্ব ও ভারতীয় দর্শন এবং সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক।

সত্যি বলতে কি, আমি যেন ছোট হয়ে গেলাম এবং আমার সম্পর্কে তাঁর ধারণা বোধ হয় ভালো হলো না। আমি অবশ্য পরে জেনেছিলাম, অধ্যাপক সাকাকিবারা একজন কোমলচিত্ত মানুষ এবং তিনি সাধারণভাবে আমার মানসিক অবস্থার পরীক্ষা করছিলেন : আমি ঠিক কেমন ধরনের মানুষ। এখানে অবশ্য বলার সুযোগ নেই—তাঁর পরীক্ষা মতো আমি কেমন ধরনের মানুষ ছিলাম; কিন্তু পরে প্রমাণিত হয়েছিল, আমি তাঁর পরীক্ষায় পাশ করেছিলাম। সেই বিখ্যাত অধ্যাপকটি শীঘ্রই যেন ভিন্ন মানুষে পরিণত হলেন এবং সেই মানুষটি যেন দয়ামায়ার প্রতিমূর্তি হিসেবে দেখা দিলেন।

এবার তিনি বললেন : এখানে অর্থাৎ জাপানে এলে তুমি কি মনে করে? আমি বললাম, আমি এখানে ছাত্র হিসেবে এসেছি, সিভিল এনজিনিয়ারিং পড়তে।

জবাব শুনে মৃদু হাসলেন তিনি। বললেন, তুমি কি মনে কারা প্রথমে জাপানি ভাষা না শিখেই তুমি এখানে সিভিল এনজিনিয়ারিং পড়তে পারবে? তুমি বরং রোজ সন্ধ্যায় আমার কাছে এসো, আমি তোমাকে জাপানি ভাষা শিখিয়ে দেবো।

মুহূর্তের মধ্যে আমার মধ্যে এমন একটা ভাবের উদয় হলো, যা লৌকিক ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম, এতক্ষণ যেসব কাণ্ড ঘটে গেল তা সত্য অথবা নিছক স্বপ্ন, অথবা অলৌকিক ঘটনা কিছু? ভাবতে লাগলাম, একদিনের মধ্যে এত ঘটনা ঘটে গেল : আমি এক সহকারি অধ্যাপকের বাড়িতে 'গেস্ট' হিসেবে থাকবার সুযোগ পেলাম; তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা করা হলো আমি গোয়েন্দা কিনা, এবং তার অঙ্গ হিসেবে আমার ওপর মানসিক পরীক্ষা করা হলো—একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ভারততত্ত্ববিদ প্রখ্যাত ড. সাকাকিবারার প্রত্যক্ষ পরিচালনায়; এবং সেই সংস্কৃতজ্ঞ জাপানি পণ্ডিতই আবার আমাকে জাপানি ভাষা শেখাতে স্বেচ্ছায় রাজী হলেন। শুরুতেই ব্যাপারটা আমার কাছে বেশ কিছু গোলমেলে বলে মনে হলো, কিন্তু বাস্তব অবস্থার মধ্যে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে শেষ পর্যন্ত আমার মনে হয়েছে, আমি ভাগ্যবান ছিলাম।

যাই হোক, সেদিন সন্ধ্যায় আমি অধ্যাপক তাগুচির বাড়ি গিয়ে পৌঁছলাম জিনিসপত্র নিয়ে এবং তাগুচি দম্পতি আমাকে স্বাগত অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁরা আমাকে পরিবারের অতি আপনজন হিসেবেই গ্রহণ করলেন। তাঁরা উভয়েই ছিলেন অমায়িক এবং তাঁদের সহৃদয়তার কথা আমি কখনো ভুলতে পারবো না।

আমার জাপানি ভাষা শিক্ষার ক্লাস চলতে লাগলো অধ্যাপক সাকাকিবারার কাছে। অধ্যাপক ছিলেন একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক। তিনি আমার জন্যে যা করছিলেন তা যত না কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে, তার চেয়ে বেশি – ভারতের জন্যে তাঁর ছিল প্রচুর শ্রদ্ধা, এবং আমিও এসেছি সেই ভারত থেকে – যেখানকার পণ্ডিত গণপতি শাস্ত্রীকেও তিনি শ্রদ্ধা করেন। জাপানি অধ্যাপক সম্পর্কে এই আমার অভিজ্ঞতা যে, তাঁরা বিশ্বের যে কোনো স্থানের সমগোত্রীয় অধ্যাপকদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল এবং সেই শ্রদ্ধা জানাতে তাঁরা অকুণ্ঠচিত্ত।

অধ্যাপক সাকাকিবারা যখন আমাকে ভাষা শিক্ষা দিচ্ছিলেন, আমার গৃহকর্তা ও কর্ত্রী তাগুচি দম্পতিও তখন আমাকে ভাষা বিষয়ে সহায়ক শিক্ষা দিয়ে সাহায্য করছিলেন। যেভাবে তাঁরা সাহায্য করছিলেন তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাগুচি দম্পতি ছিলেন কিয়োটোবাসী, ফলে জাপানি ভাষার কানসাই রীতির (Kansai style) সঙ্গে বিশেষ পরিচিত; এই রীতির সঙ্গে টোকিওর কান্টো উপভাষার Kanto dialect) সঙ্গে কিছু লক্ষণীয় পার্থক্য আছে। টোকিও জাপানের রাজধানী এবং রাজপরিবারের বাসস্থান হওয়ায়, টোকিওর ভাষারীতিই প্রচলিত জাপানি ভাষারীতি হিসেবে মর্যাদা পেয়েছে। ব্যাপারটা ঠিক যেমন, অক্সফোর্ড-ইংরেজিই মহারাণীর ইংরেজি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তাগুচি দম্পতির লক্ষ্য ছিল, বিদেশি ছাত্র হিসেবে যাতে আমি টোকিও শহরের কান্টো-জাপানি ভাষাটা রপ্ত করতে পারি। কেননা, কানসাই রীতিতে অভ্যস্ত লোকের পক্ষে কান্টো উপভাষা রপ্ত করা খুবই কঠিন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, আমার গৃহকর্তা তাগুচি দম্পতি আমার জন্যে সর্বপ্রকার কষ্ট স্বীকার করছিলেন আনন্দের সঙ্গে। তাঁরা আমার সুবিধের জন্যেই ঠিক করেছিলেন, আমার সামনে তাঁরা কেবলমাত্র টোকিও প্রচলিত কান্টো উপভাষায় কথা বলবেন। তাগুচি দম্পতির দিক থেকে এই দৃষ্টিভঙ্গি ছিল মানবিকতাপূর্ণ।

আমার গৃহকর্তা দম্পতি আমার খাদ্য সম্পর্কেও ছিলেন সমান সহানুভূতিপূর্ণ। তাঁরা সর্বপ্রকারে চেষ্টা করছিলেন কোন খাবারটা আমার পক্ষে উপযুক্ত হবে তা বোঝার। এটা একটা অস্বস্তিকর অবস্থা : যেখানে আমি চাই প্রথাগত জাপানি খাদ্য, সেখানে তাগুচি দম্পতি তাঁদের অভ্যাসের বাইরে গিয়ে ভারতীয় পদ্ধতিতে খাবার তৈরি করতে চেষ্টা করতেন কেবল আমার সুবিধের জন্যেই। ফলে, তা হতো না ভারতীয় না জাপানি খাবার। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলতে পারি, তাঁরা আমাকে খেতে দিতেন বিরাট পাত্রভর্তি ভাতের সঙ্গে উপযুক্ত মশলা সহ সয়াবিনের ঝোল। জাপানি প্রথায় ভাতের সঙ্গে সয়াবিনের ঝোল তৈরি করা ও খেতে দেওয়া সাধারণত অপ্রচলিত; ভাত ও অন্যান্য পদের খাদ্য সেখানে সাধারণত পৃথকভাবে খাওয়া হয়, কিন্তু ভারতে ভাতের সঙ্গে তা একত্রে খাওয়া প্রচলিত। শ্রীমতী তাগুচি প্রায়ই আমার জন্যে বিশেষভাবে তৈরি করতেন মুরগি বা ডিম সহযোগে চিকেন-রাইস; সঙ্গে থাকতো

চিনি বা সয়াবিনের স্বাদযুক্ত বিশেষ খাবার — যাকে তিনি সস্নেহ ঠাট্টার সঙ্গে বলতেন মিস্টার নায়ারস-পেটেন্ট।

আমরা কখনো কখনো কারির মধ্যে মশলার ব্যবহার প্রসঙ্গে আলোচনা করতাম এবং তার ফলাফল নিয়েও বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করতাম। পরিণাম, আমি বলবো অবশ্যই সন্তোষজনক। ভারতে সকলেই জানেন, কারি-পাউডার পাওয়া যায় বিভিন্ন মশলার ও বিভিন্ন পদ্ধতিতে তৈরি। তৈরির পদ্ধতি হলো রান্নার উপকরণ ও প্রার্থিত স্বাদ আনার ওপর নির্ভরশীল। আমাদের খাদ্যাভ্যাস বিভিন্ন প্রদেশের রুচি-পছন্দ অনুসারে তৈরি হয়েছে বলে তার মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, দক্ষিণীরা খাদ্যে প্রচুর মশলা ব্যবহার করে, অথচ উত্তরাঞ্চলের মানুষ তা পছন্দ করে না। আবার, উত্তর ভারতীয়রা যেখানে প্রচুর ঘি পছন্দ করে, দক্ষিণিরা তা আদৌ করে না; এইরকম আরো কত পার্থক্য রয়েছে।

বিপরীতভাবে, জাপানি খাদ্য অপেক্ষাকৃত শাদাশিধে অথচ খাদ্যগুণ পূর্ণ অর্থাৎ স্বাস্থ্যকর। প্রদেশভেদে ভারতের মতো অত বিভিন্ন ও পার্থক্যযুক্ত নয়। যদিও প্রচলিত জাপানি খাদ্য তেমন বেশি মশলাযুক্ত নয়, তবু জাপানবাসীরা বিশুদ্ধ ভারতীয় মশলাযুক্ত কারি বেশ পছন্দ করে। তাগুচি দম্পতির সংসারে বহুদিনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আমরা জাপানি প্রথায় তৈরি খাদ্য-খাবারেই বেশ অভ্যস্ত হয়েছিলাম। যখনি আমরা মুখ বদল করতে একটু পরিবর্তন চাইতাম, কোনোই অসুবিধে হতো না। কেননা, প্রায় ভারতীয় প্রথার কাছাকাছি একটা রীতিতে তৈরি কারি ও ভাত জাপানের বেশ কয়েকটি সিটি হোটেলে চালু ও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, সেই ১৯২০ সনের কাছাকাছি সময় থেকেই। একই সঙ্গে বিশেষ কয়েক পদের পশ্চিমি খাদ্যও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, যেমন — কর্নফ্লেক ও টমাটো যুক্ত খাবারগুলি। প্রকৃতপক্ষে, কারি-রাইস ক্রমশ জাপানি খাদ্য প্রথার অঙ্গ হয়ে গেল, এমনকি ভাষায়ও স্থান পেলো জাপানি শব্দে (Kareraisu)।

আমার ছাত্রাবস্থায় 'চেরি' (cherry) নামে একটি সুপরিচিত রেস্তোরাঁ ছিল কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছেই। আমি ঠিক জানিনে, এখনো সেটা আছে কিনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানার মধ্যে অবস্থিত ক্যানটিনে এক বিশেষ ধরনের কারি-রাইস তৈরি হতো, কিন্তু ঐ চেরি রেস্তোরাঁয় তৈরি কারি-রাইসের স্বাদ ছিল আরো ভালো। আমার শিক্ষকদের একজন ছিলেন বিশেষভাবে ছাত্রদের সঙ্গে মিশুকে প্রকৃতির। তিনি কখনো কখনো আমাকে নিয়ে এই চেরি রেস্তোরাঁয় যেতেন লাঞ্চের জন্যে। রেস্তোরাঁয় ঢুকে তিনি তাঁর পছন্দমতো লাঞ্চের নির্দেশ দিতেন এবং আমাকে দেখিয়ে বেশ আন্তরিকভাবে ওয়েটারকে বলে দিতেন — মিঃ নায়ারের জন্যে কারি-রাইস। আরেকজন অধ্যাপক, ড. কোবায়াশি (Dr Kobayashi) — আমার জাপানি ভাষা শিক্ষায় সাহায্যকারী — তিনিও আমাকে নিয়ে মাঝে মাঝে আরেকটি মাঝারি গুরের রেস্তোরাঁয় নিয়ে যেতেন এবং কারি-রাইস খাওয়াতেন, কিন্তু তাতে আমি

চেরি রেস্তোরাঁর মতো স্বাদ পেতাম না। সম্ভবত তিনি নীরবে আমার এই অতৃপ্তি লক্ষ্য করে তিনি আর সেখানে আমাকে নিয়ে যাননি এবং আমাকে অন্য কোনো পছন্দমতো ভালো রেস্তোরাঁয় যেতে বলেছিলেন যদিও একটু ইতস্তত করে ; কেননা তা ছিল বেশ ব্যয়সাপেক্ষ। কালক্রমে আমি বিভিন্ন স্থানে রাস্তার মোড়ে বেশ কয়েকটি খাবার দোকান খুঁজে পেয়েছিলাম, সেগুলি তত দামি নয় ও সেখানেও কারি-রাইস পাওয়া যেত ; কিন্তু মশলাটা ঠিক বিশুদ্ধ ভারতীয় ছিল না বলে স্বাদটা একটু বিচিত্র ধরনের। যাই হোক, সেকালে রেস্তোরাঁর খাদ্যাদির সাধারণত খুব একটা চড়াদাম ছিল না। অর্থাৎ আমার ছাত্রাবস্থায় এক প্লেট কারি-রাইসের দাম ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যানটিনে — জাপানি ৫ সেন (ভারতীয় মূল্যে প্রায় ১০ পয়সা) — এখনকার দিনে অনেকটা ঠাট্টা-তামাশার মতোই শোনাবে।

আমি আমার লেখাপড়া বেশ মনোযোগের সঙ্গেই চালিয়ে গেলাম এবং পাঠ্য বিষয় আয়ত্ত করতে বেশ পরিশ্রম করতে লাগলাম। আমি বিদেশে এসেছি সংসারের টাকা খরচ করে, তাই সর্বদাই চিন্তা ছিল যাতে এই টাকার উপযুক্ত সদ্ব্যবহার হয় ও সুফল পাওয়া যায়। আধুনিক জাপান এক বিশ্বশক্তিতে পরিণত হয়েছে এবং তার শিক্ষার মান বেশ উঁচু। দেশ ছাড়ার আগে আমি যে অঙ্কের বিশেষ শিক্ষা পেয়েছিলাম তার জন্যে শিক্ষককে ধন্যবাদ, বিদেশের এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে এনজিনিয়ারিং শিক্ষার ক্ষেত্রে অঙ্কে আমার তেমন কোনো অসুবিধে হয়নি। ফলে, আমার অবসর সময়ে আমি উচ্চতর জাপানি ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে পূর্ণ মনোযোগ দিতে পেরেছিলাম। কেননা, টেকনিক্যাল বিষয়ের ছাত্রদের পক্ষে জাপানি ভাষার শব্দ-ভাণ্ডার ব্যাপক হওয়া দরকার, অন্তত অন্যান্য বিষয়ের (যেমন, ব্যবসা-বাণিজ্য) তুলনায় ; শেষোক্ত বিষয়ের ছাত্ররা মোটামুটি কথ্যভাষার সীমিত সংখ্যক স্বল্প শব্দ-ভাণ্ডার নিয়ে কাজ চালাতে পারে।

আমার শিক্ষকদের সঙ্গে সঙ্গে আমিও বেশ খুশি হলাম আমার জাপানি ভাষা-শিক্ষার ক্রমোন্নতি দেখে। পূর্বোক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও অন্যান্য বিষয়েও কয়েকজন শিক্ষক ও সহপাঠীর কাছ থেকে আমি যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি — যখনি কোনো অসুবিধে হয়েছে তখনি তাঁদের সহায়তা পেয়েছি। মিশুকে প্রকৃতির ছাত্র হিসেবে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গে মেলামেশা করে দেখেছি, লেখাপড়ায় অগ্রগতির পক্ষে এই মেলামেশা আমার পক্ষে বেশ সহায়ক হয়েছে। তাদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে একদিকে আমি ভাষাশিক্ষায় দক্ষতা অর্জন করেছি, তার ফলে আমার লেখাপড়ার বিশেষ কোনো সমস্যার কথা তাদের সহজে বুঝিয়ে বলতে পেরে তার সমাধানও পেয়েছি। আবার, সহজে মেলামেশা করে আমার প্রবাসজীবনের একাকীত্ব আর হতাশার ভাব কাটাতেও সমর্থ হয়েছি। তার ফলে আমার সামাজিক মেলামেশাও সহজসাধ্য হয়ে উঠেছে। আমি দেখেছি, যদিও জাপানিরা বিশেষত চরিত্রগত ভাবে রক্ষণশীল ও মিতভাষী, কিন্তু পরিচিত জনের সঙ্গে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ আর বন্ধুত্বপূর্ণ —

বিশেষত কেউ যদি তাদের সঙ্গে তাদের মাতৃভাষা বিশুদ্ধ জাপানিতে সহজে কথাবার্তা বলতে পারে।

বিদেশি ছাত্রদের, বিশ্বের যেখানে হোক না কেন, সাধারণ একটা ঝোঁক থাকে আপন দেশের ছাত্রদের সঙ্গেই সংকীর্ণ দলবদ্ধ ভাবে থাকা বা চলাফেরা করা। আমার কাছে অবশ্য এটা বরাবরই অসংগত বলে মনে হয়েছে। যদিও তারা আপনাপন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বজায় রাখতে সচেষ্ট হবে, তেমন যেখানে তারা আছে সেখানকার অর্থাৎ বিদেশের ভালো জিনিসও তাদের খোলামনে গ্রহণ ও অর্জন করতে হবে। সৌভাগ্যের কথা, তখন জাপানে বিশেষত কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ে আমিই ছিলাম একমাত্র ভারতীয় ছাত্র, ফলে আমি কোনো সংকীর্ণ দলবদ্ধ হবার সুযোগ পাইনি—একমাত্র জাপানি সহপাঠী ছাড়া।

কিয়োটো আমার খুব ভালো লেগেছিল। জাপানের শহরগুলির মধ্যে এটা একটা সুন্দর শহর, এবং এখনো পর্যন্ত জাপানের সাংস্কৃতিক শহর হিসেবে সুপরিচিত। শহরটি তৈরি হয়েছিল ৭৯৪ খ্রীস্টাব্দে, অতঃপর রাজপরিবার তৎকালীন নারা শহর ছেড়ে এই কিয়োটো শহরেই তার অবস্থান পরিবর্তন করে। ইতিহাসে দেখা যায়, মাঝে মাঝে প্রায়ই এই শহরটি যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে—ভূমিকম্প এবং অভ্যন্তরীণ গৃহযুদ্ধ ইত্যাদির ফলে। শহরটি প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল খ্রী ১৫ শতকের দ্বিতীয় ভাগের গোড়ার দিকে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত খ্রী. ১৬ শতকের শেষ দিকে আবার শহরটি পুনর্গঠিত ও পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠে টয়োটোমি হিদেয়োশির হাতে। হিদেয়োশি ছিলেন এক সামরিক কমাণ্ডার এবং তারই নেতৃত্বে দেশে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক একতা গড়ে ওঠে,—প্রায় একশো বছরের অবিরত গৃহযুদ্ধের পর। তৎকালীন সম্রাটরা থাকতেন কিয়োটো শহরে দীর্ঘ প্রায় ১১ শতাব্দী যাবৎ। সময়টা ছিল ঠিক ১৮৬৮ সনের মেইজি পুনরুদ্ধারের (Meiji Restoration) পরে; এই সময় থেকেই কিয়োটো থেকে জাপানের রাজধানী সরকারিভাবে টোকিও শহরে স্থানান্তরিত হয়। এক সময়ে কিয়োটো পরিচিত ছিল 'হেইয়ান কিও' (Heiyan-kyo) হিসেবে - আক্ষরিক অর্থে শান্তি ও নির্জনতার স্থান; এই বর্ণনাটি এখনো পর্যন্ত উপযুক্ত ভাবেই মানানসই।

ঐতিহাসিক ভাবে কিয়োটো শহর ছিল ধর্ম, শিক্ষা ও শিল্পকলা ইত্যাদির পীঠস্থান। এই শহরে ছিল প্রায় ৩ হাজার বৌদ্ধ মন্দির ও শিন্টো তীর্থস্থান। এখানকার সুন্দর সুন্দর বাড়িঘর ও অসংখ্য দুর্গ/পুরীর মধ্যে গোল্ডেন প্যাভিলিয়ান (Golden Pavilion) ছিল মূলত য়োশিমিৎসু শোগান-এর বাসস্থান এবং তার মৃত্যুর পরে তা রূপান্তরিত হয় এক বৌদ্ধ মন্দিরে।

কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয় হলো জাপানের সম্ভ্রান্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম, প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দ। শহরের ন্যাশন্যাল মিউজিয়াম বিশ্বের সেরা মিউজিয়ামগুলির অন্যতম। মোট কথা, কিয়োটো শহরের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে এবং

এখানকার সংস্কৃতিতে আছে এক সূক্ষ্ম ও উচ্চস্তরের সৌন্দর্যবোধ। এখানকার নিসর্গ-দৃশ্যে আছে সীমাহীন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। শহরটি যেন সাজানো রয়েছে পাইন উইলো এবং অন্যান্য চমৎকার বৃক্ষরাজিতে ঘেরা পাহাড়ের মাঝখানটিতে। জাপানি বাগানগুলি ঠিক যেন সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি, কিন্তু কিয়োটো শহরে তা যেন বিশ্বস্বীকৃত শিল্পরুচি মণ্ডিত জাপানি শিল্পকলায় পরিণত হয়েছে। বসন্তকালে, অর্থাৎ বিখ্যাত চেরি ফুলের বিশেষ মরশুমে সমগ্র কিয়োটো শহর যেন বিশেষ এক স্বপ্নপুরীতে পরিণত হয়।

কয়েকজন আবেগপ্রবণ কবি ও গদ্যলেখক জাপানের বিশেষ সৌন্দর্য বিষয়ে প্রচুর লিখেছেন। সকলেই জানেন, জাপানের প্রত্যেক প্রদেশেরই নিজস্ব বিশেষ সৌন্দর্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। খ্রী. ১৯ শতকের বিখ্যাত এক লেখক হিরাতোরি নাকাজিমার (Hiratori Nakajima) লেখা একটি গদ্যকবিতার অংশবিশেষ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন:

এখানে-সেখানে গাছের পাতা পড়ে শুকিয়ে আছে—বিবর্ণ হলুদ আর ক্রিমসন রঙের; পম্পাস-ঘাস দুলছে যেন কাউকে ডাকছে তাদের লম্বা লম্বা ডালপালা নিয়ে; এমনই এক সৌন্দর্য মণ্ডিত পাহাড়ি পথে—যেখানে ফুলকুমারী আর অর্কিড বাগানের মধ্যে পথ যেখানে ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে—ক্রিসানথিমাম যখন ক্রমশ ফুটতে শুরু করেছে—তাদের শাখা-প্রশাখাগুলি যখন শিশিরবিন্দুর ভারে অবনত হয়ে পড়েছে—মাঝে মাঝে দোলা দিচ্ছে—অন্য সব কিছু ছেড়ে দিয়ে—তাদের শ্রী ও সৌন্দর্য যেন আমাদের হৃদয় ছুঁয়ে যাচ্ছে।...

আমি জানি না, লেখক হিরাতোরি এখানে জাপানের কোন বিশেষ এলাকার চিত্র এঁকেছেন; কিন্তু আমার মনে হয় তাঁর কালি-কলমের ছবি কিয়োটো শহরের পক্ষেই যেন বিশেষভাবে প্রযোজ্য। জাপানের পক্ষে বিশেষ সৌভাগ্যের কথা, কিয়োটো শহরটি বিগত বিশ্বযুদ্ধের সময় বোমাবাজির হাত থেকে রেহাই পায়—যখন অন্যান্য জাপানি শহরগুলি আমেরিকান বিমানের বোমারু বাহিনীর হাতে মাটির সঙ্গে একেবারে মিশে যায়।

৮

রাসবিহারী বোসের সঙ্গে সাক্ষাৎ

বিগত ১৯২৮ সনের এপ্রিলের গোড়ার দিকে আমি স্বল্প সময়ের জন্যে টোকিও সফরে যাই। আমি গিয়েছিলাম সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে, সেই সঙ্গে আরো একটি উদ্দেশ্য ছিল সমান প্রয়োজনীয়। বিখ্যাত ভারতীয় বিপ্লবী রাসবিহারী বোস তখন স্বেচ্ছা নির্বাসনে দিন কাটাচ্ছিলেন টোকিওতে। আমি তাঁর নাম এবং ভারতে কার্যকলাপ সম্পর্কে অনেক কিছু শুনেছি, এবং ভারতীয় স্বাধীনতার জন্যে জাপানে বসেই কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়ার কথাও শুনেছি। আমি তাঁর সঙ্গে যথা শীঘ্র সম্ভব দেখা করার জন্যে আগ্রহী ছিলাম, এবং দেখা করেছিলাম নাকামুরায়া শিনজুকুতে, যেখানে তিনি এবং তাঁর পরিবারের লোকজন একটি 'স্টোর' বা দোকান পরিচালনা করতেন।

আন্তরিক স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে রাসবিহারী বোস আমাকে সেদিন আপ্যায়িত করলেন দুপুরে প্রিয় কারি-রাইস সহযোগে। আমি অভিভূত হয়েছিলাম তাঁর ব্যক্তিত্বে—যা ছিল একাধারে সহৃদয় ও শক্তিশালী তেজস্বিতায় ভরা। যদিও তিনি ছিলেন আমার চেয়ে প্রায় ২৫ বছরের বড, কিন্তু আমি সহজেই তাঁর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের মুগ্ধ পরিচয় পেয়েছিলাম। তিনি আমাকে দেখে বেশ খুশি হয়েছিলেন, বিশেষত আমি ছিলাম তখন জাপানে একমাত্র ভারতীয় ছাত্র।

আমি আগেই সংক্ষেপে লিখেছি, ভারতে বর্তমান শতকের গোড়ার দিকের ব্রিটিশ-বিরোধী বিক্ষোভের কথা, এবং কেমন করে রাজনৈতিক বিক্ষোভ ক্রমশ বিপ্লবী ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে পরিণত হয় সেকথাও লিখেছি। যারা সহিংস বিপ্লবে বিশ্বাসী ছিল, বিশেষত সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের হাত থেকে স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে যারা সশস্ত্র ও সন্ত্রাসবাদের পথ ধরেছিল, তাদের ওপর ব্রিটিশের শক্তিশালী দক্ষ পুলিশবাহিনী জঘন্য রকমের পাশবিক অত্যাচার ও নির্যাতন চালিয়েছিল। বহু সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদীকে হয় ফাঁসিকাঠে ঝোলানো হয়েছিল, অথবা দীর্ঘমেয়াদী কারাবাসে পাঠানো হয়েছিল—আইনের নামে লোকদেখানো নামমাত্র বিচার করে। এই বিপ্লবীরা আত্মরক্ষার্থে কোনোরকম চেষ্টাই করেনি, এবং অসীম সাহসের সঙ্গেই বরণ করে নিয়েছিল—মৃত্যুদণ্ড বা কারাদণ্ড—বিচারের নামে যতসব প্রহসনকে। এঁদের মধ্যে রাসবিহারী ছিলেন এক বিশিষ্ট ব্যতিক্রম। তিনি তাঁর সংগ্রামী সংকল্প পরিত্যাগ করেন নি। এবং সেই কার্যকলাপ চালিয়ে যাবার জন্যে তাঁকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে। তিনি চমৎকার ভাবে ব্রিটিশ পুলিশ বাহিনীর চোখে ধুলো দিয়ে ভারত থেকে পালিয়ে যেতে সমর্থ হলেন। এবং ঘটনাক্রমে জাপানেই

বসবাস করতে মনস্থ করলেন, সেখান থেকে ভারতের স্বাধীনতার জন্যে নতুন কৌশলে কাজ চালিয়ে যাবার জন্যে।

রাসবিহারী বোস তাঁর সাবালক জীবন শুরু করেছিলেন দেরাদুন ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটে কেরানি হিসেবে। কিন্তু এই কাজের মধ্যে থেকেই তিনি তাঁর অধিকাংশ সময় কাটাতেন গুপ্ত/বিপ্লবী রাজনৈতিক কার্যকলাপে। তিনি তখন সর্বদাই যোগাযোগ রাখতেন বাংলার বামপন্থী নেতাদের সঙ্গে, এবং এই সময়েই তিনি শিখেছিলেন কিভাবে বোমা তৈরি করতে হয়। তিনি ছিলেন উত্তর-ভারতের বিপ্লবীদের সঙ্গে গোপন যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম, বিশেষত পাঞ্জাব ও বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি হয়ে উঠলেন ঐসব রাজ্যের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের অন্যতম সংগঠক। তিনি বিশ্বাস করতেন, কেবলমাত্র সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমেই ভারতের জনগণকে জাগানো/বোঝানো যেতে পারে যে তারা ব্রিটিশের হাতে ক্রীতদাসের জীবনযাপন করছে। এইভাবে যখন তাদের চৈতন্য হবে—কেবল তখনই তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠে বিপ্লব করতে পারবে।

তিনি একদল কর্মীর একটি তালিকা করেছিলেন—যে কর্মীরা অসম সাহস আর গভীর আনুগত্যের নামে অঙ্গীকারবদ্ধ—যেকোনো দুঃখকষ্ট সহ্য করতে তারা পিছপা নয়—এমনকি জীবন বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত। তারা তাদের আচরণে অন্যদেরও প্রভাবিত করেছিল—যাতে চরমপন্থীরা সশস্ত্র উপায়ে ব্রিটিশদের ভারতছাড়া করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়—বাংলা, পাঞ্জাব ও উত্তর-ভারতের প্রদেশগুলিতেও সেইভাবে কর্মীসংখ্যা বাড়তে লাগলো। ইংরেজদের ওপর বোমবাজির আক্রমণের অনেকগুলি ঘটনা ঘটলো। বিপ্লবী সংবাদপত্র প্রচারের গুপ্ত অভিযান চললো, চোরাগোপ্তা কার্যকলাপ চলতে লাগলো বেশ উল্লেখযোগ্য দক্ষতার সঙ্গেই। সরকারও দ্রুত পালটা আঘাত হানতে ত্রুটি করেনি; সন্দেহজনক চরমপন্থীদের কঠিন শাস্তি দিয়েছে, এমনকি বিপ্লবাত্মক বইপত্র রাখার দায়েও কাউকে রেহাই দেয়নি। অনেককে দীর্ঘ কারাদণ্ডও দেওয়া হয়েছে। পুলিশের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল বিদ্রোহী মনোভাব প্রচারে ও প্রসারের জন্যে দায়ী, বিশেষত, রাসবিহারী বোসের মতো মারাত্মক ব্যক্তিদের ওপর। কিন্তু তাদের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হলো।

১৯১২ সনে, ব্রিটিশ সরকার ভাইসরয়ের অফিস কলকাতা থেকে সরিয়ে নয়া দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া স্থির করে এবং সেখানেই দেশের রাজধানী গড়ে তোলার ব্যবস্থা করে। সেই ব্যবস্থা অনুসারে তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ দিল্লি স্টেশনে এসে পৌছলেন ২৩ ডিসেম্বর তারিখে। রাজকীয় হাতির পিঠে চড়ে, বর্ণাঢ্য ও জমকালো শোভাযাত্রার আগে আগে তিনি চললেন ভাইস-রিগালের নতুন প্রাসাদে—স্টেশন থেকে প্রায় ৬ মাইল দূরে। স্টেশন থেকে প্রায় ১ মাইল দূরে, বিরাট জনতা যখন কোলাহলমত্ত, হাতির পিঠে বসা ভাইসরয়ের ঠিক পিছনেই একটা বোমা ফাটলো, একজন সেনা অফিসার দারুণভাবে আহত হলেন, স্বয়ং ভাইসরয়ের দেহ

আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হলো।

এবিষয়ে অবশ্য বিভিন্ন কথা শোনা যায় – আসলে কে সেই সাংঘাতিক বোমাটা ছুঁড়েছিল ভাইসরয়কে লক্ষ্য করে। অনেকে বলেন, কাজটা করেছিলেন খোদ রাসবিহারী বসু। কিন্তু এবিষয়ে অনেক সন্দেহ দেখা যায়। অনেকে বলেন এটা কখনোই সম্ভব নয় যে, রাসবিহারী এত সহজেই প্রকাশ্যে দেখা দেবেন; তবে এর পেছনে তাঁর সক্রিয় হাত আছে, এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এমনকি তিনি নিজেও কারো কাছে এ বিষয়ে সত্যপ্রকাশ দূরের কথা, একটি কথাও বলেন নি। বরং পারিপার্শ্বিক তথ্যাদি থেকে যতটুকু জানা যায় তো হলো, তিনি একাজে তাঁর এক বিশ্বস্ত সহচরকে নিয়োগ করেছিলেন সম্ভবত বসন্তকুমার বিশ্বাসকে। বসন্তকুমার, শোনা যায়, স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে ভাইসরয়ের শোভাযাত্রার দর্শনাকাংক্ষী জনতার একদিকে মেয়েদের সঙ্গে মিশেছিল। অন্যান্য মহিলা ও পুলিশের নজর এড়িয়ে সে একটা সুবিধামতো জায়গায় দাঁড়িয়েছিল – সেখান থেকে সে যথাসময়ে বোমাটা ছুঁড়েই শান্তভাবে সরে পড়লো এবং আবার বিরাট জনতার মধ্যে মিশে গেল।

এই বেপরোয়া আক্রমণে সরকারের সমস্ত পুলিশ বিব্রত হয়ে পড়লো এবং কয়েকমাস যাবৎ চললো কঠোর তদন্ত, গুপ্ত সংগঠনের সন্ধানে, – বিশেষত যারা গুপ্ত সংগঠনের সঙ্গে কিছুমাত্র জড়িত, তাদের এবং বিপ্লবী প্রচারপত্র যারা বিলিব্যবস্থা করতো – এদের সকলকেই ছেঁকে ধরার ব্যাপক তোড়জোড় চললো পুলিশের তরফ থেকে। ঘটনাক্রমে সরকার দিল্লি-ষড়যন্ত্র মামলা (দিল্লি কনস্পিরেসি কেস) দায়ের করলো। বসন্ত বিশ্বাস সহ মোট ১১ জনকে সন্দেহজনক অপরাধী হিসেবে গ্রেফতার করা হলো – মারাত্মক বিস্ফোরক রাখা ও হত্যা ইত্যাদির দায়ে অভিযোগ আনা হলো। বসন্ত বিশ্বাস ও অন্যান্য তিনজনকে ফাঁসির হুকুম দেওয়া হলো ১১ মে ১৯১৫ তারিখে। কিন্তু সন্দেহজনক অভিযুক্তদের প্রাথমিক তালিকাভুক্ত অন্যতম রাসবিহারীকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

সঙ্গে সঙ্গেই সরকার ৫ হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা করলেন – যে কেউ পলাতক রাসবিহারী বসুকে ধরবার সঠিক সন্ধান দেবে, এই পুরস্কার সেই পাবে। কিন্তু এই পুরস্কার ঘোষণাও ব্যর্থ হলো। রাসবিহারীর বহু ছদ্মবেশ ছিল। ফলে তিনি প্রায় প্রকাশ্যেই চলাফেরা করছিলেন, আর পুলিশ তখন তাঁকে গ্রেফতার করার জন্যে বিভিন্ন গুপ্তঘাঁটিতে হানা দিয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে হন্যের মতো। রাসবিহারীর তখন বিপজ্জনক অবস্থা। তাঁর অন্যান্য দুর্লভ ক্ষমতার মধ্যে ছিল বিভিন্ন ভাষায় কথাবলার ক্ষমতা, যে কোনো পরিস্থিতি বুঝে সময়ে চলার ক্ষমতা, দুর্দান্ত সাহস আর সাম্রাজ্যবাদী শাসন থেকে যে কোনো মূল্যে ভারতকে স্বাধীন করার দুর্জয় সংকল্প। তাঁর সঙ্গীসাথীরা তাঁকে সাধারণত 'সতীশচন্দ্র' কিংবা শুধুমাত্র 'মোটাবাবু' বলতেন। কাছের মানুষদের মধ্যেও অল্প কয়েকজনই মাত্র তাঁর আসল নাম জানতেন।

রাসবিহারীর পরিকল্পনা ছিল, ২১ ফেবরুয়ারি ১৯১৫ তারিখে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে একটা বিরাট ও ব্যাপক আক্রমণ চালানো হবে যথাসময়ে। কিন্তু কয়েকজন বিশ্বাসঘাতকের জন্যে ঘটনাটা আগাম ফাঁস হয়ে যায় এবং তাঁর পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। তাঁর কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সহকর্মী গ্রেফতার হন। কিন্তু খোদ রাসবিহারীর কোনো রকম সন্ধান পাওয়া গেল না। পুলিশ যখন হন্যের মতো ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর সন্ধান চালাচ্ছে, তাঁর বন্ধুরা ভাবলেন রাসবিহারীর পক্ষে আর ভারতে থাকা নিরাপদ হবে না, এবং তাঁরা বোঝালেন এখন ভারত ছেড়ে তাঁর অন্যত্র চলে যাওয়াই ভালো। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি রাজী হলেন। কিন্তু যেকোনো স্থান থেকেই হোক তাঁর সংগ্রাম চালিয়ে যেতে তিনি দৃঢ় সংকল্প করলেন। কবি রবীন্দ্রনাথের তখন জাপান সফরে যাবার কথা ছিল ১৯১৫ সনের মাঝামাঝি সময়ে। তখনি রাসবিহারীর মাথায় বুদ্ধি এসে গেল, পি. এন. টেগোর অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ টেগোর-এর সেক্রেটারি হিসেবেই তিনি যেন আগে থেকে ঐ সফরের প্রাথমিক ও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাদি করতে জাপান যাচ্ছেন।

কিন্তু কোন জাহাজে চেপে তিনি কলকাতা থেকে জাপানে যাবেন, সে বিষয়ে একটু সন্দেহ দেখা দেয়। কেননা শোনা যায়, তিনি এক নিরপেক্ষ দেশের জাহাজে যাওয়াই স্থির করেন—যেহেতু পুলিশ তখন প্রতিটি জাপানি জাহাজের ওপর কড়া ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছিল – ঐ জাহাজগুলির যে কোনোটিতে রাসবিহারী যেতে পারেন এই সন্দেহে। কিন্তু পি. এন. টেগোর ছদ্মবেশধারী রাসবিহারীকে কবি রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটারি হিসেবে আপাদমস্তক এমনই মানিয়েছিল যে, কারো কোনো সন্দেহই হয়নি এবং রাসবিহারীর পক্ষেও শানুকি-মারু নামে এক জাপানি জাহাজে চেপে কলকাতা ত্যাগ করতেও কোনোই অসুবিধে হয়নি। বলতে গেলে, সদা-জাগ্রত পুলিশের নাকের ডগা দিয়েই জাপানি জাহাজে চেপে রাসবিহারী জাপানে গিয়ে পৌঁছলেন ১২ মে ১৯১৫ তারিখে।

কোনো দুটি রিপোর্টই প্রায় একরকম হবে একথা বলা যায় না, এবং তা যাচাই করে কোনো সুফল পাওয়া যাবে সেকথাও ভাবা যায় না। গুরুত্বপূর্ণ আর উল্লেখযোগ্য হলো, রাসবিহারী তাঁর বিশেষ দক্ষতার বলেই পুলিশের চোখে ধুলো দিতে পেরেছিলেন। জাপানে পৌঁছনোর আগেই তিনি শাংহাইতে ছিলেন কিনা, একথা সঠিক বলা যায় না। কিন্তু এটা প্রকৃত ঘটনা যে, তিনি শাংহাই শহরে গিয়ে সেখানকার জার্মান এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন এবং তাঁর সাহায্যেই রাসবিহারী এক চালান আগ্নেয়াস্ত্র রফতানি করার ব্যবস্থা করেছিলেন বাংলার সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের ব্যবহারের জন্যে। তাঁর কাছে দুর্ভাগ্যের কথা যে, সেই অস্ত্রের চালানটি শেষ পর্যন্ত সঠিক গন্তব্যস্থানে পৌঁছায় নি—ব্রিটিশ গোয়েন্দা এজেন্টরা তার আভাস পেয়েছিল, এবং কলকাতা পৌঁছানোর আগেই মাঝপথে তা আটকে দিয়েছিল।

অনেকের কাছেই এটা এখনো বিস্ময়ের বিষয় যে, লর্ড হার্ডিঞ্জের ওপর বোমার আঘাতের ঘটনায় রাসবিহারীর হাত কতখানি, এবং তাঁর জাপানযাত্রা ও পৌছনোর ঘটনা আজও একটা অজ্ঞাত রহস্যে ঢাকা আছে। অন্তত রাসবিহারী বসুর জীবন ও কার্যকলাপ সম্পর্কে ব্রিটিশ গোয়েন্দা পুলিশের তীক্ষ্ণ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণা ইত্যাদি সত্ত্বেও তা ফলপ্রসূ হয়নি। তার অন্যতম একটা সম্ভাব্য কারণ, রাসবিহারী তাঁর বন্ধুবান্ধব বা অন্য কারো সঙ্গেই নিজের কথা বা তাঁর কার্যকলাপ সম্পর্কে তেমন কিছু প্রায় বলতেনই না। এবং আমি যতদূর জানি, কেউই সেকথা তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করার সাহসই পেত না। তাই রাসবিহারী ও তাঁর জীবন আজও দুর্ভেদ্য রহস্য স্বরূপ, এমনকি তিনি যেন ইতিহাসকেও কিছু পরিমাণে ব্যর্থ করতে সমর্থ হয়েছেন।

কর্মযোগে বিশ্বাসী রাসবিহারী নিজের অভীষ্ট লক্ষ্য ও বিশ্বাসের কথা কাউকে বলতে পছন্দ করতেন না। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ও অভীষ্ট ছিল দেশকে স্বাধীন করা এবং সেজন্যে সাধ্যমতো সর্বপ্রকারে সংগ্রাম করা। তিনি ছিলেন মহাভারতের অন্তর্গত গভীর তাৎপর্যপূর্ণ গীতার মর্মবাণীতে একান্ত বিশ্বাসী। গীতার মর্মবাণী হলো হিন্দু ধর্মদর্শনের সারকথা। তিনি যেখানেই থাকুন, তাঁর কাছে সর্বদাই একখানি গীতা থাকতো। রাসবিহারীর কাছে আদর্শ ও আকর্ষণ ছিল গীতার কর্মযোগে, কর্মফলে নয়। অন্য কথায়, তিনি ছিলেন নিষ্কাম কর্মে (অনাসক্ত যোগ) বিশ্বাসী, যার অর্থ হলো কামনাহীন বা ফলাকাংক্ষাহীন কর্মযোগ বা অনাসক্ত যোগ। গীতার বাণীও তাই: তোমার কর্তব্য বা অধিকার হলো কর্মে, ফলের কথা ভেবো না; কখনো ফলাকাংক্ষা করো না বা আসক্ত হয়ো না; কখনো নিজেকে কর্মবিযুক্ত রেখো না বা কর্ম ছাড়া কখনো থেকো না।—এই হলো রাসবিহারীর কঠোর বিশ্বাস। গান্ধীজী ছাড়া অন্য কোনো ভারতীয়কে যতদূর আমি জেনেছি—যাঁর কথা ও কাজ প্রায় একই স্তরে উন্নীত—তিনি একমাত্র রাসবিহারী বোস।

আগেই বলেছি, রাসবিহারী জাপানে পৌছলেন ১৯১৫ জুনে। এবং তার পূর্বে তিনি আরো দু'জন বিখ্যাত বিপ্লবীর সংস্পর্শে এসেছিলেন—তাঁরাও জাপানে প্রয়োজনীয় আশ্রয় পেয়েছিলেন। এঁদের একজন হলেন ভারতের লালা লাজপত রায় (পরে তিনি আমেরিকায় যান), এবং অন্যজন সান-ইয়াৎ-সেন, চীনা বিপ্লবী। কিন্তু ভারতের ও পূর্ব-এশিয়ার ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগ, বিশেষত জাপানের ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগও চুপ করে বসে ছিল না। জাপানে ব্রিটিশ গোয়েন্দা বাহিনীর কাজকর্ম ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী ও দক্ষ; তারা অনেক আগেই জানতো রাসবিহারী জাপানেই আছেন, কিন্তু সঠিক অবস্থানের হদিস জানতো না। তাদের মতে রাসবিহারী ছিলেন খুবই চতুর এবং প্রায়ই তিনি ঠিকানা বদল করতেন। ফলে তাঁর শরীরের ওপর খুবই ধকল পড়তো, এবং যে কোনো সময়েই তিনি পুলিশের হাতে ধরা পড়ার আশংকা করতেন। জাপানের ব্রিটিশ দূতাবাস জাপানি সরকারের কাছে

আবেদন করলো, বাড়ি-বাড়ি সন্ধান করে রাসবিহারীকে খুঁজে বের করতে ও তাঁকে ভারতে ফেরৎ পাঠাতে।

জাপান সরকারের উচ্চ পদাধিকারীদের মধ্যে এবং দেশবাসীদের মধ্যে রাসবিহারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সহানুভূতিপূর্ণ মানুষের সংখ্যা ছিল যথেষ্ট। এরকম একজন বিশিষ্ট মানুষ হলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কাউন্ট ওকুমা (Count Shigenobu Okuma) স্বয়ং। কিন্তু ১৯০২ সনের অ্যাংলো-জাপানি মৈত্রী তখনো বলবৎ ছিল, এবং তার ফলে ব্রিটিশ সরকার এ বিষয়ে জাপানের বিদেশ দফতরের ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল। কার্যত রাসবিহারীর বিরুদ্ধে এক বিশেষ হুকুমনামা পাশ হলো, যাতে বলা হয়, এক নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যেই তাঁকে শাংহাই হয়ে ভারতে চলে যেতেই হবে। ব্রিটিশ সরকারের মতলব হলো, একবার রাসবিহারীকে শাংহা তে নিয়ে আসতে পারলেই তারা সহজেই তাঁকে গ্রেফতার করতে পারবে – কারণ শাংহাইতে ব্রিটিশের কিছু বিশেষ আঞ্চলিক অধিকার ও কর্তৃত্ব ছিল। কিন্তু জাপান সরকারের ঐ বিশেষ হুকুমনামা কার্যকরী হবার আগেই, সৌভাগ্যক্রমে সান-ইয়াৎ-সেনের মাধ্যমে রাসবিহারীর পরিচয় হয় জাপানের তৎকালীন চরম দক্ষিণপন্থী জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীর প্রধান মিৎশুরু টয়ামার (Mitsuru Toyama) সঙ্গে।

টয়ামা ছিলেন একজন প্রচণ্ড শক্তিশালী মানুষ - যাঁর অসামান্য প্রভাব ছিল রাজপ্রাসাদ থেকে চাষীর কুটির পর্যন্ত প্রায় সর্বত্র। এই টয়ামা রাসবিহারীর গভীর স্বদেশপ্রেমে মুগ্ধ হন, এবং জাপানেই তাঁকে আশ্রয় দানের সিদ্ধান্ত নেন। ফলে রাসবিহারী একদিন যখন টয়ামার বাড়িতে বসে কথা বলছিলেন, জাপানি পুলিশ তখন টয়ামার বাড়ির বাইরে অপেক্ষা করছিল – বাড়িতে ঢোকার সাহস হয়নি তাদের। টয়ামা সেকথা জানতেন এবং খিড়কি দরজা দিয়ে রাসবিহারীকে বাড়ির বাইরে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। কেউ জানতেই পারলো না, রাসবিহারী কোথায় গেছেন। ঘটনাটা হলো, টয়ামার নির্দেশে এক বিশিষ্ট দম্পতি, মিঃ আইজো সোমা ও তাঁর স্ত্রী কোকো (Mr. Aizo Soma & Mrs. Kokkoh) নাকামুরায়া/শিনজিকুর স্বত্বাধিকারী, রাজী হলেন গোপনে রাসবিহারীকে আশ্রয় দিতে। তাঁরা বিরাট এক ঝুঁকি নিলেন। যদি কোনো ভাবে জাপানের ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস একবার এই ঘটনা ও ঠিকানা জানতে পারতো, তাহলে কেবল রাসবিহারীই নয়, তাঁর মহান আশ্রয়দাতাও দারুণ অসুবিধের মধ্যে পড়তেন। কিন্তু টয়ামা ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসকেও আয়ত্তে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন।

ইতিমধ্যে টয়ামা জাপান সরকারকে পরামর্শ দিলেন যে, ব্রিটিশের হাতে ভারতীয় স্বদেশপ্রেমিককে ধরিয়ে দিয়ে কোনোমতেই ব্রিটিশকে খুশি করা উচিত হবে না; কারণ, একবার তাদের হাতে পড়লে এই স্বদেশপ্রেমিককে নিশ্চয়ই ফাঁসিতে ঝোলানো হবে। এটাও একটা ঘটনা যে, ইয়োরোপে যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে, চীন ও ব্রিটেন সম্পর্কে জাপানের নীতিতে পরিবর্তন হতে শুরু করলো। চীনে জাপানি স্বার্থ এবং

ব্রিটিশ স্বার্থের মধ্যে সংঘাত শুরু হলো, এবং অ্যাংলো-জাপানি সম্পর্কের ওপর তার প্রতিক্রিয়া শুরু হলো। সুতরাং যদিও জাপান সরকার ঘটনাক্রমে জানতে পারে রাসবিহারী কোথায় আছেন, তবু সরকার তাঁকে কোনোরকম বিব্রত করলো না। জাপান সরকার ব্রিটিশকে কেবল অনুমান ও সন্দেহের মধ্যেই রাখলো এবং ফাঁকা কথায় ভুলিয়ে বোকা বানালো এই বলে যে, তারা সর্বপ্রকারে সাধ্যমতো চেষ্টা করবে রাসবিহারীকে ব্রিটিশের হাতে ধরিয়ে দিতে। প্রকৃতপক্ষে পরে আমি শুনেছি, যে পদস্থ পুলিশ অফিসারটির ওপর রাসবিহারীকে ধরার আদেশ ছিল, তিনিই ছিলেন জাপানের চিবা বিচে (Chiba beach) রাসবিহারীর সাঁতারু-সঙ্গী। টয়ামা রাসবিহারীকে আশ্বাস দিলেন, তাঁর কোনোরকম ক্ষতি করা হবে না।

ব্রিটিশ সরকার একজন প্রবীণ ইংরেজ পুলিশ অফিসারকে ভারত থেকে জাপানে পাঠায়—রাসবিহারীকে খুঁজে বের করার কাজে জাপানি কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করতে। এই প্রবীণ অফিসারটি রাসবিহারী সম্পর্কে যেসব খবর বহুকষ্টে সংগ্রহ করেছিলেন এবং ১৯১৫ সনে ভারত সরকারকে জানিয়েছিলেন সেই অনুসারে, রাসবিহারী তখন সম্রাট লর্ড চেম্বারলেন-এর প্রাসাদের চৌহদ্দির মধ্যেই অবস্থান করছিলেন। ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের পক্ষে এটা মোটেই কৃতিত্বের পরিচয় নয়, বরং অক্ষমতার কথা। অধিকন্তু জাপানে ব্রিটিশ কূটনীতির প্রভাব হ্রাসের জন্যে দক্ষিণ-চীন সমুদ্রে এক ব্রিটিশ টহলদার বাহিনীর লোকজন একটি জাপানি জাহাজের ওপর অভিযান চালায় এবং কয়েকজন ভারতীয় সহ জাপানি পদস্থ কর্মচারিদের গ্রেফতার করে। এর ফল হলো বিপরীত, অর্থাৎ সমগ্র জাপানে বিশেষত সরকারি স্তরে এক ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে; টোকিওর বিদেশ দফতর তখনি রাসবিহারী বোসের ওপর থেকে জাপান হতে বহিষ্কার আদেশ বাতিল করে দিল, ১৯১১ এপ্রিলে। কিন্তু যদিও রাসবিহারী সরকারি দৃষ্টিতে একজন মুক্ত মানুষ. তাঁর বিপদ তখনো কাটেনি। কারণ ব্রিটিশ সিক্রেট এজেন্টরা তখনো সারা জাপানে রাসবিহারীর খোঁজে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে, তারা হয়তো সন্ধান পেলেই রাসবিহারীকে গায়েব করে দেবে।

সুতরাং রাসবিহারী সাবধানে চলাফেরা করতে লাগলেন এবং প্রায়ই বাসা বদল করতেন। তিনি অবশ্য গোপনে সোমা পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতেন—যাঁদের সাহায্য তাঁর প্রয়োজন হতো বিভিন্নভাবে। এই গোপন যোগাযোগের সূত্র হিসেবে কাজ করতো তোশিকো, পূর্বোক্ত সোমা-দম্পতির বড় মেয়ে—যে কোনো বিপদের মধ্যে ঝুঁকি নিয়ে কাজ করার পক্ষে অসমসাহসী এক বিশিষ্ট মহিলা। এই জটিল পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে টয়ামার মনে হলো, যদি উভয় পক্ষের আপত্তি না থাকে, এবং খুবই ভালো হয়, যদি সোমা দম্পতি তাঁদের মেয়ে তোশিকোকে বিয়ে দেন রাসবিহারীর সঙ্গে; তাহলে রাসবিহারীর জীবনটা অন্তত জাপানে কম দুঃসহ হয়। টয়ামার কথা শুনেই সোমা-দম্পতি তাঁদের মেয়ে

তোশিকোর ওপরেই সিদ্ধান্ত নেবার ভার দেন। তোশিকো প্রায় এক মাস এ বিষয়ে চিন্তা করে স্থির করলো রাসবিহারীকে বিয়ে করে সে সুখীই হবে। রাসবিহারীও তাঁর দিক থেকে তোশিকোকে ভালোবাসতেন, কিন্তু তার জন্যে একটা দ্বিধা ছিল যেহেতু সোমা-দম্পতিকে তিনি নিজের পিতামাতার মতোই ভক্তিশ্রদ্ধা করতেন, এমনকি তাঁদের বাবা-মা বলেই ডাকতেন; সেক্ষেত্রে তোশিকোর সঙ্গে নতুন সম্পর্কের কথায় তিনি একটু ইতস্তত বোধ করলেন। কিন্তু তোশিকোই এই সমস্যার সমাধান করলো এবং তার সম্মতির কথা তার বাবা-মাকে জানালো। অতঃপর তোশিকোর সঙ্গে রাসবিহারীর বিয়ে হয় ১৯১৭ সনে।

এটা একটা দুর্লভ ঘটনা; অন্তত এমন ঘটনার খুব বেশি নজির নেই, যেখানে জাপানি মেয়েরা সহজে বা স্বেচ্ছায় বিদেশিদের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। এবং বিশেষত এক্ষেত্রে যেখানে এই বিদেশির মাথার জন্যে মোটা টাকার পুলিশি পুরস্কার ঘোষিত রয়েছে। কিন্তু এই বিবাহ শেষ পর্যন্ত সার্থকতায় পরিণত হয়েছিল। উদারচিত্ত তোশিকো প্রশংসনীয় সাহসের পরিচয় দিয়েছিল। রাসবিহারী এবং তোশিকোর মধ্যে যে শ্রদ্ধা-প্রীতির সম্পর্ক ছিল, মানবতার ইতিহাসে তা এক গভীর ও নিবিড় সম্পর্কের কথা ও কাহিনী হিসেবে উল্লেখযোগ্য।

তাঁদের দুই সন্তান: বড়টি ছেলে এবং ছোটটি মেয়ে। ছেলের নাম মাসাহিদে বোস, তাঁর ভারতীয় নাম অশোক; দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর মৃত্যু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ওকিনাওয়ার এক সংঘর্ষে। মেয়ের নাম তেৎসুকো: বয়স প্রায় ৫৯ বছর; বেশ ভালো বিয়ে হয়েছে মিঃ হিগুচি নামে একজন দক্ষ এনজিনিয়ারের সঙ্গে। রাসবিহারীর মেয়ে তেৎসুকো কখনো ভারতে আসেন নি, কিন্তু তাঁর বড় মেয়ে আসেন বিগত ১৯৬৯ সনে। তিনি একসময় দিল্লিতে পড়াশোনার কথা ভেবেছিলেন, কিন্তু ঘটনাক্রমে সেই পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত ত্যাগ করেন, বিশেষত ভাষাগত অসুবিধের জন্যে এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার সমস্যার কথা ভেবে।

দুর্ভাগ্যক্রমে তোশিকোর মৃত্যু হয় ১৯২৫ সনে, বিবাহের মাত্র ৮ বছর পরে। তোশিকোর বয়স তখন মাত্র ২৮ বছর। বিপ্লবী হিসেবে রাসবিহারীর সাহস কিংবদন্তির মতো সুবিদিত; অথচ সেই রাসবিহারীই স্ত্রীর মৃত্যুতে যেন ভেঙে পড়লেন। কিন্তু বিভিন্ন ভাবে কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে নিজের সংকল্প বজায় রেখে চললেন—ভারতের স্বাধীনতার স্বার্থে। ইতিমধ্যে আবার সেই মিৎসুরু টয়ামার চেষ্টায় জাপান সরকার রাসবিহারীকে জাপানের স্বাভাবিক নাগরিকত্ব দান করে ১৯২৩ সনে—যার ফলে টয়ামার মতো স্বাধীনচেতা মানুষের সাহায্যে রাসবিহারীর পক্ষে তাঁর কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়া সম্ভবপর হয়েছিল। তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত রাখলেন জাপানের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করা ও ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে আলাপ-আলোচনা করা, সভা-সমিতির অনুষ্ঠান করে

ভারতের পক্ষে ভাষণ দেওয়া, সমগ্র জাপানে ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতের পক্ষে বিভিন্ন সংস্থা সংগঠন করা ইত্যাদি অবিশ্রান্ত কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে। তিনি জাপানি ভাষা এমন দক্ষতার সঙ্গে আয়ত্ত করেছিলেন যে তিনি জাপানিতে শুধু ভাষণ দেওয়াই নয়, ইংরেজি বাংলা ও হিন্দি ভাষার বইপত্র জাপানি ভাষায় অনুবাদও করতে পারতেন খুব সহজে ও সাবলীল ভাবে। তাঁর জাপানি অনুবাদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির 'ইণ্ডিয়া ইন বণ্ডেজ' (India in Bondage) বইখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জাপানে ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে একটি সুসংগঠিত সংস্থা রাসবিহারীই স্থাপন করেন।

যাই হোক, নাকামুরায়ার মহান সোমা-দম্পতির সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। এবং হিগুচি পরিবার ও আমার পরিবারের মধ্যে একটা গভীর স্নেহ-ভালোবাসার সম্পর্ক বজায় ছিল। যখন আমি কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ছিলাম, রাসবিহারী বসুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল কেবলমাত্র সভা-সমিতি উপলক্ষে সাময়িক দেখাশোনার মধ্যেই সীমিত। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের যোগদানের সময় থেকে (তখন আমি মানচুকুয়োতে) আমদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতা ও অন্তরঙ্গতায় পরিণত হয়। (এ বিষয়ে পরে আমি এই বইয়ের যথাস্থানে বলবো।) এখন এইটুকু মাত্র ভূমিকা হিসেবে বলে রাখতে চাই, যদিও সরকারিভাবে রাস-বিহারী ছিলেন জাপানের স্বাভাবিক নাগরিক এবং সর্বপ্রকারে নিখুঁতভাবে জাপানি জীবনযাপনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন, তবুও অন্তরের অন্তস্থলে তিনি ছিলেন একজন গোঁড়া ও খাঁটি ভারতীয় স্বদেশপ্রেমিক – জাপানে আসার আগেও যা এখনো তাই। তাঁর শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত তিনি ভারতের স্বাধীনতার জন্যে কাজ করে গেছেন। হিন্দু দর্শন ও গীতা বিষয়ক তাঁর ভাষণাদির মধ্যে তিনি প্রায়ই বলতেন, ভারতের স্বাধীনতা লাভের পরে তিনি হয় মাউন্ট ফুজিতে কিংবা হিমালয় পর্বতে বসবাস করবেন, এই তাঁর শেষ ইচ্ছা।

রাসবিহারী বোসের সঙ্গে সাক্ষাতের পর আমি কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসি এই মনোভাব নিয়ে—আমি যেন এক তীর্থযাত্রায় গেছি এবং দাঁড়িয়ে আছি এক পবিত্র দেবস্থানে। এই প্রেরণা ও চেতনা আমার মন থেকে কখনো শুকিয়ে যায়নি।

৯

সম্রাটের অভিষেকের দিন

কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ছাত্রজীবনে হঠাৎ বাধা পড়লো অপ্রীতিকর এক নাটকীয় ঘটনায়; পরিহাসছলে বলতে গেলে কিয়োটোতে অনুষ্ঠিত সেই মহান জাতীয় উৎসবের মধ্যে। অর্থাৎ সম্রাট হিরোহিতোর অভিষেকের উৎসব উপলক্ষে (coronation of Emperor Hirohito)।

এমনকি জাতীয় রাজধানী কিয়োটো থেকে টোকিওতে স্থানান্তরিত (মেইজি আমলে) হবার পরেও ঐতিহ্য অনুসারে বিধান রয়েছে (এখনো তা প্রয়োজন, কেননা শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন হয়নি) যে, প্রত্যেক নতুন সম্রাটের অভিষেক উৎসব পরিচালিত হবে কিয়োটোর রাজকীয় প্রাসাদে। যখন সম্রাট তাইশোর মৃত্যু হয় ২৫ ডিসেম্বর ১৯২৬ তারিখে, রাজপ্রতিনিধি হিসেবে যুবরাজ হিরোহিতোর নাম উত্তরাধিকারী রূপে অবিলম্বে ঘোষিত হয়। কিন্তু তাঁর আনুষ্ঠানিক অভিষেকের জন্যে অপেক্ষা করতে হয় কিয়োটোতে তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি সমাধা করার জন্যে। এই ব্যবস্থাদি এমন হওয়া চাই, যাতে বিশ্বশক্তি হিসেবে জাপানের মান-মর্যাদা বজায় থাকে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনায়কদের আমন্ত্রণ করতে হবে এবং তাঁদের জন্যে উপযুক্ত সম্মানজনক ব্যবস্থা করতে হবে সেই উপলক্ষে। অর্থাৎ সবকিছুই সমাধা করতে হবে নিখুঁতভাবে, যাতে সেই অনুষ্ঠান তথা দেশের সম্মান বাড়ে। সর্বোপরি নিরাপত্তা ব্যবস্থা হওয়া চাই অটুট নিশ্ছিদ্র। এখনো সত্য মনে আছে, যুবরাজের জীবনহানির চেষ্টা হয় ১৯২৩ ডিসেম্বরে, টোকিও রাজ-প্রাসাদের কাছে টোরানোমোন এলাকায়; আততায়ী দাইশুকে নামবা। কিন্তু এই মর্মান্তিক পরিণতি সামান্যর জন্যে এড়ানো সম্ভব হয়, কেননা নিক্ষিপ্ত বুলেটটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

সম্রাটের রাজ্যাভিষেকের সেই শুভ অনুষ্ঠানের সময় নির্দিষ্ট ছিল ১০ নভেম্বর ১৯২৮ তারিখ বেলা ৪টায়। আগের দিন রাত্রি প্রায় ৯টা থেকেই বড় বড় রাস্তা-গুলি জনসমাবেশে ভর্তি হয়ে গেল—কে কোথায় ভালোভাবে দাঁড়াতে পারবে সেই চিন্তায় যথাসময়েই জমায়েত হলো—বিশেষত যেসব রাস্তা দিয়ে রাজকীয় শোভা-যাত্রা রাজপ্রাসাদের দিকে যাবে, সেইসব রাস্তার দু'ধারে প্রচুর ভিড় হলো। জনতা সাগ্রহে দেখতে চায়, তাদের সম্রাট রাজকীয় শোভাযাত্রা পরিচালনা করে আগে আগে চলেছেন তাঁর ঘোড়ায় টানা রথে চড়ে—পিছনে পিছনে চলেছে মোটর সাইকেলধারী রক্ষী বাহিনীর দল।

এই ধরনের অনুষ্ঠানের মধ্যেই সাধারণত কিছু অসুবিধা থাকেই—যে অসুবিধা

নিখুঁত সরকারি প্রশাসন যন্ত্রও ঠিকমতো দূর করতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, হাজার হাজার লোক যখন রাস্তার দু ধারে জমায়েত হয় এবং সারাদিন ধরে দাঁড়িয়ে থাকে, স্বাভাবিক নিয়মেই তখন নানা অসুবিধা দেখা দেয়। বিশেষত মানুষের শারীরিক দিক থেকে (মলমূত্র ত্যাগের বিষয়ে) যেসব সমস্যা অনিবার্য। এই অবস্থায় সমস্যা মূলত দু'রকমের : প্রথমত মলত্যাগের বেগ এবং দ্বিতীয়ত মূত্র-ত্যাগের প্রয়োজন, কিভাবে এগুলি সামলানো যায় সেটাই বড় কথা, – বিশেষত রাস্তা নোংরা না করে কিংবা অস্বাস্থ্যকর অবস্থার সৃষ্টি না করে কিভাবে এই সমস্যার সমাধান করা যায়, সেটাই বড় সমস্যা।

মানুষও এই সমস্যার সহজ সমাধান করে ফেলেছে। মলত্যাগের বেগ অসহ্য হলেও বেশ কিছুক্ষণের জন্যে অপেক্ষা করা যায়। কিন্তু মূত্রত্যাগের বেগ কিছুতেই সহ্য করা যায় না, বিশেষত আবহাওয়া যখন ঠাণ্ডা থাকে, নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে। অত-এব একটা ব্যবস্থা অবশ্যই করা চাই। প্রত্যেকেই হয় একটা রাবারের ব্লাডার অথবা খালি বোতল সঙ্গে রাখে, মূত্রত্যাগের প্রয়োজন মেটানোর জন্যে। কাজ সারা হলে ও পাত্র ভর্তি হয়ে গেলে, একটা নির্দিষ্ট কেন্দ্রে এগুলি জমা রাখা হয় এবং শেষ পর্যন্ত স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে এগুলি নষ্ট করে ফেলা হয়। অর্থাৎ ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়।

রাজ্যাভিষেকের এই অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ হারাতে চাই না বলে, আমিও একটা খালি বোতল সঙ্গে নিয়ে ৮ নভেম্বর সন্ধ্যায় গিয়ে যথাস্থানে পৌঁছলাম। প্রয়োজনীয় মুহূর্তে সবাই যা করে আমিও তাই করতে যেই প্রস্তুত হয়ে খালি বোতল বের করেছি, অমনি জাপানি রক্ষীবাহিনীর কয়েকজন আমার দিকে এগিয়ে এলো। বিশেষ জাপানি প্রথায় তাদের অভিবাদন করে দাঁড়াতেই, তাদের একজন এসে তন্ন তন্ন করে আমার দেহ তল্লাসি করলো যাতে ডবল নিশ্চিত হওয়া যায় যে, আমার শরীরের কোথাও অস্ত্রশস্ত্রাদি লুকোনো নেই। অবশ্য তারা কিছুই পায়নি। আমার মূত্রত্যাগের বোতল অন্য আর পাঁচজনের মতোই স্বাভাবিক এবং তা কোনোক্রমেই ক্ষতিকর হতে পারে না। তবুও রক্ষীবাহিনীর কয়েকজন সর্বক্ষণই আমার পাশেই দাঁড়িয়ে রইলো। যতদূর দেখলাম, আর কাউকেই এভাবে সতর্ক নজরবান্দী রাখা হয়নি। আমার খুবই আশ্চর্য লাগালো যে, আমাকে সবাই অদ্ভুত ভাবে দেখতে লাগলো এবং স্বভাবতই আমি বিব্রত বোধ করতে লাগলাম। আমি কিছুটা আপনমনে এবং কিছুটা রক্ষীবাহিনীর সুবিধার্থে বললাম – আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে এভাবে আর শোভাযাত্রা দেখতে চাইনে, ততক্ষণ আমি কোনো সিনেমা দেখবো। অত্যন্ত বিমর্ষচিত্তে আমি বাড়ি ফিরে গেলাম এবং ঘুমিয়ে পড়লাম।

কিন্তু ব্যাপারটা এখানেই শেষ হলো না। পরদিন আমি জানতে পারলাম যে, পুলিশ বিভাগের শাদা-পোশাকের কয়েকজন গোয়েন্দা কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে অনুমতি চাইলো আমার গতিবিধির ওপর নজর রাখবার জন্যে। কিন্তু

কর্তৃপক্ষ এরকম কোনো অনুমতি দিতে অস্বীকার করলেন। বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানার মধ্যে এসব চলবে না বলে দিলেন : সীমানার বাইরে পুলিশ যা করতে চায় সে বিষয়ে তাদের কিছু বলার নেই। যেহেতু আমি অধ্যাপক তাগুচির বাড়িতে থাকতাম, একজন পুলিশ অফিসার তাঁকে গিয়ে আমার কথা বললেন এবং তাঁর সম্মতি চাইলেন আমার ওপর নজর রাখবার। অফিসারটি অধ্যাপক তাগুচিকে হঠাৎ বললেন সিক্রেট সার্ভিসের নির্দেশ আছে আমার ওপর নজর রাখার, যেহেতু গ্লচেস্টার ডিউকের নিরাপত্তার দিক থেকে আমি নাকি বিপজ্জনক, — তিনি তখন ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে কিয়োটোতে ছিলেন অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে, এবং আমিও থাকতাম ঐ কিয়োটোতেই।

আমার আশ্রয়দাতারা স্বভাবতই দারুণ বিব্রত বোধ করলেন যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। অধ্যাপক তাগুচিকে শান্ত করতে পুলিশ অফিসাররা বললেন, তাঁরা অধ্যাপককে কোনোক্রমেই হয়রানি করবেন না, তাঁরা ছদ্মবেশে বাড়ির ছাদের ওপর থেকে এবং বাড়ির বাইরে থেকে আমার ওপর নজর রাখবেন। অধ্যাপক তাগুচি কোনোক্রমেই খুশি হলেন না, কিন্তু আপত্তি করার কোনো উপায় দেখতে পেলেন না। তিনি শুধু এইটুকুই বললেন সবকিছু আমাকে বলাই ভালো হবে।

পুলিশ অফিসারটি আমার কাছে এলেন এবং বিনীতভাবে অভিবাদন জানিয়ে তাঁর পরিচয়পত্র আমাকে দেখালেন। অফিসারটি আমার প্রতি সশ্রদ্ধ ভাব দেখালেন, যা আমি আশা করিনি, বিশেষত আমি যখন একজন ছাত্র। অফিসারটি বললেন — মিঃ নায়ার, আমাদের বন্ধু হিসেবেই মনে করবেন, আমরা আপনাকে সিনেমায় নিয়ে যাবো, অথবা অন্য যেখানে আপনি যেতে চান নিয়ে যাবো, কিন্তু আমরা আপনার সঙ্গেই থাকবো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কেন? অফিসারটি জবাব দিলেন : গ্লস্টারের ডিউক এখন অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাবেন; আমাদের বলা হয়েছে আপনি একজন বিপজ্জনক লোক, এবং আপনি ডিউকের ক্ষতি করতে পারেন; যদি তাই হয় তাহলে আমরা খুবই মুশকিলে পড়বো, অতএব আপনাকে আমাদের নজরে রাখতে হবে।

এটা খুবই আশ্চর্যের কথা যে, সিক্রেট সার্ভিসের লোকেরা এমন খোলাখুলি বিপদের কথা জানিয়ে দেবে - সাধারণত যা গোপন রাখারই কথা — তার মধ্যে সত্য-মিথ্যা যাই থাক না কেন। যাই হোক, তার ফলে আমি কম বিরক্ত হইনি। আমিও বেশ রাগতভাবেই বললাম : আপনারা এরকম ভাবছেন কেন? বেশ ঠাণ্ডা মাথায় পুলিশ অফিসারটি বললেন : যেহেতু আমরা ভারত থেকে খবর পেয়েছি ; ব্রিটিশ পুলিশ বিভাগ চায় আপনার ওপর আমরা নজর রাখি ; অতএব আপনি অবশ্যই বিপজ্জনক লোক।

যদিও দারুণ ক্ষেপে গিয়েছিলাম, তবু যথাসাধ্য শান্ত থাকার চেষ্টা করে আমি সবিনয়ে বললাম : আমি মোটেই বিপজ্জনক লোক নই, আমি কিয়োটো বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের একজন ছাত্র। কিন্তু অফিসারটি আমাকে স্বস্তি দিলেন না। অফিসারটি বললেন : না। আগের মতো শান্ত ও দৃঢ় ভাবেই বলে চললেন : ব্রিটিশের মতে আপনি বিপজ্জনক। অতঃপর মেজাজ চড়িয়ে বললাম : দেখুন বন্ধুবর, এটা আপনাদের দেশ, আপনি আপনাদের নিয়মে যা হয় কর্তব্য করুন, আমাকে বিরক্ত করবেন না ; আমি আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যথানিয়মে ভারতীয় ছাত্র হিসেবেই ভর্তি ও তালিকাভুক্ত হয়েছি ; আমি বুঝতে পারি না, কেন আপনি ও আপনার লোকজনেরা আমাকে এভাবে হয়রানি করবেন।

অফিসারটি যেভাবে শান্ত হয়ে সব কথা শুনছিলেন তাতেই যেন আমার মেজাজ আরো চড়ে যাচ্ছিল। অফিসারটি বললেন : অবশ্য আমরা আপনার কোনো ক্ষতি করবো না। আরো বললেন : আমরা আপনার মতোই ছাত্রদের পোশাক পরবো, কিন্তু আমরা অবশ্যই আপনার সঙ্গেই থাকবো, আপনি যেখানেই থাকুন না কেন॥ আমি বললাম : আপনি কিভাবে ছাত্রদের পোশাক পরবেন, আপনি যখন পুলিশের লোক, অবশ্যই আপনাকে পুলিশের পোশাক পরতে হবে বলে জানি। অফিসারটি বললেন : ওহো, এটা কোনো সমস্যাই নয়, আমরা সাধারণ পুলিশ নই, বিশেষ পুলিশের লোক, ; আমরা যে কোনো পোশাক পরতে পারি। আমি ভাবলাম, এসব যুক্তিহীন হতাশার কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়া অনর্থক। আমি বিরক্ত হয়েই বললাম : আপনি সরকারের বেতনভুক কর্মচারি, সরকারের আদেশমতো কাজ করতে বাধ্য, আপনি যা ভালো বোঝেন করতে পারেন।

আমি অবশ্য অফিসারটির মূলকথায় সন্দেহ করি না যে, তিনি সরকারি আদেশ-মতোই কাজ করছেন। অবশ্যই জাপানের ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগ এবং ভারতীয় পুলিশ বিভাগের মধ্যে এমন কোনো ব্যবস্থা হয়েছে যার ফলে আমার ওপর নজর রাখার সরকারি অনুরোধ এসেছে, এবং জাপানি কর্তৃপক্ষ সেই নির্দেশই পালন করছে মাত্র। আমি শুনেছি, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস হলো অক্টোপাসের মতো একটি বহুমুখী সংস্থা এবং স্বভাবতই ভারতের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে, যেমন আছে অন্যান্য দেশের সঙ্গেও। নিঃসন্দেহে আমার নাম ত্রিবাংকুর পুলিশের খাতায় লেখা আছে, কিন্তু আমার কাছে এটা নতুন খবর যে তার ফলে কেউ জাপানি পুলিশকে জানাতে পারে — আমি একজন বিপজ্জনক লোক, এবং গ্লচেস্টারের ডিউককে নিরাপদে রাখতে হবে আমার ভয়ে। নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোথাও কোনো ভুল হয়েছে, কিন্তু সেটা কি তা সঠিক জানিনে, এবং আমার মনে হয় এক্ষেত্রে আমার পক্ষে চরম বিরক্তিবোধ করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই।

গ্লচেস্টারের ডিউক কিয়োটো শহরে ছিলেন এক সপ্তাহ ; এই এক সপ্তাহ জাপানের বিশেষ পুলিশের লোক আমি যেখানেই গেছি, আমাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করেছে। এমনকি আমি যখন পায়খানায় এবং স্নান করতে গেছি তখনো পর্যন্ত। আমি অবশ্য তাদের কাজের জন্যে বাহাদুরিই দিই, কেননা তাদের আচরণ

ছিল বরাবরই বিশেষ ভদ্রোচিত। অফিসারদের একজন আমাকে বললেন, আমার মতো একজন ছাত্রের সঙ্গে তাঁকে যে এরকম ব্যবহার করতে হচ্ছে তার জন্যে তিনি বিশেষ দুঃখিত। তিনি বললেন, আমি যেখানে খুশি যেতে পারি একমাত্র ডিউকের বাসস্থানের কাছাকাছি জায়গা ছাড়া, এবং আমার সঙ্গে সর্বদাই তাঁদের লোকজন থাকবে। একদিন ডিউক যখন তাঁর বাসস্থান ছেড়ে মিয়াকো হোটেলে যাচ্ছিলেন প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করতে, তখন বিশেষ পুলিশের লোকজন বললো আমাকে এখন সিনেমা দেখতে যেতে হবে; অতএব তারা আমাকে একটি সিনেমায় নিয়ে গেল। পরে আমি যখন বললাম, আমি কোবেতে যেতে চাই আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে, তারা তাতেই রাজী হয়ে আমার সঙ্গেই চললো। যখন আমি টিকিট কাটার চেষ্টা করছি, অফিসারটি আমাকে বললেন: টিকিটের প্রয়োজন নেই, আপনি বিনা টিকিটেই যেতে পারেন। এই কথায় আমি অপমানিত বোধ করলাম এবং তাঁকে সেকথা বললাম। অফিসারটি বললেন, তিনি কোনো অপমান অর্থে একথা বলেন নি, তিনি কেবল আমার টিকিটের খরচ বাঁচাতে চেয়েছিলেন। আমি বললাম, আমি কোনো দান চাইনে। কিন্তু সর্বক্ষণ পুলিশের সঙ্গ থেকে আমি রেহাই পেলাম না। অর্থাৎ আমার ওপর যে যুক্তিসংগত কোনো কারণ ছাড়াই অবৈধ বিধিনিষেধের জুলুম চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেটাই আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠলো।

গ্লচেস্টারের ডিউক এবং অন্যান্য বিদেশি সম্ভ্রান্ত অতিথিরা চলে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেই পুলিশ অফিসারটি এবং তাঁর দলের কয়েকজন কর্মী এক বাক্স কেক নিয়ে এসে আমাকে উপহার দিলেন। তাঁরা বললেন, গত সপ্তাহে আমার সঙ্গে তাঁরা কর্তব্যের খাতিরে যে ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছেন তার জন্যে তাঁরা ক্ষমাপ্রার্থী। এবং তাঁদের কাজের জন্যে আমি যেন তাঁদের ভুল না বুঝি। আমার ওপর যাঁর নির্দেশে এই ব্যবহার করা হয়েছে তিনি যেই হোন না কেন তাঁর ওপর আমার মনোভাব চেপে রেখে বললাম, সরকারি কর্তব্যের ক্ষেত্রে তাঁরা যেভাবে জড়িত, আমি তাঁদের সেই অবস্থা বুঝি, তাই তাঁদের সম্পর্কে ব্যক্তিগত ভাবে আমার কোনো রাগ-বিদ্বেষ নেই। বরং আমি তাঁদের কর্তব্যজ্ঞান ও ভদ্র আচরণের প্রশংসা করি; যার ওপর আমি ক্ষুব্ধ তিনি অন্য লোক। তাঁরা খুশি মনে চলে গেলেন।

কিন্তু আমি খুশি হতে পারলাম না। কড়া ভাষায় আমি একটা চিঠি লিখলাম কিয়োটো শহরের গভর্নরের কাছে; আমাকে যেভাবে অপমানিত করা হয়েছে সে বিষয়ে তিক্ত অভিযোগ জানালাম। একজন এশিয়ান ছাত্র, জাপানের প্রতি যে শ্রদ্ধাশীল এবং কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত, তাকে অত্যন্ত হীনভাবে অপমানিত করা হয়েছে। এশিয়ার সর্বাপেক্ষা উন্নত একটি দেশের পক্ষে এশিয়ার অন্য এক

দেশের ছাত্রদের সঙ্গে আচরণের এটাই কি সঠিক পদ্ধতি? প্রকৃতপক্ষে চিঠিতে আমি একেবারে প্রাণ খুলে লিখেছিলাম, এবং এতদূর পর্যন্ত গভর্নরকে বলেছিলাম : জাপান কি ব্রিটেনের হাতের পুতুল ?

জাপানের গভর্নর অবশ্যই বিস্মিত হয়ে থাকবেন। সম্ভবত তিনি আমার চিঠির বিষয় উপেক্ষা করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেন নি। আমি জানতে পারলাম, তিনি তাঁর দু'নম্বর অফিসার অর্থাৎ সুপারিনটেনডেন্টকে ডেকে পাঠান এবং বলেন—এবিষয়ে আমাদের অবশ্যই কিছু করতে হবে। অতঃপর সেই সুপারিনটেন-ডেন্ট আমার ঠিকানায় এসে দেখা করে আমাকে নিয়ে গেলেন তাঁর নিজের বাড়িতে, আমাকে আপ্যায়ন করলেন ভূরিভোজনে, এবং বললেন : আমরা খুবই দুঃখিত, কিন্তু দয়া করে ভুল বুঝবেন না, আমরা জানি আপনি একজন ভালো মানুষ; আমরা জানি আপনি একজন স্বদেশপ্রেমিক, এবং সেজন্যেই ব্রিটিশরা আপনাকে পছন্দ করে না; কিন্তু আমাদেরও দায়িত্ব রয়েছে আমাদের রাজ-অতিথিদের পূর্ণ নিরাপত্তার সঠিক ব্যবস্থার অঙ্গ হিসেবে সাবধানতা অবলম্বন করার।

আমার মনে হলো, সুপারিনটেনডেন্টের এই কৈফিয়ৎ যথেষ্ট নয়। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, একমাত্র আমাকেই কেন আলাদা করে বিপজ্জনক 'লোক' বলে চিহ্নিত করা হলো। এটা যদি ব্রিটিশ-বিরোধী বিপজ্জনক ব্যক্তিকে নজরবন্দী রাখার প্রশ্নই হয়, তবে কেবলমাত্র আমাকেই ছায়ার মতো অনুসরণ করা হলো, অথচ অন্য কাউকে করা হলো না কেন, যেমন দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় রাসবিহারী বোসের কথা!

আমার এই কথায় মনে হলো সুপারিনটেনডেন্ট যেন একটা খোঁচা খেলেন—বিশেষত যখন আমি রাসবিহারীর নামোল্লেখ করলাম। তিনি যেন একটু বিব্রত বোধ করলেন এবং কিছুক্ষণের জন্যে নির্বাক হয়ে গেলেন। তারপর সামলে নিয়ে বললেন, যেহেতু মিস্টার বোস একজন সংসারী মানুষ, ব্রিটিশ সরকার নিশ্চয়ই তাঁকে এখন সক্রিয় কর্মী হিসেবে না দেখে একজন 'তাত্ত্বিক' হিসেবে দেখছেন, যিনি তেমন ক্ষতিকর নয়; কিন্তু তাঁরা এখন চিন্তিত রয়েছেন একজন সক্রিয় 'যুবকর্মী' মিস্টার এ. এম. নায়ারের সম্পর্কে।

আমি ভাবলাম, যদি সুপারিনটেনডেন্টের কথাই ঠিক হয় তাহলে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের লোকজন তেমন দক্ষ নয়, বরং অক্ষম। যাই হোক, জাপানি গভর্নরের প্রতিনিধি এই অফিসারটির সঙ্গে এসব কথা বেশি বাড়িয়ে কোনো লাভ নেই। আমাদের কথাবার্তা বন্ধুত্বপূর্ণ ভাবেই শেষ হলো এবং তখন থেকেই গভর্নরের লোকজন, বিশেষত বিদেশ দফতরের প্রধানকর্তা খুবই সদয় ব্যবহার করলেন আমার সঙ্গে। ঐ বিদেশ দফতর থেকে আমাকে একটি বিশেষ পাশ দেওয়া হলো যার বলে আমি জাপানের যে কোনো স্থানে বিনা খরচে ভ্রমণ করতে পারি, এবং একটি বিশেষ পরিচয়পত্র দেওয়া হলো যার বলে আমি বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিদের

জন্যে সংরক্ষিত স্থানে, এমনকি যুবরাজ ও রাজকন্যাদের মতো সম্ভ্রান্তদের সঙ্গে সমান মর্যাদার সঙ্গে বসতে পারি। এটা আমার কাছে একটা বিশেষ সম্মানের মতোই এলো গত সপ্তাহের সেই অগ্নিপরীক্ষার পরই।

যাই হোক, ঐ অভিষেক অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাবার পরে কিয়োটো শহরে আবার আগের সেই পুরনো জীবনযাত্রা ফিরে এলো। তখন আমি ঐসব ঘটনার বিষয়ে কিছুটা নিরপেক্ষ ভাবে চিন্তা করার অবসর পেলাম। আমার মনে হলো, ঘটনাটি যখন ঘটেছিল তখন তা খুবই অপ্রীতিকর এবং আমার কাছে একরকম চ্যালেঞ্জ ও পরীক্ষা হিসেবেই এসেছিল। অপ্রীতিকর ঝামেলা জীবনে আসে, যেমন এসেছিল আমার কাছে, কখনো কখনো একেবারে অপ্রত্যাশিত ভাবে, কিন্তু অবশ্যই তা থেকে উত্তীর্ণ হতে হবে। ঝামেলা দেখে এড়িয়ে বা পালিয়ে যাবার কথা ওঠে না। বরং এরকম ঝামেলা যত বড রকমের হবে, অভিজ্ঞতাও তত বড় হবে। মালয়ালম একটি প্রবাদে বলে : আগুনের মধ্যে যে গাছের জন্ম, সূর্য তার কী করবে।

কিন্তু আমি তো তেমন নিরাসক্ত বা নির্বাণ অবস্থায় পৌঁছাই নি, তাই ঘটনাটাকে ততখানি বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিতে দেখতে পারিনি ; তাই আমাকে যেভাবে হয়রানি করা হয়েছে, সেকথাই আমায় যেন পেয়ে বসলো। এর মধ্যে যদি কোনো যুক্তিসংগত কারণ থাকে, আমি তা বুঝতে পারলাম না। এই ঘটনার বহুকাল পরে আমি এর প্রকৃত সত্য বা তাৎপর্য বুঝতে পারি। একথা আমার কাছে জানানো হয়েছিল এক গোপন ও বিশ্বস্ত সূত্র থেকে, যার কথা বলা শক্ত নিষেধ ছিল। ঘটনাটা হলো এই যে, জাপানের ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা থেকে তাদের সাংহাই শাখার মাধ্যমে দিল্লিতে (এবং সম্ভবত লণ্ডনেও) সাংঘাতিক ক্ষতিকর রিপোর্ট পাঠায় – গত বছরে রাসবিহারী বোসের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ সম্পর্কে। রিপোর্টে বলা হয়, রাসবিহারী এবং আমি একটি ষড়যন্ত্র করেছি গ্লচেস্টারের ডিউকের ওপর বোমবাজি করার জন্যে, যেমন বোমবাজি রাসবিহারী করেছিলেন বিগত ১৯১২ সনে দিল্লিতে লর্ড হার্ডিঞ্জের ওপর। অতএব আমার ওপর অবশ্যই সর্বক্ষণ নজর রাখতে হবে – অন্তত কিয়োটোতে ডিউকের অবস্থানকাল পর্যন্ত।

এর চেয়ে বেশি দায়িত্বহীন ও ভিত্তিহীন ক্ষতিকর রিপোর্টের কথা কল্পনা করাও অসম্ভব। রাসবিহারীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ নেহাত সৌজন্যমূলক ছাড়া অন্য কিছু নয়। একথা সত্য যে, তিনি যদিও ব্রিটিশের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে জাপানের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছিলেন, তিনি ছিলেন আপাদমস্তক একজন ভারতীয় স্বদেশপ্রেমিক এবং সারাজীবনই ছিলেন ভাহা ব্রিটিশ-বিরোধী। কিন্তু আমার বা অন্য কারো মাধ্যমে কিংবা তাদের আশ্রয়দাতার পক্ষে ক্ষতিকর কিছু করে রাসবিহারী স্বদেশপ্রেমিক সাজবেন, একথা যে বা যারা ভাবতে পারে, তারা বদ্ধ পাগল ছাড়া আর কিছু নয়।

যাই হোক, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের এই ক্ষতিকর রিপোর্টের ফলেই আমার এই দুর্ভোগ, এবং তা কেবল গ্লচেস্টার ডিউকের আগমন ও অবস্থান কালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ডিউক চলে যাবার পর দিল্লির ভারত সরকারের রাজনৈতিক দফতর থেকে এক নির্দেশ পাঠানো হয় সারা ভারতে, বিশেষত ত্রিবাংকুরে এই মর্মে যে, ভারতে ফিরে আসা মাত্রই আমাকে যে কোনো অবস্থায় ও যে ভাবেই হোক যেন গ্রেফতার করা হয়; কারণ আমি খুব সম্ভব রাসবিহারী বোসের সঙ্গে যুক্ত আছি, এবং তাই আমি অবশ্যই একজন বিটিশ-বিরোধী সন্ত্রাসবাদী, যেমন মিঃ বোস। ভারতে আমার পরিবারের ওপর গোয়েন্দাগিরি চলতে লাগলো, যদি কোনো সূত্রে জানা যায় আমি কবে ভারতে ফিরে আসবো ইত্যাদি, তাই আমাদের ডাকের চিঠিপত্রও সেন্সর করা হতে লাগলো।

ঘটনাক্রমে ব্রিটিশের পক্ষে এত উদ্যোগ ও প্রয়াস শেষ পর্যন্ত সময়ের ব্যর্থ অপচয় ছাড়া আর কিছুই হলো না। আমাদের সমস্ত কাজের মধ্যেই যেন একটা স্বর্গীয় নির্দেশ থাকে, কী আমাদের পরিণতি অর্থাৎ কিভাবে আমাদের অন্তিমদশা উপস্থিত হবে। আমার প্রথম ভারতে প্রত্যাবর্তনের (আমার সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী জানকী নায়ার এবং আমার দ্বিতীয় পুত্র গোপালন নায়ার) তারিখ ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৫৮, ঠিক ৩০ বছর পরে—যখন আমি সুয়া-মারু জাহাজে প্রথম কলম্বো ত্যাগ করি—জাপানের কোবে বন্দরের উদ্দেশে। এতদিনে ভারত তার স্বাধীনতার দ্বিতীয় দশকে পড়েছে। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সূর্য অস্ত গেল, অর্থাৎ ভারত স্বাধীন হয় ১৯৪৭ আগস্টে।

১০

কিয়োটোতে ছাত্রজীবন

অধ্যাপক সাকাকিবারা কেবলমাত্র একজন প্রতিভাবান শিক্ষকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন অতিথিপরায়ণ মানুষ। তাঁর পরিবারও ছিল সমান বন্ধুত্বপরায়ণ। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমার এখনো মনে পড়ে একটা ঘটনার কথা—যেখানে আমি সাময়িকভাবে হলেও তাঁদের প্রতি একটা ক্ষতিকর কাজ করে ফেলেছিলাম, অবশ্য তা ছিল আমার তখন জাপানি প্রথা সম্পর্কে অজ্ঞতা ও ভুলবোঝার পরিণাম। সৌভাগ্যক্রমে শীঘ্রই আমি সেই ভুল বুঝতে পেরেছিলাম এবং তাঁদের অসুবিধে দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

আমার ভাষাশিক্ষার শেষে মিসেস সাকাকিবারা সৌজন্য বশে আমাকে জাপানি মিষ্টি কেক ও চা দিয়ে আপ্যায়িত করতেন। একদিন আমার তেমন খিদে ছিল না, তাই সমস্ত কেকটা খেতে পারিনি। আমি কেকের প্রায় অর্ধেকটা ফেলে রেখে-ছিলাম প্লেটের উপরে। বাড়ির পরিচারিকা তখন অর্ধভুক্ত কেকটি কাগজে জড়িয়ে আমার হাতে দিয়ে বলেন : দয়া করে এটা আপনি সঙ্গে নিয়ে যান, পরে কোনো সময়ে এটা খেতে পারবেন। যেহেতু ভারতে আমাদের মতো অভিজাতরা ভুক্তা-বশিষ্ট খাবার সঙ্গে করে নিয়ে যায় না, তাই আমাকে যখন ঐ প্যাকেটটা দেওয়া হলো আমি বেশ বিরক্ত হলাম। কিন্তু যেহেতু আমি তখনো অধ্যাপকের বাড়িতে রয়েছি, তাই সংযত ভাবেই আমি প্যাকেটটি হাতে নিলাম। কিন্তু সেখান থেকে বেরিয়েই ঐ প্যাকেটটি ফেলে দিলাম কাছাকাছি এক ময়লার পাত্রে - দূর যা করে।

বাসায় ফিরে আমি ঘটনাটি তাগুচি দম্পতির কাছে বললাম। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলাম, আমার ওপর কেউ কোনোরকম সহানুভূতি দেখানোর পরিবর্তে সবাই ঘটনাটির কথায় আমার বিষয়ে কৌতুক বোধ করলেন। মিসেস তাগুচি বললেন : মিস্টার নায়ার, আপনি ভুল করেছেন ; পরিচারিকা আপনাকে মনে করিয়ে দিয়েছেন, লজ্জা বা অপমানের জন্যে নয়, বরং পরিবারের শ্রদ্ধাপ্রীতির নিদর্শন হিসেবেই অবশিষ্ট কেকের প্যাকেটটি আপনাকে দেওয়া হলো ; এটা আমাদের শিষ্টাচারের অঙ্গ। আমি লজ্জায় যেন গোবেচারা বনে গেলাম, এবং অধ্যাপক দম্পতিকে ভুলবোঝার জন্যে দুঃখিত হলাম। এই চিন্তা আমাকে দীর্ঘকাল পীড়া দিয়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে অধ্যাপক দম্পতির বাড়িতে আমি জ্ঞাতসারে কোনো অপরাধ করিনি, সেটাই ছিল আমার সান্ত্বনা। এটা ছিল নেহাতই ভুল বোঝা-বুঝি অকৃতজ্ঞতার ঘটনা কিছু নয়।

কিন্তু আমার ভালোভাবে জানা উচিত ছিল, তাই নিজেকে দোষ দিলাম এই ভেবে যে, আমি জাপানের আচার-আচরণ সম্পূর্ণভাবে জানার চেষ্টা করিনি। আমি স্থির করলাম, এখন থেকে এ ধরনের দোষত্রুটির ব্যাপারে আরো সাবধান হতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, চিন্তা করে দেখলাম আমি যতটা আমার ভারতীয় 'অ্যারিস্টোক্রাসি' বা অভিজাত ভাবের কথা বলি না কেন, সেটা কোনো ক্ষমার যোগ্য অজুহাত নয়। আমার জানা উচিত ছিল, আমাকে দেওয়া ভুক্তাবশিষ্ট কেকটুকু তো ভারতীয় মতে অখাদ্য কিছু নয় ; আমারই খাদ্যাবশিষ্ট কেকটুকু তো অন্যকেও খেতে দেওয়া যেত। অর্থাৎ আমাকে দেওয়া খাদ্যের সবটুকু খেতে পারিনি বলে যা অবশিষ্ট রয়েছে, আর এঁটো করা খাবারের অবশিষ্ট তো এক কথা নয়। অতএব আমার ঐ আচরণের কোনো যুক্তি নেই, অন্তত ভারতীয় মতে ভুক্তাবশিষ্ট খাবারের বিচারে। প্রকৃতপক্ষে, কেরালায় আমাদের বাড়িতেও একটা নিয়ম ছিল, কেউ খাবার নষ্ট করতে পারবে না। বৌদ্ধধর্মেও বলেছে, খাদ্যের বিষয়ে অসাবধানী হয়ো না বা অযত্ন করো না ; খাদ্য কখনো ছুঁড়ে ফেলো

না। সমস্ত বিচারেই আমি ভুল করেছিলাম এবং সত্যি সত্যিই আন্তরিক দুঃখিত হয়েছিলাম।

কিন্তু আমি জেনে খুশি হলাম যে, বহুদিন থেকেই আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং তার বাইরে জাপানি ভাষায় বেশ সুনাম অর্জন করেছিলাম। এমনকি বহুকাল পরেও আমার বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করেছে, ভাষায় দক্ষতা অর্জনের ব্যাপারে আমার বিশেষ কোনো ক্ষমতা বা প্রতিভা আছে কিনা। এই প্রশ্নে আমি কখনো কোনো ভণিতা করিনি বা গর্ববোধ করিনি। বরং সঠিক জবাব দিতে গেলে বলতে হয়, উপযুক্ত ভাবে সময় দিয়ে পরিশ্রম করলে কোনো বিদেশি ভাষা আয়ত্ত করাই কঠিন নয়। আমার মাতৃভাষা ছাড়াও আমি স্বদেশের বিভিন্ন ভাষার মধ্যে কয়েকটি ভাষাও বেশ আয়ত্ত করেছি। মাংচুকুও, চীন, মঙ্গোলিয়া, মালয় এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে ভ্রমণকালে আমার খুব বেশি সময় লাগেনি বা তেমন অসুবিধে হয়নি ঐসব অঞ্চলের ভাষা আয়ত্ত করতে; অন্তত আমার কাজ চালানোর উপযুক্ত ভাষাজ্ঞান আয়ত্ত করতে কোনো অসুবিধে হয়নি।

আমার জাপানি ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে একটা খুব কম গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু উপভোগ্য ঘটনার কথা মনে পড়ে। জাপানে আমার ছাত্রজীবনে জাপানিজ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন থেকে প্রায়ই অনুরোধ করা হতো টোকিও স্টেশন থেকে বিভিন্ন বিষয়ে রেডিও-টক দেবার জন্যে—সাধারণত অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ের ওপর। কেননা, জাপানের রেডিও থেকে রাজনৈতিক বিষয়ে কিছু বলতে তেমন উৎসাহ দেওয়া হয় না। মিস্টার কে. কে. চেট্টুর, ইণ্ডিয়ান লিয়াজোঁ মিশনের প্রধানকর্তা, আমার ছাত্রজীবনের শেষদিকে জাপানে ভারতীয় দূত হিসেবে নিযুক্ত হন; এঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল জাপান রেডিও জাপানি ভাষার বেতার প্রচারে ভারত সম্পর্কে কী বলে, সে বিষয়ে শোনার। সাধারণভাবে অনুবাদ করা প্রচারিত সংবাদ ছাড়া জাপানি ভাষায় তাঁর তেমন কোনো দক্ষতা ছিল না। (তিনি তাঁর অফিসের বিরাট ডেস্কের উপর একটা ডায়েরি রাখতেন, তাঁর নিজে হাতে লেখা একখানি 'জাপানিজ নোটবুক'—তাতে তিনি প্রায় রোজই জাপানি শব্দ ও বাক্য লিখে রাখতেন এবং সময়মতো তার চর্চা করে তিনি জাপানি ভাষা বেশ আয়ত্ত করেন।) আমি একথা জানতে পারি ১৯৫১ সনে—যখন তিনি ভারত সম্পর্কে একটা NHK প্রোগ্রাম শুনছিলেন—যাতে আমিই ছিলাম বক্তা। তিনি অবশ্য প্রথমদিকে NHK থেকে ঘোষিত আমার পরিচিতি অংশটি যথাসময়ে শুনতে পাননি কিন্তু প্রচারিত মূল বক্তব্যটি শেষ পর্যন্ত শুনেছিলেন বলে পরে আবার উচ্চারিত আমার নামটি জানতে পারেন এই কথিকাটির বক্তা হিসেবে। কিন্তু তিনি ঠিক বুঝে উঠতে পারেন নি, যে এই বক্তা যেভাবে জাপানি উচ্চারণ করেছেন, তা কোনো ভারতীয়ের পক্ষে সম্ভব কিনা। তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না, জাপানি ছাড়া কোনো বিদেশি বিশেষত ভারতীয়ের পক্ষে এমন জাপানি উচ্চারণ, ভারত সম্পর্কে

এমন গভীর জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব কিনা। তিনি তাঁর একজন সহকারিকে বললেন সঠিক ঘটনা কি তা জানতে, এবং NHK সংস্থা যখন জানালো যে বক্তা একজন ভারতীয় ছাত্র মিঃ এ. এম. নায়ার, তখন তিনি অবাক হয়ে গেলেন। একথা আমাকে বলেছিলেন পূর্বোক্ত ভারতীয় দূত মিস্টার চেট্টুরের সহকারি, অনুসন্ধানকারী অফিসারটি স্বয়ং। আমি অবশ্যই খুশি হয়েছিলাম, কিন্তু আমি মনে করি এর কৃতিত্বটা সম্পূর্ণ প্রাপ্য আমার ভাষা শিক্ষকদের।

জাপানি ভাষা বিশ্বের উন্নত ভাষাগুলির অন্যতম একটি সৌন্দর্যপূর্ণ ভাষা। ভারতে এবং অন্য দেশের অনেকেই ভুল করে ভাবেন যে, জাপানি ভাষা বোধ হয় চীনা ভাষার সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। প্রকৃতপক্ষে এই ভাষা দুটি সম্পুর্ণ পৃথক। যদিও চীনা সংস্কৃতি প্রাচীন কালের জাপানি ভাষা ও সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছে, তবু একেবারে আদিকাল থেকেই জাপানের নিজস্ব পৃথক ভাষা চলে আসছে। খ্রী. চতুর্থ শতক পর্যন্ত জাপানি ভাষার নিজস্ব কোনো লিপি বা বর্ণ ছিল না। জাপান এ বিষয়ের অভাব পূরণ করেছিল চীনা ভাষা থেকে ধার করে, কিন্তু তা করেছিল জাপানের নিজস্ব ভাষাগত প্রয়োজন মেটানোর স্বার্থে, নিজস্ব কলাকৌশল অর্জনের মাধ্যমে।

শতাব্দীব্যাপী চেষ্টার ফলে যে ভাষাগত ও লিপিগত বিভিন্ন ও বিচিত্র সংস্কার করা হয়েছিল তা বেশ জটিল, কিন্তু সে বিষয়ে এখানে আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে, চীনা ভাষা শেখার পর, জাপানি ভাষাভাষীরা তার লিপির ক্ষেত্রে মূলত চীনা চিত্রলিপিই (ideograms) ব্যবহার করেছে, যাকে বলা হয় কান্‌জি (kanji); কিন্তু উচ্চারণের ক্ষেত্রে চীনার বদলে জাপান তার নিজস্ব জাপানি ভাষা বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে। সাধারণভাবে বলা যায়, যে চিত্রলিপিতে চীনা ও জাপানি উভয় ভাষাতেই জল অর্থে 'ওয়াটার' শব্দকে বোঝায়, তার উচ্চারণে কিন্তু উভয় ভাষার পার্থক্য রয়েছে; অর্থাৎ চিত্রলিপি অনুযায়ী চীনা ভাষায় যেখানে জল বলতে উচ্চারণ করবে 'সুই' (sui), জাপানি ভাষায় সেখানে পড়তে হবে 'মিজু' (miju) – সম্পূর্ণ পৃথক দুটি শব্দ। চীনা ও জাপানি ভাষার উচ্চারণে যেখানে বিশেষ কয়েকটি শব্দের ব্যবহার রয়েছে, সেখানে শব্দার্থের ক্ষেত্রে কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন লিপির ব্যবহার হয়।

চীনা ও জাপানি ভাষার নিজস্ব দুই প্রস্থ উচ্চারণ কৌশল রয়েছে, তাদের বলা হয় যথাক্রমে কাতাকানা (Katakana) ও হিরাগানা (Hiragana); দুটি ভাষারই রয়েছে, প্রায় ৫০ রকমের উচ্চারণ প্রতীকের পার্থক্যযুক্ত চিত্রলিপি; এগুলি হলো এই দুই ভাষার নিজস্ব ধ্বনিগত উচ্চারণের বৈশিষ্ট্যযুক্ত। এবং যার মধ্যে রয়েছে সংস্কৃত ভাষার প্রত্যক্ষ প্রভাব। এই উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যগুলি আবিষ্কার ও প্রবর্তন করেছিলেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী পণ্ডিত কোবো দাইশি (Kobo Daishi), শিংগন (প্রকৃত শব্দ) সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা, এবং যিনি জাপানি বৌদ্ধধর্মে বজ্রযান সংস্কৃতি/শাখার সূচনা

করেন। তাই, যদিও জাপানি ভাষা ও লিপিতে প্রচুর চীনা চিত্রলিপি দেখা যায়, তবু, দুটি ভাষাই পরস্পরের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

যদিও ভাষাতত্ত্বের বিচারে জটিলতা অনেক, তবু জাপানি ভাষার মধ্যে ধ্বনিগত বৈচিত্র্য ও বিভিন্ন ভাব প্রকাশের ক্ষমতা প্রচুর। জাপানি ভাষার শব্দভাণ্ডার বিশাল, এবং তার প্রাণশক্তি বজায় রয়েছে ভাষার অন্তর্গত ক্ষমতা—যে ক্ষমতা বলে অবিরত এবং প্রয়োজনমতো নতুন নতুন ভাবপ্রকাশক শব্দ এই শব্দভাণ্ডারে গৃহীত হয়ে থাকে। এই ভাষার একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো—সমাজের বড় ছোট স্তর-বিন্যাসের সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্মানসূচক শব্দাবলী। এই ভাষার শব্দভাণ্ডারে রয়েছে বিশেষ শব্দরাজি, যার দ্বারা সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস ও পদমর্যাদা অনুযায়ী পৃথক পৃথক অবস্থাকে বোঝানো সম্ভব হয়। কিন্তু এই ধরনের বাগ্‌বিন্যাসের ফলে জাপানি ভাষাভাষীর পক্ষেও অবস্থা অনেক সময় জটিল হয়ে পড়ে, ফলে জাপানি ভাষা থেকে সঠিকভাবে অনুবাদ বা তার ব্যাখ্যা করাও অনেক সময় অসুবিধে হয়ে পড়ে।

যখন ভাষা প্রসঙ্গেই আলোচনা হচ্ছে তখন আমি পাঠকদের জানাতে চাই যে, একমাত্র ভারত ব্যতীত আর কোনো দেশেই বোধ হয় এমন বিপুল সংখ্যক ছাত্রদের মধ্যে এত উৎসাহ নিয়ে সংস্কৃত ভাষার পঠন-পাঠন হয় না—যেমন জাপানে হয়ে থাকে। আগেই আমি উল্লেখ করেছি, সংস্কৃতজ্ঞ ভারতীয় পণ্ডিত ত্রিবান্দ্রামের গণপতি শাস্ত্রীর প্রতি অধ্যাপক সাকাকিবারার গভীর শ্রদ্ধাবোধের কথা। যদিও এঁরা দু'জনেই সংস্কৃতে উচ্চস্তরের প্রগাঢ় জ্ঞানের অধিকারী, তবু হাজার হাজার সাধারণ জাপানবাসীও সংস্কৃত ও পালি ভাষায় প্রাথমিক পরিস্থিতিমূলক জ্ঞানের অধিকারী। তাছাড়া, অধিকাংশ জাপানি বিশ্ববিদ্যালয়েই রয়েছে ভারতীয় দর্শনের ওপর পৃথক বিভাগ—যেখানে বিশেষভাবে সংস্কৃত ও পালি এই দুটি ভাষার চর্চা হয়ে থাকে। তারা ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিষয়েও বিভিন্ন প্রসঙ্গে উচ্চ মানের বেশ কিছু বইপত্র প্রকাশ করেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে, জাপানি ভাষায় অজ্ঞতার জন্যে স্বল্প সংখ্যক ভারতীয় ছাড়া অধিকাংশ ভারতীয় জানতেই পারে না—জাপানি ভারততত্ত্ববিদরা ভারতীয় দর্শন বিষয়ে কত প্রচুর সংখ্যক উন্নত মানের কাজ করেছেন ও করছেন।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, কোমাজাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কোগেন মিজুনো (Prof. Kogen Mijuno, Komajawa University) মূল পালি থেকে বৌদ্ধধর্মের ওপর বহু মূল্যবান কাজ করেছেন এবং তা প্রকাশিত হয়েছে; টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আকিরা হিরাকাওয়া (Prof. Akira Hirakawa, Tokyo University বিনয় পিটক সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত হিসেবে স্বীকৃত। কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ে ইদানিংকালে, অধ্যাপক আশিকাগা (Prof. Ashikaga, Kyoto University) সুখাবতিব্যূহ-সূত্র (sukhavativyuha-

sutra) অবলম্বনে একখানি নবাবিষ্কৃত চমৎকার পুঁথির আংশিক সম্পাদনা করেছেন।

আমার কলেজের পাঠ্যজীবনে ক্লাসের সমস্ত পঠনপাঠনই হতো জাপানি ভাষার মাধ্যমে। একমাত্র কিছু টেকনিক্যাল শব্দ ছাড়া এবং জার্মান, ইংরেজি বা ফরাসির মতো বিদেশি ভাষায় সাইক্লোস্টাইল করা কিছু পাঠ্য বিষয়ের নোট ছাড়া; অবশ্য তা নির্ভর করতো সংশ্লিষ্ট অধ্যাপকের ভাষাজ্ঞানের পরিধির ওপর। আমি সর্বদাই জাপানি ক্লাসনোট অনুসরণ করতাম, সঙ্গে থাকতো টেকনিক্যাল শব্দাবলীর ইংরেজি নোট।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমের পরিমাণ ছিল ঠাসা। ক্লাসের পাঠ্য ছাড়াও সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির কাজও থাকতো প্রচুর, সেখানে শর্ট-কাট বা সংক্ষেপ বলে কিছু ছিল না। ক্লাসে সুনাম করতে হলে তা করতে হতো কপালের ঘাম ঝরিয়ে। ক্লাসের মধ্যে অবসর সময়ে, জাপানি ভাষার জ্ঞানের অভাবে, আমাকে আক্ষরিক ভাবেই ঘাড় গুঁজে পাঠ্য বিষয়ের মধ্যেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হতো। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই যখন ভাষার বাধা কেটে গেল, তখন জীবনটা যেন অনেকখানি সহজ হয়ে গেল বলে মনে হলো। তখন থেকে আমি যে কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল পাঠ্যক্রম সহজেই অনুসরণ করতে পারতাম তাই নয়, বরং এর বাইরেও অতিরিক্ত কাজকর্ম করারও সময় এবং তা কাজে লাগিয়ে আনন্দ পাচ্ছিলাম। কেননা, পরিবেশের সঙ্গে কৃত্রিম সম্পর্ক এবং তার ফলে কোনোরকমে সময় কাটিয়ে সত্যিকারের কোনো আনন্দ পাওয়া যায় না। বরং এই অবস্থা কাটিয়ে উঠে অনুকূল অবস্থাকে পরিপূর্ণভাবে অর্জন করার মধ্যেই রয়েছে প্রকৃত আনন্দ। এইভাবে পরিপূর্ণ জানা ও তা থেকে প্রকৃত আনন্দ পাবার নেশাই রয়েছে এই জাতের মধ্যে, যা অনিবার্য অপ্রতিরোধ্য। এটা এমন একটা দেশ যা বলতে গেলে মাত্র অর্ধশতাব্দী অর্থাৎ ৫০ বছরের মধ্যেই প্রচণ্ড উন্নতি করেছে—অতীতের সেই সামন্ততান্ত্রিক অবস্থা থেকে আজকের উজ্জ্বল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তিতে শক্তিমান বিশ্বশক্তিতে পরিণত হয়েছে। অবশ্যই এই প্রচণ্ড উন্নতির মূলে আছে কাজের প্রতি তাদের বিশেষ ব্যতিক্রমযুক্ত জাতীয় মানসিকতা—এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফল দ্রুত উন্নতি। অতএব জাপান যদি তা করতে পেরে থাকে, তবে ভারতও কেন তা পারবে না—অন্তত তার উপনিবেশবাদী মনোভাব কাটিয়ে সক্রিয় উদ্যম-উদ্যোগ নিতে কেন পারবে না, তার কোনো যুক্তিসংগত কারণ নেই।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক ছিল ঠিক যেন প্রাচীন ভারতের গুরু-শিষ্য সম্পর্কের মতো। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতে এই সুন্দর সম্পর্কের ভাবধারা ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে, কিন্তু জাপানে এখনো এই ভাবধারা সহজেই প্রত্যক্ষ করা যায়। এই সম্পর্ক ঠিক যেন পিতামাতার সঙ্গে সন্তানের স্নেহ-সম্পর্কের মতো। শিক্ষক এই সম্পর্ক মেনে চলেন তাঁর কর্তব্য হিসেবে—তিনি চান ছাত্র যখন পড়াশোনা শেষ করে, বৃহত্তর দুনিয়ায় বিচরণ করবে, তখন যেন সে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষালাভ করে পূর্ণ

ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়—শৃংখলাপরায়ণ এবং নাগরিক কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়, কর্তব্যকর্মে অর্থাৎ তার করণীয় কাজের প্রতি যেন তার আন্তরিক আগ্রহ থাকে, কর্মানুষ্ঠানের প্রতি তার যেন গভীর নিষ্ঠাপূর্ণ কর্তব্যবোধ থাকে।

ছাত্রগোষ্ঠীর মধ্যে একটা গভীর আন্তরিকতা ও সৌভ্রাতৃত্বের বোধ ছিল, এবং তা ক্রমশ দলবদ্ধ ক্যাম্পাস জীবনকে আরো বন্ধুত্বপূর্ণ করে দিচ্ছিল। কিন্তু পুরনো ভাবধারার বন্ধন (ছাত্রদের মধ্যে) স্বাভাবিক ভাবেই অটুট থাকবে সারা-জীবন—বৃত্তি বা পেশাদার হিসেবে যে বিষয়ের ছাত্রই হোক না কেন, এবং ব্যক্তি-গতভাবে তার রাজনৈতিক মতাদর্শ যাই হোক। জাপানে এই ভাবধারার বন্ধন 'গাক্কোবাৎসু' (Gakkobatsu) নামে পরিচিত ; ব্যাপকভাবে যা প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে বন্ধুত্ব-বন্ধনকে আরো স্থায়িত্ব ও ব্যাপ্তি এনে দেয়। ফলে, আমি এখনো নিখুঁত ভাবে আমার কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায় এনজিনিয়ারিং বিভাগের ৩৬ জন সহপাঠী ছাত্রদের কথা মনে করতে পারি। দুর্ভাগ্যক্রমে কয়েকজন ছাত্র এখন আর বেঁচে নেই ; এখনো পর্যন্ত যারা জীবিত, তাদের মধ্যে পরস্পর যোগাযোগ আছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ ছিল শান্তিপূর্ণ এবং গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ্য-ক্রম অনুসরণের পক্ষে বেশ উপযুক্ত। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, ছাত্রদের মধ্যে অন্য কোনো বিষয়ে আগ্রহ আকর্ষণ বা মনোযোগ ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, ছাত্রদের মধ্যে রীতিমতো আগ্রহ আকর্ষণ ও সচেতনতা ছিল রাজনৈতিক বিষয়ে, যদিও তারা সাধারণত অন্তরঙ্গ ও ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গে ছাড়া অন্যত্র প্রকাশ্যে বা অবাধে রাজনৈতিক মতবাদ প্রকাশ করতে বিরত থাকতো বা ইতস্তত করতো। তাদের এই প্রবণতার একমাত্র কারণ, নাগরিক জীবনের ওপর জাপানি সামরিক শক্তির ক্রমবর্ধমান কঠোর নিয়ন্ত্রণ—যার ফলে সামরিক শক্তিও ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছিল।

অধিকন্তু জনসাধারণ, ছাত্র বা অন্য যে কেউ হোক না কেন, প্রকৃতিগত ভাবেই তারা খুব কম ক্ষেত্রেই মনের কথা খুলে বলে (এখনো সেই অবস্থা আছে)। কিন্তু একবার পারস্পরিক বোঝাপড়ার ফলে বিশ্বাসের সম্পর্ক স্থাপিত হলেই একটা অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ও তদুপযুক্ত আচরণে আর কোনো বাধা থাকে না। আমি ছিলাম এইরকমই একজন ভাগ্যবান, ফলে কেবলমাত্র সহপাঠী ছাত্রদের সঙ্গেই নয়, বহু বিশিষ্ট রাজনৈতিক কর্মীদের সঙ্গেও আমার একটা স্থায়ী বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এবং তা বজায় আছে। আমি সব গোষ্ঠীর সঙ্গেই মেলামেশা করতাম—তাদের ব্যক্তিগত মতাদর্শ নির্বিশেষে। তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল সোজাসুজি ও খোলাখুলি, ভাসাভাসা বা ওপর-ওপর নয়—যার ফলে কোনো রকম ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি না হয়, কেউ কারো ব্যক্তিগত বিশ্বাসের উপর অনিচ্ছাক্রমেও আঘাত না করে ফেলে। আমার উদ্দেশ্য ছিল জাপানের অভ্যন্তরীণ নীতির মতো নিরপেক্ষতা মেনে চলা, এবং তার দ্বারা সাধ্যমতো যত

বেশি সংখ্যক লোককে ব্রিটিশ-বিরোধী হিসেবে পরিণত করতে পারি এবং তাদের ভারতবন্ধু হিসেবে পেতে পারি, এবং সেটাই ছিল আমার পাঠ্যবিষয় বহির্ভূত একমাত্র বিশেষ কর্তব্য ও দায়িত্ব।

আমার সাবধান হওয়ার প্রয়োজন ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, 'উপনিবেশবাদ' (colonialism) শব্দটি জাপানে মোটেই জনপ্রিয় বা পছন্দসই নয়। বিশ্ব-শক্তি হিসেবে আবির্ভাবের পর জাপানও সম্প্রসারণবাদী উচ্চাকাংক্ষার নীতি অনুসরণ করতে থাকে; ইতিমধ্যেই সে কোরিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় কিছু কিছু এলাকা, বিশেষত ফরমোসাকে জাপানি এলাকার সঙ্গে যুক্ত করে ফেলেছে। তাই, এহেন পরিস্থিতির ফলে উদ্ভূত এই ধরনের সংজ্ঞাগত অসুবিধার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে আমি বরং 'উপনিবেশবাদ' (colonialism) না বলে ব্রিটিশ 'শোষণবাদ' (exploitation) কথাটি ব্যবহার করবো। এই ধরনের পার্থক্য যদিও খুব সূক্ষ্ম এবং প্রকৃতপক্ষে (উপনিবেশবাদ ও শোষণবাদের মধ্যে) কোনো তফাতই নেই, তবুও শ্রোতার পক্ষে এই শেষোক্ত শব্দটি (শোষণবাদ) খুবই অনুকূল, অন্তত তার মনের ওপর বেশ একটা মানসিক প্রভাব সৃষ্টি করে।

জাপানের সাংস্কৃতিক রাজধানী ব্যতীত কিয়োটো শহরের অন্য আরো অনেক গুরুত্ব রয়েছে, বিশেষত এদেশের বহু গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনেরও সূচনা ও বিকাশ এই কিয়োটো শহরেই। দক্ষিণপন্থী আন্দোলন ও তার প্রভাব ছিল এখানে আগে থেকেই, কিন্তু এখানে সংখ্যালঘু বামপন্থী গোষ্ঠীরও অস্তিত্ব ছিল, তার মধ্যে আছে 'তাত্ত্বিক'কম্যুনিস্ট গোষ্ঠী। উদাহরণ স্বরূপ, কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক হাজিমে কাওয়াকামে-র (Prof. Hajime Kawakame) নাম উল্লেখযোগ্য—তিনি আমার ছাত্রজীবনের আগে থেকেই এখানে একজন মার্কসবাদী তাত্ত্বিক হিসেবে সুপরিচিত। এবং পরলোকগত রাজকুমার ফুমিনারু কোনোয়ে (Prince Fuminaru Konoe), প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী যিনি জাপান সম্রাটের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের ঘোষণা শুনে আত্মহত্যা করেন), কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ে নাম লেখান—উক্ত অধ্যাপক কাওয়াকামে-র অধীনে পড়াশোনা করার জন্যে; এই অধ্যাপক কাওয়াকামে-র কাছেই রাজকুমারের সাম্যবাদী চিন্তাধারার হাতেখড়ি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপকরা জনসাধারণের চোখে উচ্চ মর্যাদার আসন পেয়ে থাকেন এবং প্রকৃতপক্ষে সামরিক কর্তৃপক্ষের অত্যাচারী দৃষ্টি থেকে স্বভাবতই রেহাই পেয়ে থাকেন, কিন্তু দুর্ভোগ পোহাতে হয় কম গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ লোককে। এই অধ্যাপকরা অধিকাংশই সাধারণত তাত্ত্বিক, কিন্তু তাঁদের বেশ কিছু ছাত্ররা সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে কাজ করে থাকে। তাদের অনেকেই আবার ঠাণ্ডা মাথায় ভেবেচিন্তেই কম্যুনিস্ট পার্টিভুক্ত হয় এবং জাপানে কম্যুনিস্ট পার্টি স্থাপন করে ১৯২২ সনে, এবং তা জাপানের কেন্দ্রীয় শহর টোকিওর আতংকের কারণ

হয়ে ওঠে। এদের নিয়ে টোকিওর দুশ্চিন্তা চরমে ওঠে ১৯২৪ সনে, সাধারণ নির্বাচনের সময়। এই নির্বাচনে ভোটাধিকারের ভিত্তি ছিল ব্যাপক, অন্তত সেকালে প্রচলিত ভোটব্যবস্থার তুলনায়; এবং তার ফল হয়েছিল এই যে, আগেকার রাজনৈতিক বিরোধী দলগুলির প্রভাব জনসাধারণের মধ্যে আরো বেড়ে গেল। এমনকি দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠীর মধ্যেও ভাঙন ধরলো, এবং তাদের দলভুক্ত শাসক-গোষ্ঠীর সেয়ুকাই (Seiyukai) তাঁর বিরোধীপক্ষের মিনসিটোর (Minseito) চেয়ে মাত্র সামান্য কিছু ভোট বেশি পান। সকলের কাছেই এটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, পার্টির মধ্যে দলাদলির ভাগাভাগি বেশ প্রকট। যদিও অ-দক্ষিণপন্থী পার্টিগুলি তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যক ভোট বা আসন পায়নি, কিন্তু এটা খুবই উল্লেখযোগ্য যে প্রায় অর্ধলক্ষ ভোট বামপন্থী পার্টিগুলির প্রার্থীদের পক্ষেই চলে যায়।

এই নির্বাচনের সপ্তাহগুলির মধ্যে সেয়ুকাই পার্টিভুক্ত প্রধানমন্ত্রী গিচি তানাকা (Giichi Tanaka) এক আদেশ দেন—প্রায় সমস্ত নেতৃস্থানীয় কম্যুনিস্ট নেতাদের গ্রেফতার করার জন্যে—তাদের সংখ্যা হবে প্রায় হাজার খানেক। যাঁরা গ্রেফতার হলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন কিউয়িচি তোকুদা ও সানজো নোসাকার (Kyuichi Tokuda & Sanjo Nosaka) মতো গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দ—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর জাপানে কম্যুনিস্ট পার্টির ইতিহাসে যাঁদের প্রথম সারির ভূমিকা ছিল। এখানে নাম একথার উল্লেখ করলাম সেকালের কোনো অন্তর্নিহিত একমাত্র গুরুত্বের জন্যে নয়, বরং তা করলাম রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাসের বহুদিনের পুরনো একটি ঘটনার স্মৃতি হিসেবে। রাশিয়া কম্যুনিজম গ্রহণ করে কম্যুনিস্ট হলো ১৯১৭ সনের বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে, এবং এই নতুন মতবাদের সম্প্রসারণ অন্য অনেক দেশের মতো জাপানের কাছে ভীতির কারণ হয়ে উঠলো, কারণ সেখানেও কম্যুনিজমের বিস্তার ঘটে।

এটা আরো উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, প্রধানমন্ত্রী গিচি তানাকা, বিশেষভাবে যেসব কম্যুনিস্ট নেতাদের নির্বাচনের পরেও আটক রাখতে চেয়েছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন একজন অবসরপ্রাপ্ত সেনাপ্রধান। এই সেনাপ্রধানই সাইবেরিয়ান যুদ্ধ পরিচালনা করেন—যে যুদ্ধে রাশিয়া পরাজিত হয়েছিল। তিনিই আবার সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগের এক শাখা তোকুমু-কিকান 'এর Tokumu kikan প্রতিষ্ঠাতা। এই পরিস্থিতিতে তাই এটা কোনো আশ্চর্য নয় যে, জাপান সরকার অঙ্কুরেই কোনো বিদ্রোহের অবসান ঘটাতে চাইবেন—এবং দেশের সরকারি প্রশাসনে কোনো বামপন্থী মতবাদের বড় রকমের অনুপ্রবেশ সহ্য করবেন না। আজ পর্যন্ত তাই রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে স্বাভাবিক সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও, দুর্ভাগ্যবশত বহু বিষয়ে কেউ কারো দিকে ফিরেও তাকায় না—বিশেষত রাজনৈতিক ও অন্যান্য অনেক বিষয়ে।

জাপানি ছাত্রদের পক্ষে সামরিক ট্রেনিং বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের অংশবিশেষ। কিন্তু বিদেশি ছাত্র হিসেবে আমার ওপর তেমন কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না। আমি কখনো ড্রিল কিংবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অংশগ্রহণ করিনি। প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত সামরিক ট্রেনিং ইউনিটগুলি পরিচালিত হতো একজন কর্নেল পর্যায়ের অফিসারের দ্বারা। কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ের সামরিক ট্রেনিং ইউনিটের পরিচালক ছিলেন কর্নেল তেরাদা (Col. Terada)। যদিও এইসব কর্নেল পর্যায়ের আর্মি অফিসাররা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্টের অধীনস্থ, অর্থাৎ প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন, তবু কার্যত তাঁদের চালচলনে বোঝা যেত তাঁরা সামরিক হাই-কমাণ্ডের কাছে ছাড়া আর কারো কাছেই দায়ী নন। তাঁদের কারো কারো মধ্যে দেখা যেত উদ্ধত ভাবের আচরণ, এবং কোনো কোনো সময়ে তাঁরা মেজাজ চড়িয়ে সহপাঠী ছাত্রদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহারও করতেন। সহপাঠী ছাত্রদের অনেকেই কর্নেল তেরাদার সঙ্গে পাল্টা ব্যবহার করেছে। কিন্তু আমি যেহেতু কোনো সামরিক ট্রেনিং প্রাপ্ত বা তার মধ্যে জড়িত ছিলাম না, তাই কর্নেল তেরাদা ও তাঁর সহকারিদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল সৌহার্দ্যপূর্ণ। আমরা প্রায়ই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করতাম এবং সেই আলোচনার বিষয় ছিল আমার স্বদেশ ভারত এবং মিত্রশক্তি ব্রিটিশের দ্বারা ভারতের ওপর অবিচার-অত্যাচারের কথা।

এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, জাপানি সেনাবাহিনী সরকারি প্রশাসনের সমস্ত স্তরেই তার নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করেছিল। কিন্তু আমি যতদূর জানি, মিলিটারি ট্রেনিং ইউনিটগুলি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ট্রেনিং দেওয়ার কাজে বা অন্যভাবে, যেভাবেই নিযুক্ত থাকুক না কেন, উপযুক্তভাবে কাজে লাগাতে পারলে তাদের মধ্যেও বেশ ভালোভাবেই ব্রিটিশ-বিরোধী প্রচারকাজ চালানো যায় — অন্তত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অনুকূলে। রাসবিহারী বোস ভালোই জানতেন কিভাবে এইসব সুযোগ কাজে লাগাতে হয় — অন্তত সমাজের যে উচ্চস্তরে তাঁর প্রচুর মেলামেশা ও যেখানে তিনি সম্মানিত, সেখানকার সুবিধে-সুযোগ নেওয়ার বিষয়ে তিনি অবহিত ছিলেন। আমি স্থির করলাম, আমার সাধ্যমতো স্থানে ঘোরাঘুরি করে একটি জায়গা ঠিক করবো, যেখান থেকে এরকম কাজকর্ম চালানো যায়। সাময়িকভাবে এখানকার সামরিক ইউনিটগুলি আমার বক্তৃতা ও প্রচারকাজ চালানোর পক্ষে উপযুক্ত একটি জায়গার ব্যবস্থা করে দিল। এ ব্যাপারে যাদের সঙ্গে আমার বেশি পরিচয় হয়েছিল তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ছিলেন জেনারেল ইয়ামামোতো (Gen. Yamamoto), অষ্টম ডিভিশন আর্মির কমাণ্ডার ছিলেন, এবং তাঁর ঘাঁটি ছিল ফুশিমিতে, কিয়োটো শহরের একটি মফস্বল এলাকায়।

শীঘ্রই আমার প্রচেষ্টার লক্ষণীয় ফল ফলতে লাগলো। বিভিন্ন মহল থেকে আমার ক্রমাগত ডাক আসতে লাগলো ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের সপক্ষে বক্তৃতা ও ভাষণ

ইত্যাদি অনুষ্ঠানের জন্যে, যার ফলে আমার অবসর সময়ের প্রায় সবটাই এই কাজে কাটতে লাগলো। যেহেতু আমি ভালো স্বাস্থ্যের অধিকারী হিসেবে ভাগ্যবান ছিলাম এবং দীর্ঘ শ্রমসাধ্য কাজের পক্ষে তা ছিল উপযুক্ত, আমি তাই প্রতিটি অনুষ্ঠানই ঠিকমতো চালিয়ে যেতে সমর্থ হই। এবং সাধ্যমতো স্থানে আমি আরো বেশি কাজের সুযোগ সৃষ্টি করতে পেরেছিলাম। এজন্যে আমি ভারত সম্পর্কে বিভিন্ন সূত্র থেকে বহু চেষ্টা করে তথ্য সংগ্রহ করতাম, একাধারে প্রচারের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ভাষণ ও আলোচনা ইত্যাদির জন্যে। এর ফলে আমার বেশ জনপ্রিয়তা বাড়লো, অন্তত ছাত্র হিসেবে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার জন্যে। ভারতে আমার রাজনৈতিক কার্যকলাপের ফলে ব্রিটিশ যেখানে আমাকে গ্রেফতার করার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়, সেখানে জাপানের রাজনৈতিক মহলে আমার অতীত কার্যকলাপ বেশ ক্রমবর্ধমান ভাবে সুবিদিত হয়ে উঠলো। তাছাড়া, জাপানের বিশেষ পুলিশ বাহিনীর (টোক্‌কো) সঙ্গে, সম্রাটের অভিষেক উপলক্ষে আমার সংঘর্ষের কথা জানাজানি হওয়ার ফলেও আমার প্রতি অনেকেরই সহানুভূতি বেড়ে গেল।

এশিয়ায় জাপানের সুনির্দিষ্ট অবস্থান ও মর্যাদাপূর্ণ অবস্থা দেখে আমার মনে সর্বদাই একটা ক্ষোভের ভাব ছিল, বিশেষত বিদেশি সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা আমার দেশের অবিরত দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ অবস্থার জন্যে। সন্দেহ নেই যে, জাপানের ক্রমবর্ধমান শক্তির ফলেই তাকে সম্প্রসারণবাদী নীতি গ্রহণের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু আমার সেদিনকার নিজস্ব চিন্তার কথা মনে করলে আমি অবশ্যই বলবো, জাপানের এইসব মতিগতির বিষয়ে আমার কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না ; তার চেয়ে বরং আমার চিন্তা ছিল কিভাবে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে জাপানি সহানুভূতি ও সেখানকার অনুকূল পরিবেশে সুবিধা-সুযোগ ইত্যাদি কাযকরী ভাবে সংহত করে কাজে লাগানো যায়। রাসবিহারী বোস জাপানে যে কাজ ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছিলেন, তা ছিল আমার কাছে অবিরত প্রেরণার উৎস স্বরূপ। যদিও আমার প্রথম ও প্রাথমিক কর্তব্যকর্ম ছিল পাঠ্যক্রমভুক্ত ক্লাসের লেখাপড়া, তবু ভারতের সপক্ষে রাসবিহারীর সঙ্গে আমার কাজের সংযোগ সাধন করাই আমার কাছে অত্যন্ত জরুরি মনে হয়েছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার দ্বিতীয় বর্ষ থেকে পাঠ্যক্রমের শেষ পর্যন্ত, এখানে আমি কোনো সভা-সমিতিই বাদ দিইনি ; যেখানেই এশিয়া ও ভারত সংক্রান্ত কোনো রকম আলোচনা/বৈঠক হয়েছে সেখানেই গিয়েছি। এইসব অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার ফলে কেবল আমার সহপাঠীদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্কই বাড়েনি, বরং এর ফলে আমার পক্ষে বিভিন্ন জাপানি সংস্থাগুলির সঙ্গেও যোগাযোগ করা ও তা বজায় রাখতে সাহায্য হয়েছিল, অন্তত যেসব সংস্থাগুলি তাদের শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী নীতিগুলি রূপায়ণের কাজে সক্রিয় ছিল তাদের সঙ্গে। এটা খুবই স্বাভাবিক,

একবার যে স্বাধীনতা সংগ্রামের কাজে অংশগ্রহণ করেছে, তার পক্ষে দুনিয়ার যেখানেই এরকম কাজের সূত্রপাত অর্থাৎ স্বদেশপ্রেমের কাজকর্ম হোক না কেন, তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখা অস্বাভাবিক নয়। এসব ক্ষেত্রে এরকম পরিবেশের প্রভাব খুবই শক্তিশালী হয়ে থাকে। আমি যতই জাপানিদের জাতীয়তাবাদী চেতনাপূর্ণ কাজকর্ম দেখতে লাগলাম, ততই আমি ভারতের জাতীয়তাবাদী কাজকর্মের পক্ষে আন্তরিক প্রেরণা বোধ করতে লাগলাম। বিদেশে বেশকিছু ভারতীয় স্বদেশপ্রেমিক বসবাস করতেন, কিন্তু সর্বদাই তাঁরা স্বদেশের মুক্তি সংগ্রামের জন্যে কাজ চালিয়ে যেতেন। আমি মনে করতাম, স্বদেশের স্বাধীনতার জন্যে জাপানি মহলে আমার বক্তৃতা ও প্রচারমূলক কাজকর্মেরও একটা গুরুত্ব আছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার তৃতীয় বর্ষ, অর্থাৎ ১৯৩১ সন থেকে (6th year of Showa), আমি আরো বেশি করে ডাক পেতে লাগলাম বিভিন্ন সংস্থার জমায়েতে প্রচারমূলক বক্তৃতা দিতে, বিশেষত যেসব সংস্থায় এশিয়া সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষ ভাবে চর্চা করা হতো। এইসব সুবিধা সুযোগগুলি সদ্‌ব্যবহার করতে, আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করতাম, ভারতে ও বিদেশের বিভিন্ন ঘটনাবলীর সঙ্গে পরিচয় ও যোগাযোগ রাখতে; এবং এইভাবে মাঝে মাঝেই যোগাযোগ হতো রাসবিহারীর সঙ্গে—যাঁর কাছ থেকে আমি প্রায়ই নানা মূল্যবান উপদেশ-নির্দেশ পেতাম, যা আমার জীবনপথে চলার পক্ষেও খুবই সহায়ক ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরের মধ্যে আমার ব্রিটিশ-বিরোধী প্রচারকর্ম ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত নিচু পর্দায় বাঁধা ছিল, যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম-শৃংখলা ইত্যাদি বিঘ্নিত না হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের বাইরে আমার প্রচারাভিযান বেশ শক্তিশালী ভাবেই আমি চালিয়েছিলাম। এইসব সংস্থার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল সামরিক সংস্থা ও বিভাগগুলি।

জাপানে আমার কলেজ জীবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বা বাইরে কোথাও আমি জাতিগত বা অন্য কোনো রকম বিভেদ আমি দেখিনি। কিন্তু যেখানে কোরিয়ানরা অবস্থিত, ছাত্র সমাজ বা অন্যত্র যেখানেই হোক, একটা মানসিক বিভেদের ভাব সহজেই নজরে পড়ে, তা দেখার মতো সতর্ক দৃষ্টি যাদের আছে তাদের কাছে। সংস্কারমুক্ত জাপানের সংস্পর্শে থেকেও কোরিয়ানদের মধ্যে এখনো যে এইভাব বজায় আছে, সেটা খুবই আশ্চর্যের। তবে মানুষের প্রকৃতিগত প্রবৃত্তিই এই যে, কোনো পরিস্থিতিতেই কেউ কারো স্বভাব ছাড়তে পারে না। কোরিয়ান ছাত্রদের মধ্যে আমার বেশ কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল, যাদের কয়েকজন বেশ মেধাবী ছাত্র। তাদের মধ্যে বেশ একটা দুর্বলচিত্ততার ভাব ছিল, এবং বেশ কয়েক-জন আমাকে সাবধান করে দিয়েছিল জাপানের সঙ্গে কোরিয়ার সম্পর্কবিরোধী যে কোনো রকম কথাবার্তার জন্যে। তাদের এই দুশ্চিন্তার কথা বোঝা খুবই

সহজ। আমি আগেই বলেছি আমার নতুন শেখা বিষয়, অর্থাৎ পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলার বিষয়ে, যেমন আমি এখানে শিখেছিলাম জাপানিদের সঙ্গে কথা বলার সময় 'উপনিবেশবাদ' (colonialism) শব্দটি এড়িয়ে চলতে। অর্থাৎ বুদ্ধিমত্তা ও বীরত্বের একটা অঙ্গই হলো পার্থক্য বজায় রেখে চলা।

বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের আরেকটি স্মৃতি এখনো আমার মনে জাগরুক আছে, যার সঙ্গে ছাত্র সমাজের কোনো সামঞ্জস্য দেখি না। কিন্তু তা একটি জাপানি ব্যবসায়ী সংস্থার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত—এবং যে সংস্থার সঙ্গে আমার একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে যোগাযোগ হয়েছিল।

এখানে উল্লেখ্য যে, আমার জন্যে একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা ছিল, যার ফলে আমি দেশ থেকে প্রতি মাসে আমেরিকান ২০ ডলার পেতে পারতাম—আমার কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ে মাসকাবারি খরচ চালাবার জন্যে। তা ছিল মাসকাবারি ৭০ ইয়েন-এর সমতুল্য, যা ছিল যথেষ্ট। অনিবার্য কারণবশত, ঐ মাসকাবারি পাঠানো টাকা পেতে প্রায়ই দেরি হয়ে যেত এবং আমার বন্ধুরা সাময়িক ভাবে বাড়ি থেকে টাকা না আসা পর্যন্ত আমাকে টাকা ধার দিয়ে সাহায্য করতো। আমার ছাত্রজীবনে জাপানে ছাত্রদের পক্ষে কোনোরকম আংশিক সময়ের পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে কাজ করে তাদের আর্থিক অসুবিধের সুরাহার কোনো সুযোগ ছিল না। ফলে যে ভাবেই হোক, আকস্মিক প্রয়োজনের সময়ে কাজ চালানোর মতো একটা গচ্ছিত তহবিল গড়ে তোলার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল—প্রধানত কিছু কিছু কমার্শিয়াল বা বাণিজ্যমূলক কাজের দ্বারা। আমার ভাই নারায়ণন নায়ার এক সময় ত্রিবান্দ্রাম ফিশারিজ-এর ডিরেকটার হয়েছিল এবং ভারতীয় সমুদ্রজাত শামুক জাপানের বাজারে চালান দেবার জন্যে চিন্তিত হয়ে উঠলো, যেহেতু সে প্রমাণ করতে পেরেছিল যে ভারতীয় দু'রকম সমুদ্রশামুকই ভালো জাতের, এবং বাজারে ছিল তুল্যমূল্য। সে আমাকে একটা নমুনা-চালান পাঠালো, এবং আমি সানন্দে তার বিক্রির বন্দোবস্ত করতে রাজী হলাম। জাপানের কোবে শহরের একটি প্রথম শ্রেণীর ব্যবসায়ী সংস্থাকে আমি নমুনা-চালানটি দেখালাম; তারা এই নমুনা দেখে জিনিস পছন্দ করলো এবং প্রচুর পরিমাণে ঐ জিনিসের অর্ডার দিল উপযুক্ত মূল্যের ভিত্তিতে।

স্বভাবতই আমি ত্রিবাংকুর থেকে আমদানি করলাম বেশ কয়েক টন সমুদ্র-শামুক। কিন্তু হঠাৎ ঐ সংস্থাটি তার জিনিসের দাম পূর্বচুক্তি থেকে কিছু অর্থাৎ এক-দশমাংশ কম দিতে চাইলো। আমি বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পারলাম, তারা এটা করেছিল কারণ তাদের মতে আমি নেহাতই একজন ছাত্র, এবং তাই বাণিজ্যিক কারবারে একজন নবিশ মাত্র, সুতরাং সহজেই ফাঁকি দেওয়া যাবে। ফলে, আমি আমার যৌবনোচিত তেজে এই ঘটনাটিকে আমার জাতীয় চেতনা ও আত্মসম্মানের পক্ষে আঘাত স্বরূপ বলে মনে করলাম, এবং সংগত ক্রোধের বশেই সমস্ত চালানটি

সমুদ্রে মজুত করে রাখলাম, আমার ক্ষতি স্বীকার করেও। এবং আমার ভাইকে, আমি যা করেছি সে বিষয়ে জানিয়ে দিলাম। স্বভাবতই তাতে সে খুশি হয়নি, কিন্তু আমিও তাতে দুঃখিত হইনি। হয়তো অন্যেরা এতে অন্য কিছু ভাবতে পারে, কিন্তু আমার যুক্তি এই যে আমি যখন আমার কথার খেলাপ করিনি কারো সঙ্গে, অন্য কেউ আমার সঙ্গে সেরকম ব্যবহার কেন করবে তারও কোনো যুক্তিসংগত কারণ আমি দেখতে পাইনে।

আমার বন্ধুদের যার কাছেই এ ঘটনার কথা আমি বলেছি, তারা প্রত্যেকেই আমার কাজ সমর্থন করেছে এবং প্রত্যেকেই স্বীকার করেছে যে, আমি একটা নীতিগত প্রশ্নে অবিচল থেকে খুব ভালো দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছি। এমনকি তার ফলে আমাকে আর্থিক ক্ষতিও স্বীকার করতে হয়েছে। এই ঘটনা আমাকে মানবচরিত্রের মানসিক অবস্থা বোঝার পক্ষে অনেকখানি সাহায্য করেছে। সব সময়েই কিছু মানুষ থাকে যারা অন্যায় সুযোগ নেবার ফিকির খোঁজে। কিন্তু মানুষকে এরকম অবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে—পরিণামের চিন্তা বা ভয়-ভীতিকে উপেক্ষা করে। যাই হোক, যে সংস্থা আমার সঙ্গে পূর্বোক্ত ভাবে অন্যায় আচরণ করেছিল, ঘটনাক্রমে তারা আমার কাছে ক্ষমা চাইলো, কিন্তু আমার ক্ষতিপূরণ করার পক্ষে তা খুবই দেরি হয়ে গিয়েছিল।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, আমার জীবনে কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি যতদূর মনে পড়ে তা হলো রীতিমতো আনন্দদায়ক। এমনকি এখনো পর্যন্ত আমার মনে হয় আমি একজন ভাগ্যবান, কারণ এই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ছাত্রদের তালিকায় আমারও নাম অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ হয়েছিল। শুরুতেই আমার সৌভাগ্য হয়েছিল মহান অধ্যাপক ড. সাকাকিবারা, স্নেহশীল তাগুচি দম্পতি এবং অন্যান্য শিক্ষকদের সতর্ক দৃষ্টি ইত্যাদি লাভের জন্যেই। তাছাড়া, শেষের দিকে একজন উচ্চস্তরের আর্মি ডিভিশনাল কমাণ্ডার, জেনারেল ইয়ামামোটোর (Gen. Yamamoto) সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়। এই জেনারেলের মাধ্যমে জাপানি সমাজের সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর মধ্যে ব্রিটিশের অধীনে ভারতের দুরবস্থার বিষয়ে আমি বিশদ চিত্র তুলে ধরতে পেরেছিলাম, এবং এবিষয়ে তাঁদের সহানুভূতিমূলক সমর্থন সংগ্রহ করতেও সমর্থ হয়েছিলাম, বিশেষত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিষয়ে। যাই হোক, বন্ধুত্বসূত্রে জেনারেল ইয়ামামোটো আমাকে ভাইয়ের মতো দেখতেন। তার ফলে সেনাবাহিনীর দিক থেকে আমি প্রচুর সাহায্য সহযোগিতা পেয়েছি, বিশেষত বাহিনীর তরুণ সেনাদের কাছ থেকে। অতঃপর আমি খুবই আনন্দিত ও সম্মানিত বোধ করেছি যখন জেনারেল বলেছেন : এখন থেকে আপনি সভা-সমিতিতে আমার পাশেই বসবেন—অন্তত যেসব সভায় আপনি বক্তৃতা ও ভাষণ দেবেন।

আমার পাঠ্যক্রমের শেষ বছরে (Showa, ৭ম বছর, ১৯৩২) আমি কিয়োটো

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সিভিল এনজিনিয়ার হিসেবে গ্রাজুয়েট হলাম। পাঠ্যক্রমের শেষদিকে বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রয়োজনে আমি ওসাকার একটি এনজিনিয়ারিং সংস্থায় যোগদান করলাম। সংস্থার নাম—কুরিমোতো অ্যাণ্ড কোং (Kurimoto & co.) এবং তাদের সঙ্গে কাজ করলাম প্রায় বছর খানেক। তারপরেই এলো আমার জীবনের নতুন এক পর্যায়।

১১

জীবনের নতুন পর্যায়: ১৯৩২-৩৩

বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস জীবনের অবরুদ্ধ ভাব যেন দুর্বার হয়ে উঠলো—আমার রাজনৈতিক জীবনের গতি আর রুদ্ধ হয়ে রইলো না। আমি এখন নিজেকে আরো অবাধে প্রকাশ করতে পারি, আরো খোলাখুলি ভাবে সম্ভবত আরো বলিষ্ঠতার সঙ্গে প্রকাশ করতে পারি। আমার জাপানি বন্ধুমহল—সেনাবাহিনীর মধ্যে ও সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে—এখন হয়ে উঠলো আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত। ব্রিটিশ-বিরোধী বক্তৃতা ও প্রচারকর্ম ইত্যাদির পর্দা উঠলো আরো উঁচুস্তরে। আমি এখন বেশি সংখ্যক লোকেদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে লাগলাম, আরো বেশি করে সভা-সমিতিতে ভাষণ দিতে লাগলাম এবং ভারতের ওপর নানা প্রবন্ধ নিবন্ধ লিখতে লাগলাম জাপানি পত্র-পত্রিকাদিতে। এরকম একটি পত্রিকা হলো 'এরিয়ান' (Aryan), প্রকাশিত হতো ওসাকার 'ইউনিভার্সিটি অফ ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজেস' সংস্থার হিন্দুস্তানি বিভাগ থেকে। জাপানের বিভিন্ন অঞ্চলে আমি যথাসাধ্য ঘুরে বেড়ালাম আমার ব্রিটিশ-বিরোধী প্রচারের স্বার্থে এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে জাপানি জনমত সংগ্রহের প্রয়োজনে।

আমার মনে পড়ে, বিগত ১৯৩২-৩৩ সনে আমার কয়েকটি জনসভায় প্রদত্ত বক্তৃতার কথা। তখন আমি অবশ্যই একজন দায়িত্বশীল এনজিনিয়ার হিসেবে কর্মরত, কিন্তু প্রায় সদ্য কর্মজীবন শুরু করেছি বলে মনে হতো এখনো কিছুদিন বোধ হয় ছাত্রজীবন যাপন করতে পারি, অন্তত একজন শিক্ষানবিশের মতো। তখন জনসভায় বক্তৃতাদির সময়ে আমি ছাত্রদের মতো ইউনিফর্ম পরতাম, কেননা মনে হতো কর্মচারির পোশাক পরার চেয়ে ছাত্রদের পোশাকে আমি শ্রোতাদের কাছ থেকে আরো বেশি করে সহানুভূতি পাবো। আমি আশানুরূপ ফল পেয়েছিলাম, একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। শ্রোতারা প্রথমদিকে কিছুটা অবাক

হলো, পরে একজন ছাত্রের এই ব্যবহার রীতিমতো 'স্পর্ধা' বলে মনে করতে লাগলো—বিশেষত আমি যখন প্রকাশ্য ভাষণে ব্রিটিশ-বিরোধী কথাবার্তা বলে তাদের উদ্দেশে আক্রমণ করতাম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। তখন অবশ্য জাপানি শ্রোতাদের অনেকেই বিস্ময়ের সুরে বিশেষ জাপানি কায়দায় মন্তব্য করতো: এই হলো একজন খাঁটি মানুষ। বলা বাহুল্য, এই প্রশংসাসূচক মন্তব্য শুনে তখন আমি খুশিই হতাম এবং কিছুটা যেন গর্ববোধও করতাম, যদিও কোনোক্রমেই তা অহংকার বলে প্রকাশ করতাম না।

আমার মনে হয়, ঐতিহ্যবাহী জাপানি আত্মসংযম ও বিনয় আমাকে কখনো আঘাত করেনি এবং তার প্রভাবেই আমার দিক থেকেও কোনোরকম অহংকার বা উদ্ধতভাব প্রকাশ পায়নি। যে যার কর্তব্য করবে এটা যেমন স্বাভাবিক ও গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি তা নিয়ে লোক-দেখানো ভনিতা করার কোনো অর্থ হয় না। আগে থেকেই আমি এই ধারণা নিয়েই চলছিলাম এবং মনে হয় তা ঠিকই করে-ছিলাম। সেই সময় আমার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ও বিশিষ্ট জাপানিদের মধ্যে যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল, তা খুবই আন্তরিক ও দীর্ঘস্থায়ী এবং তা সময়ের কষ্টিপাথরে যাচাই করা। এখনো সেকথা বলা চলে। একটি সুনির্দিষ্ট আনন্দের স্মৃতি যা এখনো আমান মনে জাগরূক আছে তা হলো, সেই সময়কার জাপানের উচ্চশ্রেণীর এক শিন্টো পুরোহিতের (Shinto High Priests) সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল ; নাম তাঁর স্যাংগি (Sangie)। তিনি সম্রাটের কাছ থেকে উচ্চশ্রেণীর 'অর্ডার-অফ মেরিট' (Order of Merit) উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। সেকালীন জাপানের সরকারি ধর্ম ছিল 'শিন্টোবাদ' (Shintoism) এবং তার দারুণ প্রভাব ছিল দেশের রাজনৈতিক জীবনের ওপর। সেই পুরোহিত সম্প্রদায়ের মাননীয় স্যাংগি ও আমি প্রায়ই আমন্ত্রিত হতাম একত্রে সভা-সমিতি পরিচালনা ও বক্তৃতাদানের জন্যে। আমরা প্রায়ই একই মঞ্চ থেকে জনতার উদ্দেশে বক্তৃতাদি করতাম, জায়গাটা ছিল স্যাংগির বাসভূমি নাগানোশিমায়।

ভারতে তখন জাতীয় স্তরে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে চলেছে একের পর এক, এবং তার ফলে দেশবাসীর মনে যথেষ্ট আবেগ ও উত্তেজনা চলছে। আগেই উল্লেখ করেছি, জাতীয়তাবাদীদের দ্বারা সংবিধান সংস্কারমূলক সাইমন কমিশনকে (Simon Commission) বয়কট করার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়েছে, যে কমিশন স্থাপিত হয় ১৯২৮ সনে। কমিশন অনর্থক সময় কাটালো কোনো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ছাড়াই। ১৯৩১ সনে কংগ্রেস দেশব্যাপী ব্রিটিশ-নিয়ন্ত্রিত রাজ্য ও কেন্দ্রীয় আইনসভা বয়কটের ডাক দিল। একই সঙ্গে কর্মসূচি ঘোষিত হলো আইন-অমান্য আন্দোলনের। গান্ধীজী এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ করা হলো, কিন্তু ভাইসরয় লর্ড আরউইন (Lord Irwin, Viceroy) আগেই বুঝেছিলেন, দমননীতির ফলে ভারতে ব্রিটিশ স্বার্থের অনুকূল কোনো কাজ হবে না, বা কোনো

রকম প্রত্যাশিত ফলপ্রসূ হবে না। অতঃপর বন্দীদের যথাশীঘ্র জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হলো, এবং গান্ধীজী ও আরউইনের মধ্যে একটা চুক্তি হলো এই মর্মে যে, সংবিধান-সংস্কার সংক্রান্ত সাইমন-কমিশনের বক্তব্য নিয়ে আলোচনা করা হবে লণ্ডনে গোলটেবিল-বৈঠকে (Round Table conference)। ফলাফল সাপেক্ষে কংগ্রেস ব্রিটিশের তৈরি আইনের বিরুদ্ধে এবং ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন চালিয়ে গেল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত গোলটেবিল-বৈঠক ব্যর্থ হলো। ব্রিটেন গান্ধীজীর পূর্ণ স্বরাজের (complete Independene) দাবি বাতিল করে দিল। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ আবার যেন জলে উঠলো, এবং সেই অবস্থা বুঝে ব্রিটিশ সরকারের অফিসাররাও আবার দমননীতি চালালো পূর্ণমাত্রায়। কংগ্রেস নেতাদের আবার কারারুদ্ধ করা হলো। লণ্ডনের ইণ্ডিয়া লিগ (India League, London) এক প্রতিনিধি-দল পাঠালো ভারতে, এবং সেই দলে ছিলেন চিন্তাশীল মনীষী বারট্রাণ্ড রাসেল, যিনি পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করলেন : জার্মানিতে নাৎসি বাহিনীর যেমন স্বার্থের অজুহাত ছিল, ভারতেও ব্রিটিশের অজুহাতের অভাব নেই, এবং ভারতে তার অপকর্মের পরিমাণ সাংঘাতিক ও সীমাহীন।....

ভারতের চরম দুর্দশার প্রচুর তথ্যগত উপকরণ আমার হাতে ছিল এবং জাপানি জনতার কাছ থেকে ভারতের সপক্ষে যথেষ্ট সহানুভূতিমূলক সাড়া পাওয়া গেল। একটি অনুষ্ঠানে আমি জাপানি শ্রোতাদের পড়ে শোনালাম একটি ইংরেজি পত্রিকায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধের সারমর্ম। এই প্রবন্ধে বলা হয়েছিল, ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে উৎপন্ন কৃষিজাত দ্রব্যে স্থানীয় অধিবাসীদের বার্ষিক প্রয়োজনের তুলনায় মাত্র ৪১ দিনের কাজ চলে। বছরের অবশিষ্ট ৩২৪ দিনের জন্যে ব্রিটেনকে তার উপনিবেশের উৎপাদনের ওপর বিশেষত ভারতের ওপরই নির্ভর করতে হয়, এবং তা উৎপাদকের পক্ষে ক্ষতিকর নামমাত্র মূল্যে সংগ্রহ করা হয়। এমনকি ভারতীয়দের মধ্যে যখন চাল বা গমের অভাব চলছে, ইংরেজ পরিবারের বাগানে তখন গোলাপের চাষ হচ্ছে এবং তা ভারত থেকে অন্যায়ভাবে অর্জিত টাকায়। অধিকন্তু ভারতে ব্রিটিশ শাসন মানে বেয়োনেটের শাসন। প্রায় ১৫০০ বিলাসী ইংরেজ লক্ষ-লক্ষ অনাহারী ভারতবাসীকে শাসন করে সেনাবাহিনী ও পুলিশের মাধ্যমে সন্ত্রাস ও দমননীতির সাহায্যে, অথচ সেনাবাহিনী ও পুলিশের সঙ্গেও শাসকগোষ্ঠী ক্রীতদাসের তুল্য ব্যবহার করে।

ইতিমধ্যে চীনা-জাপানি সম্পর্ক ক্রমশ দ্রুত অবনতির দিকে যাচ্ছিল। চীন ও কোরিয়ার মধ্যে মতভেদ ও সংঘর্ষ চলছিল ভূখণ্ডের লিজ নিয়ে ; কোরিয়ানরা ছিল জাপানের আশ্রিত অধিবাসী। চীনারা আবার জাপান-বিরোধী বয়কট আন্দোলন চালু করলো এবং জাপানের সঙ্গে তার সম্পর্ক বাঁধা হলো নিচু পর্দায় ; ১৯৩১

জুলাই মাসে যখন শিনতারো নাকামুরা (Shintaro Nakamura) নামে এক জাপানি আর্মি ক্যাপ্টেন ছদ্মবেশে চীনে ঘোরাঘুরি করছিলেন, তাঁকে হত্যা করে একদল চীনা সৈন্য। বছর শেষ হবার আগেই এক সংকটময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো মুকদেনের ঘটনায় (Mukden Incident), ১৮ সেপটেম্বর ১৯৩১ তারিখে। অতঃপর দক্ষিণ মানচুরিয়া রেলওয়ে লাইনে বোমা ফাটলো, এবং জাপানি বাহিনী (যাদের ওপর অনেকে দোষারোপ করেন এই ঘটনার জন্যে) অজুহাত দিল তাদের নিরাপত্তা বাহিনীকে হেয় করার জন্যেই হিসেব করে এই ঘটনা সংঘটিত করা হয়েছে, এবং সঙ্গে সঙ্গেই তারা চীনা বাহিনীর বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করলো। শীঘ্রই জাপানি বাহিনী সদর ঘাঁটি স্থাপন করলো কোয়ানটুং-এর নিজ ভূখণ্ডে, এবং মানচুরিয়ার বিভিন্ন এলাকায় সামরিক কৌশলগত সুবিধাজনক শিবির স্থাপন করলো, অথচ তারা টোকিও শহরে অবস্থিত প্রধানমন্ত্রী ওয়াকাৎসুকি (Wakatsuki, Prime minister) পরিচালিত মিনসিটো গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে কোনোরকম অনুমতি নেবারও প্রয়োজন বোধ করেনি।

অবশ্য, মানচুরিয়ায় জাপানি বাহিনীর কার্যকলাপ সম্পর্কে বিশদ বক্তব্য প্রকাশ করা কিংবা সে সম্পর্কে খুঁটিনাটির মধ্যে যাওয়া এই রচনায় আমার উদ্দেশ্য নয়; কিংবা ১৯৩২ জানুয়ারিতে শাংহাই যুদ্ধের (Shanghai War, 1932) দোষগুণ নিয়েও আমি এখানে কোনো রকম আলোচনা করতে চাইনে। তবে এইটুকু বলাই যথেষ্ট হবে যে, ঐ সময়ে চীনে বিশেষত মানচুরিয়াতেও এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। মানচুরিয়ায় জাপানি সামরিক কার্যকলাপের পিছনে মূলত সামরিক শক্তির মদতই ছিল। জাপানের 'চেরি সোসাইটি' স্থাপিত হয় ১৯৩১ সনে, প্রধানত সেনাবাহিনীর অফিসারদের নিয়ে গঠিত। রাজনৈতিক পার্টিগুলি, জাইবাৎসু (Zaibatsu), এবং সিভিলিয়ান ব্যুরোক্রাসি ইত্যাদি সকলকেই দায়ী করা হলো জনসাধারণের যাবতীয় দুঃখ-কষ্টের জন্যে, বিশেষত ১৯২৯ সনের পশ্চাদপসরণের পরিপ্রেক্ষিত। ১৯২৬ সনের মন্দা-বাজার এবং ১৯২৩ সনের নজিরবিহীন ভূমিকম্প ইত্যাদির ফলে যখন প্রায়-দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি সারা দেশকে গ্রাস করতে বসেছে, সেই ভয়ংকর অবস্থার কথা এখনো অনেকেরই মনে আছে। এইসবের সঙ্গে দেশের জনসংখ্যার আধিক্য, সারা দেশে এক চরম অসন্তোষের অবস্থা সৃষ্টি করলো বিশেষত জনসাধারণের মধ্যে, যার সুযোগ নিয়েছিল সমরবাদী সামরিক নেতারা

বিদেশি সম্পর্কের ক্ষেত্রে, সরকার রীতিমতো ক্ষুব্ধ ও অপমানিত বোধ করলো — বিশেষত ওয়াশিংটন কনফারেন্স ১৯২১-২২ (Washington conferenec, 1921-22) এবং লণ্ডন ন্যাভাল কনফারেন্স ১৯৩০-এর (London Naval confc.) বক্তব্য ও কাজকর্মে। কেননা, এই দুই সংস্থার বক্তব্যই ছিল জাপানের প্রতি অবিচারমূলক ও অবমাননাকর। তাছাড়া, আমেরিকার ইমিগ্রেশান পলিসির (US.

Immigration Policy) বিরুদ্ধেও সাংঘাতিক প্রতিবাদ হয়েছিল – যে পলিসিতে জাপান সম্পর্কে বিভেদমূলক নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। মোট কথা, জাপানি জনসাধারণের মধ্যে এমন একটা ভাবধারা ক্রমশ গড়ে উঠছিল যে, উন্নতি/অগ্রগতির ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের চেয়ে কোনো অংশে ছোট না হয়েও জাপানের প্রতি জাতিগত ভাবে পশ্চিমি দৃষ্টিভঙ্গি হলো অবিচার ও বিভেদমূলক। সন্দেহ নেই যে, মানচুরিয়ায় জাপানি কার্যকলাপ পূর্ব-পরিকল্পনা মাফিক হয়েছিল এবং যার দ্বারা জাপানের সম্প্রসারণবাদী নীতি ও কর্মসূচি প্রভাবিত হয়েছিল ১৯২০ সনের শেষ দিকে। কিন্তু সামরিক প্রচারাভিযানের দক্ষতায় জনসাধারণ এমনই ভুলে গেল যে তারা ভারতে শুরু করলো, সম্প্রসারণবাদের দৃষ্টিতে পশ্চিমিদের তুলনায় জাপান এমন কিছু ভুল বা অন্যায় করেনি।

আমি স্থির করেছিলাম, ওসাকা ফার্মে বছর খানেক কাজ করার পর ভারতে ফিরবো। কিন্তু তার আগেই কেরালার বাড়ি থেকে এবং অন্যান্য সূত্র থেকে খবর পেলাম, জাপানে আমার ব্রিটিশ-বিরোধী কার্যকলাপের প্রতিটি খবরই সঙ্গে সঙ্গেই ভারতে জানানো হচ্ছে জাপানের ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগ থেকে। এবং এখন আমার বিরুদ্ধে এমন ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে যে মূহুর্তেই আমি ভারতের মাটিতে পা দেবো, সেই মূহুর্তেই আমাকে গ্রেফতার ও আটক করা হবে। আগেই বলেছি, ভারতে আমার পরিবারের সঙ্গে আমি যে চিঠিপত্র লেখালেখি করি তাও গোয়েন্দা বিভাগ থেকে সেন্‌সর করা হয়। একখানি চিঠিতে আমার ভাই নারায়ণন নায়ার লেখেন যে, আমার চিঠিপত্র তাঁর হাতে দেয় ডাকপিওনের পরিবর্তে পুলিশ কনস্টেবল।

যাই হোক, এই অবস্থা মোটেই আনন্দের বা আরামের নয়। সৌভাগ্যক্রমে আমার দাদাদের সঙ্গে সরকারি কর্তৃপক্ষের ব্যক্তিগত এমন প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল যে, তাঁরা আমার কোনো বিপদের সম্ভাবনা থাকলে আগে থেকেই বেসরকারিভাবে দাদাদের জানিয়ে দিতেন। এরকম একবারের কথা মনে আছে, যখন ত্রিবান্দ্রামের দেওয়ান নয়াদিল্লির পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্ট থেকে নির্দেশ পান, আমার দাদাদের বাড়ি খানাতল্লাসি করে যদি আমার সম্পর্কে বিশেষ কোনো সূত্র-সন্ধান পাওয়া যায়, অবিলম্বে তা সংগ্রহ করতে হবে। শীঘ্রই একটি দিন ঠিক করা হয় যেদিন আমাদের পরিবারের প্রত্যেকের ঘরবাড়ি ত্রিবান্দ্রামে এবং নেয়াট্টিংকারাতে খানাতল্লাসি করা হবে। আমার দাদা ও কাকারা পূর্বোক্ত অফিসারদের কাছ থেকে খবর পেয়েই তখনি ধীরেসুস্থে সমস্ত প্রমাণ যথা চিঠিপত্র, ফটোগ্রাফ ও অন্যান্য জিনিসপত্রাদি, পুলিশের চোখে যা কিছু সন্দেহজনক মনে হতে পারে, তার সবকিছুই সরিয়ে ফেললেন যাতে পুলিশ এসে দেখেশুনে সহজেই বলতে পারে

তারা সন্দেহজনক কিছুই দেখতে পায়নি। কিন্তু আসলে আমার একখানি ফটোগ্রাফ ছিল একটা ঘরে, যা তল্লাসি করা হয়েছিল ; ফটোগ্রাফখানি শুধুমাত্র একটি আয়নার পিছনে টাঙানো ছিল। পুলিশ অফিসারটি আয়নাটিই দেখেছিলেন, কিন্তু পিছনদিকে দেখেন নি। আমার এক দাদা ওটি ওখানে রেখেছিলেন পুলিশ অফিসারের সঙ্গে একটু তামাশা করার জন্যে। জনৈক মনোবিজ্ঞানী ঠিকই বলেছেন, কোনো লোক যখন আয়না দেখে তখন সে স্বভাবতই আয়নার সামনেটাই দেখে, পিছনটা দেখে না।

আমার জীবনের এই কাহিনী প্রসঙ্গে, আমাকে দুঃখের সঙ্গেই বলতে হবে ১৯৩৯ ডিসেম্বরে আমার মায়ের মৃত্যু হয়। এই সময়ে আমাদের পরিবারের বিশেষ শুভাকাংক্ষী দেওয়ান—স্যার সি. পি. রামাস্বামী আয়ার আমার দুই দাদা কুমারন ও নারায়ণনকে বলেছিলেন বলে জানা যায় যে, তাঁরা এবং তাঁদের সমস্ত আত্মীয়স্বজনের উচিত আমার সঙ্গে কোনোরকম সম্পর্ক ত্যাগ করা। আমাদের পরিবারে ভাগাভাগি (tharavad) হবার পরে, নিয়াট্টিংকারায় আমার নিজের নামে কিছু সম্পত্তি ছিল। তাছাড়া, আমার মায়ের মৃত্যুর ফলে তাঁর সম্পত্তিরও একটা অংশ আমার ভাগে পড়লো। অতএব আমার যদি মৃত্যু হয়, তাহলে আমার এই সমস্ত সম্পত্তিই পরিবারের জীবিতদের মধ্যেই ভাগাভাগি হবে। আমাদের পরিবারের যাঁদের সাক্ষ্য-প্রমাণাদি সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে আপাতভাবে গ্রাহ্য হবে, তাঁরা লিখে সই করে দিলেন এই বলে যে, আমার মৃত্যু হয়েছে এবং তার ফলে ভারতে আমার সমস্ত নিজস্ব সম্পত্তি (যা 'থারাবাদ' থেকে প্রাপ্ত) 'এবং মায়ের কাছ থেকে প্রাপ্ত অংশের সম্পত্তি প্রকৃতপক্ষে পরিবারের জীবিতদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে গেল।

আমার পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন হলো যে, স্যার সি. পি. রামাস্বামীর মতো একজন দক্ষ প্রশাসক আমার সম্পর্কে এরকম পরামর্শ দিতে পারেন। যদি সত্যিই তিনি এরকম পরামর্শ দিয়েও থাকেন, তাহলে আমি কিছুতেই বুঝতে পারিনে তার কারণটা কী। কারণটা যদি জানতে পারতাম আসলে কে কি কারণে এরকম কাজ করেছেন, তাহলে আমি তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতাম। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমি এ ব্যাপারে কারো বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করিনি বা করতে পারিনি : কিন্তু যখন জানতে পারলাম, আমাদের পরিবারেরই কেউ রামাস্বামীর নাম করে এরকম কাজ করতে পারেন, এত নিচে নামতে পারেন, সেটা আমার পক্ষে একটা দারুণ দুঃসংবাদের মতো মনে হলো। মানবপ্রকৃতি মাঝে মাঝে এমনই দুর্বোধ্য ও রহস্যময় হয়ে ওঠে।

১৯৩১ সনের শেষদিকে প্রকৃতপক্ষে সারা মানচুরিয়া জাপানের নিয়ন্ত্রণে এসে গেল। দুনিয়ার প্রতিক্রিয়া ছিল স্বভাবতই জাপানের পক্ষে প্রতিকূল। ভারতের

জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দও জাপানি কর্তৃপক্ষের এহেন কার্যকলাপে সায় দিতে পারলেন না : এটা খুবই স্বাভাবিক, কেননা ভারতও ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছিল, এবং কোথাও কোনোরকম সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী কার্যকলাপ দেখলেই তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। কোয়ানটুং আর্মি অবশ্য এসব কোনো সমালোচনা ও মন্তব্যের মধ্যে ছিল না। কোয়ানটুং আর্মি স্থির করেছিল, যেভাবেই হোক চীনের হাত থেকে মানচুরিয়াকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাজ্য হিসেবে স্থাপন করতে হবে।

চিং সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট হেনরি পু-ই (Henri Pu-yi of Ching dynasty), ১৯১২ সনে যিনি গদিচ্যুত হন, তিনি তখন তিয়েনসিনে বসবাস করছিলেন। কোয়ানটুং আর্মির কমাণ্ডার জেনারেল শিগেরু হনজো-র (Gen. Shigeru Honjo) নির্দেশমতো কর্নেল সেশিরো ইতাগাকি (Col. Seishiro Itagaki) চলে গেলেন তিয়েনসিনে এবং কোনোরকমে রাজী করিয়ে পু-ই কে নিয়ে এলেন মানচুরিয়ার চ্যাংচুন রাজ্যে (Changchun, পরে নতুন নাম হয় সিংকিং/ Hsingking, নতুন রাজধানী)। এই বিজিত রাজ্য মানচুরিয়াই নতুন ভাবে মানচুকুও নামে ঘোষিত হলো, ১লা মার্চ ১৯৩২ তারিখে। এবং প্রাক্তন গদিচ্যুত পু-ই'কেই অন্তর্বর্তীকালীন রাজ-প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত করা হলো। ১৯৩৪ সনের ১ মার্চ তারিখে তাঁকেই সম্রাট উপাধিতে ভূষিত করা হলো। অতঃপর মানচুকুও সাধারণতন্ত্র রূপান্তরিত হলো রাজতন্ত্রে।

এই নতুন পরিস্থিতির ফলে নিঃসন্দেহে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য পশ্চিমি রাষ্ট্রগুলি বেশ বিব্রত বোধ করলো। তবে কেবলমাত্র আমেরিকাই মানচুরিয়াকে স্বীকৃতি না-দেবার নীতি গ্রহণ করলো, তার বেশি কিছু নয়। চীনে সহিংস আন্দোলন সংঘটিত হলো, এবং শাংহাই-এর জাপানি সম্প্রদায়ের মোটামুটি ৩০ হাজার মানুষের জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতির আশংকা করা হলো। তৎকালীন মন্ত্রী মামোরু শিগেমিৎসুর (Mamoru Shigemitsu,) অনুরোধে যুদ্ধমন্ত্রী ইওশিনোরি শিরাকাওয়া (Yoshinori Shirakawa) টোকিও থেকে শাংহাইতে তিন ডিভিশন আর্মি এবং নৌবাহিনী পাঠানোর নির্দেশ দিলেন অ্যাডমিরাল কিচিসাবুরো নোমুরার (Adm. Kichisaburo Nomura) নেতৃত্বে। দিন কয়েকের সাংঘাতিক যুদ্ধের পর জাপানি বাহিনী শাংহাই থেকে চীনা বাহিনীকে হঠিয়ে দিল।

জাপানিরা সন্দেহক্রমে একখানি চীনা বিমানকে ভূপাতিত করলো। কিন্তু পরে জানা গেল বিমানটি ছিল আমেরিকান, কিন্তু তার গায়ে ছিল চীনা পতাকা আঁকা এবং সেটি চালাচ্ছিল একজন চীনা পাইলট। যখন এই খবর জানাজানি হলো, আমি তখন বসেছিলাম মিঃ ফ্রাঙ্কলিন-এর বাড়িতে; তিনি একজন আমেরিকান প্রেসবিটেরিয়ান মিশনারি, কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছাকাছি

তানাকা নামে এক জায়গায়। মিঃ ফ্রাঙ্কলিন ব্যক্তিগতভাবে একজন শান্তিবাদী হিসেবে পরিচিত ছিলেন; তিনি অবাক হলেন এই ভেবে এবং বলে ফেললেন যে, এই প্রথম একজন আমেরিকানকে গুলী করে মাটিতে ফেললো একজন এশিয়ান। জবাবে আমিও বললাম, সম্ভবত এই প্রথম ঘটনা যখন একজন আমেরিকানের মৃত্যু হলো এশিয়ানদের বিরুদ্ধে প্রতারণা করতে গিয়ে, এবং ভবিষ্যতেও যখনি এরকম কোনো প্রতারণার ঘটনা হবে, তার পরিণতিও একই রকম হতে পারে। মিঃ ফ্রাঙ্কলিন আবার মন্তব্য করলেন, এতে কিন্তু আমেরিকান সরকার জড়িত নয়, এবং পাইলট একজন স্বেচ্ছাসেবক মাত্র। অতঃপর আমি এই বলে কথা শেষ করলাম যে, যুদ্ধে সর্বদাই এরকম বহু অজুহাত ও কৈফিয়ৎ দেওয়া যেতে পারে, এবং যেকোনো ঘটনাই ঘটতে পারে।

ইতিমধ্যে ১০ ডিসেম্বর ১৯৩১ তারিখে লিগ-অফ নেশন্‌স থেকে একটি কমিশন নিযুক্ত করা হলো মানচুকুও ঘটনার ব্যাপারে তদন্ত করে দেখার জন্যে। এই কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হলেন গ্রেট ব্রিটেনের আর্ল-অফ লিটন (Earl of Lytton, Gt. Britain), এবং একজন করে সদস্য নির্বাচিত হলেন যথাক্রমে ইটালি ফ্রান্স, আমেরিকা ও জার্মানি থেকে। জাপান সরকার কমিশনের সঙ্গে যথেষ্ট সহ-যোগিতা করলেন নানা সুবিধা-সুযোগ ইত্যাদি দিয়ে, কমিশন যাতে যথাযথ ভাবে তার প্রতি ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করতে পারে। কিন্তু জাপানে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের বহু দল-উপদল ছিল, যারা জাপানের ব্যাপারে তদন্ত করতে লিটন-কমিশনের নিয়োগের আদৌ পক্ষপাতী ছিল না। এরকম বিরোধী নেতাদের মধ্যে ছিলেন জিম্‌মু-কাই দলের ড. শুমেই ওকাওয়া (Dr. Shumei Okawa, *Jimmu-kai*), একজন গোঁড়া জাতীয়তাবাদী; জানা যায় ইনিই নাকি ১৫ মে'র ঘটনা সংগঠন করেছিলেন, যার ফলে প্রধানমন্ত্রী সুয়োশি ইনুকাই (Tsuyoshi Inukai) নিহত হন।

তৎকালীন জাপানি রাজনীতির উল্লেখযোগ্য একটি বিশেষত্ব হলো—চরম দক্ষিণপন্থী জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে অনেকেই সম্রাটের স্বর্গীয় ভাবধারা অক্ষুণ্ণ রাখতে কৃতসংকল্প ছিলেন, এবং জাপানের সামরিক শক্তি অটুট রাখার পক্ষে উচ্চশিক্ষিত ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষদের বিপজ্জনক বলে মনে করা হতো। জিম্‌মু-কাই'এর নেতা শুমেই ওকাওয়া (Shumei Okawa) যাঁকে আমি খুব ভালোভাবেই জানতাম এবং আমাকেও যিনি খুব পছন্দ করতেন—তিনি ছিলেন এরকম একজন মানুষ। তিনি টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রিধারী ছিলেন—একটি দর্শনে (ভারতীয় দর্শন সহ) এবং আরেকটি ছিল রাজনীতিতে। তিনি ছিলেন ভারতের একজন বন্ধু। তিনি এবং রাসবিহারী বোস ছিলেন ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে সহযোগী, এবং এই সূত্রেই তাঁর সঙ্গে আমারও ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল।

একই রকম ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হলো আমার সঙ্গে মিৎশুরু টয়ামা-র (Mitsuru Toyama)—যিনি স্থাপন করেছিলেন 'গেনিওশা' ১৮৮১ সনে (Genyosha, 1881) এবং রায়েচেই উচিদা, যিনি স্থাপন করেন 'কোকুরিয়ুকাই' অর্থাৎ ব্লাক ড্রাগন সোসাইটি, ১৯০১ (Ryochei Uchida, Kokuryukai, Black Dragon Society, 1901)—প্রভৃতির সঙ্গে। তাঁরা ছিলেন জাপানি যুদ্ধবাজ দলের মধ্যে অত্যন্ত শক্তিশালী নেতা। কিন্তু সেখানে ঐ একই কারণে জীবনপণ সংগ্রামরত অন্যান্য আরো দলও ছিল। আমার সঙ্গে ঐ সমস্ত দলের প্রত্যেকের সঙ্গেই যোগাযোগ ছিল। যেহেতু ব্রিটিশ বিরোধিতাই ছিল তাদের সঙ্গে যোগাযোগের সাধারণ সূত্র, এবং বেশ ভালোভাবেই ঐসব যোগসূত্রগুলিকে আমি কাজে লাগাতে পেরেছিলাম ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বার্থে।

মানচুকুও সমস্যার তদন্তের জন্যে লিটন-কমিশনের নিয়োগের ফলে দক্ষিণপন্থী সংগঠনগুলি, বিশেষত মিৎশুরু টয়ামা ও শুমেই ওকাওয়ার পার্টিগুলি লিগ-অফ নেশন্স'এর পশ্চিমি শক্তিগুলির বিরুদ্ধে আন্দোলন ও প্রচারাভিযানের মাত্রা বাড়িয়ে দিল। তারা পশ্চিমি শক্তিগুলিকে এশিয়ায় জাপানের ব্যাপারে নাক গলানোর জন্যে দায়ী বলে অভিযোগ করলো যে, তারা নিজেরাই যেখানে উপনিবেশবাদী, তাদের পক্ষে কোনোভাবেই কোনো তদন্ত করা সাজে না, বা তার কোনো অধিকারই নেই। এই দক্ষিণপন্থী পার্টিগুলির চিন্তাধারার সঙ্গে খুব কম লোকেই হয়তো একমত হবে, কিন্তু তাদের বক্তব্যের আন্তরিকতায় কারো কোনো সন্দেহ ছিল না।

যাই হোক, লিটন-কমিশন বিরোধী যে আন্দোলন শুরু করলেন শুমেই ওকাওয়া, তা ছিল কিয়োটো শহরে ১৯৩১-৩২ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত পাশ্চাত্য-বিরোধী বৃহৎ আন্দোলন। আমিও কমিশনের বিরুদ্ধে এরকম কয়েকটি আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলাম। এবং কয়েকটি আন্দোলনের বিরাট সমাবেশে ভাষণও দিয়েছিলাম—আন্দোলনকারীদের উৎসাহ দেবার জন্যে। আমার ভাষণে মানচুরিয়ার জাপানি কার্যকলাপের কোনো সমর্থন ছিল না। কিন্তু আমার বক্তব্য ছিল এই লিটন-কমিশন ব্যর্থ হতে বাধ্য, কেননা এশিয়ার ব্যাপারে এশিয়ান দেশগুলি নিজেরাই আলাপ-আলোচনার দ্বারা যেকোনো সমস্যার সমাধান করতে পারে। আমার বক্তব্যের মধ্যে আমি একথার ওপর জোর দিয়ে আরো বললাম, লিটন-কমিশনের চেয়ারম্যান স্বয়ং লর্ড লিটন হলেন ব্রিটেনবাসী এবং সেই ব্রিটেনই ভারতকে পরাধীন করে রেখেছে। অতএব এহেন লোক মানচুরিয়া সমস্যা সমাধানের পক্ষে একেবারেই অনুপযুক্ত। আমার বক্তব্যের মূল কথা হলো—'এশিয়াবাসীদের জন্যেই এশিয়া' (Asia for Asians) কেবল দক্ষিণপন্থী সংগঠনগুলির কাছেই নয়, জাপানি জনসাধারণের অন্যান্য মতাবলম্বীদের কাছেও ভালো লাগলো এবং সাড়া জাগালো। অবশ্য সর্বদাই আমার মনে হচ্ছিল, ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের সঙ্গে আমার সম্পর্ক দ্রুত অবনতির দিকে যাচ্ছে।

রাসবিহারী বোস ছাড়া মাত্র স্বল্প কয়েকজন প্রখ্যাত ভারতীয় বিপ্লবী এসেছেন জাপানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর স্বল্প কালের জন্যে। কিন্তু ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে প্রচারের ক্ষেত্রে অনেক ভালো কাজ করেছেন। এরকম কয়েকজনের মধ্যে আছেন—লাজপত রায় রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ ও বরকতুল্লাহ প্রভৃতি। লাজপাত রায় ও বরকতুল্লাহর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের সুযোগ হয়নি। কিন্তু রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের সংস্পর্শে আসার সুযোগ হয়েছে আমার ১৯৩০ সনে, যখন আমি কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।

মহেন্দ্রপ্রতাপের খ্যাতি ছিল প্রথম ভারতীয় হিসেবে, যিনি কাবুলে ১৯১৫ সনে অন্তর্বর্তীকালীন স্বাধীন ভারত সরকার গঠন করেছিলেন। তিনি ছিলেন প্রথম যুগের ভারতীয় স্বদেশপ্রেমিকদের অন্যতম, যিনি স্বদেশের বাইরে থেকে ভারতীয় স্বাধীনতার পক্ষে উল্লখযোগ্য কাজ করেছেন। তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের গোড়ার দিকে ইয়োরোপেই ছিলেন এবং পরে সেখান থেকে আফগানিস্তানে যান—যেখানে তাঁকে রাজনৈতিক আশ্রয় ও নাগরিকত্ব দান করা হয়। তাঁর দিক থেকে এটা হলো বিশ্বাসের কথা যে, আফগানিস্তানে যখনি প্রকাশ্যে তিনি হাজির হয়েছেন কোনো জনসভায় বা অন্য কোনো ব্যাপারে, তখনি তিনি নিজেকে আফগান নাগরিক বলে পরিচয় দিয়েছেন; অবশ্য এটা তাঁর আফগানিস্তানের প্রতি কৃতজ্ঞতার পরিচয়—যারা তাঁকে ব্রিটিশের কোপদৃষ্টি থেকে আশ্রয় দিয়েছে। মহেন্দ্রপ্রতাপের সঙ্গে কিয়োটোতে আমার প্রথম পরিচয়ের সময় তাঁর সঙ্গে কয়েকবারই আমার দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে—প্রধানত ভারতীয় সমস্যাদি সম্পর্কে এবং তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনা নিয়ে: কিভাবে ভারতের স্বাধীনতার জন্যে জনমত সংগঠন করা যায় এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি নানাস্থানে ঘোরাঘুরি করে বহু যোগাযোগ স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

তিনি ছিলেন একজন সেরা ভ্রমণকারী, এবং তাঁর অমায়িক ব্যক্তিত্বের ফলে তাঁর বহু বন্ধুলাভ হয়েছিল। সেকালের একজন রাজকুমার হিসেবে তাঁর পরিচয় তাঁর কাজের ক্ষেত্রে খুবই সহায়ক হয়েছিল। আমার তখন খুবই সন্দেহ ছিল—ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পক্ষে একটা বিশ্ব সেনাবাহিনী কিংবা এমনকি এশিয়ান আর্মিও গঠন করা সম্ভব কিনা; কিন্তু যাই হোক, মহেন্দ্রপ্রতাপের সাহাসকতা এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আন্তরিকতা সম্পর্কে কারো কোনো সন্দেহ ছিল না। যদিও সময়ের দিক থেকে ব্যস্ততা ও দ্রুততার জন্যেই তিনি আফগান নাগরিকত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি সর্বান্তঃকরণে ছিলেন একজন খাঁটি ভারতীয় এবং সাচ্চা স্বদেশপ্রেমিক। তাঁর বেশ ভালো যোগাযোগই ছিল জাপানি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে, এবং জাপানি ভাষা না জানার ফলে ভাষাগত অসুবিধে সত্ত্বেও তিনি ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে জাপানি আগ্রহ বাড়িয়ে তুলতে যথেষ্ট ভাবে সমর্থ হয়েছিলেন। জাপানের বিভিন্ন স্থানে ভাষণদান কালে তাঁর ভাঙা

ভাঙা জাপানি শব্দসহ কথাবার্তা সত্যিই সাহসিকতা ও আন্তরিকতার পরিচয়। কথাবার্তার মধ্যে তাঁর ভাষাগত অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটি সহজেই ক্ষমার যোগ্য, অন্তত জাপানি জনসাধারণের কাছে বক্তব্য পৌঁছে দেবার প্রকৃত আন্তরিকতার বিচারে।

লিটন-কমিশন বিরোধী আন্দোলন চলাকালে কানসাই প্রদেশে মহেন্দ্রপ্রতাপের সঙ্গে দ্বিতীয়বার আমার দেখা হয়। কয়েকজন জাপানি ও ভারতীয় বন্ধুরা মিলে ওসাকার নাকানোশিমা হলে (Nakanoshima Hall, Osaka) একটি বড জনসভার আয়োজন করেন—পশ্চিম জাপানের এটি সবচেয়ে বড ও প্রশস্ত অডি-টোরিয়াম যুক্ত হল। জনসভায় বিশাল জনসমাবেশ হলো এবং তার ফলে বন্ধু ও পরিচিতদেরও সহজে চেনা দায় হলো। কিন্তু আমি শ্রোতাদের মধ্যে থেকে সহজেই মহেন্দ্রপ্রতাপকে চিনতে পারলাম। কারণ তিনি ছিলেন স্বল্প কয়েকজন ভারতীয়ের অন্যতম এবং তাঁর ঘনকালো চুল চিনতে কখনো ভুল হয় না। সেই সভায় আমিই ছিলাম প্রধান বক্তা হিসেবে পূর্ব নির্দিষ্ট এবং স্বভাবতই আমার বক্তব্য বিষয় ছিল—ব্রিটিশ-শোষিত ভারত। মনে হলো আমি বেশ ভালোভাবেই প্রস্তুত। জাপানি ভাষায় আমার অনর্গল বলার ক্ষমতা এবং জাপানি শ্রোতার চমৎ-কার সাড়া দেওয়ার গুণে, আমি আমার ভাষণ চালিয়ে গেলাম। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আমি কখনো মৌখিকভাবে বেসামাল উক্তি করিনি। অবশ্যই ব্রিটিশ গোয়েন্দারা কড়া নজর রাখছিল, কিন্তু সেজন্যে আমি বলা বন্ধ করিনি বা দুশ্চিন্তা করিনি। বহু জাপানি নেতা ও বন্ধুরা আমাকে অভিনন্দন জানান। রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপও অভিনন্দন জানান; অতঃপর তখন থেকে তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ আরো ঘনিষ্ঠ হয় ও বেড়ে যায়। আমাদের মধ্যে একটা ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠলো, এমনকি ভারতের স্বাধীনতার জন্যে আমাদের অভিন্ন লক্ষ্য ছাড়া কর্ম-পদ্ধতির মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গি জনিত মতভেদ ছিল প্রচুর।

মহেন্দ্রপ্রতাপ, আমার মতে একজন আদর্শবাদী—বাস্তবজ্ঞানের কিছুটা অভাব ছিল তাঁর। তিনি একজন সত্যিকারের ভালো মানুষ, নিঃসন্দেহে আন্তরিক এবং ভারতকে মুক্ত স্বাধীন দেখতে তাঁর দুশ্চিন্তা ছিল একেবারেই খাঁটি। তিনি ছিলেন একজন ভবিষ্যতের স্বপ্নদ্রাষ্টা, তাঁর লেখার ক্ষমতাও ছিল। জওহরলাল নেহরু একবার তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন—শূন্যে প্রাসাদগড়া মানুষ। মহেন্দ্রপ্রতাপের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ব্রিটিশের কাছ থেকে ভারতকে তিনি মুক্ত করবেনই—একদল স্বেচ্ছাসেবী এশিয়ান আর্মির (Asian Army) সাহায্যে, এবং সেই আর্মি তিনি সুসংগঠিত করতে পারবেন তাঁর জাপান, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, চীন, মংগোলিয়া, তিব্বত এবং আরো কয়েকটি দেশ পরিভ্রমণ কালে। এবিষয়ে আমি কখনোই তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারিনি। আমার মতে, ভারতীয়দের যুদ্ধ করা উচিত তাদের নিজস্ব লোকবলের ভিত্তিতে, যদিও নানান বাধাবিপত্তির জন্যে বিভিন্ন সূত্র থেকে যথা-

সাধ্য সাহায্য নেবার ও পাবার প্রয়োজন ছিল।

এই প্রসঙ্গে আমি এখানে কিছু বলতে চাই — যেকথা খোলাখুলি ভাবেই আমার চীনা এবং কোরিয়ান এমনকি জাপানি সহপাঠী ছাত্রদের সঙ্গেও হয়েছিল। এদের প্রত্যেকেরই আমার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের প্রতিও বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাব ছিল — বিশেষত ব্রিটিশের হাতে ভারতের দুর্দশার জন্যে। কিন্তু এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রবাসী ভারতীয়দের যুদ্ধপ্রচেষ্টা — তা নিজেদের লোকবলেই হোক, আর অন্য কোনো দেশের সাহায্যেই হোক — কেবল ধারণা হিসেবেই ভুল নয়, কার্যতও অবাস্তব। প্রকৃতপক্ষে, আমার কয়েকজন জাপানি সহপাঠী প্রায়ই আমাকে সাবধান করে দিত এই বলে যে, জাপানি সামরিক শক্তির তৎকালীন আগ্রাসী ক্ষমতা এত বেশি যে তা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে না রাখলেই আশংকার কারণ হতে পারে। এবং ভারত নিশ্চয়ই চায় না যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বদলে সেখানে সম্ভাব্য জাপানি সম্প্রসারণবাদের আবির্ভাব হোক। তাই রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ যখন এশিয়ান-আর্মির কথা বলেন, বোঝা যায় এই আর্মির ধরনধারণ ও পরিণতি কী হবে সে সম্পর্কে তাঁর কোনো স্পষ্ট পরিষ্কার ধারণা নেই। তবু আমি আগেও যা বলেছি এখনো তাই বলি, আমি তাঁর স্বদেশপ্রেমের প্রশংসা করি।

১২

মানচুকুও প্রদেশে

মানচুরিয়ার ঘটনা এবং লিটন-কমিশন বিরোধী আন্দোলন, উভয়তই ছিল যৌথ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পক্ষে পরীক্ষাস্বরূপ এবং লিগ-অফ নেশন্‌স'এর দায়িত্ব ছিল তার উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় দেখাশোনা করা। মানচুরিয়ায় জাপানি কার্যকলাপ এবং মানচুকুওর সৃষ্টি অবশ্যই লিগ-অফ নেশন্‌স'এর শক্তিসামর্থ্যের পরিচায়ক নয়। লিটন-কমিশন নিঃসন্দেহে যথেষ্ট কাজ করেছিল, যদিও তার ফলাফল লিগের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি। আগেই বলেছি, লিটন-কমিশন বিরোধী আন্দোলন জাপানেও শুরু হলো কমিশনের প্রায় সূচনাকাল থেকেই। কমিশন জাপান পরিদর্শন করলো এবং অধিবেশন করলো বিদেশমন্ত্রী কেনকিচি ইয়োশিসাওয়া এবং যুদ্ধমন্ত্রী সাদাও আরাকির সঙ্গে (Kenkichi Yoshisawa & Sadao Araki) এবং

তারপর মানচুকুওয় গেল পু-ই (Pu.-yi) এবং কোয়ানটুং আর্মি চিফ জেনারেল শিগেরু হনজোর সঙ্গে (Gen. Shigeru Honjo) আলোচনা করতে। পিকিঙেও এই আলোচনা চলেছিল।

লিটন-কমিশনের রিপোর্টের উল্লেখযোগ্য বক্তব্য হলো, কমিশন কার্যত কোয়ানটুং আর্মিকেই অভিযুক্ত করলো—মানচুরিয়া ও চীনে আগ্রাসী কার্যকলাপের জন্যে; কিন্তু এইসব অঞ্চলে জাপানের কিছু বিশেষ ক্ষমতা ও অধিকার স্বীকার করে নিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কমিশন সার্বভৌম চীনের এলাকার মধ্যে পৃথক মানচুকুওর স্বাধীন সত্তাকে স্বীকার বা সমর্থন করলো না। স্বভাবতই কমিশনের এই মনোভাবে জাপান প্রতিবাদ করলো, এবং লিগ-অফ নেশন্‌স তার অধিবেশনে যখন এই রিপোর্ট অনুমোদনের জন্যে প্রস্তাব করলো, জাপানি প্রতিনিধি দলের নেতা ইয়েসুকে মাৎসুওকা (Yosuke Matsuoka) তার প্রতিবাদে ওয়াক আউট করলেন। বিগত ২৭ মার্চ ১৯৩৩ তারিখে জাপান লিগ-অফ-নেশন্‌স থেকে বেরিয়ে আসে।

মানচুকুও কাহিনীর আরেকটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দিক এবং লিটন-কমিশনের বিরুদ্ধে আলোচনা-সমালোচনার ফল হলো এই যে, জাপানের বিরুদ্ধে যেসব দেশ প্রতিবাদ করেছিল তারা সবাই ছিল ছোটাখাটো দেশ। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র লিগ-অফ নেশন্‌স'এর সদস্য ছিল না, বাইরে বাইরে একটা প্রতিবাদের ভাব দেখালো, কিন্তু মানচুকুওর জন্যে তেমন বিশেষ কোনো মাথাব্যথা ছিল না তার। কেননা, তার বেশি আগ্রহ ছিল চীন ও তৎকালীন মানচুরিয়ার নিজের স্বার্থ বিষয়ে। ফ্রান্স ও ব্রিটেনেরও বড রকমের স্বার্থ ছিল চীনে। ফলে, তারাও আমেরিকার মতো একই কৌশল অবলম্বন করেছিল।

প্রকৃতপক্ষে, ব্রিটেনের দৃষ্টিভঙ্গিও স্পষ্ট বা পরিষ্কার ছিল না। এটা বোঝা যায় যখন চিন্তা করা যায়, দুনিয়াব বিভিন্ন দেশে ব্রিটেন কি করছে, বিশেষত ভারতে তার কার্যকলাপ কী। ফলে, মানচুরিয়ায় জাপানি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ব্রিটেনের বক্তব্য পরিষ্কার হওয়া সম্ভব নয়। ১৬ সেপটম্বর ১৯৩২ তারিখে, অর্থাৎ লিগ-অফ নেশন্‌স' এর অধিবেশনে লিটন-কমিশনের রিপোর্টের আলোচনার কয়েক সপ্তাহ আগে, লণ্ডনের বিখ্যাত সংবাদপত্র 'দি টাইম্‌স' (The Times) ব্রিটিশ সরকারের স্বীকৃত বেনামদার মুখপত্র, মানচুরিয়ার জাপানি কার্যকলাপের অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দিল।

এই প্রসঙ্গে 'টাইম্‌স' তার সম্পাদকীয়তে লিখলো: জাপান শাংহাইতে যা করেছে তার জন্যে জাপান এদেশে খুব সামান্যই সমর্থন পেয়েছে; কিন্তু মানচুরিয়ায় তার অবস্থা ভিন্ন প্রকৃতির। সেখানে জাপানের অর্থনৈতিক স্বার্থ, তার দ্রুত ও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে শক্তিমান ও সম্পদশালী হয়ে ওঠার পক্ষে অত্যন্ত জরুরি; জাপান মানচুরিয়াকে এই শতকের গোড়ার দিকে রাশিয়ার

বাঁচিয়েছে ; অধিকন্তু জাপান মানচুরিয়াকে বিশৃংখলা ও সন্ত্রাসবাদের হাত থেকে বাঁচিয়েছে—যার ফলে চীনের অন্যান্য অঞ্চল অস্থির হয়ে উঠেছে। জাপান সংগতভাবেই অর্থনৈতিক অধিকার অর্জন করেছে—চীনদেশ যা অসংগত ভাবে বাধা দিচ্ছিল, অথচ জাপান তা পুনরুদ্ধারের জন্যে দীর্ঘকাল ধৈর্য ধরে কূটনৈতিক উপায়ে প্রয়াস চালিয়েও ব্যর্থ হয়েছে। এটা অবশ্য জোরের সঙ্গেই বলা যেতে পারে, লিগ-অফ নেশন্‌স যেসব আচরণবিধি বেঁধে দিয়েছে তা দুনিয়ার সর্বত্র ঠিকমতো প্রযুক্ত বা পালিত হয়নি ; কিন্তু একথা সর্বদাই মনে রাখতে হবে, লিগের প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রই যখন সমান ও সমমর্যাদার অধিকারী, তখন প্রত্যেকের কার্যকলাপই সমদৃষ্টিতে দেখা প্রয়োজন।…

এমনকি লিগের অধিবেশনে আলোচনা চলাকালে, ব্রিটেনের সেক্রেটারি অফ স্টেট স্যার জন সাইমন (Sir John Simon) এবং কানাডার প্রতিনিধি জাপানের চেয়ে চীনেরই সমালোচনা করলেন বেশি। ইতিমধ্যে ১৯৩২ এপ্রিল মাসে টোকিওতে গোলমাল শুরু হলো। এপ্রিলের ২৯ তারিখে—সম্রাট হিরোহিতোর জন্মদিবসের (Emperor Hirohito's birth anniversary) অনুষ্ঠানে জনৈক কোরিয়ান একটি বোমা ছুঁড়লো মঞ্চ লক্ষ্য করে। তখন মঞ্চে বসেছিলেন অ্যাডমিরাল নোমুরা (Adm. Nomura) শিরাকাওয়া এবং শিগেমিৎসু (Shirakawa & Shigeimitsu) প্রভৃতি বসেছিলেন। নোমুরা অক্ষত ছিলেন কিন্তু শিগেমিৎসু তাঁর ডান পায়ে আঘাত পান, পরে তা সেলাই করতে হয়, এবং শিরাকাওয়ার মৃত্যু হয় যে মাসে।

১৯৩৩ সনের গ্রীষ্মকালে ওসাকায় আমি একটি খবর পেলাম গুনটা নাগাও-এর (Gunta Nagao) কাছ থেকে—সে ছিল কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি বিষয়ের ছাত্র হিসেবে আমার সমসাময়িক। আমরা একই বছরে গ্রাজুয়েট হই, এবং আমরা ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম। নাগাওকে মানচুকুওয় একটি দায়িত্বপূর্ণ কাজ দেওয়া হয়েছিল। তার সঙ্গে ছিল আমাদের একই বছরের অন্যান্য কয়েকজন সহপাঠী -ছাত্র (বিভিন্ন বিষয়ের ও বিভাগের)—মানচুকুওয় নতুন প্রশাসন সংগঠনে সাহায্য করার জন্যে এবং তার ভিত্তি ছিল—পাঁচ-জাতের একতা (Five Races unity)। মানকুচুওয় বসবাসকারী পাঁচটি জাতি হলো ; জাপানি, কোরিয়, চীনা, মানচু ও মংগোল। অতএব মানচুরিয়া সরকার ও প্রশাসন এই পাঁচ জাতির প্রতিনিধি সংস্থা নিয়ে গঠিত হওয়ার কথা—এজন্যে একটা অ্যাসোসিয়েশান বা সংস্থা গঠিত হলো, তার নাম হলো—গোমিনসোকু কিওয়া-কাই বা পাঁচ-জাতির ঐক্যদল (Gominsoku kyowa-kai, five nations unity party)। এই ইউনিটি-পার্টি বা ঐক্যদলের কাঠামো সংগঠনে নাগাও ছিলেন মুখ্য ভূমিকাধিকারীদের অন্যতম একজন, অধিকন্তু লিটন-কমিশনের বিরোধীদের একজন প্রধান প্রবক্তা। তাঁর ওপর কাজের দায়িত্ব দেবার সময়েও তিনি বলেন আমাকে তাঁর সঙ্গে যেতে,

তাঁর কাজে সাহায্য করতে ; কিন্তু আমি ওসাকায় থেকে যেতেই মনস্থির করি—কানসাই প্রদেশে লিটন-কমিশন বিরোধী আন্দোলন ও অন্যান্য কাজের সুবিধের জন্যে। কিন্তু নাগাও যখন আবার আমাকে অনুরোধ করলেন ১৯৩৩ সনে, আমি তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণের সিদ্ধান্ত করলাম।

মানচুকুওয় আমার মর্যাদা ছিল একজন রাষ্ট্রীয় অতিথির সমান। আমি সিংকিং বা অন্য যে কোনো স্থানে আমার ইচ্ছেমতো থাকতে পারতাম। আমার ওপর নির্দিষ্ট কোনো কাজের চাপ ছিল না, কেবলমাত্র যখনি প্রয়োজন হবে মানচুকুও গভর্নমেন্টকে সাহায্য ও পরামর্শ দিতে হবে। অন্য সময়ে আমি যা-খুশি করতে পারবো, এমনকি আমার ব্রিটিশ-বিরোধী কার্যকলাপও আমার খুশিমতো উপায়ে চালিয়ে যেতে পারবো। যদিও লিটন-কমিশন তাঁর কাজকর্ম ১৯৩৩ সনের শেষ নাগাদ প্রায় সম্পূর্ণ করে ফেলেছিল এবং এটা প্রায় পরিষ্কার ভাবেই বোঝা যাচ্ছিল—জাপান লিগ-অফ নেশন্‌স থেকে বেরিয়ে আসছে কমিশন-রিপোর্টের প্রতিবাদে, তবু নাগাও ভাবলেন মানচুকুওতে তাঁর সঙ্গে আমার থাকাটা বিশেষ প্রয়োজন। বিশেষত দাইরেন প্রদেশে একটা বৃহত্তর এশিয়ান কনফারেন্স (Asian Conference, Dairen) সংগঠনের জন্যে।

এই এশিয়ান কনফারেন্সের উদ্দেশ্য ছিল—বৃহৎ পশ্চিমি দেশগুলিতে জাপান-বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে এশিয়ান জনসমর্থন সংগ্রহ ও সংগঠিত করা এবং পশ্চিমিদের কার্যকলাপের উপযুক্ত জবাব দেওয়া, কেননা এই বৃহৎ পশ্চিমি দেশগুলি চীনে তাদের জাপান-বিরোধী ক্ষতিকর কার্যকলাপের মাত্রা বাড়িয়ে শক্তিশালী হওয়ার দিকেই আগ্রহী ছিল। শুমেই ওকাওয়া (Shumei Okawa) আমাকে নাগাও-এর সঙ্গে যেতে উৎসাহ দিলেন এবং আমিও যেতে মনস্থির করলাম। রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ আমার কর্মসূচির কথা জানতে পেরে আমাকে বললেন, তিনিও মানচুকুও প্রদেশে যেতে দারুণ আগ্রহী এবং এ ব্যাপারে তিনি আমার সাহায্য চান। নাগাও-এর মাধ্যমে তাঁর জন্যেও আমি একটা আমন্ত্রণের ব্যবস্থা করলাম এবং আনন্দিত হলাম এই দেখে যে, আমার সুপারিশ মেনে নিয়ে তাঁর জন্যেও রাষ্ট্রীয় অতিথির মর্যাদা দেওয়ার ব্যবস্থা হলো।

সিংকিং প্রদেশে আমার প্রথম কাজ ছিল সেখানে একটা সংস্থা গঠন করা, যার মাধ্যমে ভারতের পক্ষে প্রচারকাজ চালোনো যাবে - পুস্তিকা, নিউজ-লেটার ও বুলেটিন ইত্যাদির সাহায্যে। এবং ব্রিটিশ-বিরোধী সভা-সমিতিও পরিচালনা করা যাবে—যার ফলে ভারতে ব্রিটিশের অপরাধমূলক কার্যকলাপ, বিশেষত ভারতকে ব্রিটিশের দাসত্বে আবদ্ধ করার বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রচার করা যাবে। মহেন্দ্রপ্রতাপ ও আমি উভয়ে মিলে প্রচুর ঘোরাঘুরি করে বেড়ালাম ঐ অঞ্চলে এবং প্রকাশ্য জনসভা,

সভা-সমিতি ও বিভিন্ন জাতিগত যোগাযোগের সূত্রমাধ্যমে। আমরা সর্বদাই সাবধান ছিলাম যাতে আমাদের কার্যকলাপে জাপানি কর্তৃপক্ষ অসন্তুষ্ট না হয় বা তারা আমাদের বিপক্ষে চলে না যায়। প্রকৃতপক্ষে, মানচুকুও প্রশাসনে জাপানি কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোনো পক্ষের কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করা বা নাকগলানোর কোনো উদ্দেশ্যই আমাদের ছিল না। আমাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ ছিল কেবলমাত্র ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রগতি ও তাকে জোরদার করার মধ্যে।

আমাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি মানচুকুওর পাঁচ-জাতির ঐক্যদলের সংস্থা গোমিনসোকু কিওয়া-কাই'এর সাধারণ সহানুভূতি ছিল। তবে আমরা লক্ষ্য করেছি, মংগোলরা সাধারণত কোনো কথা না বলে চুপচাপ থাকতো; কিন্তু ঘটনাক্রমে আমরা তাদেরও সমর্থন অর্জন করেছিলাম। চীনা ভাষা ছাড়া মংগোলিয়ান উপভাষায় কথাবার্তা বলার ক্ষমতাও ছিল আমার, এবং তার ফলেই অনেকখানি কাজ হলো। মহেন্দ্রপ্রতাপও ঐ ভাষা শেখার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ঘটনাক্রমে আমিই সফল হলাম, কেননা আমি ছিলাম তাঁর চেয়ে অনেক তরুণ।

আমাদের ভ্রমণের সুবিধের জন্যে সাউথ-মানচুরিয়ান রেলওয়ে আমাদের প্রথম শ্রেণীতে যাতায়াতের ফ্রি-পাশ মঞ্জুর করলো। যখনি যেখানে কোনো বিশেষ কাজে যাতায়াতের প্রয়োজন হলো, সুদূর গ্রামঞ্চলে বা অন্য কোথাও, মানচুকুও সরকার ও প্রশাসন কর্তৃপক্ষ থেকে তার বিশেষ ব্যবস্থা করা হলো। এই সময় একবার আমি ছিলাম ইউজাও হোম্মার (Yuzao Homma) রাজপ্রাসাদে; তিনি ছিলেন সম্পর্কে শুযেই ওকাওয়ার ভাই। আবার, দাইরেন প্রদেশে আমি ছিলাম শুজো ওকাওয়ার (Shuzo Okawa) অতিথি; শুমেইর ছোট ভাই ছিলেন রাশিয়ান ব্যাপারে অভিজ্ঞ এবং রুশ ভাষা জানতেন। তিনিও ছিলেন একজন অগ্রণী এবং আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন দাইরেন প্রদেশে একটা প্রচার সংস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে – ভারতের স্বাধীনতার স্বার্থে।

আমাদের আর্থিক প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে নিঃশর্ত সাহায্যের ব্যবস্থা করেছিলেন সাউথ-মানচুরিয়ার রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ, কেবলমাত্র শুমেই ওকাওয়ার সুপারিশের ভিত্তিতেই। জিমমু-কাই'এর সঙ্গে সক্রিয় ও জীবন্ত যোগাযোগের কাজ ছাড়াও শুমেই ওকাওয়া ছিলেন সাউথ-মানচুরিয়ান রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের ইকনমিক-সেণ্টারের মুখ্যকর্তা। গভর্নমেণ্টের ঠিক পরেই এই রেলওয়ে (SMR – South Manchurian Railway) কর্তৃপক্ষই ছিল মানচুরিয়ার দ্বিতীয় শক্তিশালী সংস্থা। এই SMR-সংস্থার বহুমুখী ও বিভিন্ন শাখা-সংস্থা ছিল। এই রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের কাজ কেবলমাত্র রেলওয়ে লাইন পরিচালনার কাজকর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তার ব্যাপক কার্যকলাপের মধ্যে ছিল – স্বাস্থ্য, শিক্ষা অর্থনীতি, গবেষণা ইত্যাদি কাজের দ্বারা জনজীবনে বিভিন্ন ভাবে প্রভাব বিস্তারের প্রভূত ক্ষমতা। এই

রেলওয়ে কোম্পানির কাজের ক্ষেত্রে জাপান গভর্নমেন্ট একক বৃহত্তম অংশীদার ও শরিক মাত্র ; তাই SMR-সংস্থার প্রেসিডেন্ট নিয়োগের ব্যাপারটা টোকিওর সরকারি ক্যাবিনেটে স্বভাবতই অগ্রাধিকার পেত।

জাপান সরকারিভাবে মানচুকুওকে স্বীকৃতি দিল ১৫ সেপটেম্বর ১৯৩২ তারিখে। এল-সালভাডোর'এর কাছ থেকে মৌখিক স্বীকৃতি এসেছিল ৩ মার্চ ১৯৩৪ তারিখে। সোভিয়েত রাশিয়া সরকারি কূটনৈতিক স্বীকৃতি স্থগিত রেখেও নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে মানচুকুওর সৃষ্টিতে স্বীকৃতি জানালো, এবং সঙ্গে সঙ্গেই আদান-প্রদানের ভিত্তিতে উভয় তরফেই স্থাপিত হলো কনসুলেট অফিস ও দফতর—যথাক্রমে জাপানে ও মানচুকুওতে। কিছুকালের জন্যে অন্যান্য দেশ থেকে তেমন সাড়া মেলেনি ; কিন্তু মৌখিক স্বীকৃতি এসেছিল কয়েকটি দেশ থেকে বিভিন্ন তারিখে—স্পেন (১ ডিসেম্বর ১৯৩৭) ; পোল্যাণ্ড (১৯৩৮-এর শুরুতে) ; হাংগেরি (১৯৩৯ জানুয়ারি) ; ওয়াং চিং-এর চীনা গভর্নমেন্ট (১৯৪০ নভেম্বর) রুমানিয়া (১৯৪০ ডিসেম্বর), এবং থাইল্যাণ্ড (১৯৪১ আগস্ট)। ইতিমধ্যে বাণিজ্যিক আদান-প্রদান (কখনো চোরাগোপ্তা ভাবে, কখনো প্রকাশ্যে খোলাখুলি ভাবে) চলতে লাগলো ব্রিটেন ও মানচুকুওর মধ্যে, যদিও ব্রিটেন এই নতুন রাষ্ট্রকে সরকারিভাবে স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত ছিল না।

আমি জানি, এমনকি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রও মানচুকুওর সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাচ্ছিল, পরোক্ষভাবে অন্য দেশের—সম্ভবত মধ্য-আমেরিকান দেশ এল-সালভাডোর 'এর মাধ্যমে। প্রকৃতপক্ষে, এসব বিষয়ে মানচুকুও কর্তৃপক্ষের গোচরে আনার ব্যাপারে প্রথম থেকেই আমার একটা ভূমিকা ছিল। কেননা, ব্রিটেন ও আমেরিকা যেভাবে চীনের সাহায্যে ও তার মাধ্যমে এসব কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল, সে বিষয়ে তাদের কার্যকলাপ ও ধরনধারণ সম্পর্কে আমার কিছু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। আমার নিজের কাজের সূত্রে আমার ছিল এক ব্যাপক যোগাযোগের সূত্র—যার মধ্যে বিভিন্ন জাতিগত ও রাষ্ট্রগত সূত্রও ছিল খবরাখবর সংগ্রহের এবং তার কার্যকরী প্রভাবও ছিল যথেষ্ট। আমি প্রায়ই পশ্চিমি গুপ্ত-সংস্থার কার্যকলাপ ও খবরাখবরও জানতে পারতাম—জাপানি ও মানচুকুও কর্তৃপক্ষের সংবাদ সংগ্রহের আগেই।

ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ স্বভাবতই আমাকে দারুণভাবে অপছন্দ করতো। কিন্তু আমার প্রতি ও আমার কাজে গভীর সহানুভূতি ছিল কেবলমাত্র। সিংকিয়াং-এর মানচুকুও গভর্নমেন্টেরই নয়, অধিকন্তু গোমিনলোকু কিওয়া-কাই ও কোয়ানটুং আর্মির—যাদের সঙ্গে আমি যুক্ত ছিলাম। লেঃ জেনারেল সেশিরো ইতাগাকি (Lt. Gen. Seishiro Itagaki), কোয়ানটুং আর্মির উপ-প্রধান ছিলেন আমার ব্যক্তিগত বন্ধু ; আমি তাঁকে মানচুকুওতে বদলি হয়ে আসার আগে জাপান থেকেই জানতাম। তিনি ছিলেন ভারতের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ, এবং ভারতের স্বাধীনতা

সংগ্রামে গভীর আগ্রহী। ১৯৩৪ সনে যখন তিনি বিশ্ব পরিক্রমার উদ্দেশ্যে জাপান ছেড়ে যাচ্ছিলেন এবং তাঁকে বিদায় জানাতে গিয়েছিলাম ইয়োকোহামায়, তখন তিনি আমার কাঁধে হাত রেখে আন্তরিক ভাবেই বললেন: ফিরে গিয়ে মানচুকুওয় থেকে ভালোভাবে কাজ চালিয়ে যান; আমি আশা ও প্রার্থনা করি, আমার দৃষ্টিশক্তি থাকতে থাকতেই আমি ভারতকে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত দেখতে চাই। (বিশেষভাবে জাপানিদের কথা বলার ভঙ্গি—তারা যেন কোনো শুভ ঘটনা অতি বৃদ্ধ হবার আগেই দেখে যেতে পারে)।

মানচুকুওতে যেভাবেই হোক, আমার মর্যাদা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আমি কেবলমাত্র গভর্নমেন্টের নিছক একজন অফিস-বেয়ারার ছিলাম না; বরং একজন প্রত্যক্ষদর্শী পর্যালোচক হিসেবে আমার নিরপেক্ষতায় নিশ্চিত হয়ে কর্তৃপক্ষের প্রবীণ কর্মচারিরাও বিভিন্ন বিষয়ে আমার পরামর্শ চাইতেন। আমিও এরকম সুপারিশ ইত্যাদি দেওয়ার ক্ষেত্রে সর্বদাই একটা সামগ্রিক নিরাপক্ষতার নীতি নিয়ে চলতাম, এবং কখনোই আমি আন্তরিকভাবে যা চিন্তা করতাম তা বলতে ক্রটি বা সংকুচিত বোধ করতাম না। আমার এই নীতি অনেক সময় অনেকের কাছেই প্রীতিকর হতো না। কিন্তু যাঁরা সত্যিই কোনো সংস্থা ও সরকারের প্রতি আস্থাশীল ছিলেন, তাঁরা আমার মতামতকে গ্রাহ্য করতেন।

জাপানি প্রশাসনও ক্রটিমুক্ত ছিল না, কিন্তু তাদের অবশ্যই বাহাদুরি দিতে হবে—অন্তত যেভাবে তারা সারা দেশটাকে ঐক্যবদ্ধ রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছে। যদিও তাদের অভিজ্ঞ কর্তাব্যক্তিদের সর্বক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ ক্ষমতার বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না, বিশেষত টেকনিক্যাল বিষয়ে, তারা সর্বপ্রকারে চেষ্টা করছিল জনসমাজের সমস্ত অংশই যাতে উন্নতি। অগ্রগতির ক্ষেত্রে সমান সুবিধা-সুযোগ পায়। কয়েকজন উচ্চতর দক্ষতা সম্পন্ন জাপানি অফিসারদের চীনা মংগোল বা মানচু প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণাধীনে নিযুক্ত করা হয়; এবং জাপানি অফিসাররাও তাঁদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব কোনো রকম প্রতিবাদ। প্রতিরোধ না করে ঠিকমতো পালন করতেন।

অতএব কিছুসংখ্যক পশ্চিমি লেখকরা যে বলেছেন, গোমিনসোকু কিওয়া-কাই এমন একটি সংস্থা যেখানে কেবলমাত্র জাপানিদেরই আধিপত্য, অন্য কোনো জাতির মানুষের কিছু বলার কোনো অধিকার নেই,—সেকথা আদৌ সঠিক নয়। জাপান কিন্তু তার কাজের দ্বারা পাঁচ-জাতির ঐক্য মতবাদ (five-races unity principle) রূপায়িত করার ক্ষেত্রে গভীরভাবে আন্তরিক ছিল। যেহেতু অন্য অনেক দেশের ও জাতির প্রধানদের কথা ও কাজের ক্ষেত্রে ফারাক ছিল, তাই তারাই জাপানের বিরুদ্ধে এরকম অপপ্রচার চালাতো। তবে থাক্ সেকথা।

মানচুকুও, জাপানি নিয়ন্ত্রণাধীনে আসার আগে ছিল আসলে মরুভূমির রাজ্য;

যদিও তার আয়তন বিশাল এবং খনিজ সম্পদে ও অন্যান্য প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যে দেশটা ছিল সমৃদ্ধ। অতঃপর জাপানি উদ্যোগের ফলেই দেশে উল্লেখযোগ্য শিল্পোন্নতি সম্ভবপর হয়ে ওঠে। এই কর্মোদ্যোগের ক্ষেত্রে একটা বড় ভূমিকা নিয়েছিল—শোয়া হেভি ইনডাসট্রিজ (Showa Heavy Industries), যার প্রেসিডেন্ট আইকাওয়া গিৎসুকে (Aikawa Giitsuke) ছিলেন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের অন্যতম আরেকজন। এখানকার চিফ সিটি প্লানার অধ্যাপক তাকেই (Prof. Takei) ছিলেন আমার কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের অন্যতম, এবং তাঁর বিষয়ে দুনিয়ায় তিনি একজন সেরা মানুষ। শোয়া হেভি ইনডাসট্রিজের চিফ এনজিনিয়ার ছিলেন অধ্যাপক তাগুচি (Prof. Taguchi), এবং আমি তাঁরই বাড়িতে গেস্ট ছিলাম কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায়। এই সমস্ত দক্ষ ব্যক্তিদের নেতৃত্ব এবং গোমিনসোকু কিওয়া-কাই'এর প্রধান জুযি ইয়ামাগুচি (GujiYamaguchi) প্রমুখের পরামর্শও ছিল মানচুকুওর উন্নতিমূলক কাজকর্মের প্রাথমিক পর্বে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

এই SMR-সংস্থা প্রাথমিকভাবে রাশিয়ার হাতেই তৈরি, কিন্তু জাপানি কর্তৃপক্ষের হাতেই এর প্রচুর বিকাশ হয়। এখানকার 'এশিয়া' নামক সুপার-এক্সপ্রেস ট্রেন যা দাইরেন ও সিংকিং-এর মধ্যে যাতায়াত করে—তা হলো প্রাচ্যের সবচেয়ে দ্রুত্যগামী বিখ্যাত ট্রেন। কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে, এবং ভারি ও ক্ষুদ্র শিল্পেও জাপানের উন্নতি অগ্রগতি হয়েছে বিস্ময়কর। এটা গুরুত্বপূর্ণ এবং ভাববার বিষয় যে, মানচুকুওর প্রাপ্ত কাঁচামালের পরিমাণ যেমন রেশি, জাপানের শিল্পে তার ব্যবহারও তেমন যথেষ্ট—এতে মানচুকুওর অর্থনীতিতে কোনো ক্ষতি করে না; যেমন ক্ষতি করে ভারতের পক্ষে ব্রিটিশ নীতির ফলে। জাপানের শিল্পে রফতানির ক্ষেত্রেও মানচুকুওর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে।

ভারতের শিল্পক্ষেত্রে ব্রিটিশ নীতি হলো ক্ষতিকর—যাতে সেখানে কোনো রকম নিজস্ব শিল্প গড়ে উঠতে না পারে এবং ঔপনিবেশিক ভিত্তিকে স্থায়ী করে সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণ বজায় রাখা যায়। জাপানি উদ্যোগের লক্ষ্য হলো যাতে মানচুকুওর শিল্প নিজস্ব জোরে দাঁড়াতে পারে, অর্থনীতিতে স্বনির্ভর দেশগঠনে ভূমিকা নিতে পারে। অধিকন্তু ভারতে ব্রিটিশ শাসনের দেশভাগ-করা নীতির মতো, জাপান মানচুকুওকে ভাগ করে শাসন করতে চায়নি; বরং তার উদ্যোগের লক্ষ্য হলো কি করে পাঁচ-জাতির ঐক্যনীতিকে ভালোভাবে বজায় রাখা যায়। এখানকার অনগ্রসর শ্রেণীর লোকেদের নানা ভাবে সক্রিয় উৎসাহ দেওয়া হয়, যাতে তারা উন্নত শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে সমস্তরে উঠতে পারে। অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষদের জন্যে নানা রকম রিলিফের কাজকর্ম দিয়ে পরিকল্পিত ভাবে তাদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য আনার চেষ্টা করা হয়।

মানচুকুওতে ভারতীয় সম্প্রদায় সংখ্যায় তেমন বড় নয়; খুব বেশি হলে

১৫-২০টি পরিবার মাত্র—তারা প্রধানত সিন্ধি ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর লোক—সেখানে তারা ভালোই ব্যবসা-বাণিজ্য করছে এবং আছেও ভালো। এই পরিবারগুলির মধ্যে ভুলচাঁদ ও দৌলতরাম পরিবারের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাদের পাইকারি ও খুচরো—ছ'রকম কারবারই আছে, যার মধ্যে সংসারে মানুষের প্রয়োজনীয় নানা রকম জিনিসপত্র আছে; এবং তাদের শাখা-সংস্থাও আছে দেশের বিভিন্ন অংশে-বিশেষত মুকদেন ও সিংকিং এলাকায়। উত্তর-চীনেও এরা শাখা-সংস্থা চালাচ্ছে। এরা ছাড়া ২-৩টি মাড়োয়ারি সংস্থাও আছে, যারা গানি-ব্যাগের ব্যবসা চালাচ্ছে। আমার যতদূর মনে পড়ছে, তাদের একটি সংস্থা হলো কলকাতার একটি মাড়োয়ারি কোম্পানির শাখা (Marwar & co.), এবং অপরটি হলো ওয়ালিয়া কোম্পানি (Walia & co.)। এই সংস্থা দুটি হলো বেশ চতুর কারবারি এবং স্টক-মার্কেটে তাদের বেশ প্রভাব প্রতিপত্তি আছে। সিংহলের তামিল গহনা-ব্যবসায়ীও আছে কয়েক ঘর। রাজা মহেন্দ্র-প্রতাপ ও আমার এখানে আবির্ভাবের পর, এইসব ব্যবসায়ী সংস্থা ও তাদের লোকেরা আগের চেয়ে অনেক বেশি সহজ ও স্বচ্ছন্দ বোধ করতে লাগলো। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাদের যখনি কোনো অসুবিধা হতো, প্রধানত আমিই তাদের সাহায্য করতাম।

এই ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর লোকেদের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। আমাদের প্রশাসনিক কাজে সাহায্য সহযোগিতা করা ছাড়াও, তারা রাজ্যের জাতিগত ঐক্য-দলগুলির কাজেও যোগ দিত—তাদের নিজেদের উদ্যোগেই। তারা চীনা ভাষা বলতো বেশ সহজে ও ভালোভাবেই। যাই হোক, সরকারি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ও কার্যকলাপের সুবিধা-সুযোগ ছিল আরো বেশি।

আমাদের ব্রিটিশ-বিরোধী প্রচারাভিযান ও কার্যকলাপের ক্ষেত্র ছিল প্রধানত উত্তর-চীন এবং মধ্য-মংগোলিয়ার বিভিন্ন অংশে। এবং মহেন্দ্রপ্রতাপ সহ আমি এসব অঞ্চলে বেশ ভালো রকম ঘুরেছিলাম। তারপর মহেন্দ্রপ্রতাপ জাপানে ফিরে গেলেন, আর আমি মানচুকুওতে থেকে গেলাম; এখানে থেকে আমি আরো বেশি কাজ ও ঘোরাঘুরি করতে লাগলাম—বিশেষত মধ্য-মংগোলিয়া ও চীনের মধ্যে।

মহেন্দ্রপ্রতাপের আগ্রহ এবং আমার উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল, তাঁর প্রিয় এশিয়ান-আর্মির পক্ষে সম্ভাব্য উপযুক্ত দায়িত্বপূর্ণ লোক খুঁজে বের করা ও নিয়োগ করা। আশ্চর্যের কথা, তাঁর প্রয়োজনের পক্ষে উপযুক্ত স্বেচ্ছাসেবী দু'একজন চীন ও মংগোলিয়া থেকেও পাওয়া গেল। কিন্তু তাঁর সমস্ত ধারণাটাই ছিল সময়ের অপচয় মাত্র। আর, আমার একমাত্র লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ-বিরোধী কার্য-কলাপের পক্ষে প্রয়োজনীয় এই এলাকার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও তার প্রভাব সম্পর্কে পড়াশোনা ও পর্যালোচনা করা।

পরবর্তীকালে টোকিওর জাপান সরকার দেখলো, মহেন্দ্রপ্রতাপ তাদের পক্ষে

ক্রমশ দায় স্বরূপ হয়ে উঠছেন। মহেন্দ্রপ্রতাপ তাঁর দুরূহ ব্রত যা অসম্ভব স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিতে সরকারি কর্তৃপক্ষের সাহায্য চাইতে পারেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাথমিক পর্বে জাপান যখন জড়িয়ে পড়লো, মহেন্দ্রপ্রতাপ চেয়েছিলেন তাঁর নিজস্ব একটি ভারতীয় মুক্তি-সংস্থা (ইনডিয়ান ইনডিপেনডেন্স অরগ্যানিজেশান) গড়ে তুলতে, এবং তার সদর দফতর হবে টোকিওর ইম্পিরিয়াল হোটেল। মিলিটারি হাইকমাণ্ড আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় আমার কাছে জিজ্ঞাসা করলো, ভালোমানুষ এই রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের ঐ অবাস্তব স্বপ্ন-কল্পনা সম্পর্কে কি করা যায়। কেননা, তিনিও স্থানীয় গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী মানুষজনের ও গোষ্ঠীর সঙ্গে পূর্বেকার সম্পর্কসূত্রে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন—এঁদের মধ্যে জাপানের রাজপরিবারেরও কয়েকজন ছিলেন। এঁদের কাছে মহেন্দ্রপ্রতাপ তাঁর অবাস্তব স্বপ্নকে রূপ দিতে নানারকম অসম্ভব সুবিধা-সুযোগের জন্যে চাপ দিতেন।

এমনিতেই জাপানি কর্তৃপক্ষের যুদ্ধ সংক্রান্ত নানা জরুরি সমস্যা ছিল সেদিকে ঠিকমতো মনোযোগ দেবার, অথচ দেখা গেল আমার বন্ধু মহেন্দ্রপ্রতাপ তাদের দৈনন্দিন স্বাভাবিক কাজকর্মের পথে ক্রমশ বাধা স্বরূপ হয়ে উঠছেন। আমার আশংকা হলো জাপানিরা মহেন্দ্রপ্রতাপের কোনো ক্ষতি করতে পারে ; এমনকি জাপান থেকে বের করে দেওয়ার কথাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু জাপানি কর্তৃপক্ষকে আমি আশ্বাস দিলাম, মহেন্দ্রপ্রতাপ একজন ভালোমানুষ, তাঁর লক্ষ্য কেবল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, আর কিছু নয়—কেবল তখনি মিলিটারি হাইকমাণ্ড থেকে তাঁর পক্ষে কোনোরকম ক্ষতিকর কিছু করা থেকে বিরত হলো।

কিন্তু এই সুবিধে-সুযোগের প্রতিদানে মহেন্দ্রপ্রতাপকে কিছু আপোষ করতে হলো। তাঁকে কেবল ইম্‌মপিরিয়াল হোটেলই ছাড়তে হলো না, টোকিও শহরও ছাড়তে হলো ; তাঁকে শহরতলি এলাকায় বাসা নিতে হলো। মহেন্দ্রপ্রতাপের সঙ্গে প্রথম যখন আমি তাঁর সমস্যা প্রসঙ্গে এই প্রস্তাবের কথা বলি, তখন তিনি শহর ছাড়তে খুবই অনিচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু আমি তাঁকে বোঝালাম, মিলিটারি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তর্ক বাড়িয়ে কোনো লাভ নেই। শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর অফিস গুটিয়ে নিয়ে চলে গেলেন কোকুবুনজি (Kokubunji) এলাকায়। সেখানে তাঁর আর কোনো অসুবিধে নেই। অতঃপর তিনি ভারত স্বাধীন হলে দেশে ফিরে যান। আমি এখনো তাঁকে ভালোবাসার সঙ্গে স্মরণ করি। যদিও তিনি সর্বদাই মানসিক দুশ্চিন্তার মধ্যে সময় কাটান, তবুও নিঃসন্দেহে তিনি সর্বান্তঃকরণে একজন স্বদেশপ্রেমিক এবং একজন সাহসী মানুষ। তাঁর কাছ থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি। তিনি ছিলেন অ্যাডভেনচার প্রিয়, স্বার্থত্যাগী এবং কঠোর পরিশ্রমী ; যত কষ্ট আর অসুবিধেই থাক না কেন, তিনি বিশ্বাস করতেন ভারত শীঘ্রই ব্রিটিশের শাসনশৃংখল থেকে মুক্ত হবেই।

মানচুকুওর বিভিন্ন স্থানে ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে ব্রিটিশ-বিরোধী প্রচারাভিযান

ও কার্যকলাপের জন্যে শাখাকেন্দ্র স্থাপনের পরে, আমি শুরু করলাম দাইরেনে একটি এশিয়ান কনফারেন্স সংগঠনের কাজকর্ম। একাজে গুন্টা নাগাও (Gunta Nagao) আমার সাহায্য চাইলেন এবং সংশ্লিষ্ট কাজের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই আমার ওপর দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া হলো।

আমি আমার কাজের পক্ষে দাইরেন এলাকার সবচেয়ে বড় ইয়ামাটো হোটেলকে (Yamato Hotel) উপযুক্ত স্থান হিসেবে ঠিক করলাম। আমি ইচ্ছে করেই এ জায়গা পছন্দ করেছিলাম, কারণ এর বিপরীত দিকেই ছিল ব্রিটিশ কনসুলেট অফিস। অর্থাৎ ব্রিটেন যেন জানতে পারে, বৃহৎ এক এশিয়ান কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, এবং তার সংগঠনী দায়িত্বে আছে একজন ভারতীয় সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে, অর্থাৎ সে কাজ করছে জাপানি বা মানচুকুও সরকারের অধীনে থেকে নয়, তবে অবশ্যই জাপানি সমর্থন নিয়ে।

কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হলো ১৯৩৪ সনের শরৎকালে, এবং সেই অনুষ্ঠানে এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে অন্তত ১০০ জনেরও বেশি প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ভারতীয়দের মধ্যে মহেন্দ্রপ্রতাপ ও আমি ছাড়া ছিলেন—এ. এম. সহায় (জাপান), ডি. এন. খান (হংকং) এবং ও. আসমান (শাংহাই) প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। চীনের বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিরাও ছিলেন। জাপান থেকেও কয়েকজন এসেছিলেন, তবে তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন দক্ষিণপন্থী সংস্থার সদস্য।

এই কনফারেন্স সার্থকভাবেই তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছিল—এশিয়ান ঐক্যবোধ জাগ্রত করার ক্ষেত্রে। অধিকন্তু মানচুকুও প্রদেশ দুনিয়ায় আরো বেশি পরিচিত হয়ে উঠলো। ফলে, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের মেজাজ স্বভাবতই অত্যন্ত তিরিক্ষে হয়ে উঠলো। এখানকার কনসুলেট অফিস থেকে ভারত সরকারের পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্টে রিপোর্ট করা হলো, এই কনফারেন্স অনুষ্ঠানের পেছনে আমার সক্রিয় ভূমিকার কথা—তাদের গোয়েন্দা বিভাগ থেকে আমাকে যথাসাধ্য দাগী আসামীর মতো চিত্রিত করা হলো। আমার নামে তাদের অভিযোগ ছিল, জাপানিদের অযথা উত্তেজিত করা এবং মানচুকুওর পুতুল-সরকারের পক্ষ নিয়ে এই অঞ্চলে পশ্চিমি স্বার্থবিরোধী কাজ করার। এই রিপোর্টের অনিবার্য ফল হতো, ব্রিটিশ আমলে ভারতে প্রবেশ করামাত্রই আমার গ্রেফতার ও আটক। কিন্তু আগেই বলেছি, আমি স্থির করেছিলাম, ভারত স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত আমি স্বদেশের বাইরেই থাকবো।

ভারত বিভাগ ও পাকিস্তান সৃষ্টির সময়ে, ভারত সরকারের নয়াদিল্লিস্থ কেন্দ্রীয় দফতরের কিছু গোপন দলিলপত্র ভাগাভাগি করার প্রয়োজন হয় উভয় সরকারের স্বার্থে। এই ভাগাভাগির কাজের সময় নয়াদিল্লি কর্তৃপক্ষ স্থির করে বহির্বিষয়ক মন্ত্রকের 'বিশেষ গোপন' চিহ্নিত (top secret) ফাইলগুলি সমস্তই রাখার

আর প্রয়োজন নেই। অতএব স্তূপাকৃতি ফাইলপত্র পুড়িয়ে দেওয়া হলো—এর মধ্যেই ছিল 'বিপজ্জনক ভারতীয়' (dangerous Indians) মার্কামারা ফাইলগুলির মধ্যে একটিতে আমার বিবরণ। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ভারতের স্বাধীনতার প্রাক্কালে এইভাবে বিদেশি ফাইলপত্র নষ্ট করার ফলে ব্রিটিশের নথি থেকে আমার নামও অদৃশ্য হয়ে গেল।

ব্রিটিশ সিক্রেট-সার্ভিস আমাকে 'মানচুকুও নায়ার' (Manchukuo Nair) বলে চিহ্নিত করেছিল। তাদের মতলব ছিল স্পষ্টতই ক্ষতিকর, অর্থাৎ মানচুকুও সরকারের পক্ষে আমি কাজ করছি, এটা বোঝানোই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি কোনো গভর্নমেণ্টের দ্বারাই নিযুক্ত ছিলাম না। যদিও একথা ঠিক যে, টৌকিও এবং সিংকিং, উভয় সরকারের সঙ্গেই আমার যথেষ্ট যোগাযোগ ও প্রভাব ছিল। এই উভয় সরকারের কাছ থেকেই আমি নানা রকম সুবিধা-সুযোগও পেয়েছি, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বার্থে প্রাচ্যে আমার কাজকর্মের পক্ষে। তাই, শুনতে খারাপ হলেও ব্রিটিশের দেওয়া আখ্যা একেবারে অচল নয়। আমার অনেক বন্ধু-বান্ধবও আমাকে ঐ নামে ডাকতে লাগলো, যদিও ঠাট্টাচ্ছলে এবং ভালো অর্থেই। তাদের অনেকের কাছেই আমি এখনো 'মানচুকুও নায়ার' হিসেবে পরিচিত, যদিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই মানচুকুও নামটিও বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

১৯৩৪ সেপটেম্বরে রাসবিহারী বোস মানচুকুও সফর করেন একটি বক্তৃতা উপলক্ষে; এই নতুন রাজ্যের অ্যাসোসিয়েশান অফ জাপানিজ অ্যাডভাইসার্স এর প্রেসিডেণ্ট কাজামি রিওমির (Kazami Ryomei) আমন্ত্রণে। কাজামি ছিলেন একজন বুদ্ধিজীবী এবং ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারে গভীর আগ্রহী। তিনি জাপানে এশিয়া লিগ (Asia Leaguie, Japan) সংগঠন করেন এবং তার শাখা ছিল মানচুকুওতে; উদ্দেশ্য ছিল—'এশিয়াবাসীর জন্যে এশিয়া' (Asia for Asians) এই ধারণার অধিকতর প্রসারের কাজ। তিনি একটি ভালো পত্রিকা চালাতেন, রাসবিহারী বোস সেই পত্রিকায় নিয়মিত ভাবে ভারতীয় বিষয় সংক্রান্ত নিবন্ধ লিখতেন। আমি খুশি মনে কাজামির কাজে সাহায্য করতাম। রাসবিহারী বোসের কর্মসূচি ইত্যাদি বিষয়ে দেখাশোনা করে রাসবিহারীর সঙ্গে আমি দেখা করি ৪ সেপটেম্বর সিংকিঙে, এবং তাঁর দু-সপ্তাহের সফরকালের পুরোটাই আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম; তাঁর সফর শেষ হয় দাইরেন প্রদেশে।

মানচুকুওতে রাসবিহারীর এই সফরের ফলে টৌকিওর জাপানি কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁর জনপ্রিয়তা সাময়িকভাবে কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়। প্রথমত—তিনি ভাষণ দেন পুরোপুরি জাপানি শ্রোতাদের সামনে, অথচ তাঁর বক্তৃতার সংগঠকরা আশা করেছিলেন তিনি বহুজাতিক মানচুকুওর সমাবেশে ভাষণ দেবেন। কিন্তু তাঁর আরেকটি কাজ ছিল খুব বলিষ্ঠ। তিনি খোলাখুলি ভাবেই জাপানের কিছু নীতির সমালোচনা করেন। দাইরেন থেকে জাপানে ফেরার কিছু আগে তিনি জাপানের

যুদ্ধমন্ত্রী জেনারেল আরাকির (Gen. Araki) নামে একটি টেলিগ্রাম পাঠান ; তাতে তিনি স্পষ্টতই মানচুকুওতে চীনাদের ওপর অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ করেন। এবং এই টেলিগ্রামে তিনি 'ইন্দোজিন বোস' (Indojin Bose) নামে স্বাক্ষর করেন, যার অর্থ—বোস, ভারতীয় (Bose, Indian)। টেলিগ্রামটি তিনি আমার হাতেই দেন পাঠানোর জন্যে। টেলিগ্রামটি হাতে নিয়ে একটু ইতস্তত করে বললাম—এটা কি ঠিক হলো তাঁর পক্ষে 'ইন্দোজিন বোস' বলে স্বাক্ষর করা, যখন তিনি একজন জাপানি নাগরিক। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর স্পষ্ট জবাব এলো : আমার জাপানি নাগরিকত্ব হলো বিপদমুক্তির জন্যে ; কিন্তু আমার সমস্ত চিন্তা ও কর্মে আমি একজন ভারতীয় ; অতএব টেলিগ্রামে স্বাক্ষরের দায়িত্ব আমিই নিলাম ; কিন্তু আপনি অবশ্যই নিজে টেলিগ্রাফ অফিসে যাবেন এবং দেখবেন যাতে টেলি-গ্রামটি আমার নির্দেশ অনুসারে ঠিকমতো যায়।

জেনারেল আরাকি স্বভাবতই টেলিগ্রাফ বার্তাটি তেমন পছন্দ করেন নি। কিন্তু তাতে রাসবিহারীর সামগ্রিক কার্যকলাপ ঘটিত ব্যক্তিত্ব জাপানের সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি ; তাঁর প্রতি বা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে জাপানি দৃষ্টিভঙ্গিতে সহানুভূতির কোনো অভাব হয়নি। টেলিগ্রামের কথা কালক্রমে সকলে ভুলে যায়। কিন্তু সেটা আমার পক্ষে এক বিরাট শিক্ষা। এটা ছিল আমার কাছে গীতার বাণী অর্থাৎ 'অনাসক্ত' কর্ম স্বরূপ। এই হলেন একজন মানুষ—যিনি বহিরঙ্গে জাপানি নাগরিক (technically a Japanese), কিন্তু অন্তরের অন্তস্তলে (intensely sensitive) একজন খাঁটি ভারতীয় স্বদেশপ্রেমিক, এবং নিজেকে 'ইন্দোজিন বোস' বলে পরিচয় দিতে যিনি নির্ভীকচিত্ত। এই ঘটনাটি দীর্ঘদিন আমার মনে বিশদভাবে জাগরুক ছিল। ঘটনাটি আমার মনে আরো বেশি জাগ্রত হয়ে ওঠে জাপান যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করে ; তখন আমি জাপানি হাইকমাণ্ডের কাছ থেকে ইণ্ডিয়ান ইনডিপেনডেন্স লিগের প্রেসিডেন্ট হিসেবে রাসবিহারী বোসের নির্বাচনের পক্ষে অনুমোদন লাভ করি ; এর প্রথম অধিবেশন হয় সান্নো হোটেলে (Sanno Hotel) এবং সে অধিবেশনে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে ভারতীয় প্রতিনিধিরা যোগদান করেছিলেন।

মানচুকুও থেকে আমার একবার জাপান সফরের সময়, অর্থাৎ ১৯৩৪ সনে আমি টোকিওতে মিস্টার চমনলালের (Mr, Chamanlal) সঙ্গে দেখা করি,—তখন তিনি ছিলেন দিল্লিস্থ 'হিন্দুস্থান টাইম্‌স'-এর (Hindusthan Times, Delhi) বিশেষ সংবাদদাতা। ঐ সময়ে তিনি সফররত ছিলেন তাঁর সংবাদপত্রের জন্যে কিছু নিবন্ধাদি রচনার কাজে। তাঁর সঙ্গে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের সংযোগ ছিল, এবং তাঁরা উভয়েই তখন একটি মাঝারি স্তরের পশ্চিমি কেতার হোটেলে অবস্থান করছিলেন—আজাবুর অন্তর্গত তানজুমাচিতে (Tanzumachi, Azabu)। মহেন্দ্রপ্রতাপ আমাকে খবর পাঠালেন এবং যখন আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম,

তিনি দুটি জিনিসের জন্যে আমাকে অনুরোধ করলেন—সম্ভব হলে চমনলালের জন্যে তা তাকে ব্যবস্থা করতে হবে। প্রথমটি হলো—যুদ্ধমন্ত্রী জেনারেল আরাকির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করতে হবে; দ্বিতীয়—মানচুকুও সফরের ব্যবস্থা করতে হবে পৃষ্ঠপোষকতার ভিত্তিতে, এবং সম্রাট পু-ই'র সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ সহ। এসব ব্যবস্থা করা অত সহজ ব্যাপার নয় এত অল্প সময়ের মধ্যে, তবু কথা দিলাম আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।

আমি জানতে পারলাম, জেনারেল আরাকির সঙ্গে সাক্ষাৎপ্রার্থীদের তালিকা বেশ দীর্ঘ এবং তা ঝুলে রয়েছে প্রায় দু'মাসেরও বেশি সময় যাবৎ—সাক্ষাৎ-প্রার্থীদের অধিকাংশই হলেন বিদেশি সাংবাদিক এবং আরো অনেকে। অতএব চমনলালের সাক্ষাতের সুযোগ করতে আমাকে কোনো শর্টকাট ব্যবস্থা করতে হলো। আমি, কর্নেল আইনুরার (Col. Iinura) সঙ্গে যোগাযোগ করলাম—তিনি ছিলেন মিলিটারি হাইকমাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত এশিয়া ও রাশিয়া সংক্রান্ত গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান; তাঁকে বললাম, ইন্দো-জাপানি সুসম্পর্কের নীতিতে বিশ্বাসী বিখ্যাত একটি ভারতীয় সংবাদপত্রের একজন নামকরা সাংবাদিক জেনারেল আরাকির সঙ্গে যথাশীঘ্র সাক্ষাৎকার প্রার্থী, কারণ খুব অল্প সময়ের জন্যেই জাপানে থাকবেন। আমি প্রস্তাব করলাম, যুদ্ধমন্ত্রী যদি কিছু সময় দিতে পারেন খুবই ভালো হয়—কারণ তখন তিনি ভারত সম্পর্কে তাঁর মতামত দিতে পারবেন। কর্নেল আইনুরা আমাকে 'এক মিনিট' অপেক্ষা করতে বলে আমার সামনেই ফোনে কথা বললেন জেনারেল আরাকির সঙ্গে; অতঃপর আমাকে বললেন মিঃ চমনলাল পরদিনই বেলা ১১টায় দেখা করতে পারেন জেনারেলের সঙ্গে। এটা সবার কাছেই একটা বিস্ময়কর ব্যাপার মনে হলো—কি করে একজন ভারতীয় সাংবাদিক এত অল্প সময়ের মধ্যে জেনারেল আরাকির সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেলেন—যেখানে অন্য বহুজন অন্তত কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস অর্থাৎ দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করে আছেন।

জেনারেল আরাকি ছিলেন খুবই অমায়িক, এবং তাঁর বিদেশি সাক্ষাৎপ্রার্থীদের তিনি সাধারণত যেখানে স্বল্প কয়েক মিনিটের কথা বলার সুযোগ দিয়ে থাকেন, সেখানে চমনলালের সঙ্গে প্রায় পৌনে একঘণ্টার আলোচনার সুযোগ দিলেন—খোলাখুলি প্রশ্নোত্তরও দিলেন। তিনি এক প্রশ্নের জবাবে বললেন—মানচুরিয়ায় অভিযান করতে হয়েছে জাপানকে নানা অসুবিধা ও অশান্তির হাত থেকে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে, এবং বিশেষত দারুণ অর্থনৈতিক চাপ, কাঁচামালের অভাব, সর্বোপরি জনসংখ্যা জনিত প্রবল চাপ ইত্যাদির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে। জেনারেল আরাকি বলেন—জাপান অবশ্য মানচুরিয়াকে উপনিবেশ বানাতে যাচ্ছে না। সেখানকার অধিবাসীদের সম্মতি নিয়েই সেখানে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপিত হয়েছে, এবং জাপান নিশ্চিত আশ্বাস দিচ্ছে, মানচুকুওর একতা ও সমৃদ্ধির জন্যে

সবকিছু করা হবে—সেখানকার সমস্ত জাতির সমান স্বার্থ বজায় রাখা হবে। চমনলাল তাঁর সংবাদপত্রের জন্যে এক দীর্ঘ টেলিগ্রাফিক সংবাদ পাঠালেন। অথচ চমনলালের কাছে তখন টেলিগ্রাফের খরচের টাকা, কিংবা ধারবাকি রাখার মতো প্রেস-ক্রেডিট কার্ডও ছিল না; সুতরাং আমাকেই সে ব্যবস্থাও করতে হলো।

চমনলালের মানচুকুও সফরের জন্যে হাইকমাণ্ড সমস্ত ব্যবস্থা বয়তে এবং সিং'কং পর্যন্ত যাবতীয় খরচপত্র দিতেও সম্মত হলেন। সিংকিং থেকে দাইরেন পর্যন্ত যাতায়াতের ও টোকিও ফিরে আসার ব্যবস্থা ও খরচপত্রের দায়িত্ব নেবে গোমিনসোকু কিওয়া-কাই, এই স্থির হলো। আমিও চমনলালের সঙ্গে যেতে রাজী হলাম, চমনলালও এই ব্যবস্থায় খুশি হলেন। তিনি স্বীকার করলেন, তাঁর এই সফর সার্থক হয়েছে। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকারগুলির মধ্যে সম্রাট হেনরি পু ই'র (Emperor Henry Pu-yi) সঙ্গে সাক্ষাৎকারই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য—যার ব্যবস্থাও আমিই করেছিলাম। তাঁর আলোচনার মধ্যে সম্রাটের দিক থেকে প্রধান আলোচ্য ছিল ভারতের অবস্থা বিষয়ে জানার গভীর আগ্রহ; বিশেষত মহাত্মা গান্ধীর কাজকর্ম বিষয়ে এবং তার স্বাস্থ্য বিষয়ে, সম্রাট বেশ চিন্তিত ছিলেন। এ বিষয়ে চমনলাল একটি টেলিগ্রাম প্রস্তুত করলেন গান্ধীজী সম্পর্কে সম্রাটের উদ্বেগ প্রকাশের ওপর জোর দিয়ে, এবং আমার খরচেই টেলিগ্রামটি পাঠানো হলো। সেই ছিল চমনলালের শেষ সাক্ষাৎকার গ্রহণ, এবং আমি তাঁকে দাইরেন পর্যন্ত যাবার ব্যবস্থা করে বিদায় নিলাম; অতঃপর গুনটা নাগাও-এর ব্যবস্থা অনুসারে গোমিনসোকু কিওয়া-কাই সংস্থাই চমনলালকে একটি টিকেট দিলেন কোবে হয়ে টোকিও সফরের জন্যে।

আমি মানচুকুও থাকাকালে অন্তত দু'বার সম্রাট পু-ই'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম—সেখানকার স্থানীয় প্রশাসন ও তার ভিত্তি পাঁচ-জাতের একতার মতবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নীতি ইত্যাদি নিয়ে গোপন আলোচনা প্রসঙ্গে। আমার অভিমত ছিল অবশ্যই আমার ব্যক্তিগত সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করা—এবং তা ছিল কর্তৃপক্ষের ইতিবাচক ও সদর্থক মনোযোগ ও বিচার-বিবেচনার ভিত্তিতে; মানচুকুওর অসামরিক সরকার ও কোয়ানটুং আর্মিরও তাতে সম্মতি ছিল।

একথা সকলেই জানেন, বহু পশ্চিমি দেশ সম্রাট পু-ই'কে জাপান সরকারের 'পাপেট' বা পুতুল বলে থাকে। এটা ইতিহাসের একটা ঘটনা যে, জাপানি কর্তৃপক্ষই সম্রাট পু-ই'কে ক্ষমতাসীন করেন; ১৯২২ সনে তাঁকে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়, আবার এখন মানচুকুও রাষ্ট্রের প্রধান পদে বসানো হলো। কিন্তু সম্রাট পু-ই নিজের এই অবস্থা পরিবর্তনে কোনো অসন্তোষ প্রকাশ করেন নি। তাই মনে হলো, তিনি এই নতুন ব্যবস্থা ও পরিস্থিতিতে বেশ সন্তুষ্ট, এবং নিজেকেই এই মানচুকুওর যোগ্য শাসক বলে মেনে নিলেন।

জাপানি কর্তৃপক্ষও সম্রাট পু-ই'কে সাংবিধানিক সম্রাট হিসেবে উপযুক্ত স্বীকৃতি

ও সম্মান দেয়, অবশ্যই জাপানের ঐতিহ্যগত সম্রাটের স্বর্গীয় ক্ষমতাগত ধ্যানধারণার স্বীকৃতি বাদ দিয়ে। আমাদের দুটি সাক্ষাৎকারেই সম্রাট পু-ই মহাত্মা গান্ধীর সম্পর্কে এবং ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের বিষয়ে খোঁজখবর নেন। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলেও আনন্দ পাওয়া যায়, এমন চৎমকার মানুষ তিনি। তিনি আমাকে ভারতের পক্ষে কাজ করার জন্যে এবং ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে হিসেবি কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়ার জন্যেও অভিনন্দন জানালেন।

জেনারেল ইতাগাকি ও সম্রাট পু-ই'র (Itagaki & Emperor Pu-yi) মধ্যে বেশ ভালো সম্পর্ক ছিল। এটা অনেকের কাছেই বিস্ময়কর মনে হয়েছিল, অন্তত যাঁরা মানচুকুওতে তাঁর সঙ্গে জেনারেল ইতাগাকির বিরুদ্ধে সম্পর্কের কথা জানতেন; বিশেষত তথাকথিত 'যুদ্ধাপরাধীদের' বিচারার্থে জেনারেল ম্যাকার্থার কর্তৃক দূরপ্রাচ্যের জন্যে গঠিত ইণ্টারন্যাশনাল মিলিটারি ট্রাইবুনালের সামনে পু-ই'র সাক্ষ্যদান কালে বিশেষত ইতাগাকি সম্পর্কে এবং সাধারণভাবে জাপানি কর্তৃপক্ষের নামে পু-ই'র কটুভাষায় গালি বর্ষণের কথা স্মরণ করলে অবাক লাগে। এটা আসলে দ্বিমুখী অভিযান ও আক্রমণের মতো – যা তিনি পারেন বলে আমার ধারণা ছিল না। অবশ্য, সুবিধাবাদ কোনো কোনো সময়ে সীমাহীন হয়ে থাকে। মানচুকুও সরকার যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে পরাজিত হয় ১৯৪৫ আগস্টে, সম্রাট পু-ই হলেন যুদ্ধবন্দী, এবং রাশিয়ানদের হাতে এক কনসেনট্রেশান ক্যাম্পে তাঁকে চালান দেওয়া হলো। সেখান থেকেই তাঁকে সমন দেওয়া হয় যুদ্ধাপরাধীদের বিষয়ে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত করতে। তিনি অবশ্য অনুমান করতে পেরেছিলেন বিচারকালে তাঁর সাক্ষ্যদানের ওপরেই তাঁর জীবনমরণ নির্ভর করছে।

১৩

মংগোলিয়া ও সিংকিয়াং প্রদেশে

আগেই বলেছি, ১৯৩৩ সনে আমি স্বল্প সময়ের জন্যে মংগোলিয়া সফর করেছি রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের সঙ্গে। তিনি আমার নৈতিক সমর্থন চেয়েছিলেন, এবং আরো চেয়েছিলেন আমার চীনা ও মংগোলিয়া ভাষায় জ্ঞানের সাহায্য নিতে। এশিয়ান আর্মি (Asian Army) সংগঠন পরিকল্পনা বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমার ধারণার মূলগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আমি শেষ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করতে কিন্তিত

ছিলাম। আমাদের এই সফর, যা প্রায় ছয় সপ্তাহ যাবত চলেছিল, তা ছিল আমার কাছে বিশেষ প্রয়োজনীয়। এটার প্রয়োজন ছিল, বিশেষত মহেন্দ্রপ্রতাপ কতখানি অসুবিধে ও প্রতিকূল অবস্থার মোকাবিলা করতে পারেন এবং তাঁর আশা-বাদ কতখানি অম্লান, তা দেখার জন্যে। তাঁর পরিকল্পনা কখনো ব্যর্থ হতে পারে না, তাতে অন্যেরা যত দোষত্রুটিই দেখুক না কেন, এই ছিল তাঁর ধারণা। আর, আমার পক্ষে এই সফর ছিল স্থানীয় প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া, লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করা, এবং তাদের কাজকর্মের ধরনধারণ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করা, তাদের আচারবিচার রীতিনীতি ও ধর্মকর্ম ইত্যাদি বিষয়েও কিছু জানাশোনার সুযোগ গ্রহণ করা।

এই এলাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড কারো দৃষ্টি এড়াতে পারে না। তা হলো বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মরুযাত্রীদের দ্বারা বাহিত ব্যাপক ভাবে পশমের আমদানি ; তিব্বত ও চীনের মংগোলিয়ার অভ্যন্তর প্রদেশ থেকে আসছে ও যাচ্ছে বন্দর শহর তিয়েনসিনে—যে এলাকাটি ব্রিটিশরা লিজ নিয়েছিল চীনের কাছ থেকে।

এখানে তিনটি প্রধান মরুবাহিনী ছিল : একটি আসছে তিব্বত থেকে, এবং সিংকিয়াং পথে গিয়ে মিশছে ; দ্বিতীয়টি আসছে আলা শান (Ala Shaan) থেকে, এবং তৃতীয়টি আসছে মংগোলিয়ার বেশ ভেতর থেকে। কিন্তু সব কটি রাস্তাই মিশছে পাও-তাও (Pao-tao) পথে গিয়ে। এই মরুবাহিনী ছিল বেশ দীর্ঘ, এই বাহিনীতে ছিল প্রায় কয়েক শত সহস্র বা তারও বেশি পশুপ্রাণী ; অধিকাংশই তার উট, কিন্তু বেশ কিছু সংখ্যক খচ্চরও ছিল ওরা স্বচ্ছন্দে যেকোনো পথে কয়েক হাজার মাইল চলতে পারে এবং নির্দিষ্ট সময়ে তিয়েনসিন এলাকায় মালপত্র পৌঁছে দিতে পারে। অনুসন্ধানে আমি জানতে পারি, এই পশম কিন্তু চীনের ব্যবহারের জন্যে নয়, বরং তা ইংল্যাণ্ডে চালান দেবার জন্যে—অর্থাৎ ম্যানচেস্টার ও ল্যাংকা-শায়ারের বস্ত্রশিল্পের কারখানাগুলির প্রয়োজন মেটানোর জন্যে।

আমরা এইসব মরুবাহিনীর গতিবিধির মধ্যে যা দেখতাম, মহেন্দ্রপ্রতাপের সেদিকে বিশেষ কোনো আগ্রহ বা দৃষ্টি ছিল না, কিন্তু আমি তাদের সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ নিয়ে চিন্তাভাবনা করতাম। আমার চিন্তা ছিল, এইসব পশম যেখানে উৎপন্ন হয় সেখানে সফর করার এবং এই কারবার সম্পর্কে আরো বেশি খবর জানার।

মহেন্দ্রপ্রতাপ টোকিওয় ফিরে যাবার পরে আমি আবার মানচুকুওতে থেকে গেলাম, এবং আমার বন্ধু লেঃ জেনারেল ইতাগাকির (L'-Gen. Itagaki) সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। তাঁকে বললাম, আমি আবার চীন ও মংগোলিয়া সফর করতে চাই। তিনি ভাবলেন, আমি এক ঝুঁকির মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে যাচ্ছি। কিন্তু আমার ঐ এলাকায় সফর থেকে আমি প্রচুর আত্মবিশ্বাস লাভ করেছি, যার ফলে আমি তাঁকে আমার এই সম্ভাব্য বিপজ্জনক ঝুঁকির মধ্যে

সফরের ব্যবস্থা করে সেখানে যেতে দিতে অনুরোধ-উপরোধ করতে পেরেছিলাম। ঘটনাক্রমে তিনি রাজী হলেন এবং টোকিওর সম্মতি পাওয়ার পরে আমার যাত্রা সম্পর্কে বিশদ ব্যবস্থা করে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত হলেন। যাই হোক, আমি স্থির করলাম রাস্তায় প্রয়োজনীয় হিসেবে যথাসাধ্য কম জিনিসপত্র নেবো: মাত্র কয়েকটি পশু, একজন চাকর, এবং ক্যাম্প করার পক্ষে নিতান্ত দরকারি কিছু জিনিসপত্র ও এক এলাকা থেকে আরেক এলাকায় যাওয়া ও থাকার মতো খাদ্য দ্রব্যাদি।

আগেকার সফরের সময়ে আমি দেখেছি কয়েকজন ইয়োরোপিয়ান বিশেষত ব্রিটিশ মিশনারি, যাঁরা স্থানীয় লোকজনের মধ্যে চিকিৎসাদি সেবামূলক কাজ করে থাকেন। এবং এইজাতীয় সেবামূলক কাজের মাধ্যমে এইসব মিশনারিরা স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে বেশ একটা প্রভাব ও সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন। এই এলাকায় সম্ভবত প্রতি ২৫-৩০ মাইলের জন্যে একজন করে মিশনারি থাকতেন। তাঁরা সবসময় ধর্মান্তরকরণের কাজে তেমন সার্থকতা লাভ করেন নি ঠিকই, কিন্তু তাঁদের চিকিৎসাদি সেবাকাজের মাধ্যমে তাঁরা লোকজনের কাছ থেকে যথেষ্ট সুনাম ও শুভেচ্ছা অর্জন করেছেন। তাঁরা স্থানীয় ভাষা শিখেছেন, এবং বেশ স্বচ্ছন্দেই তা কাজে লাগিয়ে থাকেন, যেমন এই তরাই অঞ্চলের লোকেরা করে থাকে; তাঁদের অনেকের সঙ্গেই স্ত্রী থাকেন এবং কয়েকজনের এমনকি মোটরগাড়িও থাকে। যাই হোক, আমার কিন্তু সন্দেহ ছিল তাঁরা তাঁদের সঙ্গে গোয়েন্দাও রাখেন, প্রয়োজন মতো বিভিন্ন দেশে গোপন খবরও দিয়ে থাকেন, বিশেষত ইংল্যাণ্ডে। সম্ভবত তাঁদের কয়েকজন মধ্য-মংগোলিয়া থেকে চীনের বণিকদের এইসব বাণিজ্যপথে ফার সরবরাহে সাহায্য করে থাকেন।

জাপানিদের কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (Zeurin Kyokai) ছিল, তারাও এই সব বাণিজ্যপথে চিকিৎসাদি ও অন্যান্য সমাজসেবা কর্মে খ্রীস্টান মিশনারিদের মতো সেবা ও সাহয্যের কাজে সাহায্য করতো; কিন্তু যেহেতু কোয়ানটুং আর্মি তখনো প্রচুর পরিমাণে জড়িত ছিল মানচুকুওতে মিলিটারি ও রাজনৈতিক সংগঠনের কাজে, তাই আমি জেনারেল ইতাগাকির কাছে আমার সঙ্গে চিকিৎসাদির কাজে প্রয়োজনীয় সেবাদল (medical unit) রাখার প্রয়োজনের কথা বলিনি। অধিকন্তু দ্বিতীয়বার চিন্তা করে আমি স্থির করলাম, আমার এই সফর আমার সীমিত উদ্দেশ্যের মধ্যে কেন্দ্রীভূত রাখাই ভালো: অর্থাৎ কিভাবে কার্যকরী উপায়ে এই প্রচুর পরিমাণ পশম ইংল্যাণ্ডে চালান দেওয়া থেকে নিবৃত্ত করা যায়।

আমার মনে হলো, এই পশম চালান দেওয়ার কাজটা যদি তিয়েনসিন এলাকা থেকেই বন্ধ করা যায়, তাহলেই ব্রিটিশ বস্ত্রশিল্প তার অসুবিধেটা ঠিক বুঝতে পারবে, এবং ব্রিটিশ অর্থনীতিকেও অন্তত সেই হিসেবে দুর্বল করা যাবে। আমার মনে পড়লো ভারতে থাকাকালে ১৯২০ সনের শেষ দিকে ও ১৯৩০-এর গোড়ার

১. শ্রীমতী লক্ষ্মী আম্মা (৮০), গ্রন্থকারের মাতা।
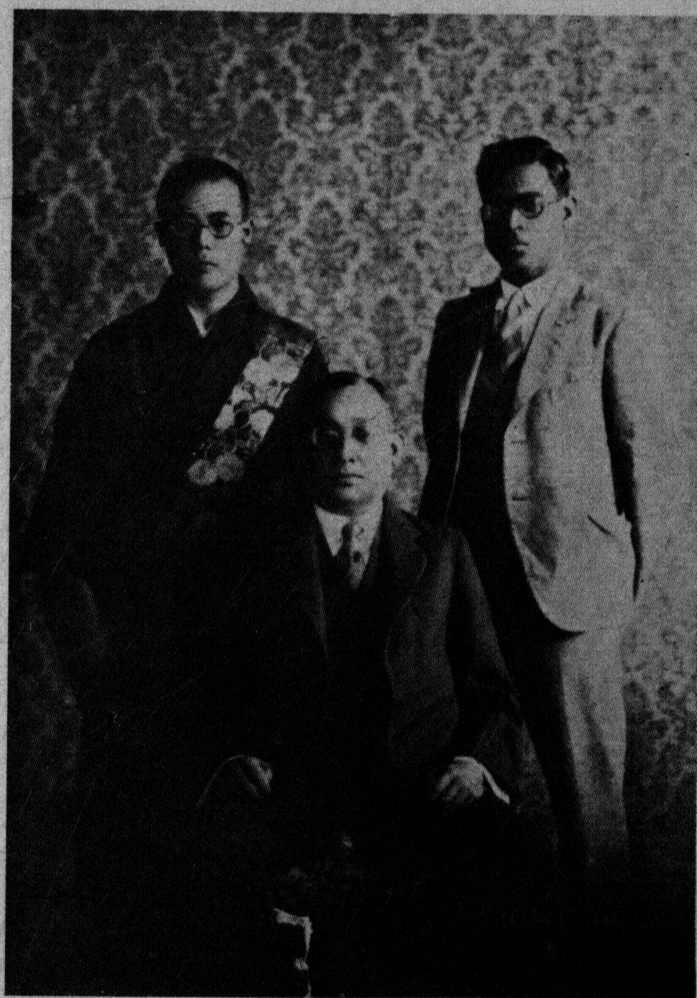
২. রাসবিহারী বোস (বসে) এবং (তাঁর বাঁদিকে) গ্রন্থকার। ১৯৩৪
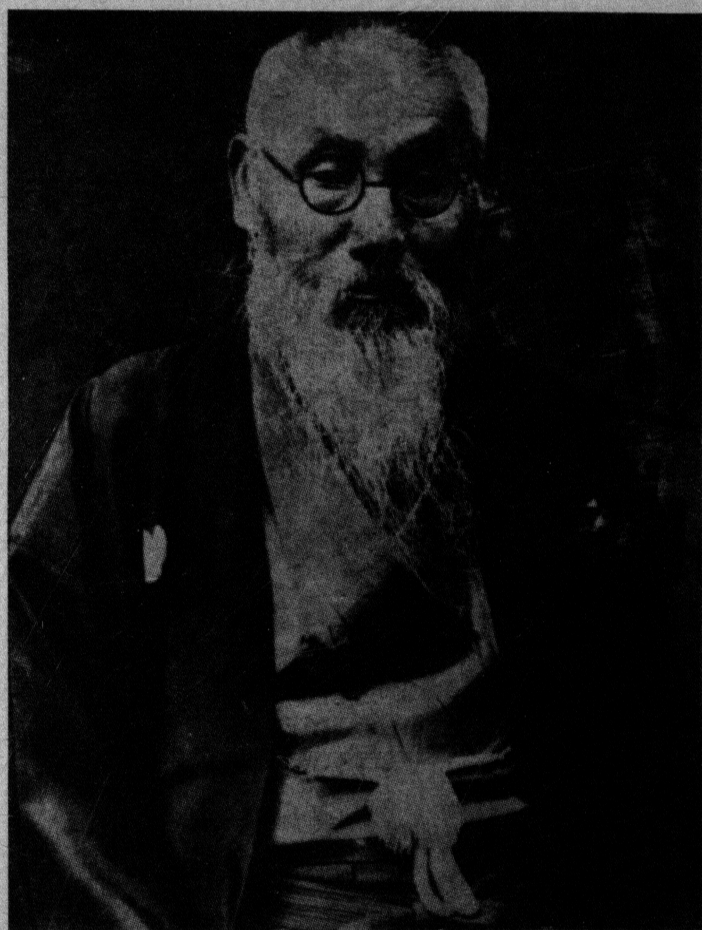
৩. মিৎশুরু টয়ামা, জাপানের চরম দক্ষিণপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতা।

৪. বৌদ্ধ লামার বেশে গ্রন্থকার (বাঁদিকে বসে)। ১৯৩৫
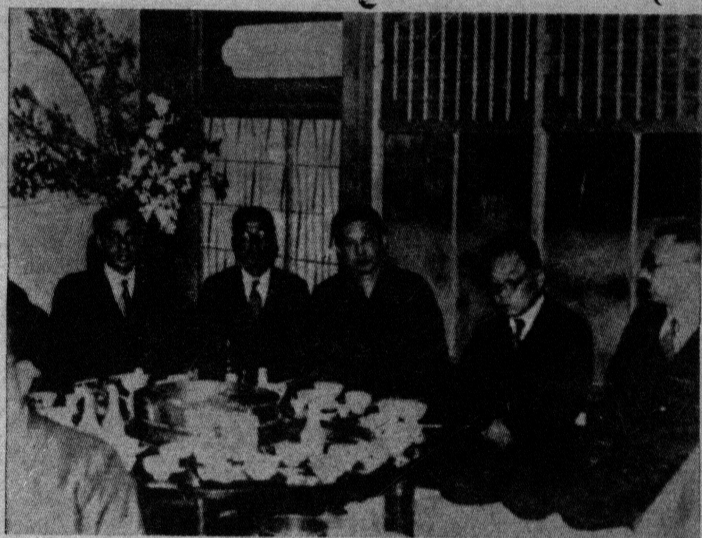
৫. ভাইয়ের সম্মানে আয়োজিত সভায় গ্রন্থকার। ১৯৩৬
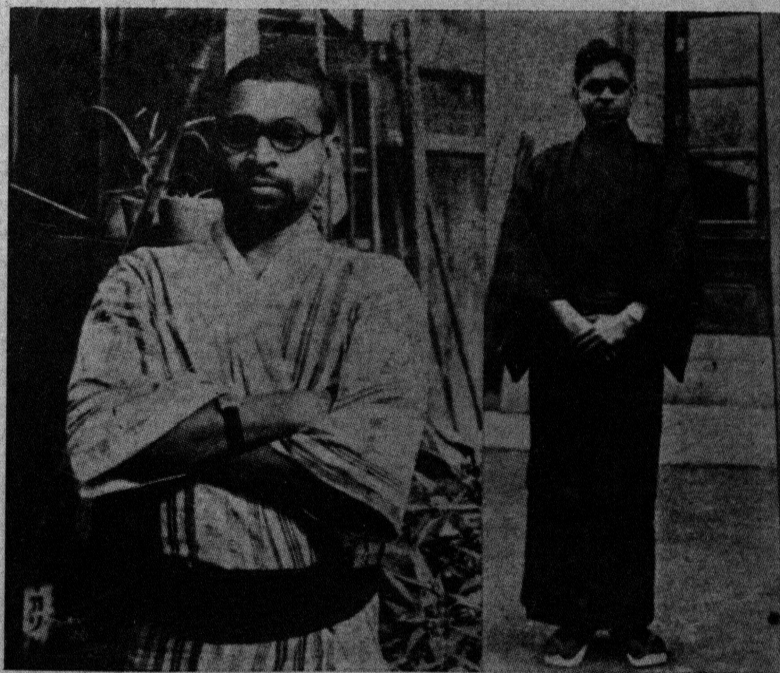
৬. বিবাহের পূর্বে গ্রন্থকারের দু'খানি চিত্র। ১৯৩৯

৭. গ্রন্থকার এবং তাঁর স্ত্রী। (বিবাহের পরেই গৃহীত)

৮. রাসবিহারী বোস এবং তাঁর স্ত্রী ও প্রথম পুত্র।

৯. রাসবিহারী বোস, ভাষণরত। টোকিও, ১৯৪২

১০. রাসবিহারী বোসের শোকসভা। (অন্যান্যদের মধ্যে আছেন জেনারেল তোজো এবং জেনারেল আরাকি)।
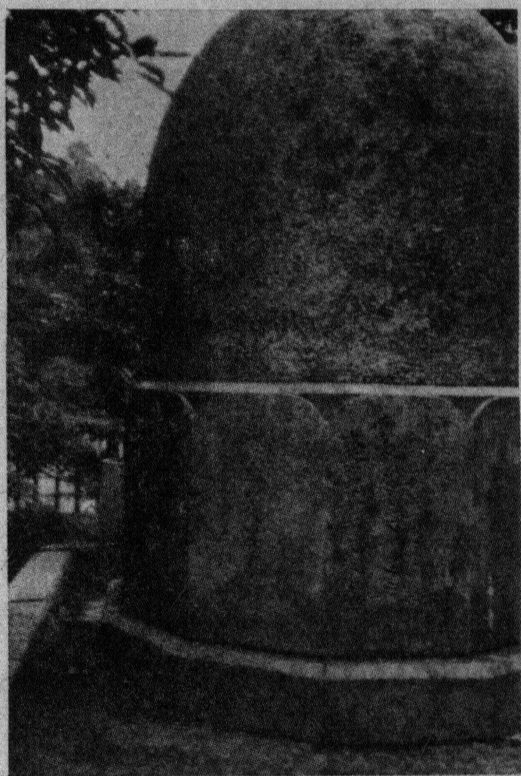
১১. রাসবিহারী বোসের পারিবারিক স্মৃতিসৌধ। টোকিও
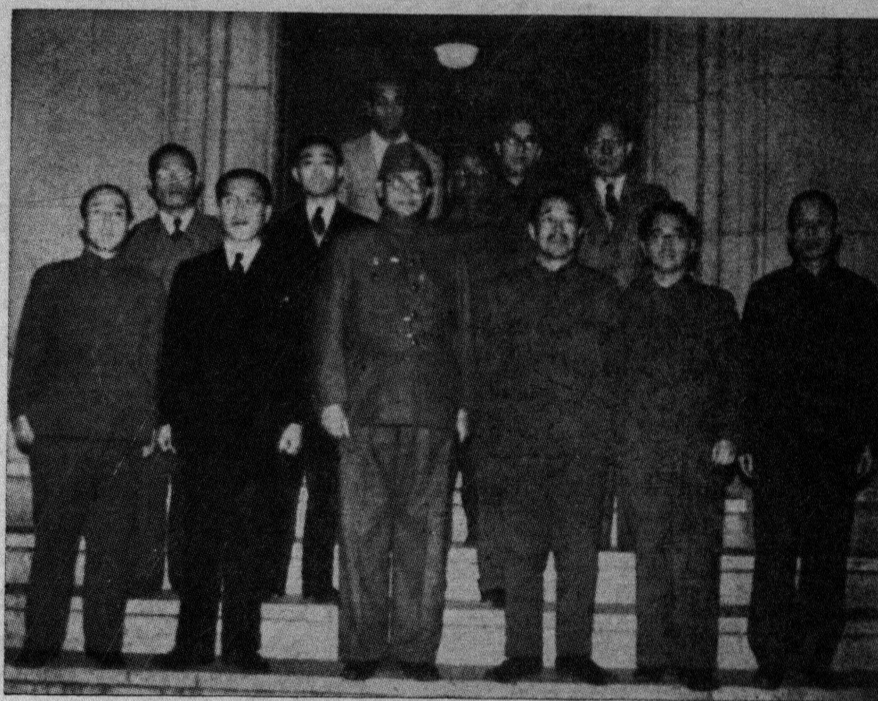
১২. সুভাষচন্দ্র বোসের সঙ্গে গ্রন্থকার। টোকিও, ১৯৪৪
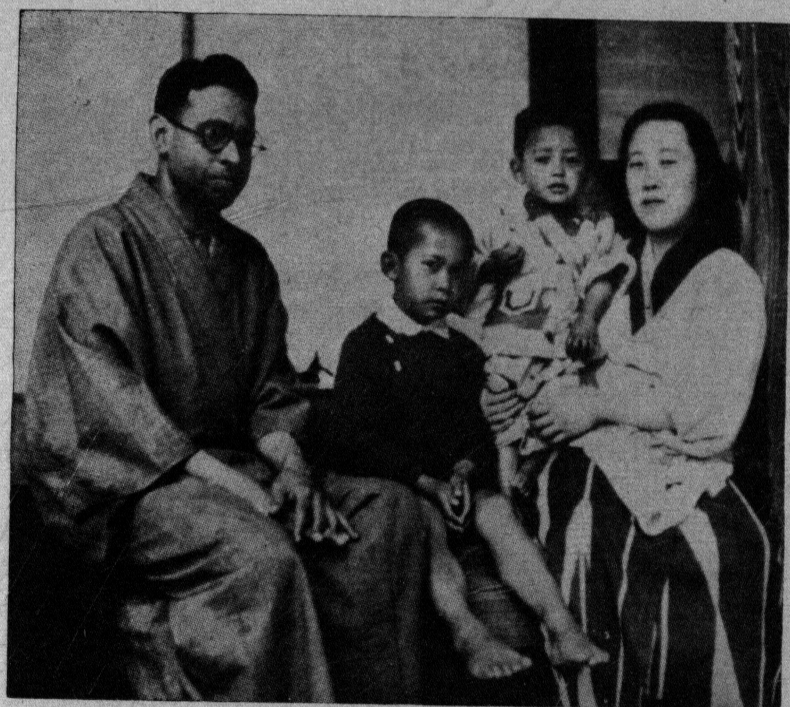
১৩. গ্রন্থকার এবং তাঁর স্ত্রী ও দুই পুত্র।
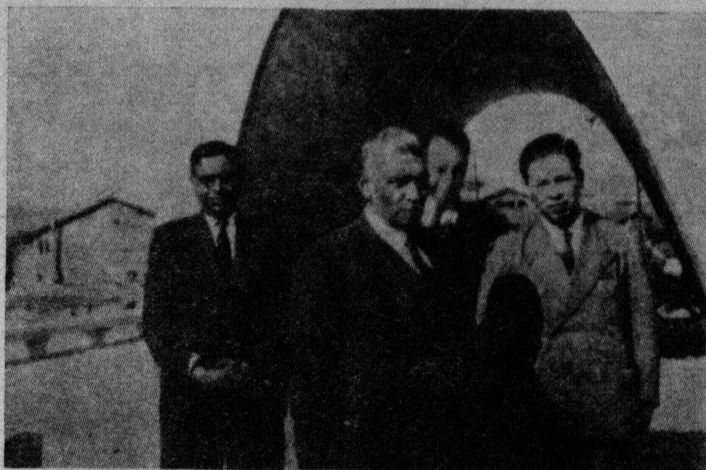
১৪. বিচারপতি ড. রাধাবিনোদ পাল-এর সঙ্গে গ্রন্থকার। ১৯৫২
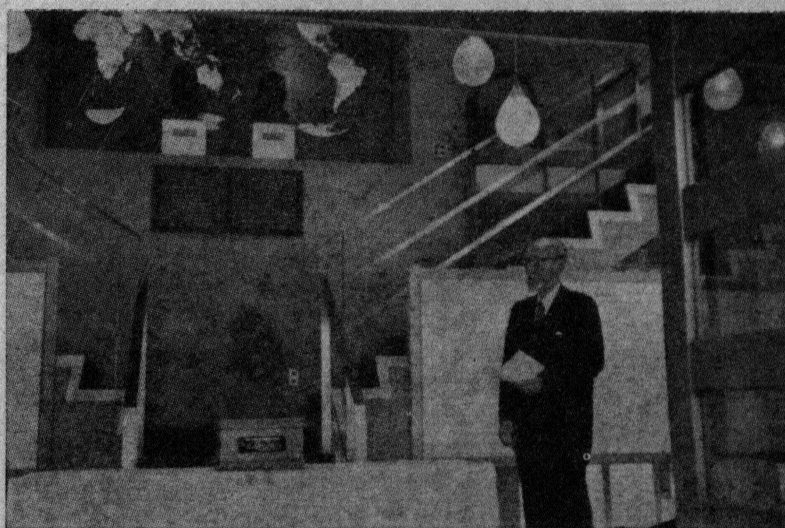
১৫. ড. থানিকাওয়া (৮৯) : বিচারপতি ড. রাধাবিনোদ পাল-এর আবক্ষ মূর্তি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে উপহার দিচ্ছেন।

১৬. গ্রন্থকার জাপান সম্রাট কর্তৃক 'অর্ডার অফ দি স্যাকরেড ট্রেজার' সম্মানে ভূষিত। (পিছনে শ্রীমতী নায়ার)

১৭. ভারতীয় রাষ্ট্রদূত অবতার সিং, পাল-শিমোনাকা হল-এর পক্ষ থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে প্রদত্ত ড. রাধাবিনোদ পালের আবক্ষ মূর্তি গ্রহণ উপলক্ষে ভাষণরত। সর্বদক্ষিণে দাঁড়িয়ে গ্রন্থকার॥
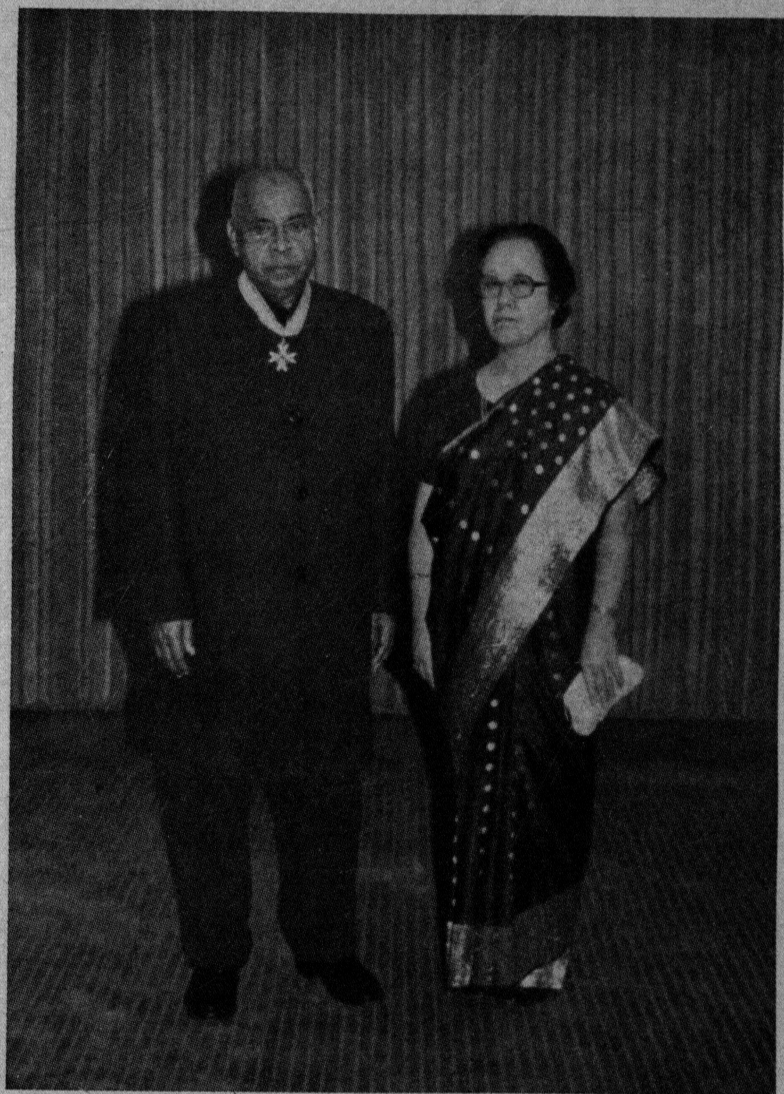
২০. গ্রন্থকার (এ. এম. নায়ার) এবং তাঁর স্ত্রী।

দিকে গান্ধীজীর নেতৃত্বে ব্রিটিশ বস্ত্রাদি ও বিদেশি জিনিসপত্র বয়কট আন্দোলনের ডাক দেওয়ার কথা। আমি নিজেও সেই আন্দোলনে যোগ দিয়ে ল্যাংকাশায়ারের মিলে তৈরি কাপড় পোড়ানোর উৎসবে অংশ নিয়েছিলাম ১৯২৫ সনে, ত্রিবান্দ্রামের সমুদ্রতীরে। এই বয়কট আন্দোলনকে কড়াহাতে দমনের পেছনে ব্রিটেনের ভয় ছিল বোধ হয় তার বস্ত্রশিল্পের ব্যবসা নষ্ট হয়ে যাবে। এবং এখন আমি নিজেই আরেকটি বড রকমের দুঃসাহসিক অভিযান করতে যাচ্ছি এই সুদূর মংগোলিয়া ও চীনের প্রত্যন্ত প্রদেশে,—কিভাবে সেই বয়কট আন্দোলনের অনুসরণে ব্রিটিশ বস্ত্রশিল্পকে আরেকটু দুর্বল করা যায়। মনে পড়ছে, আমার এই সফরের ব্যবস্থায় টোকিওর প্রতিক্রিয়ার কথা বলতে গিয়ে জেনারেল ইতাগাকি বলেছিলেন, জাপানের মিলিটারি হাইকমাণ্ড আমার সফরে সম্মতি দান কালে, এই গুরুত্বপূর্ণ সফরকালীন আমার অতি সামান্য জিনিসপত্রের প্রয়োজনের কথা শুনে তাঁরা বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

যে এলাকায় আমি সফর করতে যাচ্ছি, তা ছিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। চীন ও মংগোলদের মধ্যে জাতিগত সুপ্রাচীন সুসম্পর্কের সুযোগ নিয়ে জাপান দারুণ অস্বাভাবিক একটা ভালো অবস্থানগত জায়গা দখল করলো দক্ষিণ-চীনে, বিশেষত মানচুকুও সৃষ্টির পরে। অবস্থানগত কৌশলের দিক থেকে জাপানি আর্মি চেয়েছিল মানচুকুও এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যবর্তী অঞ্চলে একটি বাফার এলাকা। নানকিং সরকার প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ-চীনের লাগোয়া মংগোল এলাকার একটি বড অংশ কেটে নিয়ে তার নাম দিল মধ্য-মংগোলিয়া। এই মধ্য-মংগোলিয়ার অন্তর্ভুক্ত হলো নিংসিয়া, সুইয়ান, চাহার এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য এলাকা। জেহোল (Jehol) এলাকা থেকে জাপানি বাহিনী বেশ কিছু মংগোল রাজকুমারদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখার ব্যবস্থা করলো, কেননা, এই মংগোল রাজকুমারেরা তখন চীনা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে আসতে চাইছিল। এবং এইভাবে তারা তাদের চীনা-বিরোধী মনোভাব চরিতার্থ করছিল। এইসব মংগোল রাজকুমারদের মধ্যে প্রধান ছিলেন দুর্দান্ত করিৎকর্মা প্রিন্স তে-ওয়াং (Prince Teh Wang)।

মহেন্দ্রপ্রতাপের সঙ্গে মংগোলিয়ায় আমার আগেকার সফরকালে আমি এই প্রিন্স তে-ওয়াং'এর সঙ্গে দেখা করেছিলাম সুনিং নামে এক জায়গায়—যেখানে যেতে হলে মানচুকুও সীমান্তের পশ্চিমাংশ থেকে প্রায় ১০ দিন লাগে। প্রিন্স তে-ওয়াং তখন তাঁর নেতৃত্ব কায়েম করছিলেন স্বায়ত্ত শাসিত মংগোলিয়ান প্রদেশগুলিতে একটি ফেডারেশান স্থাপন করে, এবং পাই-লিং-মিয়াও (Pai-ling-miao) নামে এক জায়গায় ঐ ফেডারেশানের নতুন রাজধানী স্থাপন করে। প্রচলিত অর্থে একে ঠিক রাজধানী বলা যায় না; সেখানে রাজধানীর উপযোগী কোনো ঘরবাড়ি ছিল না, একমাত্র ইগলু-আকৃতির কয়েকটি তাঁবু আর কাদামাটির

কুঁড়েঘর ছাড়া। এই ছিল স্থানীয় মংগোল সম্প্রদায়ের সাধারণ বাসঘর : এর মধ্যে থাকতো কিছু 'গের' (Gers), যৌথভাবে তাদের বলা হতো 'আইল' (ails) ; মঙ্গোলিয়ান ভাষায় পরিচিত এইসব বাসঘরগুলি থাকতো সাধারণত উপত্যকা এলাকায়। এই এলাকাতেই আমি প্রিন্স তে-ওয়াং'এর সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা করলাম। প্রিন্স আমাকে আবার দেখে অবাক হয়ে গেলেন, কিন্তু ঠিক আগের মতোই আন্তরিক ভাবে স্বাগত জানালেন ও আতিথ্য দিয়ে তিনি আমার ব্যবহারের জন্যে একটি তাঁবুর ব্যবস্থা করলেন, এবং দেখলাম আমি যা আশা করেছিলাম তার চেয়ে অনেক ভালো ও আরামদায়ক ব্যবস্থা রয়েছে এর মধ্যে। এমনকি এর মধ্যে শীতনিবারক একটি অগ্নিকুণ্ড এবং খাবার তৈরির উনুনও ছিল। শুকনো পশুহাড়ই ছিল একমাত্র জ্বালানি, এই এলাকার অধিকাংশ স্থানেই যেমন হয়ে থাকে (এবং ভারতের কয়েকটি স্থানেও তাই), এবং এখনো সেই অবস্থাই আছে। এই এলাকায় কোনো আনাজপত্র হয় না, ফলে কোনো কাঠ বা জ্বালানিও পাওয়া যায় না।

আমাদের আলোচনা হয়েছিল মংগোলিয়ান ভাষায় – যে ভাষায় আমি বেশ ভালো-রকম দক্ষতা অর্জন করেছিলাম। প্রিন্স তে-ওয়াং ছিলেন বুদ্ধিমান, কিন্তু বাইরের দুনিয়া সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। তাঁর প্রতি আমার যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল, কেননা তিনি ঈর্ষাকাতরচিত্ত ছিলেন না। তাঁর চারপাশে ছিল তিনটি বৃহৎশক্তি : এদের মধ্যে অবশ্যই একটি হলো চীন, এবং এই বৃহৎশক্তির তিন মিলিটারি প্রধানের একমাত্র চিন্তা ছিল, তারা প্রত্যেকেই তে-ওয়াং'এর এই এলাকাটিকে নিজ নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে শাসন করবে। নানকিঙে চিয়াং-কাইশেক দেশকে একতাবদ্ধ করতে তেমন আগ্রহী বা তৎপর ছিলেন না ; রাশিয়া তাঁর বিরুদ্ধে সামরিক চাপ দিচ্ছিল বহির্মংগোলিয়ার মাধ্যমে; এবং জাপান, মানচুকুওকে সংগঠনের পরে সেখানে তার প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়ানোর সক্রিয় চেষ্টা করছিল, এবং সেই সূত্রে জাপান এসে হাজির হলো মংগোলিয়ার প্রায় সীমানা ঘেঁষে।

এখানকার একটা অতিরিক্ত সমস্যা ছিল মংগোলিয়ার সংশ্লিষ্ট চীনা রাজ্যগুলিতে কম্যুনিস্ট বাহিনীর গেরিলা কার্যকলাপ - যার নেতৃত্বে ছিলেন মাও-সেতুং। ফেং-ইউশান ছিলেন এরকম একটি সীমান্ত রাজ্যের নেতৃত্বে ; তিনি মংগোল রাজ্যের একাংশের অপরদিকে অবস্থিত সিংকিয়াং মিলিটারি গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছিলেন। এইসব পরিস্থিতির মধ্যে প্রিন্স তে-ওয়াং-'এর স্বায়ত্তশাসিত সরকার নিজেকে দেখতে পেলো পার্বত্য এলাকা পরিবেষ্টিত উইঢিবির মতো অসহায়। ম গোলদের দিক থেকে তাই চীনাদের সম্পর্কে প্রচুর ভুল ধারণার সৃষ্টি হলো, এবং রাশিয়ার আশংকা হলো মংগোলরা হয়তো তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস নষ্ট করে ফেলবে – যা মংগোলদের কাছে ছিল খুবই প্রিয়।

যখন আমি প্রিন্স তে'র কাছে এই পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে বললাম যে পরিস্থিতির মধ্যে তিনি রয়েছেন, তিনিও আমাকে বললেন এই অবস্থার মধ্য থেকে একটা

রাস্তা বের করে দিতে। আমি তাঁকে বললাম, যতই আমি তাঁকে সাহায্য করতে চিন্তিত হই না কেন, প্রকৃতপক্ষে এই মুহূর্তে সম্পূর্ণ নিরাপদ কোনো রাস্তা দেখাতে পারছি না। কেননা, জাপানিদের কোনো সম্প্রসারণবাদী মতলব নেই, একথা আমার পক্ষে বলা বোধ হয় অসংগত হবে। অধিকন্তু নীতিগতভাবে আমি ছিলাম কাউকে অযাচিত উপদেশ দেবার বিরোধী, অন্তত যাতে কেউ না ভাবে যে আমি সংশ্লিষ্ট কোনো দেশের ঘরোয়া ব্যাপারে নাক গলাচ্ছি। আমার উদ্দেশ্য ছিল, যে কোনো ভাবে হোক ব্রিটিশকে দুর্বল করা, এবং তা হবে অন্য কোনো দেশের ব্যাপারে নাক না-গলানো।

তবুও আমি প্রিন্স তে'কে বলেছিলাম, আমি তাঁকে কোয়ানটুং আর্মির চিফ-স্টাফ লেঃ জেনারেল ইতাগাকির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি—যিনি আমার একজন ব্যক্তিগত বন্ধু এবং যাঁর পরামর্শের ওপর আমি নির্ভর করতে পারি। তাঁকে আরো বললাম, আমি বলতে পারি না মধ্য-মংগোলিয়ার প্রতি জাপান সরকারের নীতিনির্দেশ কী হবে, কিন্তু আমি মনে করি লেঃ জেনারেল ইতাগাকি প্রিন্স তে-র পক্ষে কোনো অসুবিধে করবেন না। কেননা, নিঃসন্দেহে ইতাগাকি মানচুকুও সৃষ্টির ব্যাপারে গভীরভাবে জড়িত, কিন্তু তা ছিল অনিবার্য পরিস্থিতির চাপে—যাতে তাঁর কোনো হাত ছিল না: তিনি কেবল আদেশবলে কাজ করছেন মাত্র। মূলত, তিনি চান সমস্ত এশিয়ান দেশগুলিই মুক্ত হোক, যদিও পশ্চিমি সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির পক্ষে তাঁর কোনোরকম সহানুভূতিই ছিল না।

প্রিন্স তে-ওয়াং'এর কাছে আমি পরিষ্কার করেই বললাম, আমার কাজ হবে কেবলমাত্র লেঃ জেনারেল ইতাগাকির সঙ্গে যোগাযোগের জন্যে প্রয়োজনীয় পরিচয়-পত্র জোগাড় করে দেওয়া। আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত হবে একান্তই তাঁদের মধ্যে এবং কঠোরভাবে গোপনীয়। আমি তাঁকে সাবধান করে দিলাম, জেনারেল ইতাগাকি স্বভাবতই তাঁর স্টাফ অফিসারদের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারেন। যেভাবেই হোক, প্রিন্স তে-ওয়াং'এর বোঝা উচিত যে, গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক বিষয়গুলি সযত্নে ও সাবধানে চিন্তাভাবনা করতে হবে। অন্যান্য স্বায়ত্তশাসিত কেন্দ্রগুলির সঙ্গেও অবশ্যই আলোচনা করতে হবে। ফেডারেশানের চেয়ারম্যান হিসেবে তাই তে-ওয়াং'কে অন্যান্য স্বায়ত্তশাসিত কেন্দ্রগুলিকেও তাঁর সঙ্গে নিতে হবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে। আমার সবকথা শুনে প্রিন্স তে বললেন, তিনি আমার মূল বক্তব্য বুঝেছেন। আলোচনার শেষে আমি তাঁকে লেঃ জেনারেল ইতাগাকির সঙ্গে যোগাযোগের জন্যে একখানি পরিচয়পত্র দিলাম।

প্রয়োজনীয় অফিসিয়াল নির্দেশপত্র দিলেন প্রিন্স তে-ওয়াং তাঁর সমস্ত মংগোল প্রধান সেনাপতিদের কাছে, এবং বলে দিলেন আমাকে সমস্ত রকম সুবিধা-সুযোগ

দিতে, যার মধ্যে আছে : উট বা ঘোড়া, আশ্রয়, খাদ্যদ্রব্যাদি, নিরাপত্তা ইত্যাদি। আমি যাত্রা করলাম পাই-লিং-মিয়াও (Pai-ling-miao) থেকে উজিনোর (Ujino) উদ্দেশে—উজিনো ছিল শেষ মংগোলিয়ান রাজ্য—সিংকিয়াং ও চীনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মধ্য-মংগোলিয়ার পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত। এইসব নানা রাজ্যে অল্প সময়ের ক্যাম্প করার পরে শেষ পর্যন্ত আমি উজিনোয় গিয়ে পৌছলাম প্রায় ৪ সপ্তাহের মধ্যে। আগেকার 'রাজধানীগুলির' মতো, এখানকার রাজধানীও ছিল কয়েকটি তাঁবুর সমষ্টি মাত্র। কিন্তু এখানকার গভর্নর ছিলেন উল্লেখযোগ্য চমৎকার মানুষ, এবং আমি তাঁর সঙ্গ বেশ উপভোগ করেছিলাম। এবং উজিনোতে আমার ১০ দিনের অবস্থানও বেশ উপভোগ্য হয়েছিল।

আমার উজিনো যাবার পথে এবং সেখানে থাকা কালে, আমি চেষ্টা করেছিলাম স্থানীয় এলাকায় মংগোলিয়ান পশম-শিল্পের বিষয়ে যথেষ্ট পরিমাণে খবরাখবর নিতে। কিন্তু সংগৃহীত খবরের বিষয়ে এবং তার সূত্র সম্পর্কে আমি নিশ্চিত ছিলাম না। উজিনোতে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেল যে, এর প্রাচুর্যের সূত্র হচ্ছে আলা-শান (Ala Shaan) অঞ্চল, মংগোল রাজ্যের একটা বৃহত্তর এলাকা—চিংঘাইয়ের সীমান্তে অবস্থিত এবং চীনা সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। আমি নিজে এই পরিস্থিতির বিষয়ে খোঁজখবর নেবার জন্যে চিন্তিত হয়ে উজিনোর রাজার কাছে অনুরোধ জানালাম ঐ আলা শান এলাকায় আমার সফরের পক্ষে প্রয়োজনীয় সুবিধে-সুযোগ করে দিতে। তিনি চিন্তিত হয়ে আমাকে সাবধান করে দিলেন ঐ বিপজ্জনক পথের বিষয়ে—যে পথ গিয়ে মিশেছে ওপারের বিস্তীর্ণ মরুভূমির সঙ্গে, এমনকি সেই এলাকার সুদীর্ঘ দূরত্বের ও প্রশাসনিক সমস্যার বিষয়েও আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। আমি তাঁর দুশ্চিন্তার কথা বুঝলাম, কিন্তু আবার তাঁকে অনুরোধ করলাম, অন্তত যৎসামান্য সুবিধে-সুযোগও সম্ভব হলে তার ব্যবস্থা করে দিতে। তিনি খুবই বিবেচক ছিলেন বলে সেই ব্যবস্থা করতে রাজী হলেন, এবং আমার জন্যে ঠিক করে দিলেন একজন লামা গাইড, একজন সর্বক্ষণের দেখাশোনার লোক, তিনটি উট, এবং প্রয়োজনীয় ভ্রমণের জিনিসপত্রাদি। অতঃপর আমি আলা-শানের উদ্দেশে যাত্রা করলাম।

মংগোলরা সাধারণত আন্তরিক ভাবেই ধর্মনিষ্ঠ, একথা জেনেও আমি স্থির করলাম আমার পক্ষে খুবই সহায়ক হবে একজন মংগোলিয়ান লামার ধরনে ধর্মীয় জীবন-যাপনে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া—যে ধর্মীয় জীবনযাপন ছিল একজন তিব্বতী সাধুর জীবনযাপনের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাছাড়া, আরো ভালো হয় যদি ঐ ধরনের অন্যান্য লামাদের জীবনযাপনের সঙ্গেও অভ্যস্ত হতে পারি—তিব্বতে যাঁদের বলা হয় 'রিমপোচেস' (Rimpoches)—যাঁরা খুবই সম্মানিত, যেহেতু তাঁরা জীবন্ত বুদ্ধের সমগোত্রীয় অবতার হিসেবে স্থানীয় এলাকায় যথেষ্ট শ্রদ্ধা পেয়ে থাকেন। কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ছাত্রাবস্থায় আমি বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে

যথেষ্ট পড়াশোনা করেছি, তার মধ্যে এর তিব্বতী ও মংগোলীয় ভাষ্যও ছিল— যা ছিল 'রিমপোচেস'দের সম্পর্কে জানার পক্ষে সহায়ক।

একজন উচ্চশ্রেণীর লামার মতো আমার ভাবভঙ্গি ছিল নানা দিক থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্যকারী। প্রথমত—এর ফলে আমার ও চারপাশের লোকজনের মধ্যে একটা সম্পূর্ণ দূরত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠলো। আমি এটাই চেয়েছিলাম, তবে তা এজন্যে নয় যে আমি একজন স্নব (snob), বরং আমার স্বাস্থ্যের দিক থেকেই তার প্রয়োজন ছিল। স্থানীয় অধিবাসীদের জীবনযাপনের অভ্যাস আদৌ স্বাস্থ্যকর ছিল না, একথা দুঃখের সঙ্গেই স্বীকার। বলা হয়, সাধারণত মংগোলরা ও তিব্বতীরা পরিধেয় পোশাক পাল্টায় সারা বছরে মাত্র একবার কি দু'বার। হয়তো এটা অতিরঞ্জিত, কিন্তু একথা অস্বীকার করা যায় না যে, স্নানাদি ক্রিয়া তাদের মধ্যে খুব সামান্যই, সেকথা তাদের কাছে সুদূর কল্পনা, এবং তাদের দেহ থেকে যে গন্ধ বেরোয় তা অসহ্য রকমের কড়া। আবহাওয়া, জলের অভাব এবং আরো অসংখ্য নানা কৈফিয়তযোগ্য কারণ আছে, কিন্তু তাতে অসহ্য ব্যাপার সহ্য করা যায় না। সাধারণভাবে স্থানীয় ঠাট্টা প্রচলিত আছে যে, শরীর গরম রাখার একটা উপায় হলো তাদের শরীরের ঝুলন্ত পোশাকের জমা ময়লা থেকে উকুন ধরে ধরে চিবানো। মংগোলদের পোশাকের (del) সঙ্গে তিব্বতী পোশাকের (baku) সাদৃশ্য আছে।

এছাড়া, আরো একটি বিপদের বিষয়ে আমাকে সাবধান করে দেওয়া হয়। যদিও লামাদর মধ্যে কড়াকড়িভাবে কুমার-কুমারী প্রথা প্রচলিত ছিল, কিন্তু স্ত্রীলোকরা সামান্য ইঙ্গিত মাত্রেই যৌন আবেদনে সাড়া দিয়ে থাকে—তাদের যৌন-কামনা চরিতার্থ করতে। কারণ স্থানীয় স্ত্রীলোকদের বিশ্বাস, লামাদের সঙ্গে যৌন সংসর্গের সুযোগ নিয়ে তাদের কামনা তো চরিতার্থ হবেই, তাছাড়া এভাবে যে সন্তানের জন্ম হবে তারা লামাদের মতো দেখতে সুশ্রী ও খুবই বুদ্ধিমান হবে। কোনো অল্পবয়সী লামা হয়তো সহজেই এ ধরনের লোভে পড়ে সহজেই কোনো কুমারীর সঙ্গে গোপনে যৌন সংসর্গ করতে পারে। কিন্তু কোনো 'রিমপোচের' পক্ষে তা কঠিন : কেননা তাঁকে সর্বদা মর্যাদাবোধ বজায় রেখে চলতে হয়, যেহেতু সবার সামনে প্রকাশ্যেই তাঁকে চলাফেরা করতে হয়, সবার নজরেই তিনি থাকেন। ফলে, স্থানীয় কোনো স্ত্রীলোকের পক্ষেও সহজে তাঁকে অর্থাৎ রিমপোচেকে কামনার ইঙ্গিত করা, বা তাঁর কাছ থেকে কোনো যৌন সংসর্গের সুযোগ নেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না।

এইরকম একজন অবতার লামা বা জীবন্ত বুদ্ধ হিসেবে আমি খুব সহজেই কোনো স্ত্রীলোককে আমার কাছাকাছি আসতে নিষেধ করতে পারতাম! এবং তাদের পক্ষেও আমার তাঁবুতে কোনোক্রমে ঢুকে পড়া সহজ ছিল না। ফলে, আমার পক্ষেও ব্রহ্মচর্য থেকে বিচ্যুত হওয়ার কোনো আশংকা ছিল না। স্থানীয় স্ত্রীলোকদের মধ্যে

(এবং পুরুষদের মধ্যেও) যৌনরোগের ঘটনা সাংঘাতিক ভাবেই বেশি। জনৈক সুইডিশ মিশনারি আমার মংগোলিয়ায় অবস্থানকালে আগেই আমাকে বলেছিলেন : সম্ভবত সমগ্র মংগোল জাতটাই লুপ্ত হয়ে যাবে মাত্র ২।৪ প্রজন্মের মধ্যেই, এই যৌনরোগের জন্যেই – যদি প্রতিকার হিসেবে কিছু না করা যায়।

আমি স্থির করলাম, আমার সঙ্গে কোনো দেহরক্ষী রাখবো না। উচ্চস্তরের লামাদের কয়েকজন আমকে প্রায়ই সঙ্গে দেহরক্ষী রাখার জন্যে অনুরোধ উপরোধ করতেন, এবং আমার চলাফেরার সময়ে সর্বদাই আমার ওপর কড়া নজর রাখতেন। আমি ভাবতাম, জীবন্ত বুদ্ধ হিসেবে এবং ধৈর্য ও শান্তির প্রতীক হিসেবে আমার পক্ষে দেহরক্ষী রাখা অর্থহীন ; বরং আমাকেই নিজের কঠোর শৃংখলাপূর্ণ সৈনিকের মতো প্রহরী নিযুক্ত রাখতে হবে সবসময়ের জন্যে। আমার একছড়া বড় বড পুঁতির মালা ছিল (জপমালার মতো), যেটা আমি সর্বদাই কাছে রাখতাম এবং বিড়বিড় করে মন্ত্রজপের মতো বুদ্ধমন্ত্র প্রার্থনা করতাম, এমনকি আমি জানতামও না আমি কি বলছি। আমি আমার বন্ধুদের কাছে বলেছিলাম, একজন প্রকৃত লামার পক্ষে এইভাবে পুঁতির মালা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বুদ্ধমন্ত্র জপ করা সমস্ত বিপদ ও অমঙ্গল থেকে নিজেকে রক্ষা করার পক্ষে এক শক্তিশালী অস্ত্র বিশেষ।

আমি স্থানীয় লোকজনের মধ্যে বেশ কিছু অসুখ-বিসুখের চিকিৎসা শুরু করলাম। যদি তাদের মাথাব্যথা হতো, আমি তাদের নিরাময়ের জন্যে প্রার্থনা করতাম। তারা যথাসময়েই আরোগ্য লাভ করতো এবং আমাকে ধন্যবাদ দিত। যখন কেবলমাত্র প্রার্থনায় কাজ হতো না, আমি তাদের কিছু কিছু পেটেণ্ট ওষুধ দিতাম আমার থলি থেকে। আশ্চর্যের কথা, বহু অসুস্থ রোগী চটপট সুস্থ হয়ে উঠতো আমার এই হাতুড়ে চিকিৎসায়। যদি আরোগ্য লাভ না করতো, তাহলে সেইসব অসুস্থ রোগীরা তাদের রোগকে ‘কর্মফল’ (অদৃষ্ট) বলে মেনে নিত; এটা তারা জেনেছিল তাদের ধর্মশিক্ষা থেকে। তাদের শেখানো হয় যে, তাদের অবশ্যই পাপের ফলভোগ করতে হবে। বলা বাহুল্য, এ ধরনের শিক্ষার ফলে আমার পক্ষে অনেক দুশ্চিন্তা ও বিপদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব হয়েছিল, বিশেষত এই বিপদসংকুল তরাই অঞ্চলে সফরকালে ; এবং এরই মধ্যে সাহায্য-সহযোগিতার ফলেও আমি স্থানীয়ভাবে যথেষ্ট শুভেচ্ছা-সদিচ্ছার সম্পর্ক গড়ে তুলতে পেরেছিলাম।

অনেকের কাছেই আজও মংগোলিয়া এক রহস্যময় ও নির্জন এলাকা, এবং দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন – যেন গল্পের সেই শাংগ্রিলার মতো। অন্যেরা ভাবে এটি চেংঘিস খাঁয়ের দেশ – সাত শতাব্দী আগে যিনি মহা আতংক সৃষ্টি করেছিলেন সভ্য দুনিয়ার অধিকাংশ এলাকা জুড়ে, যার মধ্যে ছিল : মধ্য এশিয়া, চীন, ইয়োরোপ ইত্যাদি। তাঁর পুত্র-পৌত্রদের নিয়ে চেংঘিস খান ইতিহাসে এক বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। তারপর প্রায় ছ'শো বছর হলো মংগোলিয়ার পতন ও

বিচ্ছিন্নতার ইতিহাস। তারপর মংগোলিয়া সভ্য দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে। মধ্য-এশিয়ার এই এলাকাটি কীলকাকার বা গোঁজের মতো অবস্থান করছে সোভিয়েত রাশিয়া ও চীনের মধ্যবর্তী স্থানে। এলাকাটি এখন দুটি রাজনৈতিক শিবিরে বিভক্ত : এক, প্রাক্তন স্বায়ত্ত শাসিত এলাকা, যা মধ্য-মংগোলিয়া নামে পরিচিত এবং এখন প্রজাতন্ত্রী চীনের অন্তর্ভুক্ত ; দুই, আগে যাকে বলা হতো বহির্মংগোলিয়া, সার্বভৌম রাষ্ট্র, কিন্তু এখন সোভিয়েত প্রভাবাধীন এলাকা হিসেবে পরিচিত।

কুবলাই খান, চেংঘিস খানের তৃতীয় পৌত্র—তাঁর বাসনা ছিল ১২৭০ সনের কাছাকাছি সময়ে তিনি জাপান জয় করবেন, কিন্তু ব্যর্থ হন। জাপানিরা বিশ্বাস করেন, এটা সম্ভব হয়েছিল 'স্বর্গীয়' কারণে (Divine Wind, Kami Kaze); এক 'স্বর্গীয় বাতাস' কুবলাই খানের সমস্ত জাহাজকে জাপানি বন্দর থেকে একেবারে যেন ঝেঁটিয়ে সাফ করে দেয়। অতঃপর কুবলাই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন মহান তিব্বতী সাধু ফাগপা গিয়ালসেন-এর (Phagpa Gyaltsen) প্রভাবে। ষোড়শ শতাব্দীতে 'গ্রাণ্ড-লামা'দের তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত সোনাম গিয়াসো (Sonam Gyatso) মংগোলিয়া সফর করেন মংগোল রাজা আলতান খানের (Altan Khan) আমন্ত্রণে, এবং রাজাকে বৌদ্ধধর্মের মহাযান মতে ধর্মান্তরিত করেন 'ইয়েলো সেক্ট' (Yellow sect) সম্প্রদায় ভুক্ত করে ; তখন তাঁরা ছিলেন কোকো-নর (Koko-nor) এলাকায়। রাজা আলতান খান তাঁর 'গুরু' সোনাম গিয়াসোকে 'দালাই লামা বজ্রধর' (Dalai Lama Vajradhar, the All Embracing Lama, the Holder of the thunderbolt)—এই উপাধিতে সম্মানিত করেন। 'দালাই' (Dalai) শব্দের অর্থ 'সমুদ্র' (Ocean) ; কথাটির মূল রয়েছে মংগোল 'থালে' (Thale) শব্দটির মধ্যে। এইভাবে তিব্বত ও মংগোলিয়ার ধর্মীয় সংস্কৃতির মূলের সন্ধান পাওয়া যায় ভারতে—যেখান থেকে বৌদ্ধধর্ম বিস্তারলাভ করেছে দুনিয়ার অন্যান্য দেশে।

বুদ্ধদেবের দেশের মানুষ হিসেবে আমার বিশেষ একটি সুবিধা ছিল। যে মংগোল-দের সংস্পর্শে আমি এসেছিলাম তারা আমার 'লামা' হিসেবে পরিচয় পেয়ে বেশ অভিভূত হলো, এবং আমাকে 'ধরম রিমপোচে' (Dharm Rimpoche) বলে স্বীকৃতি দিল—যার অর্থ সমস্ত গুণের অবতার, অতএব একজন অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। ফলে, এমনকি আমার পরবর্তী গন্তব্যস্থানে পৌছানোর আগেই খবর চলে যেত বিভিন্ন স্থানে এই বলে যে, 'ধরম রিমপোচে' যাত্রাপথে চলেছেন এবং তাঁকে যেন প্রয়োজনীয় সমস্ত রকম সাহায্য-সহযোগিতা দেওয়া হয়। এটা খুবই আশ্চর্যের কথা, কি করে এত জলদি চারদিকে খবর পৌছে যায়, যেখানে ডাকের, টেলিগ্রাফের বা রেডিওর কোনোরকম অস্তিত্বই নেই।

আলা-শান এলাকায় আমার সফর ছিল দারুণ ভয়ংকর ধরনের। উজিনো থেকে

রাজ্যের রাজধানী পর্যন্ত (আলা-শান নামেও পরিচিত) আমার সফরের আনুমানিক সময় ছিল দু'সপ্তাহের মতো। এই গোটা সফরকালে দেখার কিছুই ছিল না, একমাত্র সীমাহীন বিস্তীর্ণ বালুকাভূমি ছাড়া। এমনকি ঠিকপথে যেতে হলেও গাইডদের ওপর নির্ভর করতে হবে। এইসব গাইডরা অসাধারণ লোক। সামান্য কিছু কল্পনাশক্তি আর অভিজ্ঞতার সাহায্যে তারা বিস্তীর্ণ মরুভূমির মধ্যে চলাফেরা করতে আর পথ দেখাতে পারে—ঠিক যেন জাহাজের ক্যাপটেন বা বিমানের পাইলট তার কম্পাস ও কমপিউটার ইত্যাদি জটিল যন্ত্রপাতির সাহায্যে করে থাকে। সম্ভবত উটকে সংগতভাবেই 'মরুভূমির জাহাজ' (ship of the desert) বলা হয়ে থাকে—কেননা, এদের দেহাভ্যন্তরেও বোধ হয় প্রকৃতিগত ভাবেই একটা গাইড-ব্যবস্থা গড়ে ওঠে এবং চালু থাকে দেহের ভেতরকার প্রবৃত্তিবশে। এইজন্যেই তাদের মরুভূমির জাহাজ বলা হয়। তারা তাদের প্রবৃত্তিবশে গাইডদেরও বলে দিতে পারে কখন বাতাস আসছে, বাতাসের গতিপথ কোনদিকে, বাতাসের বেগ, বাতাসের সম্ভাব্য স্থিতিকাল ইত্যাদি—যার ফলে ভয়ংকর বালিয়াড়ি পথ এড়িয়ে চলা যায়।

সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, একটি মাত্র জলের উৎস একটি কূপ খুঁজে বের করা—যেটা অবস্থিত রয়েছে উজিনো এবং আলা-শানের মাঝপথে কোথাও। আমাদের অবশ্যই সেই সঠিক স্থানে পৌঁছতে হবে এবং অষ্টম দিনে তা খুঁজে বের করতেই হবে, যেহেতু আমরা যাত্রাস্থান থেকে যেটুকু জল সঙ্গে এনেছিলাম তা সবই ঐ সময়ের মধ্যে ফুরিয়ে যাবে। উটের বাহিনীতে যেটুকু জমা থাকার কথা তা অবশ্যই জমা রাখতে হবে এবং জলবহনকারীদের সাহায্যে আগামী সপ্তাহের মতো আবার জল সংগ্রহ করতে হবে। যদি কোনো কারণে দুর্ভাগ্যবশত মাঝপথের সেই কূপটি খুঁজে না পাওয়া যায়, তাহলে সঙ্গের প্রাণী ও মানুষগুলোকে অবশ্যই জলতেষ্টায় মরতে হবে—গন্তব্যস্থানে পৌঁছানোর আগেই। সুতরাং সেই সংকটময় অষ্টম দিনে, সেই মরুপথের অন্যান্য যাত্রীদের মতো আমি, আমার গাইড ও সহচরটি—সবাই মিলে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলাম ; তিনি কৃষ্ণ, বুদ্ধ, আল্লা যেরূপেই বিরাজ করুন না কেন, তিনি আমাদের যেন সঠিক পথে চালিত করেন জলের উৎস সেই কূপের দিকে।

আমরা সত্য সত্যই ধন্যবাদ দিলাম সর্বশক্তিমানকে, যখন দেখলাম আমাদের প্রার্থনার ফল ফললো। সন্ধ্যার দিকে আমরা সঠিক জলের জায়গা সেই কূপটি খুঁজে পেলাম কূপের মুখ থেকে কাঠের তক্তাযুক্ত আবরণী সরিয়ে ফেললাম (এরকম আচ্ছাদনের বিশেষ প্রয়োজন বালিতে বুজে যাবার হাত থেকে বাঁচনোর জন্যে) এবং দেখতে পেলাম সেই জীবনদায়ী তরল পদার্থকে, অতঃপর সেখানেই তাঁবু খাটালাম। জলভর্তি করা শেষ হলো এবং আমরা পরদিনই আবার যাত্রা শুরু করলাম ; গাইডের সঠিক সাহায্যে আমরা আরেক সপ্তাহের মধ্যেই আলা-শানে পৌঁছলাম।

এইভাবে প্রায় ১৫ দিন আমাদের কাটলো নানা অসুবিধের পথে - তারপর পৌঁছলাম নীলাকাশের রাজ্যে - যা ছিল এককালে চেংঘিস খানের। দিনের বেলায় সূর্য আর তপ্ত বালি ছিল আমাদের নিত্যসঙ্গী ; রাত্রিবেলায় ছিল চাঁদ আর নক্ষত্র, তাদের সমস্ত সৌন্দর্য নিয়ে। কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বড ভরসা বা শক্তি ছিল নিঃসন্দেহে আমাদের ভিতরের প্রাণশক্তি, আর উপরে ঈশ্বর।

আমি আলা-শানে ছিলাম ১০ দিন। খুব সহজেই আমি পেতাম সমস্ত সংবাদ যখনি যা প্রয়োজন হতো। সব সময়েই খুব একটা নতুন খবর কিছু পেতাম না, কিন্তু সঠিকভাবেই জানতে পারলাম, প্রায় অবিশ্বাস্য রকমের প্রচুর পরিমাণে পশম আলা-শান থেকে পাঠানো হতো উটবাহিনীর সাহায্যে পাও-তাও (pao tao) ঘাঁটিতে, এবং আগেই বলেছি, এখান থেকে চালান যেত তিয়েনসিন বন্দরে - সেখান থেকে জাহাজভর্তি হতো ইংল্যাণ্ডের উদ্দেশে।

আমি স্থানীয় রাজার সঙ্গে দেখা করলাম বেশ কয়েকবার। তিনি প্রথমেই বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেলেন একজন ভারতীয় লামার দুঃসাহসের কথায়—যে নাকি এক পক্ষকালের যাত্রার ঝুঁকি নিয়ে এমন ভয়ংকর এক মরুপথে পাড়ি দিয়ে এই দুর্গম এলাকায় এসে পৌঁছেচে। যাই হোক, তিনি বেশ বন্ধুবৎসল এক মজাদার মানুষ এবং আমার অনুরোধে আমাকে নতুন একজন গাইড দিলেন, একজন স্থানীয় সর্দার এবং নতুন একপ্রস্থ উটবাহিনী - ফিরতি যাত্রার জন্যে। উজিনোর সেই পথ আবার খুঁজে বের করা যেমন জটিল সমস্যাপূর্ণ, তেমন ছিল সামনের দুর্গম যাত্রাপথ ; কিন্তু আমরা নিরাপদে উজিনোয় পৌঁছলাম এবং সেখান থেকে আবার ফিরে এলাম পরবর্তী দু-সপ্তাহের মধ্যেই।

ইদানিংকালের গুজব থেকে আমি শুনেছি, চীন সরকারের একটি নিউক্লিয়ার-অস্ত্র পরীক্ষার গোপন ঘাঁটি আছে এই মরুপথের কোথাও - যে পথে আমি যাতায়াত করেছি ১৯৩৫ সনে।

উজিনোর রাজা আরো আশ্চর্য হলেন আমাকে দেখে, অন্তত আলা-শানের রাজার চেয়ে। কিন্তু আমাকে নিরাপদে ফিরে আসতে দেখে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন, যেহেতু আমি জীবিত এবং অক্ষত আছি। তিনি অনুরোধ করলেন আমি এখন যেন কয়েকদিন বিশ্রাম করি, তাঁর সঙ্গে মাজোং (Majong) খেলা করি। আমি সেই খেলার সঙ্গে পরিচিত ছিলাম ; খেলাটা জাপান চীন ও মানচুকুওতে খুবই জনপ্রিয়, এবং সেই খেলায় আমি বেশ দক্ষতা অর্জন করেছিলাম। উজিনোর রাজা কিন্তু সেই খেলায় খুব একটা পারদর্শী ছিলেন না, এবং আমি ইচ্ছে করলে খেলায় প্রতিবারই তাঁকে হারাতে পারতাম। কিন্তু রাজাকে সব সময় হারানো উচিত নয়। বরং নিজেই বেশির ভাগ সময়ে হেরে যেতে হবে, অন্যথায় তা হবে

অভব্যতা। কিন্তু প্রতিপক্ষ যাতে বুঝতে না পারে যে আমি ইচ্ছে করে হেরে যাচ্ছি, এমনভাবে খেলতে আরো বেশি দক্ষতার প্রয়োজন। তবে আমি উপযুক্ত কৌশলে খেলছিলাম, আনুষঙ্গিক ভাবভঙ্গি আর আওয়াজ করছিলাম, যাতে মনে হয় রাজা নিশ্চিত জিতে যাবেন বিপুলভাবে। রাজাও খুশি হতেন।

আমার খুব ইচ্ছে হলো একবার সিংকিয়াং সফর করবো, বিশেষত হামি ও উরুমচি (Hami and Urumchi) এলাকায়, অন্তত দুটি কারণে। প্রথমত — আমরা চেয়েছিলাম এই পশম-শিল্প বিষয়ে আরো কিছু খবর সংগ্রহ করবো — যে পশম-শিল্পের জন্যে এই চীনা প্রদেশটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি হিসেবে চিহ্নিত। দ্বিতীয়ত — আমি এই এলাকার রাস্তাঘাটের গতিপথ নিয়ে চিন্তিত ছিলাম, কেননা এখানকারই কোনো একটি পথ নিশ্চয়ই চলে গেছে হিমালয় পার হয়ে ভারতে। আমার যৌবনোচিত উৎসাহে, আমি চিন্তা করলাম বৌদ্ধ পরিব্রাজক চীনের ফা-হিয়েন ও হুয়াং-সাং'এর কথা, বিখ্যাত আবিষ্কারক ভেনিসের মার্কো-পোলো, সুইডেনের স্বেন হেডিন (Sven Hedin) এবং অন্যান্যদের কথা। তাঁরা তো একাজ করতে পেরেছেন, আমি কেন পারবো না ?

আমি রাজার কাছে একথা বললাম। তিনি আমার এতখানি আশাবাদের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু যথেষ্ট সহৃদয়তার সঙ্গে তিনি আমার প্রয়োজনীয় কয়েকটি পশু, একজন ভৃত্য এবং অন্যান্য জিনিসপত্রের ব্যবস্থা করে দিলেন। তিনি আমাকে সাবধান হতে বলে দিলেন বারবার, যেহেতু এই যাত্রা খুবই বিপজ্জনক। তিনি আমার জন্যে একজন সশস্ত্র প্রহরীর ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি একজন লামা হিসেবেই যাত্রা করতে চাইলাম এবং তাই কোনো রকম বিশেষ পাহারার ব্যবস্থা করতে নিষেধ করলাম। অবশ্য আমার এই অতি আস্থার জন্যে পরে আপশোষ করতে হয়েছিল।

এযাত্রায় এই পথ ছিল অধিকাংশই মালভূমি এলাকা। কিন্তু এপথে ছিল উঁচু পর্বতমালা, তাদের মধ্যে কয়েকটির উচ্চতা প্রায় ১৫ হাজার ফুট বা তারও বেশি। সিংকিয়াং যদিও মূলত অনুর্বর ভূমি, কিন্তু দৃশ্যত সুন্দর এলাকা। গোবি মরুভূমি বা আলা-শান অঞ্চলের বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ি এলাকার তুলনায় সিংকিয়াঙের এই এলাকা একেবারে বিপরীত প্রকৃতির। এই মরুযাত্রাপথ চলে গেছে রুক্ষ তরাই অঞ্চল পর্যন্ত — যার কিছু অংশ চলে গেছে বিপজ্জনক ভাবে দুর্গম পাহাড়চূড়ার নিচে দিয়ে — যেখানে রুক্ষ বাতাস গর্জন করে ফিরছে এবং বাতাসের চাপে এই রাস্তার মাঝে মাঝে বিশাল সুড়ঙ্গ আর গহ্বরগুলি আরো বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। এবং এসব জায়গায় মানুষের গলার আওয়াজ এমনভাবে প্রতিধ্বনিত হয়, যেন একশো মাইল দূর থেকেও শোনা যায়।

এই যাত্রাপথের কয়েকটি জায়গা ছিল বিশ্বাসঘাতকের মতোই বিপজ্জনক, কিন্তু উটেরা হলো আশ্চর্য ভাবে দৃঢ় প্রত্যয়যুক্ত প্রাণী। আমার মরুবাহিনীটি ছিল

ছোট, এই বাহিনীতে ছিল মাত্র তিনটি প্রাণী। কোনো কোনো সময়ে আমরা দু'দিন পর্যন্ত চলার পরই তবে কোনো জনবসতিপূর্ণ গ্রামে পৌঁছতে পেরেছি। আমরা একেক সময় চলেছি তো চলেছি, একটানা প্রায় ১২ মাইল চলেছি এক-বারে—মরুপথের অন্যান্য যাত্রীদের মতোই। এবং এইভাবে প্রায় দু-সপ্তাহ চলার পর মনে হলো, আমরা হামি অঞ্চলের কাছাকাছি এসেছি—যে এলাকা ছিল সিংকিয়াঙে আমার প্রথম আকর্ষণীয় কেন্দ্র। সেখানেই আমরা প্রথম বিপদের মুখে পড়লাম।

মংগোলিয়ান এলাকার পর থেকে আমার যাত্রা ছিল শান্তিপূর্ণ। এই এলাকায় কোনো চোর-ডাকাত বা ঠগের উপদ্রব ছিল না, অন্তত ব্যবসায়ী বা মরুযাত্রী লামাদের কোনো হয়রানি হয়নি। কিন্তু সিংকিয়াং অঞ্চলে চোর-ডাকাত বা ঠগের উপদ্রব ঠেকাতে কোনো কড়া শাসন ছিল না। সশস্ত্র প্রহরী ছাড়া এ অঞ্চলে যাত্রীদের কোনোরকম নিরাপত্তা ছিল না। অবশ্যই কিছু চোর-ডাকাত লক্ষ্য করেছিল, আমার ছোট মরুবাহিনীতে সশস্ত্র পাহারার কোনো ব্যবস্থা ছিল না।

যে মুহূর্তে আমার দলবল হামিতে পৌঁছে প্রথম সন্ধ্যাতেই তাঁবু গাড়লো, এক জন চীনা দস্যু বেয়োনেট লাগানো একটি বন্দুক নিয়ে আমাদের তাঁবুতে ঢুকে পড়লো এবং আমার ভৃত্যটিকে বললো তাকে অনুসরণ করতে। অবাক হয়ে আমি সেই অনুপ্রবেশকারী লোকটিকে বললাম, ব্যাপারটা কী হচ্ছে। লোকটি আমার দিকে একবার তাকালো মাত্র. কোনো জবাব দিল না, কিন্তু আমার ভৃত্যটিকে আবার হুকুম করলো তার সঙ্গে সঙ্গে যেতে। ভৃত্যটি আতংকিত হয়ে কাঁদতে শুরু করলো চিৎকার করে এবং আমার সাহায্য চাইলো।

আমার যাত্রাকালের তিন মাসের মধ্যে আমি এরকম পরিস্থিতির মধ্যে কখনো পড়িনি। কিন্তু এখানে এই বন্দুকবাজ চীনার চাহনি দেখে বুঝলাম, একটা কিছু ভুলত্রুটি হয়েছে। একঘণ্টা পরে আরেকজন চীনা এলো এবং—নিজেকে পরিচয় দিল মিঃ লো-পিং ফু (Mr. Low-Ping Fu) বলে। লোকটি অস্বাভাবিক লম্বা সুন্দর, এবং ইংরেজি বলছিল। লোকটি বললো সে একজন সাধারণ যাত্রী, যাচ্ছে তিব্বতের দিকে। কিন্তু ভেবে আমার অবাক লাগলো, সে বোধ হয় একজন সিকিউরিটি অয়ারলেস অপারেটার অথবা একজন মেকানিক, এবং আমি তাকে বোধ হয় কোনো উপলক্ষে দেখেছি মংগোলিয়ায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে লোকটা কে তা জানার কোনো উপায় ছিল না, অতএব সে যা বললো তাই শুনতে হলো। লোকটা বললো যে, একজন কুখ্যাত ঠগী আমার ভৃত্যটিকে পাকড়াও করেছে এবং

পরদিন তাকে ফাঁসি দেবে ; এবং আজ রাত্রেই সেই ঠগীটি আবার আসবে আমাকে ধরতে ও আমার ভাগ্যে কী আছে তাই ঠিক করতে।

এটা খুব গোলমেলে ব্যাপার হলো। কে হতে পারে এই লো-পিং ফু, এবং কী তার বক্তব্য ? এবং কি করে সে এই ঠগীটির কথা এবং আমার ভৃত্যটিকে ফাঁসি দেওয়ার মতলবের কথা ইত্যাদি জানলো ? যেভাবে হোক আমার মনে হলো, লোকটি বোধ হয় একজন ওয়ারলেস টেকনিসিয়ান, অপারেটার নয় (কারণ কোথাও আমার অ্যান্টেনা নজরে পড়লো না)। চিন্তাটি আমার মনে অনেকক্ষণ ছিল। কিন্তু শীঘ্রই আমার সন্দেহ হলো, লোকটি হয়তো ঠগীটির একজন সঙ্গী—যে ঠগীটি আমার ভৃত্যটিকে ধরে নিয়ে গেছে। মিস্টার ফু হঠাৎ কথাবার্তার মধ্যেই আমাকে জিজ্ঞাসা করলো—আমার সঙ্গে কত 'ইউয়ান' (Yuan, চীনা রৌপ্যমুদ্রা, তৎকালীন মূল্য আমাদের প্রায় ৩টাকার সমান) আছে ? আমি বললাম, আমার সঙ্গে ৫০টি মুদ্রা আছে ; বলার পরই আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম, কেন লোকটি একথা জিজ্ঞাসা করছে। লোকটি তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল, আবার অল্পক্ষণের মধ্যেই ফিরে এলো এবং আমাকে বললো, সে আমাকে বাঁচাতে আগ্রহী এবং তাই সে ঐ ঠগীটির সঙ্গে কথা বলে একটা আপোষরফা করবে। এটা একটা খুবই দুঃখের বিষয়, সে বললো—আমার মতো একজন 'খাঁটি লামা'র ক্ষতি করবে একজন ঠগী এটা ঠিক নয়, তাই সে আমাকে বাঁচানোর ঝুঁকি নেবে, যদি আমি আমার সঙ্গের ঐ ৫০ মুদ্রাই তাকে দিয়ে দিই।

আমি কিছুক্ষণের জন্যে চিন্তা করলাম, এবং মনে পড়লো বিখ্যাত এক মালয়ালম কবির কথা, যিনি বলেছেন - মানুষের অধিকাংশ দুর্দশার কারণই হলো—অর্থ আর স্ত্রীলোক। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমার সঙ্গে কোনো স্ত্রীলোক জড়িত নেই, আছে আমার সঙ্গে কিছু অর্থ। অতএব মনে মনে লোকটির কথায় রাজী হলাম এই ভেবে যে, সিংকিয়াঙে এসে এভাবে জীবন বিপন্ন করার চেয়ে বেঁচে থাকাই ভালো। এবং নিজেকে সান্ত্বনা দিলাম এই ভেবে যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে বীরত্ব দেখানোর চেয়ে লোকটির কথায় রাজী হওয়াই ভালো। অতএব আমার সঙ্গের ৫০ মুদ্রাই মিঃ ফু-কে দিয়ে দিলাম। কিন্তু ঐ সময় যখন আমি তার কাছে সিংকিয়াং প্রদেশে আরো এগিয়ে যেতে সাহায্য চাইলাম, সে অস্বীকার করলো, এবং লোকটি জোর দিয়ে বললো আমাকে অবশ্যই 'ফিরে যেতে' হবে—এগিয়ে নয়। এই কথাতেই আমি নিশ্চিত হলাম, এই মিঃ ফু নিশ্চয়ই আগের ঐ ঠগীটির সর্দার। শেষ পর্যন্ত আমি তাকে অনুরোধ করলাম আমার চীনা ভৃত্যটিকে জীবন্ত ফিরিয়ে দিতে, কিন্তু তাতেও লোকটি অস্বীকার করলো। গভীর মর্মাহত হলাম এই ভেবে যে, আমার বিশ্বাসী ভৃত্যটিকে তার অত্যাচারীর হাত থেকে বাঁচাতে পারলাম না, এবং ব্যর্থ হয়ে আমি আবার ফিরে চললাম সেই উজিনোর পথে।

সিংকিয়াঙের হামি ও উরুমচি অঞ্চলে যাওয়া এবং সেখান থেকে তিব্বতের দিকে

যাওয়ার পরিকল্পনা এভাবে ব্যর্থ হওয়া, বোধ হয় আমার পক্ষে একটা দারুণ হতাশার কথা। আমি একথা উজিনোর রাজার কাছে গিয়ে বললাম। তিনি খুব সহানুভূতি দেখালেন কিন্তু দুঃখ প্রকাশ করলেন এই বলে যে, আমি তাঁর উপদেশে কর্ণপাত করিনি। প্রকৃতপক্ষে আমি আরো দুঃখিত হলাম এই ভেবে যে, আমি আমার জপমালার ওপর খুব বেশি নির্ভর করেছিলাম, এবং নিজের দুঃখজনক অভিজ্ঞতার মূল্যে দেখতে পেলাম, এই জপমালার অন্তত সিংকিয়াঙে কোনো ক্ষমতা নেই।

কিন্তু এসব শোনার পরে উজিনোর রাজা আমাকে যে খবর দিলেন, তা আমি কোনোক্রমেই ভাবতে পারিনি। সিংকিয়াঙের দিকে আমার যাত্রার পরে, জাপানি আর্মির একটি ছোট বিমান একজন অফিসার সহ উজিনোতে গিয়েছিল আমার খবর নিতে। রাজা জানতে পেরেছিলেন, আমি সিংকিয়াং ত্যাগ করেছি এইমাত্র। বিমানটি চলে গেল। আমি স্বভাবতই হতভম্ব হয়ে গেলাম, কিন্তু তখনকার মতো এর বেশি আর কিছু জানতে পারলাম না। আমি সিংকিঙে পৌঁছানোর পরেই জানতে পারলাম বিশদ ঘটনা, কিন্তু এখানে আমি সংক্ষেপে সেকথা বলবো, কেবলমাত্র ঘটনার পরিস্থিতি ও ফলাফল বোঝানোর জন্যে।

ঘটনাটা সংক্ষেপে এএরকম : কোয়ানটুং আর্মি ক্রমশ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে উঠলো —সিংকিয়াং সফর শেষ করে আমার ফিরতে দেরি দেখে, এবং আমার কোনো খবর না পেয়ে। একটা গুজবও ছড়িয়ে পড়লো, আমি বোধ হয় 'মিসিং' অর্থাৎ হারিয়ে গেছি। জেনারেল ইতাগাকি, যিনি বিশেষভাবে চিন্তিত ছিলেন, তিনি আমাকে খুঁজে বের করতে একখানি ফাইটার বিমান পাঠাতে সিদ্ধান্ত করলেন। কিন্তু আমি যখন জানতে পারলো আমি আলা-শান ছেড়ে এগিয়ে গেছি, বিমানচালক তখন সেখানেই আমাকে সন্ধান করতে স্থির করলেন। এবং ঠিক সেই সময়ে কোয়ানটুং আর্মি আলা-শান অঞ্চলে একটি 'তোক্কুমু-কিকান' বা গোয়েন্দা-ফাঁড়ি (Tokkumu kikan, intelligence out-post) স্থাপন করতে সিদ্ধান্ত করলো—যাতে মধ্য-মংগোলিয়ার পশ্চিম থেকে যথাসাধ্য খবরাখবর শোনা যায়। মেজর ইয়োকোটা (Major Yokota) একজন রিজার্ভ অফিসার, ঐ একই নামের একজন আর্মি জেনারেলের ভাই, ঐ গোয়েন্দা-ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত অফিসার হিসেবে মনোনীত হলেন, এবং তাঁর সহযোগী হিসেবে নিযুক্ত হলেন আরো ৩-৪জন কর্মী। এই গোয়েন্দা-ফাঁড়িটিতে একটি অয়ারলেস সেটও ছিল, যাতে অন্যান্য ফাঁড়ির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা যায়।

ঘটনাটি হলো এই যে, ঐ 'টোক্কুমু-মুকিকান' বা গোয়েন্দা-ফাঁড়ি আলা-শান এলাকায় স্থাপিত হওয়ার আগেই আমি সিংকিয়াঙের ঠগীদের কবলমুক্ত হয়ে আবার উজিনোর দিকে যাত্রা করেছি। আমার হদিশ পাবার জন্যে অনুসন্ধান করা হয়েছিল, এই ঘটনাটা যাতে প্রচার না হয় সেজন্যে আর্মি থেকে একটি গল্প ফাঁদা হয়েছিল

এই বলে যে, কয়েকজন অফিসার নিয়ে একটি বিমান যাচ্ছে আলা-শান অঞ্চলে — সেখানে নতুন স্থাপিত একটি ফাঁড়ি পরিদর্শন করতে। কিন্তু সেই ছোট বিমানটিতে (২-৩ জন বসার উপযোগী) ছিলেন জেনারেল ইতাগাকি স্বয়ং, এবং সঙ্গে আরো জনা-দুয়েক জুনিয়ার অফিসার। এটা খুবই অস্বাভাবিক যে, একজন জেনারেল যাবেন নেহাতই একটা ফাঁড়ি পরিদর্শনে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা অবশ্য এই যে, তিনি আমার সম্পর্কে এতখানি ঘনিষ্ঠভাবে চিন্তিত ছিলেন যার ফলে তিনি স্বয়ং ঐ অনুসন্ধানী দলের সঙ্গে যেতে সিদ্ধান্ত নিলেন আমার হদিশ পাবার জন্যে। তিনি অবশ্যই একটা অসংগত রকমের ঝুঁকি নিয়েছিলেন।

যখন আলা-শান অঞ্চলে গিয়ে এটা পরিষ্কার বোঝা গেল যে আমি ইতিমধ্যেই উজিনোর পথে ফিরতি-যাত্রা করেছি, জেনারেল ইতাগাকি তখন তোক্‌কুমু-কিকান ফাঁড়ি এলাকা থেকে বিমানটিকে ছেড়ে দিলেন মেজর ইয়োকোটাকে (Maj. Yokota) সঙ্গে দিয়ে, উজিনোর পথে আমার খোঁজ করতে। এই বিমানটির কথাই উজিনোর রাজা আমাকে বলছিলেন। তিনি স্বভাবতই তখন পর্যন্ত আমার বিষয়ে যতটুকু জানতেন তা বলতে পারতেন সেই অনুসন্ধানকারী অফিসারটিকে। কিন্তু তিনি ভেবেছিলেন অনুসন্ধানকারী দলটি সিংকিয়াঙের ওপর দিয়ে ঘোরাঘুরি করে আমার সম্পর্কে এবং আমার ছোট বাহিনী সম্পর্কে আরেকবার অনুসন্ধান চালাবে ; তাই বিমানটি আরো নিচুতে নামাছল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা পারলো না। সুতরাং অনুসন্ধানকারী বিমানটি ফিরে গেল আলা-শান অঞ্চলে টোক্‌কুমু-কিকান ফাঁড়িতে জেনারেল ইতাগাকিকে তুলে নিতে এবং সেখান থেকে ফিরে গেল কালগান হয়ে সিংকিং অঞ্চলে। যেহেতু আমার সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোনো খবর সংগ্রহ করা গেল না, অতএব আমার নাম 'মিসিং' বা নিখোঁজ ব্যক্তির তালিকাভুক্ত করা হলো। লেঃ কর্নেল রিউয়িকিচি তানাকা (Lt-Col. Ryuikichi Tanaka), কোয়ানটুং আর্মির বিভাগীয় প্রধান অফিসার (মংগোলিয়ান বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত), এই ঘটনায় ধরে নিলেন আমার মৃত্যু হয়েছে। তিনি এবং আমার কয়েকজন বন্ধু একত্রে মিলিত হলেন, এবং আমার স্মরণে একটি শোকশোভা করলেন।

পশম-শিল্পের কথায় আবার ফিরে আসা যাক। অনুসন্ধানের ফলে আমি দেখেছিলাম, যদিও এই পশমের একটা মোটা অংশ আসে মংগোলিয়া থেকে, কিন্তু ব্যবসায়ীরা সবাই চীনা, বিশেষত মুসলমান। তাছাড়া, এই ব্যবসায়ে লেনদেনের বিনিময় মাধ্যম টাকা-পয়সা ছিল না, তা হতো বাট্টার ভিত্তিতে। মংগোলিয়ানরা পশম বিক্রি করতো বিচিত্র সব জিনিসপত্রের মাধ্যমে, যথা : গম, জোয়ার, ভুট্টা, সুতি বস্ত্র ও ছিটকাপড়, জানালার শার্সির ফ্রেম, চপস্টিক, কসাইয়ের ছুরি, ছোরা ইত্যাদি। গম এবং জোয়ার-ভুট্টা ছিল মংগোলিয়ানদের পক্ষে বিলাসদ্রব্য, —

কারণ এদের প্রধান খাদ্য হলো মাংস। তাদের অন্যান্য জনপ্রিয় কেনাকাটার জিনিসপত্র হলো চীনা ফারের টুপি, আয়না, চা আর লবণ।

কিন্তু তাদের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হলো 'টোবাকো' বা তামাক। মংগোলিয়ানরা তামাক কেনে উল্লেখযোগ্য বেশি পরিমাণে। তারা তামাক ব্যবহার করে নানা ভাবে, যথা : চিবিয়ে খায়, ধূমপান করে, নস্যি তৈরি করে। মংগোলিয়ান ও তিব্বতীয় উভয় সমাজের মধ্যেই নস্যির বিনিময় হলো পারস্পরিক সম্ভাষণের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রথা। তার ফলে, চীনে-তৈরি নস্যির বোতল বা বাক্সের প্রচুর চাহিদা। আমিও দেখেছি, প্রচুর পরিমাণে ব্রিটেন-মার্কা শস্তা সিগারেট বিক্রি হয় মরুযাত্রীদের কাছে। তিয়েনসিন অঞ্চলের ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরা এই শস্তা সিগারেটের ফলাও কারবার করে মংগোলিয়ানদের সঙ্গে। এই রকম একটি শস্তা দরের সিগারেটের নাম 'হাটোমান' (hatoman), আমি একবার টেনে দেখেছি—একেবারে যাচ্ছেতাই খারাপ। এইসব সিগারেটের দাম, পশমের দামের সঙ্গে বিনিময় করা হতো, কিন্তু সিগারেটের দাম ধরা হতো অস্বাভাবিক চড়া দরে। স্বভাবতই ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরা দারুণভাবে এবং প্রচুর পরিমাণে ঠকাতো সরল ও গরিব মংগোলিয়ানদের। আমার মনে পড়লো আফিম ব্যবসায়ের কথা—পশ্চিমি ব্যবসায়ীরা যা সাফল্যের সঙ্গে করে থাকে চীনাদের সঙ্গে (এবং ব্যর্থভাবে মানচুকুওর সঙ্গে)।

উজিনো থেকে মানচুকুও যাবার পথে আমি ফিরে গেলাম পাও-তাও (Pao-tao) এলাকায়। এখানেও ব্যবসায়ীরা এবং অসংখ্য সরাইখানার মালিকরা হলো অবস্থাপন্ন চীনা-মুসলমান ; এরা তাদের আয়ের সবটার জন্যে না হোক, অধিকাংশের জন্যেই পশম চালানি ব্যবসায়ের ওপর নির্ভরশীল। সিংকিংয়াঙে অপহৃত হবার পর থেকে আমি হলাম একজন 'সম্মানিত ভিখারি' (honourable beggar)—প্রধানত অন্যের বদান্যতার ওপর জীবনযাপনে নির্ভরশীল এবং এভাবেই থাকতে নিজেকে আশ্বস্ত করলাম, অন্তত যতক্ষণ মানচুকুওতে ফিরে যেতে না পারি।

সিংকিংয়াঙে কেউ আদৌ বিশ্বাসই করতে চায় না যে আমি সশরীরে বেঁচে আছি, এবং আমি ভূত নই। কারণ তারা ধরেই নিয়েছে আমার মৃত্যু হয়েছে, তাই তারা শোকসভাও করেছে। কিন্তু আমি যে মরিনি, তার একমাত্র চাক্ষুষ প্রমাণ হলো আমার মুখে গোঁফদাড়ি গজিয়েছে প্রচুর পরিমাণে। মিলিটারি কর্তৃপক্ষ এবং আমার অন্যান্য বন্ধুরা শীঘ্রই বুঝলেন আমি সত্যিই বেঁচে আছি। তাঁরা আমাকে উষ্ণ সম্বর্ধনা জানালেন। এবং ইতিপূর্বে আমার নামে শোকসভা করেছেন বলে তার জন্যে ক্ষতিপূরণ করলেন রাজকীয়ভাবে, আমার ফিরে আসা উপলক্ষে এক উৎসবের অনুষ্ঠান করে।

যখন আমি সিংকিংয়াঙের পথে দিশেহারা, তখন একটা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অবস্থার সৃষ্টি হলো সিংকিঙে। আলা-শানে ফেরার পথে পিয়া-লিং-মিয়াও (Pia-

ling miao) এলাকায় প্রিন্স তে-র (Prince Teh) সঙ্গে আমার আলোচনার কথা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি। তার কিছুকাল পরে ঐ রাজকুমার এসেছিলেন জেনারেল ইতাগাকির সঙ্গে দেখা করতে, এবং তখন তিনি ছিলেন হোটেল কোকুতোয় (Hotel Kokuto) – যে হোটেলটি আমারও খুব পছন্দসই ছিল। স্বাধীনভাবে একটি ইনার-মংগোলিয়ান ফেডারেশান স্থাপনে এবং তার চেয়ারম্যান হিসেবে রাজকুমার তে-কে পেতে জাপানি সহযোগিতা পেয়েছিলাম আমার আগের সফর-কালে, এবং ঘটনাক্রমে তার ফলেই সম্ভব হয়েছিল মেংগকুকুও (Mengkukuo, অথবা Mokyo, মোকিও, জাপানি উচ্চারণ অনুসারে) রাষ্ট্রের উদ্ভব। ইতিপূর্বে, জেনারেল কেন্‌জি দোইহারা (Gen. Kenji Doihara), কোয়ানটুং আর্মি ডিভিশনের তৎকালীন প্রধান, – তিনি ছিলেন 'স্পেশাল সার্ভিস'-এর ভারপ্রাপ্ত, এবং তাঁর ওপরেই দায়িত্ব ছিল – মংগোলদের দ্বারা সুইয়ানদের (Suiyan) নিয়ন্ত্রণ করার। এই নতুন রাষ্ট্র মেংগকুকুওর অন্তর্গত ছিল নিংসিয়ার কতকাংশ এবং রাজধানী হলো কালগান (Kalgan) শহর।

আমি জেনে অবাক হলাম যে, প্রিন্স তে নিজেও এই ব্যবস্থায় সম্মত হয়েছিলেন কেননা, তাঁরা ছিলেন অস্বাভাবিক। কালগান হলো একটি চীনা শহর, এবং এর অর্থনীতি ছিল মংগোলিয়ানদের থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। এই পরিস্থিতিতে, শাসক ও শাসিতের মধ্যেকার সম্পর্ক দুর্বল ও মেকি হতে বাধ্য। মোকিও প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টি হয় কোয়ানটুং আর্মির সাহায্যে, – সংশ্লিষ্ট মংগোলিয়ান রাষ্ট্রগুলির প্রকৃত ভৌগোলিক স্বার্থের কথা চিন্তা না করেই। জাপানি বাহিনীর কাছে মোকিওর অবস্থানগত গুরুত্ব স্বভাবতই অনেক বেশি, যার ফলে কোয়ানটুং আর্মি একাজে আকৃষ্ট হয়েছিল। আমি জানতে পেরেছিলাম যে, বোঝাপড়া ও চুক্তি হয়েছিল প্রিন্স তে এবং জাপানি যোগাযোগকারীর মাধ্যমে মানচুকুও সরকারের প্রতিনিধির সাহায্যে, এবং তা ছিল মোকিওর মংগোলিয়ান স্বার্থ ও নির্বাচকমণ্ডলীর বিরুদ্ধে। আমি আরো জানতে পারলাম, আগের ঐ আলোচনার এক সংকট পর্বে, জেনারেল ইতাগাকি সিংকিঙে উপস্থিত ছিলেন না, এবং ঐ সিদ্ধান্ত প্রিন্স তে-র দ্বারা পাকা-পাকি ভাবে গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্যতম এক হোতা ছিলেন কর্নেল রিউইকিচি তানাকা।

আমি সর্বদাই কর্নেল তানাকাকে সন্দেহের চোখে দেখতাম, কারণ তাঁর আন্তরিকতা খাঁটি ছিল না। তিনি প্রিন্স তে-র মতো ভালো মানুষের চোখে ধুলো দিতে পারতেন, ঠিক যেমন ঘটনাক্রমে তিনি নিজেরই তৎকালীন চিফ, জেনারেল ইতাগাকির চোখে ধুলো দিয়েছিলেন। অর্থাৎ কর্নেল তানাকা ছিলেন দু'মুখো। জেনারেল ইতাগাকি যখন কোয়ানটুং আর্মির চিফ-অফ স্টাফ ছিলেন, তানাকা তখন তাঁর 'ডান হাত' ছিলেন, এবং জেনারেল তাঁকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতেন। কিন্তু 'যুদ্ধাপরাধীদের' বিচারকালে (war crime trial) তানাকা তাঁর আনুগত্যের মুখ ফিরিয়ে নেন এবং জেনারেলের

সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেন। তিনি বহু বিষয়ে ভুল সাক্ষ্য দেন, যে বিষয়ে জেনারেল ইতাগাকির করার কিছুই ছিল না; এইভাবে তিনি ক্রমে আমেরিকান প্রসিকিউটিং কাউনসেল-এর চিফ মিঃ কিনান-এর (Mr. Keenan) পক্ষে চলে যান, তাঁকে ভুল তথ্য সরবরাহ করেন—যার পরিণতিতে জেনারেল ইতাগাকির মৃত্যুদণ্ড হয়।

আমার মংগোলিয়া যাত্রা, সিংকিয়াঙে স্বল্পকালীন ঘোরাঘুরি সমেত, প্রায় ছ' মাসের মতো হবে। আমি সিংকিঙে ফিরে আসি ১৯৩৫ সনের শীতকালের শেষ দিকে, এবং ১৯৩৬-এর গোড়ার দিকে টোকিও সফরের সিদ্ধান্ত করি। উদ্দেশ্য ছিল জাপান সরকারের সিনিয়ার অফিসারদের সঙ্গে এবং মিলিটারি হাইকমাণ্ডের সঙ্গে দেখা করা, এবং মংগোলিয়ান পশম-শিল্পের বিষয়ে আমি যেসব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, তা নিয়ে আলোচনা করে কোনো সম্ভাব্য কার্যকরী প্রতিকার মূলক ব্যবস্থা করা। অতঃপর আমি টোকিও গিয়ে পৌঁছলাম নতুন বছরের (১৯৩৬) ফেব্রুয়ারি মাসে।

১৪.

টোকিও সফর

১৯৩৬ সনের গোড়ার দিকে টোকিও একটা অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে ছিল। টোকিও শহর তখন ছিল প্রকৃতপক্ষে মার্শাল-ল অ্যাডমিনিসট্রেশনের অধীনে। জাপান সরকার তখন চলছে এক সংকটজনক অবস্থার মধ্যে দিয়ে। একদিকে ছিল জাপানি আর্মির প্রচণ্ড চাপ—প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যে। অন্যদিকে—খোদ জাপানি আর্মির মধ্যেই চলছিল এক শ্রেণীর অফিসারদের উচ্ছৃংখল আচরণ। তখন গভর্ণমেন্টের মধ্যে 'সামুরাই ধারা' ফিরিয়ে আনার পক্ষে একটা ঢেউ এসেছিল, এবং 'শোয়া' রাজতন্ত্রে ফিরে যাবার (Showa Restoration) পক্ষে কথাবার্তা চলছে প্রচুর পরিমাণে—যার মূলকথাই হলো সম্প্রসারণবাদী ধারার পুনঃপ্রবর্তন।

এইভাবে আর্মির মধ্যে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ চলেছিল বেশ কিছুকাল। ১৯৩৫ সনের ১২ আগস্ট তারিখে একজন তরুণ অফিসার লেঃ কর্নেল সেবুসো আইজাওয়া (Lt. Col. Sebuso Aizawa) তাঁর তরবারি দিয়ে মিলিটারি অ্যাফেয়ার্স ব্যুরোর ডিরেকটার, জেনারেল তেতসুজান নাগাতাকে (Gen.

Tetsujan Nagata) হত্যা করেন তাঁরই অফিসঘরের মধ্যে। ফলে, '২-২৬ ঘটনা' (২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬) হিসেবে যা জানা গেল তা হলো, আর্মির চরমপন্থী একাংশ এইভাবে ক্যুপ (coup d' etat) করার চেষ্টা করেছিল যাতে গভর্নমেণ্টের উচ্চপদস্থ নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে যাদের তারা পছন্দ করে না, তাদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। এই ক্যুপের ফলে হতাহতের সংখ্যা ছিল প্রচুর। মৃতদের মধ্যে ছিলেন অর্থমন্ত্রী মিঃ তাকাহাসি (Mr. Takahashi), মিলিটারি এডুকেশনের ইন্সপেকটার জেনারেল মিঃ জোতারো ওয়াতানাবে (Mr. Jotaro Watanabe) এবং একজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, অ্যাডমিরাল সাইতো (Admiral Saito)। তাছাড়া প্রিন্স সাইওনজি (Prince Saionji), গ্রাণ্ড চেম্বারলেন অ্যাডমিরাল কানতারো স্তুজুকি (Admiral Kantaro Suzuki) প্রমুখের জীবননাশেরও প্রচেষ্টা হয়। একমাত্র প্রধানমন্ত্রী ওকাদা (Okada) বেঁচে যান, যেহেতু তাঁকে তাঁর শ্যালক বলে ভুল হয়েছিল এবং তাঁকেই হত্যা করা হয়।

এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ যে, একটি বা দুটি বিচ্ছিন্ন এবং ছোটখাটো ব্যক্তিগত উচ্চাশার ঘটনা ব্যতীত, এর মধ্যে এমন কোনো লক্ষণই ছিল না যাতে বলা যায়—আর্মি অফিসারিদের প্রকৃত শক্তিশালী বিদ্রোহী একাংশের মধ্যেকার এই ঘটনা উদ্দেশ্যমূলক ও ব্যক্তি স্বার্থমূলক ছিল। তাই, স্বাভাবিক অর্থে এটাকে কোনোভাবে ক্যুপ বলা যায় না। কেননা, যারা বিদ্রোহ করেছিল তারা প্রত্যেকেই পুরোপুরি ভাবেই ছিল আগের মতোই সম্রাটের প্রতি অনুগত। প্রকৃতপক্ষে, বিক্ষুব্ধ অফিসারদের অভিযোগ ছিল যে, গভর্নমেণ্টের মধ্যে সম্রাটের মর্যাদার প্রতি একটা অবহেলা ও ঔদাসীন্যের ঢেউ (তাদের মতে) চলছিল।

কোকি হিরোতা (Koki Hirota) অ্যাডামিরাল ওকাদাকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করলেন, বহু জেনারেলকে অবসরগ্রহণে বাধ্য করলেন—তরুণ বিদ্রোহীদের পক্ষ নেবার অভিযোগে, এবং ওয়ার কাউন্সিল-এর (War council) দায়িত্ব দিলেন জেনারেল জিরো মিনামির (Gen. Jiro Minami) হাতে, এবং তাঁকে মানচুকুও থেকে টোকিওতে বদলি করা হলো। হিদেকি তোজো (Hideki Tojo) একজন জাপানি ব্রিগেডিয়ার এবং কঠোর শৃংখলাপরায়ণ হিসেবে পরিচিত ছিলেন, তাঁকে পাঠানো হলো মানচুকুওতে মেজর-জেনারেল পদে—কোয়ানটুং আর্মির সশস্ত্র পুলিশের প্রধান (Kempetai) হিসেবে। জেনারেল ইতাগাকি ছিলেন কোয়ানটুং আর্মির কমাণ্ডার এবং তিনি আশংকা করছিলেন তাঁর বাহিনীতেও আগেকার মতো গোলমাল দেখা দিতে পারে—যেমন হয়েছিল টোকিওয় রাজকীয় বাহিনীতে (ইমপিরিয়াল আর্মি হাইকমাণ্ড)। কিছু পরিমাণে গোলমাল অবশ্যই দেখা দিয়েছিল, কিন্তু জেনারেল ইতাগাকির সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী সেই পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আয়ত্তে এনেছিল। এমনকি পরবর্তী সময়েও আর্মিতে যেসব বড় রকমের অবাধ্যতার ঘটনা ঘটেছিল, তা সমূলে উৎপাটিত করা হয়। কিন্তু তাঁর

ফলেও সরকারি প্রশাসনে সামরিক শক্তির অধিপত্য পুরোপুরি স্থাপিত হয়নি।

কোয়ানটুং আর্মির দৃষ্টিতে মানচুকুও একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান হয়ে উঠলো। মানচুকুওর বক্তব্য হলো এই নতুন রাষ্ট্রটির দ্রুত উন্নতি-অগ্রগতি হোক, যেহেতু জাপানের জাতীয় প্রতিরক্ষার স্বার্থেই এই রাষ্ট্রের একটা ঘনিষ্ঠ সংযোগ ও গুরুত্ব আছে; বিশেষত সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের দিক থেকে সম্ভাব্য আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ হিসেবে। তাছাড়া, একই সঙ্গে ব্রিটিশ ও আমেরিকান স্বার্থকেও দুর্বল করা হবে এবং জাপানি নৌশক্তিকেও জোরদার করা যাবে। ফলে, কোয়ানটুং আর্মির খরচের মাত্রা বেড়ে গেল, এবং তা দাঁড়ালো জাপানের জাতীয় বাজেটের প্রায় অর্ধেক পরিমাণ। জাপানের হিরোতা ক্যাবিনেটে (Hirota cabinet) তাঁরাই ছিলেন যাঁরা যুদ্ধমন্ত্রী জেনারেল জুইচি তেরাউচির (Gen. Juichi Terauchi) কাছে আস্থাভাজন। জেনারেল স্টাফ অফিসারদের মধ্যে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন জেনারেল তোমোয়ুকি ইয়ামাশিতা (Gen. Tomoyuki Yamashita)।

এই সময়েই জাপানের ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগ লক্ষ্য করে যে, আমি প্রায়ই টোকিওতে যাতায়াত করি এবং উচ্চস্তরের মিলিটারি অফিসারদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করি। ফলে, ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগ আমার নামে সম্পূর্ণ মিথ্যা রিপোর্ট দাখিল করে ভারত সরকারের কাছে। রিপোর্টে বলা হয়, জাপান সরকার ও কোয়ানটুং আর্মি যৌথ ভাবে আমাকে একজন উচ্চপদাধিকারী বেসামরিক ইনটেলিজেন্স অফিসার হিসেবে নিযোগ করেছে জাপানি আর্মিতে।

ঐ রিপোর্টটি ছিল দুরভিসন্ধিমূলক। জাপানিরা আমাকে যথেষ্ট ভালোভাবেই জানতো যে, আমি কখনোই তাদের ভূমিকা সমর্থন করবো না, এমনকি তারা চাইলেও না। ব্রিটিশ এজেন্টরাই সম্ভবত একমাত্র ব্যতিক্রম, যারা আমার সম্পর্কে একথা জানতো না; অথবা এটা তাদের একটা সুবিদিত ঘটনা এবং না জানার ভাব দেখানোর উদ্দেশ্য হলো তাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে ইচ্ছাকৃতভাবে বিভ্রান্ত করা। তবে এটা সত্য যে, আমি জাপানিদের সঙ্গে বিচ্ছিন্নভাবে সহযোগিতা করছিলাম, যাতে আমার নিজস্ব ব্রিটিশ-বিরোধী কার্যকলাপের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সুবিধা-সুযোগ পাওয়া যায়; কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার, অন্তত জাপানিদের পক্ষে গোয়েন্দা অফিসার হিসেবে নিযুক্ত হবার তথাকথিত রিপোর্টের তুলনায়। এটা আমার একান্ত বিশ্বাসেরই অঙ্গ যে, ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে আমার কার্যকলাপের সামান্যতম অংশও আমি জাপানি কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোনো মহলের হস্তক্ষেপে প্রভাবিত হতে দেবো না। আমার এই স্বাধীন কার্যকলাপের অধিকার ও বিশ্বাস আমি বজায় রাখতে পারি, যদি আমি কারো মাইনে করা লোক

হিসেবে নিযুক্ত না হই।

যেসব ঘটনায় ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগ আমার সম্পর্কে ঐ ভুল রিপোর্ট পাঠাতে উৎসাহিত হয়, সম্ভবত তা হলো জাপানি ও কোয়ানটুং আর্মি হেড-কোয়ার্টারের সঙ্গে আমার অবাধ যোগাযোগ ও মেলামেশার ঘটনা ও কার্যকলাপ। এটাও সত্যি যে, আমাকে একজন মেজর-জেনারেল স্তরের মর্যাদা দেওয়া হয়। তাছাড়া, আমার ঘোরাঘুরি কাজের সুবিধার্থে আমাকে একখানি 'স্পেশাল পাশ' দেওয়া হয়েছিল, যাতে আমি যে কোনো স্থানে অবাধে যাতায়াত করতে পারি এবং একজন মেজর-জেনারেল পদাধিকারীর প্রাপ্য অগ্রাধিকার সহ যাবতীয় সুবিধা-সুযোগ দাবি করতে পারি। এবং এইসব সুবিধা-সুযোগের মধ্যে আছে, জরুরি প্রয়োজনে বিমান ব্যবহারের অধিকার। প্রকৃতপক্ষে, আমি এই সুযোগ একবার মাত্র গ্রহণ করেছিলাম। সাধারণত এক জায়গা থেকে অন্য কোথাও যাতায়াতের ক্ষেত্রে এই বিশেষ সুবিধা না নিয়েও আমার কোনো সমস্যা ছিল না, কেননা আমি প্রায় সকল সংশ্লিষ্ট অফিসারদেরই ব্যক্তিগতভাবে জানতাম। তবে আমার অন্যান্য কাজকর্মের ক্ষেত্রে, আর্মির মেজর-জেনারেল পদাধিকারীর সমান ক্ষমতা-মর্যাদা আমার খুব বেশি একটা সহায়ক হয়নি। আমি কাজকর্ম চালাতাম অফিসারদের সঙ্গে আমার ব্যাপক পরিচিতির সাহায্যে—এই অফিসারদের মধ্যে ছিলেন একজন মেজর থেকে লে: জেনারেল ও পুরোপুরি জেনারেল পর্যন্ত অনেকেই। লে: জেনারেল ও জেনারেলদের সঙ্গে আমার রীতিমতো ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল এবং তাঁদের সঙ্গে আমি প্রয়োজনীয় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাই করতাম।

টোকিওতে বিশৃংখল অবস্থার জন্যে সেখানে যে কাজে আমি গিয়েছিলাম অর্থাৎ মংগোলিয়ান পশমের কারবার বিষয়ে কী করণীয়, সে সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হয়ে গেল। যাই হোক, আমি সেখানে থেকে যেতে স্থির করলাম ঐ বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়ার জন্যে। আমি দেখলাম, জাপান সরকার স্পষ্টতই এই পশমের কারবার বন্ধ করতে চান, কিন্তু অফিসাররা অন্যান্য কাজে দারুণ ব্যস্ত আছেন। তাঁরা খুবই খুশি হবেন আমি যদি এই বিষয়টি সর্বপ্রকারে দেখাশোনা ও যথাকর্তব্য করতে পারি। কাজের জন্যে প্রয়োজনীয় সুবিধা-সুযোগ ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হবে কোয়ানটুং আর্মির মাধ্যমে।

আমি এই সুযোগ পেয়ে খুব খুশি হলাম, এবং একটা কার্যকরী পরিকল্পনা করতে রাজী হলাম। যাই হোক, একাজে আমার যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকা উচিত এবং কোনো দিক থেকে কোনো রকম বিরক্তিকর হস্তক্ষেপ না থাকাই বাঞ্ছনীয়। পরিবর্তে অবশ্য আমি কোনো পুরস্কার আশা করি না। তাছাড়া, আমার প্রয়োজনীয় চাহিদাও হবে ন্যূনতম। টোকিও আমার শর্তে রাজী হলো।

এই সমস্যা ঠিকমতো সামলাতে গেলে দ্বিমুখী ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। প্রথমেই যা দরকার তা হলো ইংল্যাণ্ডের দিকে জাহাজ বোঝাই পশমের রফতানি বন্ধ করা; কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও লক্ষ্য রাখতে হবে, এই পশমের কারবার বন্ধ হবার ফলে তা যেন এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় যাতে তার ওপর নির্ভরশীল বহু মংগোলীয় ও চীনাদের জীবিকায় টান পড়ে। সেক্ষেত্রে একটাই মাত্র পুরোপুরি সমাধানের পথ: জাপানকে অবশ্যই সেই পশমের পুরোটাই কিনে নিতে হবে এবং পশমের ব্যবহার করতে হবে নিজেদের স্বার্থে ও সুবিধার্থে, কোনোভাবেই তাকে ইংল্যাণ্ডে যেতে দেওয়া চলবে না। অধিকন্তু ব্রিটিশ ব্যবসায়ী, যারা তিয়েনসিন এলাকায় শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করেছে তাদের দমন করতে হলে, পশম কেনার জন্যে এমন একটা কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে—যেখানে ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের প্রভাব নেই, অথবা ব্যবসায়ী হিসেবে তাদের কোনো রকম জোর নেই। বিকল্প স্থান হিসেবে অতএব পাও-তাও (Pao-tao) এলাকার মালগাড়ির ইয়ার্ডটিই ভালো জায়গা, এখানেই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ মরুবাহিনীই এসে জড়ো হয়। অন্যভাবে বলা যায়, পশমের কারবার পাও-তাও এলাকাতে নিয়ন্ত্রণ করা সংগত, এইভাবে ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের ও তাদের এজেন্টদের এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

কিন্তু আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, স্থানীয় পশম কারবারীদের পাও-তাও কেন্দ্রেই দাম মিটিয়ে দিতে হবে, এবং সেই দাম হবে ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে তিয়েনাসিং কেন্দ্রে তারা যে দাম পেত তার সমান হয়। অন্যথায় সর্বপ্রকারে গোলমাল দেখা দেবে। জাপান সরকারকে আনুষঙ্গিক যানবাহনের জন্যেও অতিরিক্ত খরচ মিটিয়ে দিতে হবে। এই পরিকল্পনার প্রস্তাবেও সরকার রাজী হলো। এবং এই কাজের পরিচালনগত সমস্ত দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া হলো আমার সঙ্গে কোয়ানাটুং আর্মি, মোকিও, অথবা অন্য যে কোনো কর্তৃপক্ষের মধ্যে, যাদের সাহায্য আমাদের প্রয়োজন হতে পারে।

১৯৩৬ জুনে, যখন আমি জাপানি গভর্নমেন্টের সঙ্গে আমার কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা চালাচ্ছি, তখন আমার বড়ভাই নারায়ণন নায়ারের কাছ থেকে খবর পেলাম— কানাডা থেকে বিজ্ঞানে মাস্টার্স ডিগ্রি-কোর্স শেষ করে তিনি শীঘ্রই ফিরে আসছেন জাপান হয়ে। জাপানের পথে তিনি কয়েকদিনের যাত্রা বিরতি করবেন এবং কিছুদিন থাকবেন আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে।

আমরা বেশ কয়েকদিন একসঙ্গে আনন্দে কাটালাম। কিন্তু আমি বিব্রত বোধ করলাম একথা জেনে যে, বড়ভাই আমার জাপানের দিনযাপন তথা কার্যকলাপে খুশি হতে পারেন নি। আসলে তিনি জানতেন, ভারতে যদি আমি ফিরে যাই তাহলে বিপদের ভয় আছে; কেননা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে আমার নাম রয়েছে

তাদের ব্ল্যাক-লিস্টে। একই সময়ে তিনি এই ভেবে চিন্তিত ছিলেন যে, আমি ক্রমশই খুব বেশি করে জড়িত হয়ে পড়ছি রাজনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গে। ব্যাপারটা তাঁর কাছে আরো ঘোরালো হয়ে উঠলো যখন তাঁর কয়েকজন জাপানি বন্ধু তাঁকে বললেন, সাময়িকভাবে হলেও আমি ক্রমশই রীতিমতো একজন যোদ্ধায় (Ronin) পরিণত হচ্ছি, এবং এখনই যদি অন্য কোনো পেশায় আমাকে বদলি করা না হয়, তাহলে আমি শীঘ্রই রাজনৈতিক ভাবে এমন পর্যায়ে জড়িত হয়ে পড়বো—যেখান থেকে আর ফেরা সম্ভব হবে না।

তাই সমাধান হিসেবে বড়ভাই আমার কাছে প্রস্তাব করলেন, জাপান ত্যাগ করে আমাকে হয় আমেরিকায় অথবা কানাডায় যেতে। আমি চাইলে সেখানে গিয়ে লেখাপড়াও করতে পারি। কিন্তু আমি আর পড়াশোনা করতে চাই না, এখন নিজের অভিজ্ঞতায় জীবনকে দেখতে চাই। বড়ভাই এমনও বললেন, প্রয়োজনে তিনি আমার খরচপত্রের আংশিক দায়িত্ব গ্রহণেও রাজী, এবং বাকিটা আমি যেন জোগাড় করে নিতে পারি সেরকম আশা করলেন।

আমি আমার বড়ভাইকে অখুশি করার কথা ভাবতে পারলাম না। তাঁকে বললাম, যদিও আমি তাঁর প্রস্তাবের মর্যাদা দিতে ইচ্ছুক, তবুও আমাকে এখনো মানচুকুও এবং মংগোলিয়ার অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করতে হবে। তাই, আমাকে সেখানে আরো অন্তত একবার যেতে হবে এবং সেখান থেকে জাপানে ফিরে তবেই যাবো আমেরিকা কিংবা কানাডায়। আমি জানতাম, আমার বড়ভাইয়ের প্রকৃত ইচ্ছাটা কী, অর্থাৎ পশ্চিমি দেশগুলিতে গেলে আমি সম্ভবত আমার ব্রিটিশ-বিরোধী ভাবমূর্তিটি নষ্ট করতে পারবো এবং একজন মার্কামারা ব্যক্তি হিসেবে ব্রিটিশের দৃষ্টিতে শাস্তিযোগ্য সিদ্ধান্ত কাটিয়ে ভালো ভাবেই আবার ভারতে ফিরতে পারবো। আমি পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে বলার পর বড়ভাই রাজী হয়ে বললেন, হ্যাঁ আমি আরেকবার মাত্র মানচুকুও এবং মংগোলিয়া যেতে পারি, কিন্তু তিনি চান আমি সেখান থেকে ফিরে শীঘ্রই আমেরিকার উদ্দেশে পাড়ি দিই।

জাপানে কয়েকদিন থাকাকালে, বড়ভাইকে আমি পরিচয় করিয়ে দিলাম আমার অনেক বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ; তাঁদের মধ্যে ছিলেন : কর্নেল আইমুরা (Col. Iimura) —মিলিটারি হাইকমাণ্ডের দ্বিতীয় ডিভিশনের ৮ম সেকশনের প্রধান ; ড· শুমেই ওকাওয়া (Dr. Shumei Okawa)। ওসাকায় বহুসংখ্যক শিল্পপতি, শিক্ষাবিদ ও সাংস্কৃতিক নেতৃবৃন্দ বিরাট এক ডিনারের আয়োজন করলেন আমার বড়ভাইয়ের সম্মানে। অনুষ্ঠানটি একজন প্রধান পুরোহিত সেংগেই-এর (Priest Sengei) আশীর্বাদধন্য হলো এবং সেকালের একজন বিশিষ্ট চীনা পাণ্ডিত কোইচি ফুকুদার (Koichi Fukuda) শুভাগমনে বিশেষ মর্যাদা লাভ করলো। এই ফুকুদার বাড়িতেই আমি এক সময় গেস্ট ছিলাম, এবং আমার দাদাও তাঁর বাড়িতে কিছুদিন ছিলেন। যাই হোক, এই ডিনার অনুষ্ঠানে এবং তার আগে আমার

বড়ভাইকে উচ্চস্তরের সাধারণ নাগরিকদের কাছ থেকে যেসব উপহার দেওয়া হয়েছিল তা এত অসংখ্য ছিল যে, আমার বড়ভাই রীতিমতো অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি খুব খুশি হলেন এই ভেবে যে, আমি উচ্চ সামাজিক পর্যায়ের মানুষজনের সঙ্গেই মেলামেশা করি এবং এইভাবে আমি আমার উচ্চ মর্যাদাবোধ ও নৈতিক গুণাবলী বজায় রেখেছি প্রচলিত সর্বোচ্চ মান অনুসারে। দু'চার দিনের মধ্যেই তিনি স্বদেশযাত্রা করলেন, এবং কোবে বন্দরে আমি তাঁকে বিদায় সম্ভাষণ জানালাম। আমাদের উভয়ের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠলো।

জাহাজ ছেড়ে দিতেই আমি যেন ভাবাবেগের দ্বন্দ্বে অভিভূত হয়ে পড়লাম। যখন আমি বড়ভাইকে কথা দিই যে মানচুকুও এবং মংগোলিয়াতে আমার কাজ শেষ করে আমি আমেরিকায় যাবো, মনে মনে আমি তখন নিশ্চিত জানি— ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্যে জাপানে আমার কাজ ফেলে জাপান ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। ফলে আমার নিজেকেই অপরাধী মনে হচ্ছিল, যেহেতু বড়ভাইকে আমি কথা দিয়েছি কিছুকালের মধ্যেই আমি আমেরিকা যাবো। তাহলে আমি তো আমার কথায় আন্তরিক নই, অর্থাৎ বড়ভাইকে আমি কথা দিয়েছি শুধু তাঁর অনুভূতিকে আঘাত না করে এড়িয়ে যাবার জন্যে ; কিন্তু তার দ্বারা আমার অপরাধ বোধের স্খালন হলো না। সেই আলোচনার সময়টি ছিল আমাদের উভয়ের পক্ষেই খুব একটা সংকট মুহূর্তে। আমার একমাত্র সান্ত্বনা যতদূর আমি জানতাম, বড়ভাই আমার মনটাকে সঠিকভাবে যাচাই করে দেখেছেন – আমি যা করি তাই বলি ; কেবলমাত্র খুশি করার জন্যেই আমি তাঁকে কিছু বলিনি বা কথার হেরফের করা আমি পছন্দ করি না। আমার পক্ষে আরো আনন্দের বিষয় যে, আমার বড়ভাই আশ্বাস দিয়েছেন তিনি আমার ৮০ বছরের বৃদ্ধা মাকে বলবেন— আমার চরিত্র এবং মেলামেশার সঙ্গ যথেষ্ট ভালো এবং সন্দেহাতীত।

১৫.

আবার মংগোলিয়া : ব্রিটেনের সঙ্গে আমার 'অর্ধ নৈতিক সংগ্রাম'

আমি টোকিও থেকে সিংকিঙে ফিরে এলাম ১৯৩৬-এর শরৎকালে এবং আলোচনা শুরু করলাম কর্নেল রিয়ুইকিচি তানাকার (Col. Ryuikichi Tanaka) সঙ্গে। তিনি ইতিপূর্বেই নির্দেশ ইত্যাদি পেয়েছেন টোকিও থেকে। আমি আমার

সাংগঠনিক পরিকল্পনা ইত্যাদি স্থির করে ফেললাম—কিভাবে আমি পূর্বোক্ত পশমের কারবার বন্ধ করতে ব্রিটেনের সঙ্গে আমার 'অর্থনৈতিক সংগ্রাম' (ইকনমিক ওয়ার) শুরু করবো।

এক্ষেত্রে আমার প্রথম কাজ হলো, স্বভাবতই একটি 'পারচেজিং মিশন' গঠন করে পাও-তাও এলাকায় শান্তভাবে একটি পশম-ক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা। এই ব্যাপারে জাপানের ৯টি বড় ব্যবসায়ী সংস্থার সক্রিয় সমর্থন পাওয়া গেল। এই সংস্থার মধ্যে ছিল কোবের 'কানেমাৎসু' (Kanematsu of Kobe)—যে সংস্থার ছিল বৃহত্তম পশম-ক্রয়ের ব্যাপক সাংগঠনিক ব্যবস্থা, বিশেষত অস্ট্রেলিয়ার মতো জায়গাতেও। অন্যান্য সংস্থাগুলির মধ্যে ছিল—মিৎসুই, মিৎসুবিশি ইত্যাদি। কিন্তু 'কানেমাৎসু' সংস্থারই একমাত্র ব্যবস্থা ছিল—এই পশম শিল্পের ক্ষেত্রে কিভাবে কি করতে হয়, এবং দরদাম কিভাবে ঠিক করতে হয় ইত্যাদি জানা-শোনার ব্যবস্থা। এই 'পারচেজ মিশন' ছিল মিশ্র ধরনের সংস্থা, এবং এই সংস্থার অনেকগুলি শাখা ছিল,—প্রতিটি শাখাই বিশেষ দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। কোনো ব্রিটিশ ব্যবসায়ীই এই সংস্থার দক্ষতাকে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি।

আমার নিজের কথা বলতে গেলে, কোয়ানটুং আর্মির কাছ থেকে, আমার যাতায়াতের ব্যবস্থা ব্যতীত আমি চেয়েছিলাম একটিমাত্র সাহায্য: তাদের অফিসারদের কাজের সাহায্য, বিশেষত এক চীনা অফিসার কর্নেল কুওর (Col. Kuo) সহযোগিতা ; তিনি তখন মানচুকুও আর্মিতে কাজ করছিলেন।

আমি কর্নেল তানাকাকে বললাম, আমি কর্নেল কুওকে চাই কারণ তাঁর কথা আমি শুনেছিলাম যখন তিনি টোকিও মিলিটারি কলেজে গ্রাজুয়েট ডিগ্রির জন্যে পড়াশোনা করছেন। তিনি ছিলেন একজন মুসলিম, এবং এই পশম কারবারের সঙ্গে যুক্ত মুসলিমদের মধ্যে আমার কাজের জন্যে কর্নেল কুওর মতো একজন অফিসারের সাহায্য দরকার। অধিকন্তু, কর্নেল কুওর পরিবার দক্ষিণ মানচুকুও অঞ্চলে অন্যতম অভিজাত পরিবার হিসেবে পরিচিত, এবং তিনি সেখানে ভি-আই-পি'র মতো বিশেষ মর্যাদা পাবার যোগ্য লোক। কোয়ানটুং কর্তৃপক্ষের সাধারণভাবে এইসব গুরুত্বের বিষয়ে কোনো ধারণা ছিল না ; আমাকে তাই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অনেক বিষয়ে আলোচনা করে বোঝাতে হয়েছিল, আমার কাজের জন্যে কী ধরনের ব্যবস্থাদি আমি নিতে চাই।

আমার কাজে প্রথম প্রয়োজন হলো চরম গোপনীয়তা ('Bocho') অবলম্বন। উচ্চস্তরের গোপন নির্দেশাবলী পাঠাতে হবে সমস্ত 'তোক্কুমু-কিকান' ঘাঁটিগুলিতে এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মোকিও আর মধ্য-মংগোলিয়া এলাকার অন্যান্য জাপানি কর্তৃপক্ষের কাছে ; তাদের কাছে আমার এবং আমার সহযোগীদের জন্যে নিরাপত্তা, বাসস্থান ও আহার্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুবিধা-সুযোগের ব্যবস্থা করতে হবে। গোপনে তাদের আরো জানাতে হবে, আমার কাজকর্ম আমি চালাবো ভারত থেকে

আগত একজন মুসলিম মোল্লার ছদ্মবেশে। কিন্তু একথা কোনো বেসরকারি ব্যক্তির কাছে কোনো অবস্থাতেই কখনোই বলা চলবে না। কর্নেল তানাকা আমার সমস্ত শর্তেই রাজী হলেন।

চীনে, কোনো লোকের নাম থেকে তার ধর্মের কোনো রকম সূত্র-সন্ধান পাওয়া যায় না। একজন লি-ক্যাং কুও, একজন চৌ-মেন ওয়াং, অথবা একজন তুং, কুং, মিং বা অন্য যাই হোক না কেন, তারা যে কোনো ধর্মাবলম্বী হতে পারে : বৌদ্ধ, মুসলিম বা কনফুসিয়ান। এমনকি সে একজন নাস্তিকও হতে পারে। আমিও আমার নাম পরিবর্তনের কথা ভেবেছিলাম, কিন্তু পরে সিদ্ধান্ত করলাম, পরিবর্তন করবো না। আমি ছিলাম যুবক ও আশাবাদী, এবং যে কোনো রকম হিসেবি ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত ছিলাম। চীনা পশম কারবারিদের মধ্যে দু'একজন হয়তো আমার প্রকৃত ধর্ম বুঝে ফেলতে পারে, এরকম সম্ভাবনা ছিল, তবে তার জন্যে আমার কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না। আমি ভাবলাম সেই পরীক্ষায় আমি ঠিক উত্তীর্ণ হয়ে যাবো। অতঃপর আমি দাড়ি রাখতে লাগলাম একজন চীনা মুসলিমের যেমন স্বাভাবিক দাড়ি থাকে ; সেই সঙ্গে টুপি, ঢিলে জামা এবং পোশাক পরিচ্ছদের অন্যান্য ধরনধারণ রপ্ত করলাম, যাতে একজন স্বাভাবিক মুসলিম মোল্লার মতো আমাকে দেখায়। যখন সবকিছুই প্রস্তুত, কর্নেল তানাকা একদিন আর্মি ক্লাবে একটি অনুষ্ঠান করে মুসলিম কর্নেল কুওর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। কর্নেল কুওকে যাবতীয় প্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা করে বলা হলো আমাদের গোপন ব্যবস্থা ('Bocho') অনুযায়ী। তিনি ছিলেন সত্যিকারের একজন সহযোগিতার মনোভাবাপন্ন মানুষ।

ব্যবস্থা অনুযায়ী ঠিক হলো, কর্নেল কুও আমার সঙ্গে ৪-৫ মাসের জন্যে 'স্পেশাল ডিউটি'তে থাকবেন। প্রয়োজন মতো আমার সঙ্গে অথবা একাকী যাতায়াত করবেন পাও-তাও কিংবা অন্য যে কোনো জায়গায়। তিনিও এই সুযোগ পেয়ে খুবই খুশি হলেন, কারণ এ সময়ে তিনি তাঁর বহু বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে, বিশেষত অভিজাত মুসলিমদের সঙ্গেও তাঁর দেখা-সাক্ষাৎ হবে। আমরা পরস্পর বেশ একটা প্রীতির সম্পর্কে আবদ্ধ হলাম। তাছাড়া, পাও-তাও ভ্রমণকালে এবং খোদ পাও-তাও এলাকাতেই এটা দেখে বেশ ভালো লাগলো যে, কর্নেল কুও স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে রীতিমতো একজন সম্মানিত মানুষ। এবং তাঁর সঙ্গে 'মোল্লা'-বেশী এই নায়ারও (গ্রন্থকার) ভি-আই-পি. অর্থাৎ বিশেষ ব্যবহার আশা করতে পারেন। কর্নেল কুও সর্বদাই অন্যের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবার সময়ে বেশ সম্মানের সঙ্গে পার্থক্য বজায় রেখে চলতেন, ফলে চীনা মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে আমার মানমর্যাদা আরো বেড়ে যেত। তাছাড়া, আমি যে তাদের ভাষায় বেশ ভালোভাবেই কথাবার্তা বলতে পারি, এটাও আমার পক্ষে একটা অতিরিক্ত সুবিধে ছিল।

আমরা মধ্য-মংগোলিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম ১৯৩৭-এর গরমকালে। পাও-তাও এলাকায় জাপানি 'তোক্কুমু-কিকান' ঘাঁটি আমাদের পক্ষে সর্বপ্রকারে সহায়ক ছিল। ব্যবস্থা অনুসারে আমাদের থাকার জায়গা হয়েছিল একটা নামকরা সরাই-খানায়; সেই এলাকার একজন সুপরিচিত মুসলিম ছিলেন তার মালিক ও পরিচালক। কর্নেল কুওর সঙ্গে আমি জাপানি ভাষায় কথাবার্তা বলতাম; সেটাই ছিল আমার পক্ষে আরো স্বাভাবিক, অন্তত চীনা ভাষার শব্দে কথা বলার মতো মাথা ঘামানোর কাজের তুলনায়। কর্নেল কুও জাপানি ভাষা শিখেছিলেন বেশ ভালোভাবেই, টোকিওর মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে তাঁর শিক্ষাকালে। তিনি ছিলেন ভালোমানুষ; অধিকন্তু চতুর ও বিচক্ষণ। তিনি তাই সিদ্ধান্ত করলেন, আমাকে অবশ্যই আরো যোগ্যভাবে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে, যাতে স্থানীয় এলাকায় একজন মুসলিম মোল্লা হিসেবে আমার উচ্চ মর্যাদা উপযুক্ত প্রতিষ্ঠা পায়। 'কী দারুণ ব্যাপার', আমি মনে মনে বললাম: কিছুকাল আগে আমি ছিলাম 'ধরম রিমপোচে' (dharm rimpo-che), একজন জীবন্ত বুদ্ধ; এবং এখন আমি একজন মুসলিম 'মৌলভি'। আমি মনে করলাম, একজন মৌলভি হিসেবে আমাকে অবশ্যই স্বাভাবিক ভাবে স্থানীয় মসজিদে নমাজ পড়তে হবে, পরদিন অর্থাৎ শুক্রবারে।

কর্নেল কুও আমাকে নিয়ে গেলেন স্থানীয় মসজিদে এবং আমার জন্যে উচ্চস্তরের মোল্লার উপযোগী সামনের সারিতে একটা জায়গা ঠিক করে দিলেন। মুহূর্তের জন্যে আমি কিছুটা অস্বস্তি বোধ করলাম, যেহেতু আমি একজন 'নকল' মুসলিম। যদি কেউ বুঝতে পারে, তবে তা হবে খুবই শোচনীয় ব্যাপার। কিন্তু এসব ছিল কেবল চিন্তাস্রোত মাত্র, এবং আমি আমার ঠোঁট-বন্ধ করা ভঙ্গিতে মন স্থির করলাম—মরে গেলেও কোনো কথা নয়। এমনকি আমি বিশ্বাস করতে শুরু করলাম—একজন মুসলিম মৌলভি হিসেবে আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারি; কেন পারবো না: আমি ভারতে অনেক মসজিদ দেখেছি, এবং মুসলিম আচার-প্রথা বিষয়ে যথেষ্ট জানাশোনা আছে—একজন মৌলভি হিসেবে কী করণীয়, আর না করণীয়। আচরণে সামান্য তফাৎ হতে পারে একজন ভারতীয় মুসলিম আর একজন চীনা মুসলিম হিসেবে; কিন্তু সে সব সহ্য করা যেতে পারে, অন্তত আমি ভিন্ন দেশ থেকে নবাগত একজন বলে মুসলিম উপাসকমণ্ডলী সে কথা বুঝবেন আশা করা যায়। কিন্তু একটা চিন্তা একঘেয়ে আমার মনে লেগে রইলো যে, আমি এতকাল বাইরে থেকেই মসজিদ দেখেছি; কিন্তু জীবনে এই প্রথম আমি মসজিদের ভিতরে ঢুকছি, এবং তাও ঢুকছি একজন উচ্চস্তরের মৌলভি হিসেবে। এই অবস্থার মধ্যে পরিস্থিতির পার্থক্য অবশ্যই আছে।

আমি জানতাম আমাকে 'প্রার্থনা' করতে অর্থাৎ নমাজ পড়তে হবে। মোট

কথা, আমি তখন ছিলাম পাও-তাও অঞ্চলের সবচেয়ে বড় মসজিদের ভিতরে, এবং সেদিন ছিল শুক্রবার। তার চেয়ে বড় কথা হলো, মসজিদের প্রধান মৌলভির সঙ্গে কর্নেল কুও আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন একজন বিশিষ্ট ভারতীয় মুসলিম মৌলভি হিসেবে, এবং যার সঙ্গে উচ্চস্তরের যোগাযোগ আছে মানচুকুও আর জাপানি মিলিটারি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। পাও-তাও মসজিদের প্রধান মৌলভি যখন আমাকে প্রথম সারিতে বসার আমন্ত্রণ জানালেন, আমি কিছুটা ঘাবড়ে গেলাম। প্রথম সারিতে বসা নিঃসন্দেহে সম্মানের বিষয়, কিন্তু আমার পরিস্থিতিতে তা ছিল কিছুটা অসুবিধাজনকও বটে। আমি যদি কিছুটা একধারে বসতে পারি, তাহলে আমি অন্যের আচরণ লক্ষ্য করতে পারি এবং সেই অনুসারে আচরণ করতে পারি। কিন্তু সেই কাজের পক্ষে প্রথম সারিতে বসা অসুবিধাজনক। কিন্তু এইসব অসুবিধা আমার অভীষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কাজের পথে বাধা হওয়া উচিত নয়। আমার একটাই উদ্দেশ্য, এবং তা হলো পাও-তাও এবং তিয়েনসিন অঞ্চলের পশম কারবার থেকে ব্রিটিশ একচেটিয়া প্রভুত্ব ভাঙতে হবে। আর সেজন্যে আমার লক্ষ্যপথে যে কোনো বাধাবিপত্তি আসুক, তা কাটিয়ে অগ্রসর হবার জন্যে আমাকে তৈরি থাকতে হবে।

শীঘ্রই নমাজ পড়ার সময় হলো। আমার মনে পড়লো, অনেকদিন আগে আমি এই জাতীয় অনুষ্ঠানে যা পড়েছি যা আচরণ করেছি, তাই আবার এখন করতে হবে। প্রথমেই শরীরের বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে : হাত, মুখ, নাক, চোখ, কান, মলদ্বার ও পুরুষাঙ্গ। আমি এই ধর্মাচার সমস্তই শান্তভাবে অনুষ্ঠান করলাম মসজিদের মধ্যে নির্দিষ্ট ঘরে গিয়ে। সাধারণত এই শেষোক্ত পুরুষাঙ্গ ধোওয়ার সময় অন্য কেউ দেখলে মুসলিমদের মধ্যে একটা অস্বস্তি লাগে। কারণ, একজন মানুষের শরীরে মুসলমান হিসেবে সম্পূর্ণ সনাক্তকরণের পৃথক চিহ্ন থাকে শরীরের ঐ অঙ্গে 'সুন্নত'-এর মধ্যে। অতএব একজন মোল্লা-মৌলভি হিসেবে যত না হোক, একজন সুন্নত না-করা লোকের পক্ষে মুসলিম হিসেবে অভিনয় করার আমার অসুবিধা আছে।

যাই হোক, সুবিধাজনক পরিস্থিতির জন্যে ঐ বিষয়ে আমার কোনো চিন্তা ছিল না। ১৯৩৪ সনে যখন মানচুকুওতে ছিলাম, আমার পুরুষাঙ্গের চামড়ার ওপর একটা ক্ষত হয়েছিল, এবং বিখ্যাত সার্জেন ডাক্তার ওমোরি (Dr. Omori) সেখানকার হাসপাতালে আমাকে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে একটা অপারেশান করেন, সুন্নত করার মতো। কিন্তু তখন এটা কখনো আমার মনে আসেনি যে, ঐ অপারেশনের ফলে এখন সুদূর এই মধ্য-মংগোলিয়ার পাও-তাও মসজিদের মধ্যে এই পরিস্থিতিতে আমার অবস্থা কতখানি সুবিধাজনক হয়ে দাঁড়াবে। অতএব ঘটনাক্রমে এখন ধর্মীয় প্রথাগত আচরণের দিক থেকে একজন মুসলিম হিসেবে আমার অভিনয় হলো নিখুঁত। এখন আমি খুব ভালোভাবেই অন্য যে কোনো প্রশ্নকর্তার সন্দেহ নিরসন করে দিতে পারি খুব সহজেই।

সাধারণত কোনো ধর্মের নামে ভণ্ডামি করা আমি মনে করি পাপ, কারণ সকল ধর্মই পবিত্র। কিন্তু আমি নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দিলাম, বিখ্যাত সেই প্রবাদ স্মরণ করে, যাতে বলা হয়েছে : প্রেমে ও সংগ্রামে সবই সংগত। যেহেতু আমি ব্রিটেনের সঙ্গে 'অর্থনৈতিক সংগ্রামে' লিপ্ত ছিলাম, তাই এই ধর্মীয় পাপ বৃহত্তর দর্শনের দৃষ্টিতে ছিল আমার যোগ্য।

যাই হোক, নমাজ পড়ার আগে শরীরের প্রয়োজনীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোওয়ার কাজ শেষ হলো। কিন্তু এখনো সমস্যা রয়েছে প্রকৃত নমাজ পড়ার সময়কার সঠিক ভাব-ভঙ্গির অভিনয়ের ব্যাপারে। আল্লার কৃপায় আমি অন্যের অলক্ষ্যে পাশের লোকদের দিকে অনেকবার তাকাবার সুযোগ পেলাম, এবং দেখে নিলাম যাতে তাদের অনুসরণে আমিও তদনুরূপ আচরণ করতে পারি। সম্ভবত আমার অনুকরণ তেমন নিখুঁত হয়নি, যেমন হতে পারতো আমি একধারে থাকলে ; কিন্তু আল্লারই কৃপায় আমার কাজে কারো সন্দেহ হয়নি।

মসজিদের প্রার্থনা করাটা তেমন অসুবিধাজনক ছিল না। আমি জানতাম কেমন করে আবৃত্তি করতে হয় : লা' ইলাহা ইল' লেলাহো (আল্লা অতি মহৎ) ; মহম্মদ-উর-রসুলিলা (এবং মহম্মদ হলেন তাঁর অবতার) ; আ' লাহু আকবর (আল্লা হলেন সকলের শ্রেষ্ঠ)।

যেহেতু মসজিদে অনেক লোক নমাজ পড়ছে একসঙ্গে এবং একই সময়, অতএব আমার ঠোঁট নড়া সহজেই অন্যদের সঙ্গে মিলে গেল। আমাকে শুধু মৃদু গুঞ্জন করে একটা কথাই আবৃত্তি করার দিকে খেয়াল রাখতে হয়েছিল : লা' ইলাহা ইল' লেলাহো···, এবং এর চেয়ে বেশি জ্ঞানী হবার কোনো প্রয়োজন নেই, এমনকি যদি আমার আরবি উচ্চারণ কিছু অশুদ্ধ হয় তাহলেও।

মসজিদের বাইরের ব্যাপারটা আরো সহজ। সবাইকে আমার শুভেচ্ছা জানাতে হবে। ঐতিহ্যগত মুসলিম প্রথা অনুসারে : আ' সালাম আ' আলেইকুম (আপনি বেঁচে থাকুন, সুখী হোন এবং আপনার সঙ্গে অন্যেরাও ভালো থাকুন)। এর জবাবে শোনা যাবে : 'ওআলেকুম আ' সালাম (এবং আপনিও বেঁচে থাকুন, সুখী হোন, এবং আপনার সঙ্গে অন্যেরাও ভালো থাকুন) ; ওআ রহমতু 'লাহু (এবং আল্লার কাছ থেকে সমস্ত ভালো জিনিস আপনি প্রাপ্ত হোন)।

আমার অজ্ঞাতসারেই, আমি যা করেছিলাম আমার বাইরের আচরণ দেখে তা স্বাভাবিক বলেই মনে হয়েছিল। আমি ইতিমধ্যেই দেখলাম, মুসলিম পশম কারবারিরা এবং সরাইখানার মালিকরা আমাকে তাঁদের সম্প্রদায়ের অর্থাৎ মুসলিম ধর্মাবলম্বী বলে মেনে নিয়েছেন। এ পর্যন্ত আমাদের বেশ ভালোই কাটলো। এবার আমাকে অবশ্যই আবার একটা অনুকূল পরিস্থিতির ব্যবস্থা করতে হবে— আমার কাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় পরবর্তী পদক্ষেপের জন্যে। অর্থাৎ মুসলিম পশম কারবারিদের বোঝাতে হবে, তারা যেন তাদের কারবারের পশম, তিয়েনসিনে না

পাঠিয়ে পাও-তাও অঞ্চলে স্থাপিত জাপানি-কাম-মানচুকুও পারচেজ-মিশনে বিক্রি করে। এরকম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যে পৌছনো রীতিমতো সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। কর্নেল কুওর সঙ্গে আলোচনা করে আমি স্থির করলাম যে, একাজে তাড়াহুড়ো করলে উলটো-প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ তার ফল খারাপ হতে পারে। অতঃপর আমরা মনস্থির করে ধৈর্য সহকারে ব্যাপক প্রচার অভিযান শুরু করলাম।

বাইরে আমাদের শীতকালীন অবস্থানের সময় আমি চীনা মুসলিম এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানসিক অবস্থা লক্ষ্য করলাম। বিভিন্ন সামাজিক স্তরের নানান জনের সঙ্গে কথা বলে আমি জানতে পারলাম, চীনের প্রায় সমস্ত প্রদেশেই মুসলিমদের বসতি আছে। অবশ্যই তারা সংখ্যালঘু, কিন্তু যেমন ভেবেছিলাম ততটা সংখ্যাল্প নয়। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলিতে তাদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশ। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে তারা বৌদ্ধ বা কনফুসিয়ানদের মতো সমাজ-সচেতন নয়। রাজনীতির চেয়ে তাদের জীবন তাদের নিজস্ব ধর্ম ও ব্যবসাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত।

আমি লক্ষ্য করেছি, তাদের অধিকাংশেরই নিজেদেরকে 'চীনা' না বলে 'মুসলিম' বলে পরিচয় দেবার অভ্যাস আছে। তাদের এই ধর্মীয় আগ্রহের ফলে অনেক সময় অন্যান্য দেশেও গোঁড়ামি ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবেরও সৃষ্টি করে, এমনকি ভারতেও; কিন্তু সম্ভবত রাজনৈতিক স্বার্থ না থাকার ফলে চীনা মুসলিমরা স্বভাবত বেশ অনুগত। খ্রী· ত্রয়োদশ শতকের গোড়ায় চেংঘিস খান কেবলমাত্র মংগোলিয়াতেই নয়, উত্তর-চীনেও চেংঘিস ছিলেন ভয়ের কারণ। কিন্তু চেংঘিসের নাতি কুবলাই খানের মৃত্যুর পর মুসলিম শক্তির পতন হয়, এবং সেখানে বৌদ্ধ প্রভাব দেখা দেয়।

মধ্য-মংগোলিয়ায় যেসব মুসলিমদের সংস্পর্শে আমি এসেছিলাম, তাঁরা ছিলেন অভিজাত এবং শিক্ষিত মানুষ। আমি দেখেছি, অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় তাঁরা বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং স্বাস্থ্য বিজ্ঞান সচেতন। তবে ধর্মীয় বিশ্বাসে, তাঁরা অন্যান্য দেশস্থ তাঁদের ধর্মীয় সমগোত্রীয়দের তুলনায় অনেক বেশি গোঁড়া। ফলে, এসব বিষয়ের প্রভাব তাঁদের খাদ্যাভ্যাসের ওপরেও লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য, কোনো চীনা মুসলিমই সাধারণত শূওরের মাংসের খাবার বিক্রেতা রেস্টুরেন্টে যান না। তাছাড়া একথাও স্বীকার করতে হবে যে, তাঁরা ভিন্ন ধর্মমতের ক্ষেত্রে বেশ সহিষ্ণু এবং এটা তাঁদের কৃতিত্ব। রেস্টুরেন্টে বা অন্যত্র, ভিন্ন প্রথার রন্ধনরীতি ও খাদ্যাভ্যাসের ব্যাপারে তাঁদের কোনো রকম ক্ষোভ বা বিবাদ নেই।

আমি কোনো মুসলিমকে অ্যালকোহল যুক্ত মদ খেতে বা ধূমপান করতে বা ঐ জাতীয় নেশা করতে দেখিনি। আমাকে বলা হয়েছিল, তাঁদের সম্প্রদায়ে নারীর প্রতি কোনো অবৈধ আসক্তি নেই। কোরানে অবশ্য চার বিবাহের অনুমোদন

আছে, এবং অধিকাংশ চীনা মুসলিম কোরানের এই অনুমোদনের সুযোগ নিয়ে থাকেন। আমার কয়েকজন মুসলিম বন্ধু অবশ্য আমার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন, যেহেতু অবিবাহিত ব্যাচেলার হিসেবে আমার এক স্ত্রীও নেই। এবং তাঁদের মতে এটা খুবই করুণ অবস্থার কথা। অবশ্য কোথাও কোনো স্ত্রীলোকের দিকে আমার যাবার উপায় নেই, কেননা আমাকে পুরোহিত হিসেবে উপযুক্ত পদমর্যাদা রক্ষা করে চলতে হবে, পুরোহিতদের স্থানীয়ভাবে বলা হয় 'আহোম' (ahom)। কথাটি অবশ্য 'প্রিস্ট' বা পুরোহিত ব্যতীত অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের প্রতি সম্মান দেখানোর জন্যেও বলা হয়ে থাকে। এমনকি যারা জানে না আমি একজন পুরোহিত, তারা আমাকে একজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ হিসেবে গণ্য করে ; অতএব আমার দিক থেকে আমাকে শ্রেষ্ঠ আচরণ করতে হবে এবং সেইভাবে চলতে হবে।

যখন আমি বুঝলাম উপযুক্ত সময় হয়েছে, তখন কর্নেল কুও-কে আমি বললাম যে, পাও-তাও একটি শক্তিশালী মুসলিম সংস্থা গঠন করলে খুবই ভালো হয়। তাহলে আমাদের মধ্যে ঘনঘন মেলামেশা ও মতামত বিনিময় এবং সাধারণ স্বার্থ-রক্ষা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ইত্যাদির ক্ষেত্রেও অনেক সুবিধে হবে। এবং এই উভয় সংগঠন মিলিতভাবে কাজ করলে, এই ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও ভালো লাভ হতে পারবে। কেননা, পশম কারবারিরা নানান ঝামেলা ভোগ করে তিয়েন-সিনে পশম পাঠাতে যাবে কেন—যখন তারা নিকটস্থ পাও-তাও এলাকায় আমাদের এই নতুন পারচেজ-মিশনে তারা যে দাম পাবে, তা তো তিয়েনসিন কেন্দ্রে তারা যে দাম পায় তার চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়। এবং পাও-তাও মুসলিম অ্যাসোসিয়েশানও তাদের সম্প্রদায়কে অর্থাৎ প্রতিবেশী মুসলিম পশম কারবারিদেরও সেই একই পরামর্শ দিতে পারে। তাছাড়া, সরাইখানার মালিকরাও আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারে—তাদের কারবার থেকে আয়ের কোনো রকম ক্ষতি না করেই। কর্নেল কুও সম্পূর্ণ একমত হলেন আমার সঙ্গে, এবং আমার পরিকল্পনাকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করলেন সংশ্লিষ্ট এলাকার মুসলিম জনসম্প্রদায়ের মধ্যে সেকথা প্রচার করতে। এভাবে কাজ করে বেশ উল্লেখযোগ্য ভালো ফল হলো, এবং কয়েক মাসের মধ্যেই পাও-তাও হয়ে উঠলো পশম কারবারের ক্ষেত্রে কেন্দ্রবিন্দু। ব্রিটিশরা দেখলো তাদের পশম আমদানির ক্ষেত্রে তিয়েনসিন সূত্র একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

আমাদের এই কাজের দ্বারা ম্যানচেস্টার ও ল্যাংকাশায়ারের কী ক্ষতি হলো, তার সঠিক পরিমাপ করা মোটেই সম্ভব ছিল না। কিন্তু তা বড় রকমের হতেই বাধ্য। চীনা মুসলিম কারবারিরা এবং সরাইখানার মালিকরাও আমাকে যথেষ্ট সমর্থন জানিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন সেরা ধনী, আমার কাজের জন্যে একটা গোটা বাড়িই ছেড়ে দিলেন—যা আমি অফিস হিসেবে ব্যবহার করেছিলাম পাও-তাও এলাকায় আমার পাঁচ মাস অবস্থানকালে। এই ধনী লোকটিকে আমি

মুসলিম অ্যাসোসিয়েশানের প্রেসিডেন্ট পদে নিযুক্ত করতেও সমর্থ হলাম।

আমাদের এই অ্যাসোসিয়েশানের অগ্রগতির কাজে ইয়োমেন সম্প্রদায়ের সাহায্য, বিশেষত মিস্টার নাগাশিমার সহযোগিতাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নাগাশিমা ছিলেন ওয়াসেডা ইউনিভার্সিটির একজন গ্রাজুয়েট এবং ফুকুওকা এলাকার অধিবাসী। তিনি আমার পাও-তাও এলাকায় আগমনের কয়েকমাসের মধ্যেই আমার সঙ্গে যোগ দিলেন। নাগাশিমা ছিলেন একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং আর্মি রিজার্ভ বাহিনীর একজন লেফটেনান্ট। তিনি সামরিক কাজের নির্দিষ্ট সময় ছাড়া অন্য সময়ে একজন সিভিলিয়ান হিসেবে আমাদের সঙ্গে কাজ করতে পারেন।

নাগাশিমা ছিলেন একজন বুদ্ধিজীবী এবং একই সঙ্গে সামরিক অস্ত্রশিক্ষায় খুব দক্ষ। সামরিক অস্ত্রশিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অষ্টম শ্রেণীভুক্ত। তাঁর এই শিক্ষাগত যোগ্যতার ফলে রেগুলার আর্মির মধ্যে জোর-জবরদস্তি এড়ানো সম্ভব হয়েছিল। কেননা তিনি বরাবরই এই যুক্তি দেখিয়ে পার পেতেন যে, নতুন শিক্ষার্থীদের অস্ত্রশিক্ষা দানের ক্ষেত্রে তিনি খুবই সহায়ক।

আমার পরামর্শ মতো নাগাশিমার কাজ হলো আমাদের মুসলিম ভাইদের একত্রিত করা এবং তাদের সংগঠনগুলিকে সংহত করা—যাতে তারা যথাসময়ে তাদের ন্যায্য রাজনৈতিক দাবিদাওয়া পেশ করতে পারে। অবশ্য আমার সর্বদাই লক্ষ্য ছিল যাতে আমাদের কাজ চীনের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের পর্যায়ে না পড়ে—আমরা আমাদের বন্ধুদের কেবলমাত্র ব্যক্তিগত ও সঠিক পরামর্শ দিতে চাই।

রমজানের মাস পড়লো আমার পাও-তাও এলাকায় অবস্থানকালের প্রথম দিকে। কর্নেল কুও এবং আমি যোগ দিলাম এই বিশেষ প্রার্থনা অনুষ্ঠানে, এবং উপবাস করলাম ঠিক আমাদের অন্যান্য মুসলিম ভাইদের মতোই। আমরা এ বিষয়ে কখনো ফাঁকি দিইনি। প্রকৃতপক্ষে, এই উপবাসে আমার বেশ ভালোই লাগতো। আমি মনে করি যে, উপবাসের ধর্মীয় তাৎপর্য ব্যতীত নির্দিষ্ট সময় অন্তর উপবাসের ফল স্বাস্থ্যগত কারণেও বেশ উপকারী। অবশ্য, উপবাসের পরেই অতিরিক্ত খাওয়ার বিপদ এড়িয়ে চলা উচিত, অন্যথায় পাকস্থলির গোলমাল দেখা দিতে পারে।

কর্নেল কুও পাও-তাও ছেড়ে গেলেন এবং আবার মানচুকুও ফিরে এলেন ঠিক রমজান মাসের পরে, ১৯৩৭ সনে। আমি ফিরে এলাম নাগাশিমার সঙ্গে, ১৯৩৮ সনের গোড়ার দিকে; যুক্তিসংগত ভাবেই আমি নিশ্চিন্ত হলাম এই ভেবে যে, আমাদের সংগঠিত প্রতিষ্ঠানটি নিজস্ব পথেই ঠিকমতো সব ভালোভাবেই চলবে। আমরা আশা করেছিলাম, তিয়েনসিন থেকে মাংগোলিয়ান ও চীনা পশমের ইংল্যাণ্ডে রফতানির ক্ষেত্রে ১৯৩৬ সনটিই হবে শেষ বছর। এই খবর অবিলম্বে ছড়িয়ে পড়লো জাপানে এবং অন্যান্য দেশে।

টোকিওতে ব্রিটিশ দূতাবাসে একজন ইনটেলিজেন্স অফিসার ছিলেন, নাম তাঁর—ফিগ্‌স (Mr. Figges)—যিনি কালক্রমে ব্রিটিশরাজ ষষ্ঠ জর্জের কাছ থেকে 'নাইট' উপাধি পেয়েছিলেন বলে জানতে পারলাম। তাঁর অধীনে এক বিশেষ গোয়েন্দাবাহিনী ছিল, এবং তার জন্যে বিশেষ খরচের বাজেট ছিল কেবল মাত্র আমার ও আমার কাজকর্মের ওপর নজর রাখার জন্যে। তাছাড়া, তিনিও আমাকে তাঁদের কর্তৃপক্ষের দেখাদেখি 'মানচুকুও নায়ার' বলে উল্লেখ করতেন। আমি যতদূর হাসতে পেরেছিলাম, এই ফিগ্‌স সম্ভবত আমার নাম 'বিপজ্জনক' থেকে 'অতি বিপজ্জনক' ভারতীয় বলে তাঁর নোটবুকে লিখে নিয়েছেন, এবং রাসবিহারী বসুর সঙ্গে একসঙ্গে নাম দুটি চিহ্নিত করেছেন। হয়তো খারাপ লাগতে পারে, কিন্তু আমার কোনো ব্যক্তিগত কুচিন্তা ছিল না এই ফিগ্‌স-এর বিরুদ্ধে (বা অন্য কোনো ব্রিটিশ ইনটেলিজেন্স অফিসার বা কর্মরত অন্য কারো বিরুদ্ধেই)। আমার একমাত্র রাগের কারণ, যখনি নিজের মনে বিচার করতে বসি, তখনি দেখতে পাই ব্রিটিশ সরকার প্রতিষ্ঠানগত ভাবে ভারতে যে দাসরাজ চালাচ্ছে, কেবলমাত্র তার বিরুদ্ধেই, এবং তার অবসান ঘটানোই আমার একমাত্র লক্ষ্য, সেদিকেই আমার কার্যকলাপ কেন্দ্রীভূত। তাই আমি বিশ্বাস করি কম-বেশি যাই হোক, মংগোলিয়ায় আমার কাযকলাপ সেই হিসেবে আর সে ক্ষেত্রে একটা কার্যকরী ব্যবস্থা।

তাই, আমার কাজের নিট ফল হলো ১৯৩৬ পর্যন্ত এতদিন যে পশম ইংল্যাণ্ডে চালান যেত, এখন থেকে তা জাপানে যেতে শুরু করলো। ভারতে ব্রিটিশ বস্ত্রের ও ইংল্যাণ্ড থেকে আমদানি অন্যান্য জিনিসের বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধীর 'বয়কট আন্দোলন'ই ছিল এক্ষেত্রে আমার কাজের প্রেরণা স্বরূপ ; তাই আমার লক্ষ্য হলো, তিব্বতী ও মংগোলিয় পশম যাতে ম্যানচেস্টার ও ল্যাংকাশায়ারে না যায়, তার সক্রিয় ব্যবস্থা করা। আমি আনন্দিত যে, আমি একাজে প্রায় একক ভাবে সংগ্রাম করে লক্ষ্যে পৌঁছতে পেরেছি।

লেফটেনাণ্ট ইয়ামামোতো (Lt. Yamamoto) নামে একজন রিজার্ভ অফিসার ছিলেন ; তাঁর মাথায় একসময় খেয়াল চাপে, উজিনোতে যদি একটা জাপানি সামরিক ফাঁড়ি (তোকুকুমু-কিকান) স্থাপন করা যায়, তাহলে মানচুকুও এবং জাপানের দিক থেকে মধ্য-মংগোলিয়ায় সম্প্রসারণ কর্মের সুবিধে হবে। তিনি কথাটা জানালেন কর্নেল রিউইকিচি তানাকার (Col. Ryuikichi Tanaka) কাছে, এবং অর্থ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সাহায্য চাইলেন যাতে অন্তত আধ ডজন জাপানি স্টাফ নিয়ে উজিনোতে গিয়ে প্রাথমিক তদন্ত ইত্যাদি করে দেখা যায় সেখানে সামরিক ফাঁড়ি স্থাপন ও আনুষঙ্গিক কাজকর্মের সম্ভাবনা কতখানি। কর্নেল

ইয়ামামোতোর এই পরিকল্পনাটা কর্নেল তানাকার মনে ধরলো, এবং কর্নেল ইয়ামামোতোকে সর্বপ্রকার সাহায্য দিয়ে সহযোগিতা করলেন। অতঃপর কর্নেল ইয়ামামোতো তাঁর দলবল নিয়ে 'হিনোমারু'সহ (Hinomaru, জাপানের জাতীয় পতাকা) ঘোড়ায় চেপে চললেন উজিনোর পথে, এবং ফিরে এসে কর্নেল তানাকাকে জানালেন যে, সামরিক ফাঁড়ি স্থাপনের পক্ষে উজিনো হলো আদর্শ স্থান।

জাপানি আর্মির কয়েকজন বন্ধু এবিষয়ে আমাকে বললেন, এবং আমি এ খবরে বেশ একটা ধাক্কা খেলাম, বিশেষত ঐ প্রস্তাবের অসারতায় ও বোকামিতে। আমি উজিনো স্থানটি ভালোই জানতাম এবং তার ভূপ্রকৃতি পর্যন্ত খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছি। সেখানে চীনা উপস্থিতি যদিও জবরদস্তিমূলক নয়, তবুও তা বেশ শক্তিশালী। তাই, জাপানি কর্তৃপক্ষ যদি সেখানে সামরিক ফাঁড়ি স্থাপন করতে চান তাহলে সেক্ষেত্রে তাঁদের দিক থেকে প্রাথমিক কর্তব্য হবে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে তবে অন্য কাজ করা। অথচ কার্যত না আছে সেরকম কোনো নিরাপত্তার অস্তিত্ব, না আছে তার কোনো পরিকল্পনার আয়োজন বা ব্যবস্থা। আমি কর্নেল তানাকাকে এবিষয়ে সাবধান করে দিলাম, বিশেষত কর্নেল ইয়ামামোতোর পরিকল্পনা অনুমোদন করার মধ্যে যে ভয়ংকর বিপদের সম্ভাবনা জড়িত আছে সেকথা তাঁকে বললাম। কিন্তু যাঁর জুতোর চেয়ে পা বড় এবং মনের দিক থেকে যিনি কিছুটা অস্থিরমতি, তিনি একথায় ঠিক কান দিলেন না; তিনি ভাবলেন 'হিনোমারু' (জাপানের জাতীয় পতাকা) সর্বশক্তিমান, অতএব আর কোনো চিন্তা নেই। অতঃপর তিনি জনৈক মেজর এজাকি (Maj. Ejaki) এবং ১৫ জন স্টাফের একটি দলবলকে পাঠালেন উজিনোতে একটি সামরিক ফাঁড়ি স্থাপন করতে। সেখানে একটি বেতারযন্ত্রের সেট এবং একজন অপারেটারকেও পাঠানো হলো।

এক মাসের মধ্যেই উজিনোর এই জাপানি সামরিক ঘাঁটিটিকে চীনা আর্মি একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিল : জাপানি অফিসারদের প্রত্যেককেই হত্যা করলো। যতদূর আমি জানি, এই মর্মান্তিক কাহিনী কোনোদিনই সরকারিভাবে কিংবা অন্য কোনো ভাবে প্রকাশ করা হয়নি। সম্ভবত, আর্মির মধ্যেও খুব সামান্য কয়েক জনই এই 'উজিনো এজাকি কিকান' ঘটনার কথা জানে—কেননা তা কর্তৃপক্ষের দিক থেকে 'টপ সিক্রেট' বা অত্যন্ত গোপন রাখা হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকান আর্মি থেকে এই কোয়ানটুং আর্মির ব্যাপারে একটা 'ম্যারাথন' তদন্ত হয়েছিল; সঙ্গে ছিলেন মেজর ফুজিওয়ারার মতো মানুষ (সন্দেহ করা হয়, ইনিই নাকি ইনডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি স্থাপন করেন ক্যাপটেন মোহন সিং নামে জাপানের হাতে জনৈক যুদ্ধবন্দীর সাহায্যে)। কিন্তু আমার সন্দেহ হয়, এমনকি তারাও এই উজিনো-হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে প্রকৃত ঘটনার কিছু জানতে পেরেছে কিনা।

আরেকটি দুর্ঘটনা ঘটলো এই সংগঠনের পক্ষে—যে সংগঠন আমি পাও-তাও

এলাকায় গড়ে তুলেছিলাম মাত্র দু'জন অফিসার – কর্নেল কুও এবং লেঃ নাগাশিমার সাহায্যে। ঘটনাটা ঘটলো যখন জনৈক কর্নেল নাকামুরাকে নিয়োগ করা হলো কালগানে অবস্থিত জাপানি আর্মি হাইকম্যাণ্ড-এর অর্থনৈতিক দফতরে। আগেই উল্লেখ করেছি কিভাবে আমি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা করেছিলাম – পাও-তাও এলাকায় অবস্থিত জাপানি মিশন কর্তৃপক্ষ পশমের কারবারিদের সেই একই দাম দেবে যা তারা তিয়েনসিন এলাকার বিদেশি ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে পেয়ে থাকে। এই মূলনীতিই ছিল আমার সমগ্র পাও-তাও পরিকল্পনার বনিয়াদ বা গোড়ার কথা। কিন্তু কর্নেল নাকামুরা যখন মঞ্চে আবির্ভূত হলেন, তাঁর মাথায় একটা দারুণ বুদ্ধি এলো, যেহেতু এখানে জাপানি কর্তৃপক্ষ বেশ শক্তিশালী, অতএব চীনা মরুযাত্রীদের বা পশম কারবারিদের প্রতি আর্থিক ও অন্যান্য ব্যাপারে অতখানি উদারতা দেখানোর কোনোই প্রয়োজন নেই। তাই কর্নেল নাকামুরা সায় দিলেন কিংবা সম্ভবত আদেশ দিলেন পশমের দাম কমিয়ে দেওয়া হবে – পশম কারবারিদের কাছে যা ক্ষতিকর মনে হলো। পশম কারবারিদের চিন্তা হলো তাদের শোষণ করা হচ্ছে।

আমার বন্ধু নাগাশিমা যিনি 'কাবেব কানোমাতসু' সংস্থার জনৈক স্টাফের মাধ্যমে জানতে চান ব্যাপারটা কী, তখন খুবই বিব্রত হলেন এবং আমাকে সেকথা জানালেন। আমরা কর্নেল নাকামুরার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম এবং তাঁকে সাবধান করে দিলাম তাঁর এই নীতির বিপদ সম্পর্কে। কিন্তু কর্নেল নাকামুরাও ছিলেন কর্নেল তানাকার মতো মাথামোটা ও ক্ষমতাগর্বী। আমরা তাঁকে 'উজিনো তোক্কুমু কিকান' ঘটনার কথাও স্মরণ করিয়ে দিলাম। কিন্তু তিনি তার জবাবে বললেন – উজিনো ছিল সেনাবিহীন একটা সামরিক ঘাঁটি মাত্র, আর এই পাও-তাও হলো অত্যন্ত শক্তিশালী এবং জাপানি সেনাদের দ্বারা সুরক্ষিত।

কর্নেল নাকামুরা ও তাঁর কালগান আর্মিকে নানা যুক্তিতর্কেও যখন বোঝাতে ব্যর্থ হলাম – তাঁরা কোনো যুক্তিতর্কের ধার ধারলেন না, তখন আমি টোকিও গেলাম, ১৯৩৮-এর বসন্তকালে – সেখানকার আর্মি হাইকমাণ্ডের কাছে অভিযোগ করতে। আমি প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেলাম যখন তাদের কাছ থেকে শুনলাম যে, আমি পাও-তাও এলাকা ছাড়বার প্রায় একমাস পরেই, আমি যে মুসলিম অ্যাসোসিয়েশানটি অনেক চেষ্টায় সংগঠন করেছিলাম তা ভেঙ্গে গেছে – জাপানি এজেন্টদের, সম্ভবত খোদ পারচেজ-মিশন কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থা জনিত কাজ-কর্মের ফলে। লোকজন অসন্তুষ্ট ও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল, যার ফলে চীনা কর্তৃপক্ষ সেই এলাকায় তাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করেছে, এবং সংস্থার সমস্ত জাপানি অফিসারদের হত্যা করেছে, এমনকি সেখানকার জাপানি আর্মির কমাণ্ডার একজন লেঃ কর্নেলকেও। অর্থাৎ পাও-তাও এলাকার জাপানি মিলিটারি পুলিশ কমাণ্ডকে চীনা বাহিনী একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে।

এই কাহিনীও ('পাও-তাও' ঘটনা বলে আখ্যাত) জাপানি আর্মির মধ্যে উজিনো-ঘটনার মতো গুঞ্জন তুললো। এই ঘটনায় চীনের বংশগত কারবারিরা দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হলো অন্তত বেশ কিছুকালের জন্যে, এবং বহু নির্দোষ জাপানির মৃত্যু হলো মারামারি খুনোখুনির মতো ঘটনার প্রতি স্থানীয় জাপানি কর্তৃপক্ষের অবহেলার ফলেই। কোয়ানটুং আর্মি ক্রমে এত বেশি মাত্রায় আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠলো যে, প্রাথমিক বাস্তব জ্ঞানও হারিয়ে ফেললো। এই সমস্ত ঘটনা, দুর্ভাগ্য-ক্রমে আমার নিয়ন্ত্রণের আওতার মধ্যে পড়ে না। আমার কাজ শেষ হয়েছে ইংল্যাণ্ডে পশম চালান যাওয়া বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই। কিন্তু আমি দুঃখিত হলাম এই ভেবে যে, কয়েকজন অফিসারও তাঁদের নাকের ডগার ওপারের ঘটনাও দেখতে পান না। ঘটনা যা দেখলাম তাতে আমি মানচুকুও ফিরে এলাম গভীর দুঃখের সঙ্গে। কিন্তু নতুন ঘটনার ক্ষেত্র তখনো বাকি।

১৬.

আবার মানচুকুও

টোকিও থেকে সিংকিঙে ফিরে আসার পরে অর্থাৎ ১৯৩৮-এর মাঝামাঝি সময়ে আমি আশা করছিলাম, ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে প্রচারকর্ম এবং আনুষঙ্গিক দায়িত্ব ইত্যাদি আগের বছরগুলির থেকে আরো জোরদার করবো। তাছাড়া, উপদেষ্টা হিসেবে আমার কার্যকলাপ বিশেষত 'গোমিনসোকু কিইওয়া-কাই' (Gominsoku Kyowa-kai) এবং মানচুকুও প্রশাসনের সঙ্গেও আরো ঘনিষ্ঠতা বাড়ানো দরকার। আমি এইসব কাজের দিকে আরো বেশি মনোযোগ দিলাম, কিন্তু একই সময়ে নতুন যেসব রাজনৈতিক পরিস্থিতি মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল, তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লাম।

টোকিওতে যুদ্ধ মন্ত্রক এবং কোয়ানটুং আর্মির হেড কোয়ার্টার্স তাদের কাজকর্ম চালাচ্ছিল পুরোদমে। জাপানি ফোর্স চীনে জড়িত ছিল খুব বেশি রকম এবং তাদের উপস্থিতি চীনে ক্রমবর্ধমান ভাবেই অসন্তোষের সৃষ্টি করছিল। সেখানে অর্থাৎ চীনে প্রায়ই চিয়াং কাইশেক'এর আর্মির সঙ্গে জাপানি ফোর্সের সংঘর্ষ লেগেই থাকতো। ১৯৩৭ ডিসেম্বরে জাপানি ফোর্স শাংহাইতে চীনা ফোর্সকে পরাজিত করে এবং নানকিং দখল করে সেখানে দারুণ অত্যাচার মূলক কার্যকলাপ চালায়। কিন্তু চিয়াং কাইশেক তাঁর রাজধানী হানকাউতে স্থানান্তরিত করার পরে

আরো বড আকারে প্রতিরোধ শুরু করে দিলেন। জাপানি বাহিনী তখন প্রবল চাপের মধ্যে পড়লো। ফলে, কোয়ানটুং আর্মি ব্যাপকভাবে তার সম্প্রসারণ করলো এই নতুন পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্যে।

জাপান সরকারের অতিরিক্ত এক চিন্তার কারণ ছিল, রাশিয়ার দিক থেকে চীনে অথবা মানচুকুওয়, অথবা সম্ভবত দু'জায়গাতেই হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা। তোজো (Tojo, chief of staff) যখন কোয়ানটুং আর্মির প্রধান ছিলেন ১৯৩৬-৩৭ সনে, টোকিওকে সাবধান করে দেন এই বলে যে, এরকম সম্ভাবনার কথা উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে, কোরিয়ার পরিস্থিতির প্রতিও নজর রাখতে হবে। কোরিয়ান জাতীয়তাবাদ ক্রমশ একটা শক্তিশালী রূপ নিচ্ছিল। যেহেতু তিনটি শত্রু দুটোর চেয়ে খারাপ হতে পারে, অতএব জাপান কোরিয়ার প্রতি একটু নরম ভাবভঙ্গির নীতি গ্রহণ করেছিল; অন্তত সাময়িকভাবে এই কৌশল গ্রহণের প্রয়োজন ছিল – চীন ও রাশিয়ার দিক থেকে সম্ভাব্য আক্রমণের মোকাবিলার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পক্ষে।

মানচুকুও ঘটনাবলী এই পরিস্থিতিতে জাপানি কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনায় অগ্রাধিকারমূলক প্রাধান্য পেলো। টোকিও স্থির করলো, এই নবগঠিত রাজ্য মানচুকুওর অর্থনৈতিক বিকাশ ও সামরিক প্রতিরক্ষা প্রস্তুতির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলো।

মানচুকুওর অর্থ নৈতিক বিকাশের জন্যে বিচিত্র এক বৃহৎ ও ভারি শিল্প-পরিকল্পনা কার্যকরী করা হলো – জাপানি 'জাইবাৎসু' (Zaibatsu) ব্যবস্থার সহযোগিতায়। এই ব্যবস্থার ফলে বর্ধিত সংখ্যায় কর্মসংস্থানের সুযোগ হলো কেবলমাত্র মানচুকুও-বাসীর জন্যেই নয়, কোরিয়ানদের জন্যেও – যাদের সরাসরি নিয়োগ করে প্রচুর সংখ্যায় পাঠানো হলো নতুন কর্মকেন্দ্রগুলিতে। এটা ছিল একটা হিসেবি পদক্ষেপ, যেহেতু কোরিয়ার অর্থনৈতিক উন্নতিই দেশকে রাজনৈতিক দিক থেকে আশাপ্রদভাবে শান্ত রাখতে পারে। কোরিয়ান মজুরদের এমনকি জাপানের বিভিন্ন কাজের মধ্যেও নেওয়া হলো, বিশেষত কয়লাখনির কাজে। মানচুকুওর প্রতিরক্ষা শক্তিকে সম্প্রসারণ ও জোরদার করার জন্যেও কয়েকটি অতিরিক্ত আর্মি ডিভিশনকে জাপান থেকে আনা হলো। তাদের অধিকাংশকেই নিযুক্ত করা হলো চীনা সীমান্তের খুব কাছের এলাকাগুলিতে।

এইসব কার্যকলাপের একটা দুঃখজনক অংশ, বিশেষত মানচুকুওয় ক্রমবর্ধমান জাপানি মিলিটারি বাহিনীর উপস্থিতির ফলে কোরিয়ান স্ত্রীলোকদের মধ্যে বড় রকমের অধঃপতন দেখা দিল। চীনের 'রেডলাইট' জেলাগুলি জাপানি-নিয়ন্ত্রিত চীনা যুবতীতে ছেয়ে গেল এবং তা 'স্ক্যাণ্ডাল' বা নোংরামির নরকে পরিণত হলো। মানচুকুওতে কোরিয়ান যুবতীদের দুর্দশার কারণ হলো প্রচুর সংখ্যায় তাদের 'রিক্রুট' করা হলো জাপানি বাহিনীর অগ্রবর্তী ঘাঁটির সৈন্যদের আমোদ-ফুর্তির জন্যে।

এর মধ্যে জাপানি মেয়েরাও ছিল, কিন্তু সংখ্যায় অপেক্ষাকৃতভাবে সামান্য কয়েকজন মাত্র।

এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার একটা অঙ্গ ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মানচুকুওর মধ্যবর্তী 'বাফার' এলাকাগুলি এবং জাপানি নিয়ন্ত্রিত অন্যান্য এলাকাগুলির রক্ষণাবেক্ষণ। মধ্য-মংগোলিয়া ইতিমধ্যেই এরকম একটি এলাকায় পরিণত হয়েছে, কিন্তু টোকিওর আর্মি হাইকমাণ্ড-এর গোপন পরিকল্পনা ছিল এরকম আরেকটি এলাকা সৃষ্টির। এটা ছিল সম্পূর্ণ একটা অভিনব কল্পনা।

বিরাট সংখ্যক কোরিয়ান পলাতকরা ছড়িয়ে পড়লো সীমান্তের ঠিক অপর পারের সোভিয়েত এলাকার মধ্যে। জাপানের পরিকল্পনা ছিল এই সীমান্ত এলাকায় ঢুকে পড়ে তাদের ধরে আনা এবং তাদের মাথা থেকে নিজস্ব মতলব পরিত্যাগের ব্যবস্থা করে রাশিয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্যে উত্তেজিত করা—যাতে তারা সংশ্লিষ্ট এলাকায় সংখ্যাগুরুর রাজনৈতিক স্বায়ত্ত-শাসন পাওয়ার পক্ষে কাজ করে। পরিকল্পনাটা আপাতদৃষ্টে সুদূর কল্পনা বলে মনে হতে পারে, কিন্তু জাপানি মিলিটারি এ বিষয়ে রীতিমতো দৃঢ়চিত্ত ছিল, এবং তারা চাইছিল পরিকল্পনা মতো যথাশীঘ্র কাজ শুরু করতে। যদি তা কার্যকরী ভাবে সফল হতো, কোরিয়ান পলাতকরা তাহলে জাপানের প্রতিই অনুগত থাকতো, অর্থাৎ স্বায়ত্তশাসিত দ্বিতীয় 'বাফার' এলাকার ব্যবস্থা করা হতো।

এটা নিঃসন্দেহে একটা জটিল কাজ। কোরিয়ান সহযোগিতা ছিল অনিবার্য, এবং যার অর্থ হলো একজন কোরিয়ান নেতাকে তালিকাভুক্ত করা। জাপান সরকার ভাবছিল মিঃ লি-কাই-তেন'-এর (Mr. Lee Kai-ten) কথা—সেকালের একজন অগ্রণী স্বদেশপ্রেমিক।

তখনি কথা ওঠে : মিঃ লি কেন ? কারণটা হলো, একদিকে কোরিয়ানদের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা, এবং অন্যদিকে কোরিয়ার স্বাধীনতার জন্যে জাপানি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর কূটনৈতিক যোগাযোগ। অর্থাৎ সমকালীন রাজনৈতিক বা ব্যুরোক্রাটদের কাছে লি-কাই-তেন ছিলেন একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা বিশেষ। কিন্তু তাঁরা অবশ্যই জানতেন মিঃ লি একজন জাতীয়তাবাদী, কিন্তু কতখানি বা কি পরিমাণে, তা জানতেন না। কিন্তু যাঁরা তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন তাঁরা বলেন, মিঃ লি-র মনপ্রাণ ছিল স্বদেশপ্রেমের আগুনে পূর্ণ এবং জাপানি প্রভুত্বের হাত থেকে স্বদেশকে মুক্ত দেখতে ও স্বাধীন করতে দৃঢ়চিত্ত। মিঃ লি এমন কিছুই করবেন না যাতে তা আপাতদৃষ্টেও তাঁর এই মনোভাবের বিরোধী হতে পারে। কিন্তু সংখ্যায় খুব অল্পজনই ছিলেন যাঁরা মিঃ লি-কে যথেষ্ট ভালোভাবে জানতেন। মিঃ লি এমনই চতুর ও কূটকৌশলী ছিলেন যে, কোরিয়ান স্বাধীনতার পক্ষে

অত্যন্ত কার্যকরী গোপনতার সঙ্গেই তিনি তাঁর কাজকর্ম চালিয়ে যেতে পারেন : বাহ্যত আপাতদৃষ্টে মনে হবে তিনি যেন একজন নরমপন্থী, এবং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আপোষরফায় পৌঁছুতে বৈঠকের টেবিলে বসতেও রাজী। সুতরাং বেশ কয়েকটি পরিস্থিতিতে জাপান সরকারের কাছে তাঁকে বেশ 'গ্রহণযোগ্য' ও নরমপন্থী কোরিয়ান জাতীয়তাবাদী বলে মনে হলো। কোরিয়ান পলাতকদের কাজে লাগানোর পরিকল্পনা, জাপানিদের মতে এরকমই একটা পরিস্থিতি।

আমি ছিলাম মিঃ লি কাই-তেন'এর চরিত্র এবং কোরিয়ান স্বাধীনতার পক্ষে তাঁর কার্যকলাপের ধারাধরন সম্পর্কে ঘনিষ্ঠভাবে ওয়াকিবহালদের মধ্যে একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমরা পরস্পর ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হলাম আমাদের মেলামেশার মাধ্যমে, বিশেষত রিয়োহেই উচিদা (Mr. Ryohei Uchida) – ব্ল্যাক ড্রাগন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁর দক্ষিণহস্ত স্বরূপ মিঃ মিৎসুরু টয়ামার (Mr. Mitsuru Toyama) সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে। এই দু'জন অত্যুগ্র জাতীয়তাবাদী জাপানি আমাদের অনেক ভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছিলেন। তাঁরা দু'জন ছিলেন বিশিষ্ট মানুষ। টয়ামার কথা আমি আগেই বলেছি (রাসবিহারী বোস সম্পর্কিত অধ্যায়ে)। টয়ামাকে আমি ব্যক্তিগত ভাবেই জানতাম কিয়োটোতে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনগুলিতে, এবং সেখানেই আমি রিয়োহেই উচিদার সংস্পর্শে আসি। রিয়োহেই-এর মৃত্যু হয় টিউবারকুলোসিস রোগে, ১৯৩৩ সনে। আমি অল্প কয়েকবারই তাঁকে দেখেছি এমনকি তাঁর রোগশয্যায়, এবং দেখে আশ্চর্য হয়েছি কিভাবে তিনি নিজেকে কঠোর পরিশ্রমের কাজের সঙ্গে যুক্ত রেখেছিলেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত। তিনি ছিলেন একজন লৌহকঠিন দৃঢ়চিত্ত মানুষ।

এই রিয়োহেই ও টয়ামার দিক থেকে মিঃ লি এবং আমার প্রতি অনুরাগের কারণ হলো – আমাদের উভয়ের সংশ্লিষ্ট দেশের পক্ষে গভীর স্বদেশপ্রেম – যা ছিল তাঁদের বিচারে জাপান সম্রাট ও সমগ্র জাপানের প্রতি গভীর আনুগত্যের সমান। এই ঘটনার মধ্যে কিছু লোক অবশ্য একটা স্ববিরোধের কথা বলতে পারেন। যেহেতু আমি যতদূর জানি জাপানি নেতাদের মনোভাব বোঝা খুবই কঠিন, তাই এটা মনে হবে খুবই আশ্চর্যের যে, তাঁরা উভয়েই সমান সহানুভূতিপূর্ণ ছিলেন মিঃ লি-র প্রতি – যিনি ছিলেন জাপানি কর্তৃত্বাধীন কোরিয়াবাসী। সাধারণ মনোভাব এই হতে পারে যে, তাঁরা এমন কিছুই করতে চান না যা ক্ষতিকর হতে পারে, কিংবা তাঁদের হয়তো কিছুই করণীয় নেই যা কোরিয়াবাসী এই মিঃ লি'কে তাঁর জাপানি কর্তৃপক্ষের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার প্রয়াস থেকে নিবৃত্ত করতে পারে। কিন্তু মনুষ্যচরিত্র বা মনোবিজ্ঞান সত্যই আশ্চর্যভাবে কাজ করতে পারে, বিভিন্ন মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ভাবে।

মিঃ রিয়োহেই ও মিঃ টয়ামার দক্ষিণপন্থী চরম মনোভাবের বিরুদ্ধে সমালোচকরা যাই বলুন না কেন, ব্ল্যাক ড্রাগন সোসাইটির এই নেতারা ছিলেন সংস্কৃতি সম্পন্ন।

তাঁরা মিঃ লি'র স্বদেশপ্রেমের গভীর আন্তরিকতায় এতই অভিভূত হয়েছিলেন যে, তাঁরা এমন কিছুই করবেন না (যা করা তাঁদের পক্ষে সবচেয়ে সহজ ছিল, যদি তাঁরা ইচ্ছে করতেন) যাতে মিঃ লি'র স্বদেশকে স্বাধীন করার কাজে বিন্দুমাত্র বাধা হতে পারে, এমনকি তা কোরিয়া হলেও না। একটা অস্বাভাবিক ধরনের পরিস্থিতি হলেও তা ছিল সম্পূর্ণ সত্য।

জাতীয়তাবাদই হলো অতএব আমাদের চারজনের পক্ষে (রিয়োহেই, টয়ামা, লি ও আমি) একটা সাধারণ মূল্যবোধ এবং মিলনক্ষেত্র। তবুও যাহোক আমাদের মধ্যে একটা সুস্থির বোঝাপড়া ছিল যে, আমরা কেউই পরস্পরের মূল্যবোধে আঘাত করবো না। প্রত্যেকেই আমরা নিজস্ব পথে কাজ করবো। যদি কেউ ইচ্ছে করে তাহলে সে এমনকি তার গতিবিধি বা কার্যকলাপ সম্পর্কেও অন্যকে কিছু নাও বলতে পারে, এবং তাকে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা চলবে না। তবুও আমাদের সাধারণ বন্ধুত্ব ছিল সম্পূর্ণ অটুট ও অন্তরঙ্গ। কিন্তু মিঃ লি এবং আমি—স্বেচ্ছায় ও নিজস্ব ধরনে আমাদের চিন্তাভাবনা ও কার্যকলাপের কথা পরস্পর বলাবলি করতাম। বেশ কয়েকটি উপলক্ষে আমরা একসঙ্গে ঘোরাঘুরি করেছি মানচুকুও এবং কোরিয়ায়; আমি সর্বদাই মিঃ লি'র ছদ্মবেশী কার্যকলাপের দক্ষতায় রীতিমতো মুগ্ধ হয়েছি।

মিঃ লি কাই-তেন ছিলেন দক্ষিণ কোরিয়াবাসী। তিনি ছিলেন একজন গোঁড়া জাতীয়তাবাদী এবং রাগী মানুষ—বিশেষত জাপান যখন কোরিয়া দখল করে নিল ১৯১০ সনে। মিঃ লি ও আমি একত্রে যখন মানচুকুওয় ছিলাম ১৯৩৮ সনে, তাঁর বয়স তখন প্রায় ৬৫; আমার প্রায় দ্বিগুণ বয়সী, কিন্তু কর্মক্ষমতায় আমার চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়: সম্ভবত অনেক বেশি। তাঁর বুদ্ধি ছিল ক্ষুরধারযুক্ত, আর দেহ ছিল যেন ইস্পাতকঠিন। তিনি ছিলেন ধনী পরিবারের সন্তান, এবং যখন দক্ষিণ-কোরিয়ার সিওলে থাকতেন তখন বেশ বিলাসবহুল জীবনযাত্রায় মানুষ হয়েও ব্যক্তিগতভাবে অভ্যস্ত ছিলেন অত্যন্ত শাদাসিধে সরল জীবন-যাপনে। তিনি ছিলেন ভেষজ টনিকে বিশ্বাসী এবং তাঁর স্বাস্থ্য ছিল তার উপযুক্ত প্রমাণ। মিঃ লি ধূমপান করতেন না, এবং খুব কদাচিৎ অ্যালকোহল পান করতেন খুব কড়া নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেই। আমাদের মধ্যে বয়সের এই বৈষম্য কখনো আমাদের আন্তরিক বন্ধুত্ব ক্ষুণ্ণ করেনি—যার সুচিহ্নিত ভিত্তিই ছিল আমাদের পরস্পরের স্বদেশ ও তার স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামের কঠিন সংকল্পের মধ্যে। সংগত কারণেই, তাঁর কার্যকলাপের ধরনধারণ ছিল আমার চেয়ে অনেক বেশি বিপজ্জনক।

লি'র জামাই কিন; তিনিও আমার একজন সেরা বন্ধু। কিন ছিলেন টোকিওর হিতোৎসুবাশি ইউনিভার্সিটির (Hitotsubashi University) একজন গ্রাজুয়েট।

তিনি ছিলেন একজন মেধাবী ছাত্র, গ্রাজুয়েট হন ১৯৩৫ বা ১৯৩৬ সনে; নিজের অধীত বিষয় অর্থনীতিতে তাঁর নাম ছিল সবার উপরে। টোকিওর হিতোৎসুবাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইকোনমিক্স ফ্যাকাল্টি' ছিল বিখ্যাত : যুদ্ধোত্তর জাপানের প্রধান-মন্ত্রীদের একজন মিঃ ওহিরা (Mr. Ohira), এবং আশাহি নিউজপেপারের (Asahi Newspaper) একজন বিখ্যাত সাংবাদিক মিঃ রিয়ু শিনতারো (Mr. Ryu Shintaro) এবং অন্যান্য কয়েকজন খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদও গ্রাজুয়েট হন এই হিতোৎসুবাশি বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই। লি'র জামাই কিন ছিলেন আমার প্রায় সমবয়সী। কিন ছিলেন লি'র মতোই একজন জাতীয়তাবাদী এবং তাঁর জুড়ি। শ্বশুর এবং জামাই মিলে স্বাধীনতা সংগ্রামী কর্মীদের নিয়ে দারুণ এক টিম তৈরি করেছিলেন।

একথা চিন্তা করাও ভুল হবে, এবং জাপানিদেরও এমন কোনো ধারণা ছিল না যে, লি কাই-তেন'কে কেনা যাবে, কিংবা তাঁকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে জাপানিদের এজেন্ট হিসেবে কাজ করানো যাবে। এমনকি জাপানিরা কখনো তাঁকে কোরিয়ানদের মধ্যে কাজের পক্ষে নিরাপদ মনে করেন নি, — তা সেই কোরিয়ানরা নির্বাসিত পলাতক বা অন্য যা কিছু হোক না কেন। কিন্তু তাহলেও জাপানিদের কিছু পরিমাণে ঝুঁকি নিতে হয়েছিল। কেননা, এই 'বাফার জোন' তৈরির কাজে কোরিয়ার জনপ্রিয় জাতীয়তাবাদী লি কাই-তেন'-এর সাহায্য ছাড়া অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিল না। জাপানিরা আপাতভাবে আশা করেছিল যে, রাশিয়ায় কোরিয়ার স্বায়ত্তশাসিত এলাকার ভবিষ্যৎ এবং তার ওপর কোরিয়ার কর্তৃত্ব ইত্যাদির আকর্ষণ হয়তো যুক্তিসংগত ভাবেই লি'কে আকৃষ্ট করবে একাজে তাঁর অংশগ্রহণের পক্ষে।

হান ওয়াকাবায়াশি-ও (Han Wakabayashi) যুক্ত ছিলেন ব্ল্যাক ড্রাগন সোসাইটির সঙ্গে; এঁকেই জাপান সরকার মধ্যস্থ হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন মিঃ লি কাই-তেন'এর সঙ্গে যোগাযোগ করে কোয়ানটুং আর্মির সাহায্যে 'বাফার' এলাকা তৈরির পরিকল্পনার কথা বুঝিয়ে বলতে। মিঃ লি তাঁরই শর্তে রাজী হয়ে গেলেন ঐ পরিকল্পনা মাফিক কাজ করতে।

মিঃ লি কোরিয়ান রিভল্যুশনারিদের গুপ্ত-আন্দোলনের নেতা নির্বাচিত হলেন — কোরিয়া, মানচুকুও, শাংহাই এবং চীনের অন্যান্য স্থানে; তাছাড়া রাশিয়ান এলাকাভুক্ত স্থানেও। এই সংস্থাই শাংহাইতে একটি ইস্কুল চালাবে — তার কাজ হবে লি'র পদ্ধতিতে কোরিয়ানদের গোয়েন্দাগিরির কলাকৌশল (Boryaku, espionage) শেখানো; সহযোগিতায় থাকবে কোয়ানটুং আর্মির জাপানি অফিসারবৃন্দ। এই শিক্ষাক্রম হবে দু'ভাগে বিভক্ত : একভাগে থাকবে 'আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক' শিক্ষা — যেটা মিঃ লি নিজে তদারক করবেন; এবং অন্যভাগে থাকবে 'ফিল্ড স্পাইং'-এর তত্ত্ব ও প্রয়োগ শিক্ষা — যার দায়িত্ব থাকবে জাপানি

অফিসারদের ওপর। মিঃ লি'র কূটকৌশল হলো 'নিয়ন্ত্রণের কলকাঠি' থাকবে সম্পূর্ণভাবে তাঁরই হাতে। তিনি নিশ্চিন্ত হতে চান এই দেখে যে, একাজে অংশ গ্রহণকারীরা প্রত্যেকেই মনপ্রাণ দিয়ে দৃঢ়চিত্ত হয়ে কোরিয়ার স্বাধীনতার জন্যে কাজ করছে কিনা; বিশেষত রাশিয়ান এলাকায় নির্বাসিত কোরিয়ানদের শিক্ষা-দানের কাজের সময়ে।

এই পরিকল্পনা রূপায়ণের সমস্ত আর্থিক দায়িত্ব জাপান সরকারের। যখন যেমন প্রয়োজন হবে ফাণ্ডের টাকাপয়সা হস্তান্তর করতে হবে, যৌথভাবে ওয়াকাবায়াশি ও লি'র হাতে। ওয়াকাবায়াশির হাতে যে টাকাপয়সা দেওয়া হবে তার অংশ-বিশেষ তিনি খরচ করতে পারবেন কোয়ানটুং আর্মি অফিসারদের জন্যে, এসব ক্ষেত্রে যা সাধারণত হয়ে আসছে; বাদবাকি অংশ খরচ করবেন মিঃ লি যেভাবে পছন্দ করেন। ওয়াকাবায়াশির ওপর ক্ষমতা দেওয়া ছিল তিনি নিজে প্রয়োজনমতো প্রতিবারই একটি পৃথক 'কমিশন' গঠন করতে পারবেন তাঁর যোগাযোগের কার্যকলাপের ('laison function') স্বার্থে।

মিঃ লি আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন তাঁর কাজে নির্দেশক হিসেবে যোগদানের জন্যে। তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের কথা বিবেচনা করে আমি 'না' বলতে পারলাম না; যদিও প্রথমেই আমি এটা পরিষ্কার করে নিলাম যে, আমি কেবলমাত্র মোটামুটিভাবেই গোয়েন্দাগিরির কলাকৌশল শিক্ষা দেবো, তার মধ্যে জাপানি বা কোরিয়ানদের পক্ষে বা বিপক্ষে থাকার কোনো প্রশ্ন থাকবে না। অন্যভাবে বলতে গেলে, আমি একজন 'নিরপেক্ষ' পরামর্শদাতা হিসেবেই কাজ করবো। এই গোয়েন্দাগিরির কলাকৌশল (Boryaku) শিক্ষাদানের তাত্ত্বিকদিকের ক্ষেত্রে; এবং কোনোক্রমেই এই পরিকল্পনার প্রকৃত রূপদানের কাজে জড়িত থাকবো না। আমার এই প্রস্তাব আমার বন্ধুদের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে সমর্থিত হলো। যেহেতু আমার মতো একজন 'বহিরাগত'র কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ একাজের মূল-নীতির সঙ্গে জড়িত, অতএব টোকিও কর্তৃপক্ষের অনুমোদনেরও প্রয়োজন আছে। মিঃ লি'র পক্ষে এই অনুমোদন লাভের পক্ষে কোনো অসুবিধা ছিল না। আমি তাঁকে সাহায্য করতে পেরে খুশি এইজন্যে যে, আমি সর্বদাই কোরিয়ার স্বাধীনতার পক্ষে, তা যে কোনো সূত্রে বা উপায়ে হোক না কেন।

একদল জাপানি বিশেষজ্ঞ যাঁরা প্রয়োজনীয় গোপনতার সঙ্গে ছদ্মবেশী সাহায্য দিতে পারেন, তাঁদের সাহায্য নিয়ে মিঃ লি সিংকিংয়াং-এ একটি গোয়েন্দাগিরি শিক্ষাদানের ইস্কুল খুললেন তাঁর পছন্দমতো জনা ৩০ কোরিয়ানদের নিয়ে, এবং তাদের জন্যে তিন মাসের 'ট্রেনিং কোর্স' শুরু করে দিলেন। এই প্রথম শিক্ষাক্রমের শেষে ঐ একইভাবে আবার দ্বিতীয় ব্যাচের শিক্ষাদান শুরু হলো। আমি ছিলাম একাধারে সামরিক পরামর্শদাতা ও অতিথি-নির্দেশক; ('কোর্স কোঅর্ডিনেটার'

এবং 'অনারারি অ্যাডভাইসার কাম গেস্ট ইনসট্রাকটার'); অধিকন্তু প্রধান তত্ত্বাবধায়ক (চিফ ওয়ার্ডেন)।

শিক্ষার্থীরা ট্রেনিং শেষে অর্থাৎ গ্রাজুয়েট হবার পরে এবং কাজ শুরু করার জন্যে প্রস্তুত হলে, মি. লি তাদের পাঠিয়ে দিতেন মানচুকুও-কোরিয়া-রাশিয়া সীমান্ত হয়ে সাইবেরিয়ায়। পরবর্তীকালে ১৯৪০-এর গোড়ার দিকে মিঃ লি নিজে সীমান্ত পার হয়ে সাইবেরিয়ায় যান – যখন সমগ্র এলাকাটি ছিল গাঢ় তুষারপাতে আচ্ছন্ন এবং যাতায়াতের পক্ষে অবস্থা ছিল অবর্ণনীয় ভাবেই কঠিন ব্যাপার। আমি তাঁকে সীমান্ত শহর কোনশুন পার হয়ে যেতে দেখেছিলাম। কোয়ানটুং আর্মি এবং টোকিওর জাপান মিলিটারি হাইকমাণ্ড আশা করছিলেন শীঘ্রই গুরুত্বপূর্ণ খবরাদি পাবেন এই দলের কাছ থেকে; কিন্তু কোনো খবরই আজ পর্যন্ত এসে পৌঁছায়নি। এবং এমনকি কেউই এইসব এজেন্ট বা তাদের নেতাদের বিষয়ে এ পর্যন্ত আর কিছু শোনেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, আমাকে খবর দেওয়া হয়েছিল যে, মিঃ লি ও আমি যেসব কোরিয়ানদের সিংকিয়াং-এ ট্রেনিং দিয়েছিলাম তাদের কয়েকজন উত্তর কোরিয়ার রাজনীতিতে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছেন। কিন্তু আমার পক্ষে দুঃখের বিষয় আমার বন্ধু মিঃ লি'র কী হলো, সে বিষয়ে আমি এখন পর্যন্ত কোনো প্রামাণ্য সংবাদ জোগাড় করতে পারিনি।

১৭.

আমার বিবাহ

১৯৩৮ সনের শরৎকালে, যখন আমি সিংকিয়াং-এ কোরিয়ান গোয়েন্দাগিরি শিক্ষাদান কেন্দ্রে কর্মরত, তখন আমি টোকিওতে এক স্বল্পকালীন সফরে যাই। আমি গিয়েছিলাম জাপানি হাইকমাণ্ড-এর অনুরোধে – মানচুকুও পরিস্থিতি সম্পর্কে টোকিওতে কয়েকটি অধিবেশনে যোগ দিতে। আমি এই সুযোগ গ্রহণ করে সরকারি আওতার বাইরে বেসরকারি স্তরেও আমার কিছু পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁদের মধ্যে ছিলেন মিঃ রিসুকে ফুওয়া (Mr. Risuke Fuwa) – টোকিওর একজন ব্যবসায়ী – ভারত সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে যাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল।

মিঃ ফুওয়া ছিলেন মিঃ ইমাগোরো আসামি-র (Mr. Imagoro Asami) এক জামাই; ইমাগোরো ছিলেন সাইতামা অঞ্চলের বিশেষ সম্মানিত গ্রামপ্রধান – যিনি সংশ্লিষ্ট এলাকার এক বিশিষ্ট অভিজাত পরিবারের প্রধান হিসেবেও

স্বীকৃত। আমার ব্যবসায়ী বন্ধু মিঃ রিস্কের বাড়িতে এক সন্ধ্যায় ডিনারের সময়ে তাঁর স্ত্রীর বোন অর্থাৎ মিঃ ইমাগোরো আসামি-র আরেক মেয়ে মিস ইকু আসামি-র (Miss Iku Asami) সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় ; তিনি তখন সাময়িকভাবে মিঃ রিস্কের বাড়িতে অতিথি হিসেবে ছিলেন। সেখানে মিস ইকুর সঙ্গে আমার খুব সামান্যই কথাবার্তা হয়েছে কিনা সন্দেহ, একমাত্র স্বাভাবিক সৌজন্যমূলক কথাবার্তা ছাড়া ; কিন্তু আমি দেখলাম তখনি আমি তাঁর কাছে বিশেষভাবে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছি।

যখন আমি টোকিওতে ছিলাম, আমার এই অনুভূতির কথা বিশেষভাবে নিজের মধ্যেই গোপন রেখেছিলাম। আমার মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব ছিল, বিশেষত এই প্রেমে পড়ার অভিজ্ঞতার বিষয়ে—অর্থাৎ তা হয়তো আমার তৎকালীন জীবনযাপন প্রণালীর সঙ্গে ঠিকমতো খাপ খাবে না। আমি ছিলাম ঠিক যেন একজন সামুরাই যোদ্ধার মতো (Ronin)—সাময়িকভাবে যার কোনো প্রভু অর্থাৎ উদ্দেশ্যের স্থিরতা নেই, এবং যে কেবলি ঘুরছে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়, কাজের জন্যে নির্দিষ্ট কোনো হেড কোয়ার্টার বা স্থায়ী বাসস্থান ছাড়াই। রাজনৈতিক ভাবে আমার এত কিছু করণীয় ছিল যে, আমি খুবই অনিশ্চিত অবস্থায় ছিলাম : আমি আদৌ বিবাহিত জীবনে স্থির হয়ে বসতে পারবো কিনা। আমি অতএব বিয়ের সমস্ত চিন্তাই পিছনে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু বারেবারেই সে চিন্তা ফিরে ফিরে আসতে লাগলো আমার কাছে। খুব শীঘ্রই অর্থাৎ সিংকিয়াং-এ ফিরে আসার পরেই আমার অনুভূতির কথা আমি মিস ইকু আসামি-র কাছে জানালাম, আমার এক ঘনিষ্ঠ জাপানি বন্ধু মিঃ কোরির (Mr. Kori) মারফৎ।

আমার সেই বন্ধু মিঃ কোরি এই প্রথম আমার মুখ থেকে এ বিষয়ে কথা বলতে শুনলেন। তিনি দারুণ উত্তেজিত হলেন। তিনি নিজের ঘাড়েই দায়িত্ব নিলেন এবিষয়ে তাঁর কী কর্তব্য হবে, অর্থাৎ : প্রথমেই কথাটা চাউর করতে হবে যে মিঃ নায়ার বিয়ে করতে ইচ্ছুক এবং মিস ইকু আসামিকে। এবং কথাটা চাউর করা তাঁর পক্ষে একটা দারুণ সাহসিকতার কাজ হবে, কিন্তু কেউই তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারবে না।

মিঃ কোরি বিভিন্ন উচ্চ পদাধিকারীদের কাছে টেলিগ্রাম পাঠালেন, যথা জাপানি মিলিটারি হাইকমাণ্ড, যুদ্ধমন্ত্রী জেনারেল ইতাগাকি (কোয়ানটুং আর্মির প্রাক্তন চিফ অফ স্টাফ) প্রভৃতিকে। টোকিওর ভারতীয়দের মধ্যে যাঁদের কাছে মিঃ কোরি খবর পাঠান তাঁদের মধ্যে ছিলেন—রাসবিহারী বোস প্রমুখ। মানচুকুও খবরটি শীঘ্রই ছড়িয়ে পড়লো, এবং তা পৌঁছলো সম্রাট পু-ই'র (Emperor Pu-yi) কাছে, তাঁর প্রধান সর্দার লেঃ জেনারেল কুদো'র (Lt. Gen. Kudo) মাধ্যমে। মিঃ লি কাই-তেন'কে সর্বপ্রথম বলতে হবে। খবরটি মিঃ কোরি নিজেই রচনা করেন এবং এমনভাবে বিভিন্ন স্থানে পাঠান তাতে মনে হয় যেন, মিস

ইকু'র সঙ্গে বিয়ের সবকিছুই পাকাপাকি, কেবলমাত্র বিয়ের তারিখটি ঠিক করা বাকি। যদিও তখনো পর্যন্ত আমার নিজের দিক থেকে বিয়ের ব্যাপারটা একটু অস্বস্তিকর ছিল, আমি নিজে অবশ্যই মিঃ কোরির এই সাহসী উদ্যোগে কোনো রকম বাধা দিইনি; এবং শেষ পর্যন্ত এই ভেবে নিশ্চিন্ত হলাম যে আমি এমন একজনকে পেয়েছি যিনি আমার ইচ্ছে আর প্রয়োজনটি বুঝেছেন, সেদিকে সক্রিয় দেখাশোনা করছেন, অথচ গোড়াতেই অর্থাৎ অস্বস্তি'র পর্বে সেই বিষয়ে আমাকে তেমন কিছু বেগ পেতে হলো না।

মিঃ কোরি অবশ্যই যথেষ্ট বিচক্ষণ ছিলেন; অর্থাৎ বিয়ের এই প্রস্তাবের কথা তিনি অন্যদের সঙ্গে যেভাবে বলেছেন, সেভাবে না বলে অন্যভাবে তিনি পাড়লেন মিঃ ইমাগোরো আসামি, অর্থাৎ মিস ইকু'র বাবার কাছে। অধিকন্তু মিঃ কোরি খবর পাঠানোর এমন ব্যবস্থা করলেন যাতে সরাসরি না গিয়ে খবরটি মিস ইকুর ভাইয়ের মারফৎ মিঃ ইমাগোরোর কাছে পৌঁছায়। আমার দিক থেকে অনুরোধ ছিল মিস ইকুকে বিয়ে করার ব্যাপারে তাঁর সমর্থন লাভ করা।

ঘটনা দ্রুত গড়িয়ে চললো। আপত্তি উঠলো মিঃ ইমাগোরোর কয়েকজন মেয়ের দিক থেকে। এটা প্রকৃতপক্ষে একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার যে একজন বিদেশিকে অনুমতি দেওয়া হবে জাপানি অভিজাত পরিবারে, বিশেষত একজন গ্রামপ্রধানের পরিবারের মেয়েকে বিয়ে করতে। ভারতীয়দের ক্ষেত্রে, রাসবিহারী বোসই ছিলেন একমাত্র নজির—যেখানে বিশিষ্ট ও সুপরিচিত জাপানি পরিবারের মেয়েকে বিয়ের অনুমতি দেওয়া হয়েছে যাঁর সঙ্গে, তিনি অন্তত জাপানের এক বিশিষ্ট ব্যক্তি মিৎসুরু টয়ামার চেয়ে কোনো অংশে কম ব্যক্তিত্বপূর্ণ নন। মিঃ ইমাগোরো স্বয়ং যাই হোক নিজের মন খোলা রেখেছিলেন। তিনি আমার সম্পর্কে জানেন, এবং নীতিগতভাবে এ বিয়ের কথায় তাঁর আপত্তি ছিল না আমাকে জামাই করতে; কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন এবিষয়ে আরো কিছু চিন্তাভাবনা করতে। ইতিমধ্যে আমার কাছে অভিনন্দন মূলক বার্তা আসতে শুরু করলো। পরিস্থিতি এমনই দাঁড়ালো যে, মিঃ লি কাই-তেন'এর ইস্কুলে কাজ থাকা সত্ত্বেও আমি মনে করলাম টোকিওতে আমার আরেকবার স্বল্পকালীন সফর করার প্রয়োজন আছে—অন্তত এই ব্যক্তিগত ব্যাপারে যে কোনো ভাবে একটা ফয়সালা করতে হবে আর দেরি না করে, এবং এবিষয়ে অযথা গুজব ও কানাঘুষা বন্ধ করতে হবে।

টোকিওতে আমার জন্যে অন্যান্য যেসব খবর ও চিঠিপত্র জমেছিল, তার মধ্যে ছিল জেনারেল ইতাগাকির নিজে হাতে লেখা আমার নামে একটা খামের চিঠি। এই খামের মধ্যে ছিল উষ্ণ শুভেচ্ছাবার্তা, এবং নগদ 'ম্যারেজ প্রেজেন্ট' বা উপহার হিসেবে ৩ হাজার' 'ইয়েন'। মুহূর্তের জন্যে আমি বিশ্বাস করতে পারিনি যে আমি সঠিক শুনেছি, কারণ ৩ হাজার ইয়েন তৎকালে একটা অবিশ্বাস্য অঙ্কের টাকা। কিন্তু তাছাড়া, খোদ জেনারেল ইতাগাকির শুভেচ্ছা বার্তাটিও ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ শুভেচ্ছা

বার্তা—এক্ষেত্রে লোকে যা আশা করতে পারে তার পক্ষেও সর্বোচ্চ ও আন্তরিক। আমি মিঃ ইমাগোরোর আত্মীয় স্বজনের আপত্তির কথা শুনেছিলাম ; সুতরাং আমি তাঁর কাছে জেনারেল ইতাগাকির শুভেচ্ছাবার্তা সহ খামটি (অবশ্যই টাকাটা নিজের জন্যেই রেখে দিয়ে) পাঠানো স্থির করলাম—যাতে মিঃ ইমাগোরো তাঁর পরিবারে আমাকে গ্রহণযোগ্য বলে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। তার ফল, আমি অল্পবিস্তর যা আশা করেছিলাম, হলো খুব দ্রুত। অর্থাৎ বিয়ের প্রস্তাবে আপত্তি ও প্রতিরোধের অবসান হলো, একমাত্র মিস ইকুর দুই বড বোনের দিক থেকে ছাড়া। মিস ইকুর এই দুই বড বোন এই ভেবে নিজেদের আশ্বস্ত করেছিলেন যে, আমার বিয়েটা হবে জাপানের পরাজয়ের পরে, ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে, এবং টোকিওতে আমার নিজস্ব বাড়ি থাকলে তবেই।

মিঃ ইমাগোবোর দিক থেকে একটাই প্রশ্ন ছিল : তাঁর মেয়ে আমাকে বিয়ে করলে মেয়ের পারিবারিক রেজিস্ট্রেশান বা 'কোসেকি' (Koseki) কী হবে, সেই বিষয়ে। এই পর্বে মিস ইকুর বড ভাইয়ের মারফৎ আমি খবর পাঠালাম যে, দুর্ভাগ্যক্রমে ভারত এখনো পর্যন্ত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনাধীন, কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস অবিলম্বে ভারত স্বাধীন হবে। এবং যখন তা ঘটবে, আমি কেবল তখনি তাঁর মেয়েকে বিয়ে করবো, যদি মেয়ে তখনো আমাকে বিয়ে করতে ও ভারতের নাগরিক হতে চান। মিঃ ইমাগোরো কিছুক্ষণের জন্যে চিন্তা করেন এবং সাশ্রু নয়নে তাঁদের পারিবারিক বেদীর সামনে তুলে ধরেন আমাকে লেখা জেনারেল ইতাগাকির খামের চিঠিখানি।

আমি জানতাম এই ঘটনার তাৎপর্য হলো, এই বিয়ের প্রস্তাবে তাঁর সম্মতি জ্ঞাপন। তিনি তাঁর ছেলের মারফৎ খবর পাঠালেন যে, তিনি সম্পূর্ণ সম্মত আমার বক্তব্যের সঙ্গে। তিনি তাঁর মেয়ে মিস ইকুর সঙ্গে আমার বিয়ের প্রস্তাবে সুখী। মেয়ের নাগরিকত্ব পরিবর্তন করতে হলে আমাকে ভারতের স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে ; কারণ তিনিও তাঁর মেয়েকে ব্রিটিশ প্রজা রূপে দেখেত চান না। আমি গভীরভাবে অভিভূত হলাম। আমার শ্বশুর ছিলেন জাপানের প্রথম সারির উচ্চ মর্যাদার অধিকারীদের অন্যতম—যিনি আন্তরিক ভাবেই বিশ্বাস করতেন ভারত অবিলম্বে স্বাধীন হবে। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি আর বেশিদিন বেঁচে ছিলেন না এই আনন্দের ঘটনা দেখার জন্যে। কিন্তু আমি নিজেকে প্রায়ই বলি—তিনি নিশ্চয়ই এই ঘটনায় স্বর্গে থেকেও সুখী হয়েছেন।

আমার নিজের পারিবারিক ঐতিহ্য অনুযায়ী, আমি আমার বড়ভাই ডাক্তার কুমারন নায়ারকে লিখলাম—মিস ইকু আসামিকে আমার বিয়ের প্রস্তাব জানিয়ে ; তাঁর ও আমার মায়ের জ্ঞাতার্থে আমি লিখে জানালাম মিস ইকুর পারিবারিক পরিচয়,

এবং এই বিয়ের প্রস্তাবে তাঁর ও মায়ের সম্মতিও প্রার্থনা করলাম। চিঠিখানি তাঁর কাছে পৌঁছবে কিনা এবিষয়ে আমি নিশ্চিত ছিলাম না; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা পৌঁচেছিল পোস্টম্যানের পরিবর্তে একজন পুলিশের মারফৎ। আমার বড় ভাইয়ের জবাব এসেছিল খুব শীঘ্রই : এই বিয়ের প্রস্তাবে আমার পরিবারের কোনো আপত্তি নেই। আমার মা তাঁর আশীর্বাদ জানিয়ে আরো আশা প্রকাশ করলেন এই বলে যে, আমি আমার স্ত্রীর ভরণপোষণে ভালোভাবেই সমর্থ হবো (সময়কালে ছেলে-মেয়েদের ক্ষেত্রেও – আর্থিক ও সামাজিক, উভয় দিক থেকেই : আমাকে হতে হবে একাধারে উপযুক্ত স্বামী ও পিতা। মায়ের আরো একটি ইচ্ছা ছিল : এই জগৎ ছেড়ে যাবার আগে অন্তত একবার যেন সপরিবারে আমার সঙ্গে দেখা হয়। আমি আবেগে অভিভূত হলাম। আমি মাকে লিখলাম এই কথা বলতে যে, ছোট ছেলের জন্যে তাঁর চিন্তা করা উচিত হবে না : যদি সে খুব বড মানুষ নাও হয়, তবু সে চিরকাল ভালো মানুষ হয়ে থাকবে। আমার বিশ্বাস, আমার এই কথা মাকে আশ্বস্ত করেছিল।

আমার সঙ্গে মিস ইকু আসামির বিয়ে হলো – ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯ তারিখে, টোকিওতে এক সরল ও অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্যে, – যে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আসামি পরিবারের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবরা ; তার মধ্যে ছিলেন মিসেস ইমাগোরো, এবং আমার কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব। এই গোটা দলে ছিলেন প্রায় ২০ জন মানুষ। আমার শ্বশুরমশায় আশীর্বাদ পাঠিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ আমার শাশুড়ির মারফৎ।

৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯ তারিখে আমার স্ত্রী ও আমি কোবের উদ্দেশে রওনা হলাম, এবং সেখান থেকে তার পরদিনই যাত্রা করলাম দাইরেন-এর উদ্দেশে ; সেখানে আমরা পৌঁছলাম ১১ ফেব্রুয়ারি তারিখে। তারপর বন্ধুবান্ধবদের দ্বারা আয়োজিত উৎসব-অনুষ্ঠানের উত্তেজনাপূর্ণ কয়েকদিন বাদে, আমি আবার গুছিয়ে বসলাম আমার স্বাভাবিক রাজনৈতিক কার্যকলাপের মধ্যে ; সেই সময়ে আমার প্রধান কাজই ছিল মিঃ লি কাই-তেন'এর ইস্কুলে শিক্ষাক্রমের কাজ চালিয়ে যাওয়া। সেখানকার কোরিয়ান নেতা মিঃ লি কাই-তেন আমাকে আবার ফিরে আসতে দেখে খুশি হলেন। আমি অবশ্যই ভুল করবো না – আমার বিয়ের উদ্দেশ্যে বিশেষ টোকিও যাত্রা ও ফিরে আসার জন্যে তাঁর আর্থিক সাহায্য ও সমর্থনের কথা গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করতে। তিনি আমাকে বেশ মোটা অঙ্কের টাকাই উপহার দিয়েছিলেন। যদিও আমি বেশ ভালোরকম উপহারই পেয়েছিলাম আমার অন্যান্য কয়েকজন শুভার্থীদের কাছ থেকে, এবং জেনারেল ইতাগাকির কাছ থেকেও বড রকমের উপহার পেয়েছিলাম ; তব্ মিঃ লি'র উপহারেই আমার ভালো রকম চলে যেত। তবে এই শুভবিবাহের খরচ খুব একটা সুলভ ছিল না।

সর্বদাই আমার অনেক কিছু করার ছিল, তার মধ্যে ছিল মানচুকুও এলাকার মধ্যে

ঘন ঘন যাতায়াত। আমার স্ত্রী এবং আমি একটি ভালো বাড়ি পেয়েছিলাম সিংকিং-এ আরামদায়ক জীবন কাটানোর পক্ষে। আমাদের প্রথম পুত্র, বাসুদেবন নায়ারের জন্ম হয় সিংকিং-এ ৮ ডিসেম্বর ১৯৩৯ তারিখে। আমি একদিনের জন্যেও আমার মায়ের ইচ্ছার কথা অর্থাৎ তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করার কথা ভুলিনি; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর আশা এবং আমারও বাস্তবে পরিণত হয়নি। বাসুদেবনের জন্মের ৫দিন পরে, আমার মা পরলোকগমন করেন। যদিও তিনি সেই সময় ছিলেন ৮০ বছরের বৃদ্ধা, তবু তাঁর মৃত্যু-সংবাদ আমাকে গভীর বেজেছিল। এবং তাঁর মৃত্যু এখনো আমাকে বিষণ্ণ করে তোলে, যখন আমি তাঁর কথা ভাবি এবং যেহেতু আমি প্রায়ই ভাবি।

১৮.

মানচুকুওয় শেষ কয়েকদিন

বিবাহের পরে এটা খুবই স্বাভাবিক যে, অধিকাংশ মানুষই এমনকি যাঁরা প্রথম দিকে সক্রিয় জনজীবন যাপন করেছেন তাঁরাও একেবারে না হোক অন্তত একটুখানি শান্তিপূর্ণ পারিবারিক জীবনযাপনের মধ্যে স্থিতি হয়ে বসতে চান। প্রকৃত পক্ষে, বন্ধুদের মধ্যে যাঁরা ভাবেন রাজনৈতিক কার্যকলাপের মধ্যে এখনো আমার 'রোনিন' বা যোদ্ধার বিপজ্জনক ভূমিকা রয়েছে, তাঁরা পরামর্শ দিলেন এখন আমার একটা স্থায়ী, সম্ভবত অত্যন্ত লোভনীয় ধরনের বড দরের অরাজনৈতিক কাজ নেওয়াই ভালো। আমার পক্ষে এরকম উচ্চপদের কাজ নেওয়ার সুযোগের অভাব ছিল না, তা মানচুকুও বা জাপান—যেখানেই হোক না কেন। একমাত্র ভারতেই আমার কর্মপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নেই, কেননা সেখানে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সর্বদাই আমাকে জেলবন্দী করে রাখতে চায় স্বদেশেই।

কিন্তু সেজন্যে আমি কোনোক্রমেই উত্তেজিত হতে বা আমার কাজের ধারা বদল করার কথা ভাবিনি। আমার বিবাহই প্রকৃতপক্ষে আমার ব্যক্তিগত দায়িত্ব আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু সেটা কোনো কারণ নয় যে তার জন্যে আমি ডিগবাজি খেয়ে কাজের ধারা বদল করবো। আমার স্ত্রীর কথা বলতে গেলে, তাঁর পারিবারিক জীবনের ধারা এমনই ছিল যে স্বভাবতই তিনি প্রাচুর্যময় জীবনযাপনে আকর্ষণ বোধ করবেন—নিরন্তর দুঃখকষ্টের যন্ত্রণাময় বিপ্লবীর জীবনের প্রতি কোনো আগ্রহ না থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু তিনি আমার জীবনযাপনে

কেবল সন্তুষ্টই নন, বরং অত্যন্ত আগ্রহ দেখালেন—আমি যে কোনো কর্মজীবনই পছন্দ করি বা যাপন করি না কেন, তার সঙ্গে নিজেকে সর্বপ্রকারে খাপ খাইয়ে নিয়ে আমাকে সাহায্য করতে চাইলেন। তিনি ছিলেন সর্বান্তঃকরণে আমার জীবনযাপনে ও জীবনের ব্রতপালনে সহানুভূতি সম্পন্ন, অর্থাৎ আমি যেন ঔপনিবেশক শাসন থেকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাজে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত থাকি, এটাই তাঁর কাম্য। তাই, বিবাহের দিক থেকে আমি ছিলাম ভাগ্যবান।

১৯৩৯ সনের গোড়ার দিকে. মানচুকুও সরকার চাইলেন তাঁদের প্রবর্তিত একাধিক নতুন প্রশাসনিক কর্মোদ্যোগের মধ্যে 'প্রয়োজনমতো' আমার অভিজ্ঞতাপূর্ণ কাজের সাহায্য যেন পাওয়া যায়। এই প্রস্তাবে টোকিও কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সমর্থন ছিল। যেহেতু মানচুকুওতে আমার কাজের দ্বারা যে সুফল পাওয়া গিয়েছিল তাতে তাঁরা উৎসাহিত হয়েছিলেন, যাতে জাপানি নিয়ন্ত্রিত চীনা এলাকায় ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা ও সমস্যাদিতেও আমার সাহায্য তাঁদের পক্ষে সহায়ক হয়। এই 'প্রয়োজনমতো' সাহায্য বলতে আমার বক্তব্য, যেহেতু জাপান বেশ সহজেই মানচুরিয়া জয় করে এবং স্বচ্ছন্দে তাকে একটা স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করার পরে তার ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ কর্তৃত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রে নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিল, তাই সেখানে প্রশাসনিক সংস্কার ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে প্রথম প্রয়োজন হলো অবশ্যই একদল ভালো প্রশাসক তৈরি করা। এই উদ্দেশ্যে মানচুকুও সরকার ১৯৩৯ সনের গোড়ার দিকে সিংকিঙে একটি ন্যাশনাল কন্‌সট্রাকশন ইউনিভার্সিটি (Kengoku Daigakko) স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। বিশ্ববিদ্যালয়টি চার বছরের একটি কোর্স চালু করবে—বিশেষভাবে স্থানীয় পাঁচটি জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে থেকে উচ্চ স্তরের প্রার্থীদের জন্যে। এজন্যে বিভিন্ন ফ্যাকাল্টি থেকে বাছাই করা অভিজ্ঞ শিক্ষকরা থাকবেন, তার মধ্যে মিলিটারি সায়েন্স ও সংশ্লিষ্ট কলাকৌশলের শিক্ষকও থাকবেন। টোকিও থেকে জেনারেল ইতাগাকি, এবং জেনারেল ইশিহারা, (Gen. Ishihara), কর্নেল সুজি Col Tsuji), লেঃ কর্নেল কাতাওকা (Lt. Col. Kataoka) ও মেজর মিশিনা (Maj Mishina) প্রমুখ ছিলেন এই নতুন প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা, এবং তাঁরা আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন তাঁদের সঙ্গে এখানকার শিক্ষণ ফ্যাকাল্টিতে যোগ দিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মনোবিজ্ঞান (National and International Psychology) শিক্ষাদানের দায়িত্ব নিতে। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি ছিল মানচুকুও গভর্নমেন্টের শিক্ষা বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন, কিন্তু টেকনিক্যাল বিষয়ে সমর্থন ছিল কোয়ানটুং আর্মির। ফলে, আমি এই প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণ গ্রহণ করি একজন ভিজিটিং প্রোফেসার হিসেবে।

শিক্ষাদানের পদ্ধতি হিসেবে আমার পছন্দমতো বেছে নিয়েছিলাম ছাত্রদের সঙ্গে ঘনঘন মেলামেশা, কখনো কখনো আমার বাড়িতে, বেশির ভাগ প্রতি রবিবারে—যাতে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী থেকে আগত ছাত্ররা পরস্পরের সঙ্গে ভালো ভাবে পরিচিত হতে পারে। এমন একদিন ছিল যখন সাধারণত কেউই তার মনের কথা খোলাখুলি ভাবে বলতে পারতো না—পাছে তার ওপর গোয়েন্দাগিরি করা হয় এবং তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়। কিন্তু আমার বাড়িতে বসে তাদের দেখা-সাক্ষাতের বিষয়ে যতদূর জানি, এবিষয়ে তাদের কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না। কোয়ানটুং আর্মির বড়কর্তাও আমার বাড়িটিকে মিলিটারি পুলিশের নজরদারি থেকে মুক্ত রেখেছিলেন। সুতরাং ছাত্ররাও এখানে তাদের মন খুলে কথাবার্তা বলতে পারতো নির্ভয়ে। এটা খুবই উপভোগ্য ভাবেই দেখার মতো, কিভাবে মুক্ত পরিবেশে তারা তাদের ব্যক্তিগত মতামত নির্ভয়ে প্রকাশ করতো এবং মতাদর্শের প্রশ্নে তাদের মধ্যে প্রায়ই প্রচণ্ড ভাবে সংঘর্ষ লেগে যেত।

কোরিয়ান ছাত্ররা সাধারণত জাপানি ও চীনা ছাত্রদের মতামতের বিরোধিতা করতো। কিন্তু এটাও উল্লেখযোগ্য, জাপানি ছাত্রদের মধ্যে জনা কয়েক ছিল উদারচিত্ত, তারা দুনিয়ার যেখানেই হোক. সর্বপ্রকার ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণবাদের বিরোধিতা করতো; যদিও তারা সাধারণত বিশ্বাস করতো—নতুন এশিয়া সৃষ্টিতে জাপানকে একটা নেতৃস্থানীয় ভূমিকা নিতে হবে। যাই হোক, একটা বিষয়ে আমি ছাত্রদের কাছে পরিষ্কার করে দিয়েছিলাম যে, ছাত্রদের অবশ্যই খোলাখুলি মত-প্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে, কিন্তু আলোচনার সময় যেন কেউ কারো ব্যক্তিগত সীমা ছাড়িয়ে না যায়। তাদের কখনোই ঝগড়াঝাঁটি করা বা ঘুঁষোঘুষির পর্যায়ে নামা উচিত হবে না। উত্তেজনার কারণ যাই হোক, কোনো ক্রমেই নিজেদের মধ্যে একে অন্যের বিরুদ্ধে যেন ব্যক্তিগত বিদ্বেষের ভাব না জাগে। বিতর্ক হবে নির্ভরযোগ্য তথ্যপূর্ণ এবং বুদ্ধি-বিবেচনার ভিত্তিতে। কেউ যদি অন্যের মতামতকে প্রত্যক্ষভাবে যাচাই করে দেখার সুযোগ না পায়, তবে তার যেন বিরোধিতা করার স্বাধীনতা থাকে। একটা সাধারণ উপদেশ আমি তাদের সবাইকে দিয়েছিলাম এই বলে: এশিয়ায় সর্বপ্রকার পাশ্চাত্য উপনিবেশবাদের বিরোধিতা করতে হবে।

এই সমস্ত মেলামেশা ছিল বুদ্ধি-বিবেচনা ভিত্তিক, কিন্তু তার খরচটা খুব সামান্য ছিল না। আমাদের বাড়িতে এইসব ছাত্র-অতিথিদের যথেষ্ট ভাবে খাওয়া-দাওয়ানোর উপযুক্ত সুবিধা-সুযোগ ছিল না। সুতরাং আমার স্ত্রীকেই কাছাকাছি রেস্তোরাঁ থেকে বেশ ভালো দামে তাদের জন্যে চর্বচুষ্য আহার্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করতে হতো।

মানচুকুওতে যেমন একদল দক্ষ প্রশাসক তৈরির প্রচেষ্টা চলছিল, কোয়ানটুং

আর্মি তখন একটা কঠিন সময়ের মধ্যে চলছিল। গোটা ১৯৩৯ সনটাতেই কোয়ানটুং আর্মি চীনে ক্রমশই জড়িয়ে পড়ছিল। এমনকি মানচুকুও-চীন সীমান্তের পরিস্থিতি ক্রমে জটিল হয়ে উঠলো। জাপানিরা দেখলো তাদের অজেয় ভাবমূর্তি তারা আর বজায় রাখতে পারছে না। সীমান্ত সংঘর্ষের কয়েকটি ঘটনায় প্রতিপক্ষ রাশিয়ান বাহিনীর হাতে জাপানি সেনারা বেশ মার খেলো। জানা যায়, সোভিয়েত ইউনিয়ন কোয়ানটুং আর্মির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার জন্যে প্রায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার লোককে বন্দী করে নিয়ে যায় পূর্ব-সাইবেরিয়ার এক বন্দীনিবাসে।

১৯৩৯ সনের গ্রীষ্মকালে তথাকথিত সেই 'নোমোনহান' ঘটনা (Nomonhan incident) ঘটে। ফলে, জাপানি মান-মর্যাদার ওপর দারুণ আঘাত লাগলো। কোয়ানটুং আর্মির পক্ষে এটা রীতিমতো মুখে চুনকালি পড়ার মতো ক্ষতিকর ঘটনা। 'নোমোনহান' হলো ছোট একটা গ্রাম—বহির্মংগোলিয়া ও মানচুকুও সীমান্তের মাঝে গোচারণ ভূমির কাছে একফালি ভূখণ্ড। সীমান্তের ছোটখাটো সংঘর্ষ থেকে শেষ পর্যন্ত এখানে বড় রকমের যুদ্ধ বেধে গেল—সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জাপানের মধ্যে। ফলে, এখানে বড রকমের আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণ শুরু হয়ে গেল—বিপুল সংখ্যক ট্যাঙ্ক বাহিনী, বিমানবাহিনী ও স্থলবাহিনীর সাহায্যে। কোয়ানটুং আর্মি দারুণ ভাবে ঘা খেলো : হতাহতের সংখ্যা জানা গেল, প্রায় ৯ হাজার মৃত এবং আহতের সংখ্যাও প্রায় সমান। জানা যায়, এর জন্যে স্থানীয় জাপানি কমাণ্ডারই দায়ী। কিন্তু কোয়ানটুং আর্মির চিফ-স্টাফ লেঃ জেনারেল রেনসুকে ইসোগাই (Lt. Gen. Rensuke Isogai) এই অপরাধ স্বীকার করে নিলেন। সীমান্ত থেকে তাঁকে ডেকে পাঠানো হলো। ১৯৩৯ আগস্টের রুশো-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি অনুসারে তখন মানচুকুও-সোভিয়েত সীমান্তে একটা স্থস্থির ভাব বিরাজ করছিল, যদিও জাপান কখনো রাশিয়াকে বিপদের উৎস বলে চিহ্নিত করতে বিরত হয়নি।

১৯৪০ সনের গ্রীষ্মকাল। আমি তখনো সিংবিঙে আমার স্বাভাবিক কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত : ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে প্রচারের কাজ করা এবং কেংগোকু দাইগাক্কো-তে (Kengoku Daigakko) শিক্ষাদানের কাজ করা। নোমোনহান ঘটনার পরে জেনারেল ইওশিজিরো উমেজু (Gen. Yoshijiro Umezu) কোয়ানটুং আর্মির কমাণ্ডার নিযুক্ত হলেন—জেনারেল উএদার (Gen. Ueda) পরিবর্তে। জাপানি অধিকৃত (বা নিয়ন্ত্রিত) এলাকাগুলি থেকে যেসব রিপোর্ট আসতে লাগলো তা ছিল উদ্বেগজনক। তা থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে, ঐ সমস্ত এলাকার প্রশাসনের ভিত আদৌ শক্ত নয়, বরং বেশ ঢিলেঢালা। জেনারেল উমেজু স্থির করলেন, তিনি প্রশাসনের এই সমস্ত অস্থবিধার কারণগুলি দেখাশোনা করবেন এবং সেই উদ্দেশ্যে তাঁর সহকারিদের সঙ্গে সমস্যার আলোচনার জন্যে কয়েক দফা বৈঠক করলেন। এই সমস্ত আলোচনার একটি সিদ্ধান্তের মধ্যে ছিল

যে, আমাকে অনুরোধ করা হবে কয়েকটি চীনা কেন্দ্র পরিদর্শন করে তথ্য ভিত্তিক একটি রিপোর্ট দিতে হবে জেনারেল উমেজুর কাছে।

উক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে আমিও দায়িত্ব নিলাম ঐ কাজের। কেননা, এই কাজে আমি সুযোগ পেলাম ঐসব অঞ্চলে ব্রিটিশ ও অন্যান্য পশ্চিমি শক্তিগুলির কার্যকলাপ কী তা নিজে চোখে দেখার। ঐসব এলাকায় ব্রিটিশ ও পশ্চিমি শক্তিগুলির হাতে ছিল লিজ-নেওয়া কিছু অঞ্চল। আমি জেনারেল উমেজুকে বললাম, এ বিষয়ে আমার বিশেষ আগ্রহ বা স্বার্থের কথা—যা ছিল আমার ওপর কোয়ানটুং আর্মির পক্ষে প্রদত্ত দায়িত্বের অতিরিক্ত। আমি তাঁকে জানালাম যে, আমার নিজস্ব পাল্টা গোয়েন্দাগিরি কাজের জন্যে—যেমন ব্রিটিশরাও নিশ্চয়ই সেরকম কাজ করছে শাংহাই, তিয়েনসিন, পিকিং ইত্যাদি স্থানে—আমাকে হয়তো কোনো কোনো সময়ে ও স্থানে জাপান-বিরোধী ভাব দেখাতে হবে। সুতরাং সমস্ত জাপানি কর্তৃপক্ষের কাছে বা সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের কাছে আগাম জানিয়ে দিতে হবে, যাতে তারা আমার এই অভিনয়ে আমাকে ভুল না বোঝে, বরং আমাকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ও সহযোগিতা দিয়ে সাহায্য করে। জেনারেল উমেজু আমার এই প্রস্তাবে রাজী হলেন এবং বললেন, এই মর্মে এখনি সর্বত্রই নির্দেশ পাঠানো হবে। আমি অবশ্যই আমার কাজকর্ম সুকঠোরভাবে পরিচালনা করবো 'বোচো'র (Bocho) সংকেত অনুসারে।

আমি সবসুদ্ধ প্রায় মাস পাঁচেক কাটালাম পিকিং, নানকিং এবং অন্যান্য এলাকায়। দেখলাম, ঝামেলা বা গোলমালের কারণ প্রকৃতপক্ষে সর্বত্রই একই রকমের। অর্থাৎ জাপানি মিলিটারি কমাণ্ড এবং স্থানীয় চীনা বা অন্যান্য আবাসিক ব্যক্তি বা সংস্থার মধ্যে কোনো রকম সমন্বয় ছিল না। যেমন, চীনারা জাপানি কাজকর্মের ধারাধরণ বোঝে না বা বুঝতে চায় না, এবং জাপানিরাও তাদের দিক থেকে নিজেদের কাজকর্ম সম্পর্কে চীনাদের কাছে কিছু পরিষ্কার করে তুলে ধরে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, কোনো চীনাকে যদি জাপানি আর্মির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয় কোনো রকম সাহায্যের আশায়, তবে সে জানতে পারে না সঠিক ভাবে কোন অফিসে বা কোন ব্যক্তির সঙ্গে তাকে যোগাযোগ করতে হবে। এখানে একই কেন্দ্রে বহু শাখা বা সংস্থা কাজ করছে; যেমন কোনো শাখা দেখছে পেশা বা বৃত্তিগত বিষয়, কেউ দেখছে কর্তৃপক্ষের দফতর, আবার কেউ হয়তো দেখছে প্রশাসনগত অফিস, কিংবা অন্যেরা আরেক বিষয়, এইরকম আরো নানা বিষয়। তাছাড়া এই সঙ্গে রয়েছে সাহায্যকারী অন্যান্য কেন্দ্র, যথা সরবরাহ ও পরিসেবা (supplies and services), মিলিটারি

পুলিশ প্রশাসন অফিস ইত্যাদি—যেগুলি স্থানীয় মানুষদের কাছে রীতিমতো গোলমেলে ব্যাপার বলে মনে হয়।

এই সঙ্গে আরো জটিলতা বাড়িয়েছে নানা ধরনের বিশেষ স্থানীয় সংস্থা, যেমন 'শিনমিন কাই' (Shinmin-Kai), অর্থাৎ 'নিউ পিপ্‌লস অ্যাসোসিয়েশান' বা ঐ ধরনের 'কাই' নামক অন্যান্য সংস্থাগুলি। এসবের নিট ফল হলো প্রশাসনগত জটিলতা বা গোলমেলে অবস্থা। স্থানীয় অর্থনীতি ছিল অবহেলিত। এবং যেহেতু জাপানি ব্যবসায়ী সংস্থাগুলির ওপর কোনো উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ ছিল না, ফলে তাদের দ্বারা স্থানীয় লোকজনের ওপর শোষণগত বঞ্চনার ঘটনা ছিল সাংঘাতিক রকমের।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, আমার মনে হয়েছে জাপানি আর্মি চীনে তাদের অধিকৃত এলাকাগুলির ওপর যেন কর্তৃত্ব স্থাপনের চেষ্টা করছিল ; যদিও এলাকা-গুলি জাপানি অধিকৃত ও নিয়ন্ত্রিত, তবু চীনারা তা আদৌ মেনে নিতে বা সমর্থন করতে পারছিল না। অথচ ঐ এলাকায় জাপানি বিভিন্ন শাখা/সংস্থাগুলির মধ্যেও কোনো রকম সমন্বয় ছিল না। এটা ঠিক যেন : অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।

আমার 'পাল্টা গোয়েন্দাগিরি' কাজের সময়ে আমি আবিষ্কার করলাম যে, আমেরিকান ও ব্রিটিশ উভয়পক্ষ থেকেই চীনাদের মধ্যে সক্রিয়ভাবে জাপানি-বিরোধী অর্থাৎ বিদ্বেষের মনোভাবকে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। স্থানীয় আমেরিকান রাষ্ট্রদূতকে বাইরে থেকে নিরীহ ভালোমানুষ বলে মনে হয়, কিন্তু তিনি চীনা যুবকদের মগজ-ধোলাইয়ের কাজ সক্রিয় ভাবে চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি নিয়মিত ভাবে ১০-১২ জন চীনা যুবক ও যুবতীদের নিয়ে ছোট ছোট দলকে তাঁর বাসায় প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় ডিনারে আমন্ত্রণ জানাতেন। ডিনারের সঙ্গে দেওয়া হতো মদ এবং সূক্ষ্ম ভাবে জাপান-বিরোধী অপপ্রচার করা হতো—চীনে জাপানের সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে কথা বলে এই যুবক-যুবতীরাই কালক্রমে জাপান-বিরোধী ও আমেরিকা সমর্থক হয়ে উঠতো। ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের অফিস থেকেও একই রকম সংস্থা চালানো হতো একই কায়দায়। চীনের কয়েকটি স্থানে এবং শাংহাইতে তাদের অঞ্চলগত অতিরিক্ত অধিকার ও কর্তৃত্বের ভিত্তিতে তাদের সেখানে উপস্থিতি ও সংশ্লিষ্ট কাজকর্ম ছিল বেশ সক্রিয় ভাবেই কার্যকরী। অথচ জাপানিদের দিক থেকে উপযুক্ত এমন কোনো সংস্থা ছিল না যার দ্বারা আমেরিকা বা ব্রিটেনের সিক্রেট সার্ভিসের কার্যকলাপের প্রতিরোধ করা যায়।

এরিক টিকমান (পরে Sir Eric Teichman)—ছিলেন পিকিঙের কনস্যুলেট অফিসের প্রতিনিধি এবং একজন দক্ষ গোয়েন্দা অফিসার। তাঁর যেসব মতলব ছিল তার উদ্দেশ্য ছিল, চীনাদের মধ্যে জাপান-বিরোধী মনোভাব প্রচারের থেকেও

অনেক বেশি কিছু। তিনি একটা খসড়া পরিকল্পনা করেছিলেন যার মধ্যে ছিল, চীনের মধ্যে থেকে তিব্বত হয়ে ভারতের হিমালয় পর্যন্ত সর্বপ্রকারে যাতায়াতের রাস্তার প্রস্তাবিত একটা ম্যাপ। তিনি একবার সত্যিসত্যিই সেই ম্যাপ অনুযায়ী এই রকম একটা রাস্তা খুঁজে বের করার জন্যে সরেজমিন তদন্তে বেরিয়ে পড়েন, তাঁর সঙ্গে ছিল বেশ কিছু মোটরগাড়ি এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য জিনিসপত্র যা অত্যন্ত বিস্ময়কর দক্ষতার সঙ্গেই সংগঠন করে তিনি কাজে লাগিয়েছিলেন। সেটা বেশ বড় রকমের এবং সাহসিকতাপূর্ণ একটা পরিকল্পনা; কিন্তু অন্তত প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি সেই পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করতে পারেন নি। তাঁর সেই পরিকল্পনার পথে আমি আমার সীমিত ক্ষমতা নিয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম তাঁর ঐ অভিযানে বাধা দেওয়ার জন্যে। এ ব্যাপারে আমি খুব বেশি কিছু করতে পারিনি, কিন্তু তাঁর যাত্রাস্থল থেকে গন্তব্যস্থল পর্যন্ত অন্তত তিনটি পর্যায়ের (অর্থাৎ প্রায় ৪০-৪৫ মাইল দূর থেকে) যাত্রাপথে তাঁর সমস্ত মজুত গ্যাসোলিন সাপ্লাইকে আমি জ্বালিয়ে নষ্ট করে দিতে সমর্থ হয়েছিলাম আমার এক চীনা এজেন্টের সাহায্যে—যাকে আমি এইভাবে নাশকতামূলক কাজের জন্যে নিযুক্ত করেছিলাম।

কিন্তু ব্রিটিশ কনসুলার সার্ভিসের অফিসাররা খুবই দক্ষ, এবং তাঁদের কার্যকলাপের ক্ষেত্র ছিল সিংকিয়াং-এর বেশ ভেতরে এবং চীনের অন্যান্য এলাকা ও তার বাইরেও। টিকমানকে বলা হয়েছিল আরো এগিয়ে যেতে, অন্তত উরুমচি পর্যন্ত, অর্থাৎ আমার নাগালের বাইরে। আগেই বলেছি, আমার যাত্রাপথে বাধা দিয়ে এক চীনা দস্যুদল আমাকে থামিয়ে দেয়, এমনকি হামি পর্যন্ত যাবার আগেই। আমি জানি না টিকমান উরুমচি ছাড়িয়ে আরো আগে যেতে সমর্থ কিনা, কিন্তু আমাকে বলা হয়েছিল ব্রিটিশ কনসুলার অফিসাররা একটা পরিকল্পনা করেছিলেন যার মধ্যে ছিল চীন থেকে আংশিকভাবে গোবি মরুভূমির উপর দিয়ে আড়াআড়ি ভাবে পার হয়ে এবং শেষ পর্যন্ত হামি, উরুমচি, কাশগর, গিলগিট হয়ে কারাকোরাম পর্বতমালা ছুঁয়ে ভারতের কাশমীরে পৌঁছানো যায়—এমন একটি সর্ব সময়ের উপযোগী রাস্তার ব্যবস্থা করা। প্রস্তাবিত এই যাত্রাপথে ব্রিটিশদের স্থায়ী ঘাঁটি ও সংশিষ্ট অফিস ছিল এটা আমার কাছে একটা আক্ষেপের বিষয় যে, এরকম একটা আশাপ্রদ ও সম্ভাবনাপূর্ণ যাত্রা কখনো ফলপ্রসূ হলো না। আমি তাই কখনো কখনো এমনকি আজও সেই চীনা দস্যুদের নামে শাপান্ত করি।

সিংকিঙে ফিরে এসে আমি ৩ পৃষ্ঠার এক রিপোর্ট দিলাম জেনারেল উমেজুকে (Gen. Umezu)। তিনি এবং তাঁর কর্মচারিবৃন্দ বিস্মিত হলেন তাঁদের চীনা কমাণ্ড অফিসের অকর্মণ্যতায়। অর্থাৎ তাঁদের চীনা কমাণ্ড অফিসের প্রশাসকরা স্থানীয় চীনা মনস্তত্ত্ব বুঝতে বা সে বিষয়ে পুরোপুরিভাবেই অজ্ঞ বা ব্যর্থ। জেনারেল

উমেজু আর্মি ক্লাবে আমার সঙ্গে গোপন এক মিটিং করলেন আমার দেওয়া রিপোর্ট নিয়ে বিশদ আলোচনার জন্যে ; তখন আমার রিপোর্টের সপক্ষে আমার যা বক্তব্য তা ব্যাখ্যা ও যুক্তিসহ বুঝিয়ে বললাম। আমি তাঁকে আরো বললাম, আমার পর্যবেক্ষণ সহ বক্তব্য আর্মি বা অন্যান্যদের কাছে হয়তো অপ্রীতিকর হতে পারে, কিন্তু ঐ বক্তব্য আমি বস্তুনিষ্ঠভাবেই প্রস্তুত করেছি।

এই বস্তুনিষ্ঠ আন্তরিকতার ফলেই আমি কোয়ানটুং আর্মি কমাণ্ডারের আস্থা অর্জন করেছিলাম। আমার সঙ্গে স্থানীয় চীনা কমাণ্ডের জেনারেল উশিরোকু-রও (Gen. Ushiroku) একই রকম ভালো সম্পর্ক ছিল ; তাছাড়া জেনারেল ইতাগাকি (Gen. Itagaki, তৎকালীন যুদ্ধমন্ত্রী), জেনারেল ইশিহারা (Gen. Ishihara, কোয়ানটুং আর্মির প্রাক্তন চিফ স্টাফ) এবং অন্যান্য অনেকের সঙ্গে তো ছিলই। আর্মির মাঝারি শ্রেণী অফিসারদের মধ্যে আমার বন্ধুস্থানীয়দের একজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি হলেন লেঃ কর্নেল মাএদা (Lt. Col. Maeda) – আর্মিতে সামগ্রিক ভাবে তিনি অনেক জুনিয়ার হলেও নৌবাহিনী সংক্রান্ত একটি বিভাগের ডিরেকটার হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

আমি জেনারেল উমেজু-কে বলেছিলাম, স্থানীয় চীনা কমাণ্ড অফিসে আমি যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখেছি, তাই হলো মূলগত ত্রুটি এবং তা ছিল জাতীয় মনস্তত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। আমি লক্ষ্য করেছি, এই কমাণ্ড অফিসের জাপানি অফিসারদের দৃষ্টিভঙ্গিই হলো উপেক্ষার ঠুলিপরা একপেশে। ভালো প্রশাসকের অবশ্যই মানিয়ে নেবার ক্ষমতা থাকা চাই। সুতরাং নেতৃস্থানীয় ভালো অফিসার/ প্রশাসক নিযুক্ত করতে হবে। প্রয়োজন মতো তাঁদের উচিত হবে কোনো কোনো জিনিস বা বিষয়কে, অর্থাৎ প্রচলিত জিনিসটাকে নষ্ট না করে পরিস্থিতি অনুযায়ী তাকে সংশোধন করে নিয়ে কাজে লাগাতে হবে। কিন্তু কমাণ্ড অফিসের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত অফিসারদের অনেকেই পছন্দ করেন আগেই প্রচলিত জিনিসটাকে নষ্ট করে ফেলা, এবং তারপর টুকরোগুলিকে জোড়াতালি দেওয়া। তাই, আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না।

আমার এই বক্তব্য কোয়ানটুং আর্মি তারিফ করলো। টোকিওর হাইকমাণ্ড এত খুশি হলেন যে, তাঁরা আমার দেওয়া রিপোর্ট (তাঁদের মতে 'brutally frank' বা নির্মম সত্য) অফিসিয়াল বিজ্ঞপ্তিসহ প্রচার করে দিলেন বিদেশে অবস্থিত জাপানের সমস্ত কূটনৈতিক মিশনগুলির মিলিটারি অ্যাটাশে-দের কাছে, তাঁদের অবগতির জন্যে।

টোকিও থেকে আমার বন্ধুদের অনেকেই আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে চিঠি লিখলেন, আমার বস্তুনিষ্ঠ তদন্ত ও সংক্ষিপ্ত রিপোর্টের জন্যে। কিন্তু পরিস্থিতি এমনই যে, আমার রিপোর্ট অনুসারে জাপানি অধিকৃত চীনা এলাকাগুলিতে প্রশাসনিক

সংস্কার করাটা কার্যত আদৌ সহজসাধ্য নয়। অবিরাম চীনা যুদ্ধের ধকল টোকিওর 'ওয়ার অফিস' বা সমর দফতরের ওপর বেশ দুঃসহ চাপ সৃষ্টি করলো। অর্থাৎ ব্রিটিশ ও আমেরিকানদের সহযোগিতায় চিয়াং কাইশেক যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করলেন, তার ফলে জাপান ক্রমশই চীনা প্যাঁচের পাকে পাকে যেন জড়িয়ে পড়ছিল। জাপানের প্রচেষ্টা ছিল, কোনোরকম প্রশাসনিক সংস্কারের পরিবর্তে কেবল 'স্ট্যাটাস কুও' বা স্থিতাবস্থা বজায় রাখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা। অধিকন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে গেল ইয়োরোপে, এবং তখন থেকে জাপান আরো ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে কাজে লেগে গেল কিভাবে ও কোন পথে এই পরিস্থিতিকে সুবিধাজনক ভাবে নিজের স্বার্থে কাজে লাগানো যায়।

সম্রাটের দৃষ্টান্ত অনুসারে, প্রিন্স কোনোএ (Prince Konoe) ১৯৪০ জুলাই মাসে, নির্বাচিত কয়েকটি কেন্দ্রে 'ওয়ার ক্যাবিনেট' স্থাপন করলেন। এই ক্যাবিনেটে মাৎসুওকা (Matsuoka) বিদেশমন্ত্রী, লেঃ জেনারেল হিদেকি তোজো (Lt. Gen. Hideki Tojo) যুদ্ধমন্ত্রী, এবং অ্যাডমিরাল জেংগো ইয়োশিদা (Adm. Zengo Yoshida) নিযুক্ত হলেন নৌবাহিনীর মন্ত্রী রূপে। এটা ক্রমেই পরিষ্কার হয়ে গেল যে, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কোনো রকম বোঝাপড়া হবে না। টোকিওতে মাৎসুওকা জার্মান প্রতিনিধি হেনরিক স্ট্যামার-এর (Heinrich Stahmer) সঙ্গে একটি সামরিক চুক্তি সম্পাদন করলেন ১৬ সেপটেম্বর ১৯৪০ তারিখে। নিঃসন্দেহে এই চুক্তি আমেরিকার বিরুদ্ধে যাবে বলেই করা হয়েছিল।

মাৎসুওকা সম্ভবত তাঁর কূটনৈতিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা বড় রকমের সাফল্য দেখাতে পেরেছিলেন যখন তিনি রাশিয়ার স্ট্যালিন-এর সঙ্গে পাঁচ-বছরের একটি 'নিরপেক্ষতার চুক্তি' (five-year neutrality agreement) সম্পাদন করতে সমর্থ হলেন, ১৩ এপ্রিল ১৯৪১ তারিখে।

এই চীনা সফরকালে আমার নিজস্ব লাভ হলো, ব্রিটেন ও আমেরিকান সরকারের পরিচালিত গভীর কূটনীতি পূর্ণ বাঁকাচোরা জটিল গোয়েন্দাগিরি সম্পর্কে যথাসাধ্য জ্ঞানার্জন করার সুযোগ। যাই হোক, প্রকৃতপক্ষে কোনো রকম আর্থিক বা মানবিক সুবিধা-সুযোগ ছাড়া রীতিমাফিক পাল্টা-গোয়েন্দাগিরির কাজে কারো পক্ষে আশানুরূপ ফললাভ করা প্রায় অসম্ভব।

মানচুকুওতে আমার সর্বশেষ বড় কাজ হলো, যদিও বেশ আশ্চর্যভাবে, ইয়োরোপে যুদ্ধোত্তর বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে—যা শুরু হয়েছিল ১৯৩৯ সেপটেম্বরে।

মানচুকুওতে বেশ কিছু 'হোয়াইট রাশিয়ান'দের বাস ছিল—যারা বিগত ১৯১৭ সনের বলশেভিক বিপ্লবের সময় স্বদেশ থেকে পালিয়ে এসেছিল। সবচেয়ে বেশি

সংখ্যায় ছিল হারবিন, হিলার, সিংকিং ও দাইরেন অঞ্চলে। এবং অল্প সংখ্যায় ছিল শাংহাই, তিয়েনসিন এবং চীনের অন্যান্য স্থানে। এই সম্প্রদায় কিন্তু এখানকার 'পাঁচ গোষ্ঠীর' নীতির (Five Races' polity, গোমিনসোক্ কিওয়া-কাই) অন্তর্ভুক্ত নয়, কিন্তু জাপানিরা উৎসাহ দিয়েছিল তাদের পছন্দমতো নিজস্ব একটা সংঘ/সংস্থা গড়ে তুলতে। তাদের খুশি করার জন্যে বড় বড় পরিকল্পনা রূপায়ণে রত জাপানি শিল্প সংস্থাগুলি থেকে মানচুকুওর (সিংকিং, দাইরেন ইত্যাদি) বিভিন্ন ছোটখাটো কেন্দ্রগুলিকে উচ্চস্তরের আধুনিক শহরে রূপান্তরিত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল — যাতে হোয়াইট রাশিয়ানদের সুবিধা হয়। কিন্তু এইসব উন্নয়নমূলক কর্মসূচি রূপায়ণের সময় কার্যত তা ভেঙে গেল, — জাপানিদের দিক থেকে চীনের মধ্যে পূর্বে প্রস্তাবিত নানা প্রতিশ্রুতির ফলে। এইভাবে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের ফলেই হোয়াইট রাশিয়ানদের মধ্যে বেকার সমস্যা দেখা দেয়।

রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির ফলে (Russo-German pact, 21 August 1939) বিশ্ববাসী অবাক হয়ে গেল। এমনকি যদিও এর ফলে মানচুকুও-সোভিয়েত সীমান্তে শান্তি ফিরে এলো, কিন্তু টোকিওতে ব্যারন কিচিরো হিরানুমা-র ক্যাবিনেট (Baron Kichiro Hiranuma's cabinet) যেন চমকে উঠলো। ব্যারনের ক্যাবিনেট-এর মতে এটা হলো - জার্মানি কৃত অ্যান্টি-কমিনটার্ন চুক্তি (anti-comintern pact) বিরোধী কাজ — যে চুক্তি জাপান সম্পন্ন করেছিল মাত্র কয়েক বছর আগে, অর্থাৎ ১৯৩৬ নভেম্বরে। কেননা, জাপান সর্বদাই সোভিয়েত ইউনিয়নকেই সর্বাপেক্ষা বড় বিপদ বলে মনে করে।

মানচুকুওতে নিজের প্রতিরক্ষার স্বার্থে এবং রাশিয়ার দিক থেকে কোনো রকম আক্রমণের বা হুমকির আশংকায় কোয়ানটুং আর্মির মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন আতংকের ভাব দেখা গেল। এবং এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রতিরোধ প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গড়ে তোলা হলো বিভিন্ন কেন্দ্রে বিভক্ত করে; এই রকম বাহিনী/কেন্দ্রের মধ্যে প্রায় পুরো একটি বাহিনী গড়া হলো পূর্বোক্ত হোয়াইট রাশিয়ানদের নিয়ে। আশা করা হয়েছিল যে, জারপন্থী হিসেবে তাদের দ্বারা, কম্যুনিস্ট রাশিয়ার দিক থেকে শক্তিশালী কোনো রকম আগ্রাসনের শক্ত প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে। ফলে, এইভাবে যে বাহিনী গড়ে তোলা হলো তার দ্বারা হোয়াইট রাশিয়ান সম্প্রদায়ের মধ্যে পূর্বোক্ত বেকার সমস্যাজনিত অর্থনৈতিক অসুবিধার একটা উপশমের ব্যবস্থা হলো।

এইসব হোয়াইট রাশিয়ানদের মিলিটারি ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল। এদের নিয়ে যে পৃথক আর্মি ইউনিট গঠন করা হয়, তাদের পৃথক ফ্লাগ দেওয়া হয়েছিল এবং জার্মান নাজি পার্টির সেই 'স্বস্তিকা' চিহ্নের মতো পৃথক প্রতীকও দেওয়া হয়। এবং এই বাহিনীর যাবতীয় দায়িত্ব দেওয়া হয় কোয়ানটুং আর্মি হেড কোয়ার্টার্সের ফোর্থ

ডিপার্টমেণ্ট-এর ওপর, যদিও রাশিয়ান বিষয়ক কাজকর্ম দেখাশোনার সাধারণ দায়িত্ব ছিল কোয়ানটুং আর্মির সেকেণ্ড ডিপার্টমেণ্টের ওপর।

হিটলারের প্রাথমিক সাফল্য জাপানকে খুব বেশি রকম প্রভাবিত করেছিল। যখন জার্মান বাহিনীর হাতে ফ্রান্স ও হল্যাণ্ডের পতন হয় ১৯৪০-এর গোড়ার দিকে, তখন ঐ দুই দেশের অধীনস্থ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উপনিবেশগুলিতে জাপানের দিক থেকে দখল নেবার অভিযান প্রয়াসের কথা সুবিদিত। তার ফলেই শেষ পর্যন্ত এক মিত্রতার চুক্তি সম্পন্ন হয় থাইল্যাণ্ড-এর সঙ্গে, ১২ জুন ১৯৪০ তারিখে। এবং এই চুক্তির ভিত্তিতেই জাপান বেশ সুবিধাজনক অবস্থান লাভে সমর্থ হয়। অতঃপর জাপান ক্রমশ আরো ব্যাপক ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে থাকে, যার পরিণতিতে সে বৃহত্তর পূর্ব-এশিয়ার সহ-সমৃদ্ধির অঞ্চল (Greater East-Asia Co-prosperity Sphere) নীতি গ্রহণ করে ও প্রচার করতে থাকে।

জার্মানি যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে তার 'অনাক্রমণ চুক্তি' বাতিল করে রাশিয়া আক্রমণ করলো ২২ জুন ১৯৪১ তারিখে, দুনিয়া তখন রুশ-জার্মান চুক্তি সম্পাদনের চেয়েও বেশি রকম চমকে উঠেছিল। এবং এর ফলে মানচুকুওতে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হলো এই যে, জার্মানি কর্তৃক রাশিয়া আক্রমণের খবর এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল—কোয়ানটুং আর্মির সমস্ত হোয়াইট রাশিয়ান কেন্দ্রগুলি তাদের আনুগত্য বদল করেছে এবং নিকটবর্তী রাশিয়ান কনসুলার প্রতিনিধিদের মারফৎ তারা জানিয়ে দিল—জার্মানদের বিরুদ্ধে তারা স্বেচ্ছাসৈনিক হিসেবে যুদ্ধ করবে বা প্রয়োজনীয় কাজ করতে প্রস্তুত। কোয়ানটুং আর্মি কমাণ্ডার, জেনারেল উমেজু (Gen. Umezu) রীতিমতো হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন।

গত সপ্তাহের এক সকালে (জুন ১৯৭১) আমি অবাক হয়ে দেখলাম, কোয়ানটুং আর্মি স্টাফের ফোর্থ ডিপার্টমেণ্ট-এর মেজর মাৎসুমুরা (Maj. Matsumura) গাড়ি চালিয়ে এসে ঢুকলেন আমার সিংকিঙের বাসভবনে। তখন তাঁর পরনে আর্মি ইউনিফর্ম দেখে আমি তখনি বুঝলাম, এটা তাঁর নেহাত ব্যক্তিগত সফর নয়। বেশি দেরি না করে মেজর সোজাসুজি তাঁর বক্তব্য আমাকে বললেন : আর্মি কমাণ্ডার খুবই খুশি হবেন যদি আপনি জরুরি ভাবে এখনি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। —আমি তখনি মেজর মাৎসুমুরা র সঙ্গে গেলাম এবং জেনারেল উমেজু-র সঙ্গে দেখা করলাম। আমাদের আলোচ্য বিষয় ছিল সংক্ষিপ্ত, অর্থাৎ জেনারেল উমেজু জানতে চান : আমি খুব জলদি একটা তদন্ত করে তাঁকে জানাতে পারি কিনা —কোন পরিস্থিতিতে কোয়ানটুং আর্মির হোয়াইট রাশিয়ান কেন্দ্রগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে আনুগত্য বদল করলো। —জেনারেল উমেজু-কে এই বিষয়ে একটা রিপোর্ট খুব তাড়াতাড়ি পাঠাতে হবে টোকিওতে।

সেই সময়ে আমি ঐ রকম একটা দায়িত্বের কাজ নিতে খুব একটা আগ্রহী

ছিলাম না। কারণ, মাত্র কিছুদিন আগেই আমি অত্যন্ত কঠোর শ্রমসাধ্য কাজ সেরে চীন থেকে ফিরে এসেছি। অধিকন্তু আমার স্ত্রী ও শিশুকে আবার ছেড়ে একাকী আসতে হবে সিংকিঙে, এটা আমার ভালো লাগছিল না। কিন্তু জেনারেল উমেজু আমাকে সমানে চাপ দিচ্ছিলেন তাঁকে সাহায্য করার জন্যে। এ বিষয়ে দু-একদিন চিন্তা করে এবং আমার স্ত্রীর কাছ থেকে তাঁর ও শিশুর জন্যে চিন্তার কিছু নেই এই আশ্বাস পেয়ে, আমি জেনারেল উমেজু-র প্রস্তাবে রাজী হলাম এবং এই নতুন দায়িত্ব নিয়ে আমি যাত্রা করলাম আমার তদন্তের কাজের উদ্দেশ্যে। প্রায় অচেতন ভাবেই আমি আরো আকর্ষণ বোধ করলাম, এই সুযোগে আরেক বার দেখা যাবে — চীনের ব্রিটিশ ও আমেরিকানরা তাদের এজেন্ট মারফত মানচুকুওতে কি করছে না করছে।

আমি জেনারেল উমেজু-র কাছে আমার আগেকার সফরের মতো বিশেষ সুবিধা-সুযোগ দেওয়ার কথা বললাম। তিনি তখনি সে-সবের ব্যবস্থা করে দিলেন। বরং কোয়ানটুং আর্মি আগের চেয়েও বেশি আয়োজন করলো: তাঁরা আমাকে ব্যক্তিগত ভাবে একজন লেঃ জেনারেল-এর সমান পদমর্যাদা দিলেন, এবং তদনুযায়ী প্রয়োজনীয় একখানি 'আইডেনটিফিকেশান' কার্ড। তাছাড়া, সংশ্লিষ্ট সমস্ত জাপানি অফিসারদের আমার বিষয়ে উপযুক্ত ভাবে জানিয়ে দেওয়া হলো।

কিন্তু হোয়াইট রাশিয়ান সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুপ্রবেশ করা, চীনা গোষ্ঠীতে ঢোকার চেয়েও অত্যন্ত কঠিন কাজ। তখনি আমার মনে হলো, কোনো হোয়াইট রাশিয়ানের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেতে হলে, বা তার কাছ থেকে কথা বের করতে হলে প্রচুর পরিমাণে 'ভদ্‌কা' চাই। আমাকেও অবশ্যই তার সঙ্গে ভদ্‌কা পান করতে হবে, কিন্তু কোনো ক্রমেই এমন মাতাল হওয়া চলবে না যাতে এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সমস্ত উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হয়ে যায়। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, এমন উপায় আছে যাতে একজন হোয়াইট রাশিয়ানকে প্রচুর পরিমাণে ভদকা খাইয়েও তাকে শান্ত ও সংযত রাখা যায়। অর্থাৎ উপযুক্ত পরিমাণে 'অলিভ অয়েল' প্রথমেই তাকে খাওয়াতে হবে যাতে তার আন্ত্রিক ব্যবস্থা ঠিক থাকে এবং তার ফলে রক্তে অ্যালকোহলিক প্রতিক্রিয়া প্রতিকূল না হয় এবং অন্ত্রের প্রতিরোধ ক্ষমতা ঠিক থাকে। এইসব ব্যবস্থার ফলেই ভদকা সেবীকে সংযত রাখে — যাতে সে প্রতিপক্ষের চাপে পড়ে বেসমাল কথাবার্তা বলে না ফেলে। যদিও পরিণামে স্বাস্থ্যের ওপর এর প্রতিক্রিয়া হবে প্রতিকূল, তবুও তা করতে হয় কেননা: ঝুঁকি না নিলে কোনো ফায়দা ওঠানো যায় না। তাছাড়া, আমাকেও আমার কাজ উপযুক্ত ভাবে করতে হবে। সুতরাং আমি প্রচুর পরিমাণে 'অলিভ অয়েল' জোগাড় করলাম। এই সঙ্গে এর প্রতিকার ব্যবস্থারও আয়োজন রাখতে হবে ঠিকমতো; অর্থাৎ কথাবার্তা চালানোর জন্যে 'পার্টি' দেবার পরে, ভালো আপেল আর দুধই হলো এক্ষেত্রে উপযুক্ত 'প্রেসক্রিপশান' বা ব্যবস্থা পত্র।

প্রায় মাস খানেকের বেশি সময় লাগলো হোয়াইট রাশিয়ান নেতৃত্ব সম্পর্কে বেশ ভালোভাবেই অনেক কিছু জানবার জন্যে। আমি ইউনিটগুলির কার্যকলাপ ভালোভাবে জানবার পক্ষে এই সময়টা যথেষ্ট। কারণটা খুবই সাধারণ এবং তা 'জাতীয় মনস্তত্ত্ব' (national psychology) ঘটিত। এইসব জার-সমর্থকরা (Tsarists) নিঃসন্দেহে কমিউনিস্ট-বিরোধী। রাশিয়ায় যে কোনো নাগরিক আন্দোলনে এইসব জার-সমর্থকরা কমিউনিজম বিরোধিতা চালিয়ে যায়। কিন্তু রাশিয়ার ওপর অন্য যে কোনো দেশের আক্রমণের ঘটনার ক্ষেত্রে তারা তাদের আদর্শগত মতপার্থক্য বিসর্জন দেয় এবং তখন তারা প্রথমে রাশিয়ান—পরে কমিউনিস্ট-বিরোধী। জার-সমর্থক হলেও তাদের কাছে মাতৃভূমির আঞ্চলিক সংহতি অলঘনীয় ও পবিত্র। তাই এটা পরিষ্কার যে, রাশিয়ার সঙ্গে জাপান সমেত অন্য যে কোনো দেশের মধ্যে সংঘর্ষের ক্ষেত্রে, জাপানিরা এইসব হোয়াইট রাশিয়ান ইউনিটগুলির ওপর নির্ভর করতে পারে না।

আমি ফিরে এলাম এবং এক পাতার একটি রিপোর্ট দিলাম জেনারেল উমেজু-র কাছে। অতঃপর তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত আলোচনকালে ঐ রিপোর্টের পক্ষে আমার বক্তব্য তাঁকে ভালোভাবে বুঝিয়ে বললাম। এটা খুবই আশ্চর্যের কথা যে,জাপানিরা কখনোই এইসব হোয়াইট রাশিয়ানদের জাতীয় মনস্তত্ত্ব জানার বা বোঝবার কোনো চেষ্টাই করেনি। এটা হলো সেই একই একপেশে দৃষ্টিভঙ্গির ফল—যে জন্যে জাপানিদের বহু ঝামেলার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল চীনে। এইভাবে জাতীয় মনস্তত্ত্ব অনুধাবনের কাজটা উপেক্ষা করার ফলে, বরং কার্যত তারা নিজেদের প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই একটা পঞ্চম বাহিনী গড়ে তুলেছিল।

আমার রিপোর্টটি টোকিওতে বেতার মারফৎ জানিয়ে দেওয়া হলো। কিন্তু আবারও দেখা গেল, ইতিবাচক বা সদর্থক কিছু করা খুবই কঠিন। ক্ষতি যা হবার আগেই হয়ে গেছে। অধিকন্তু টোকিওর সরকারি প্রশাসন যন্ত্র সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপক কৌশলগত খুঁটিনাটি বিষয়ের নানা চিন্তায়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি একটি ঘটনার কথা লিপিবদ্ধ করতে চাই—যেটা সম্ভবত খুব একটা সুবিদিত নয়। অর্থাৎ টোকিওর ক্যাবিনেটে সীমাবদ্ধ অন্তরঙ্গ মহলে ছিল দারুণ মতপার্থক্য। এই মহলের 'হোপ্‌পোহা' গোষ্ঠীর (Hoppohas) আগ্রহ ছিল রাশিয়ার ওপর আগে থেকেই আক্রমণ করা; এবং 'নামপোহা' গোষ্ঠীর (Nampohas) ইচ্ছা ছিল, আগে দক্ষিণের দিকে আক্রমণ করা। এই দুই গোষ্ঠী কিছুতেই একমত হতে পারছিল না। ঘটনাক্রমে প্রথমেই পার্ল হারবারে (Pearl Harbour) আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো তোজো-র (Gen Tojo); চাপে অর্থাৎ তাঁর বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স কোনোয়ে (Prince Konoe) ছিলেন অসহায়। জেনারেল তোজো তখন ছিলেন যুদ্ধমন্ত্রী। তিনি সম্রাটের কাছ থেকে 'নামপোহা' গোষ্ঠীর মতের পক্ষে সমর্থন (প্রথমেই 'দক্ষিণে আক্রমণ' করা) আদায় করতে সমর্থ

হলেন—যে মত মূলত জেনারেল তোজোর-ও ব্যক্তিগত মত। 'তোজো'—যাঁর ছদ্মনাম ছিল 'রেজর-ব্লেড' (বা ক্ষুরধার) বললে বোঝাত তাঁর 'শার্প-ব্রেন' বা শাণিত-বুদ্ধির কথা; তিনি যে কৌশল নিলেন তার অর্থ হলো—মানচুকুও-চীনা-রাশিয়া সীমান্ত অঞ্চলে অবস্থিত প্রায় এক মিলিয়ন জাপানি সেনা থাকতে রাশিয়ার দিক থেকে জাপান আক্রমণের চিন্তা অসম্ভব।

জার্মানি যখন রাশিয়া আক্রমণ করলো, 'হোপ্‌পোহা' গোষ্টির আশংকা হলো, জার্মানির মিত্রতা সত্ত্বেও জাপানের বিরুদ্ধে রাশিয়া তার পুরনো শত্রুতার বিদ্বেষ বশে সোভিয়েত ইউনিয়ন আগেই আক্রমণ চালাতে পারে মানচুকুওর ওপর অথবা জাপানের দ্বীপপুঞ্জের ওপর। কিন্তু রাশিয়ানরা ইচ্ছে করলেও সেরকম কিছু করতে সমর্থ ছিল না, কেননা তাহলে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাদের যথাসর্বস্ব খোয়াতে হতো। ইতিমধ্যে 'নাম্‌পোহা' গোষ্ঠীর বক্তব্য—দক্ষিণ অঞ্চলের প্রাকৃতিক কাঁচামালের সম্ভার অধিকার করার জন্যে সেদিকেই আগে আক্রমণ করাটা অনেক বেশি পরিমাণে সুবিধাজনক—এই নীতি বিজয়ী হলো। অর্থাৎ সংকল্পের ছাঁচ ঢালাই হয়ে গেল।

১৯.
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইনডিয়ান ইনডিপেনডেন্স লিগ

১৯৭১ নভেম্বরের শেষদিকে, কোয়ানটুং আর্মির কাছ থেকে আমি একটি বার্তা পেলাম যাতে আমাকে অনুরোধ করা হয়েছে—পুনর্নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত আমি যেন সিংকিং-এ অবস্থান করি। এর কারণটা অনুমান করা কঠিন ছিল না।

কয়েক মাস আগে থেকেই, মিলিটারি হাইকমাণ্ড-এর অফিস বিশেষ এক জরুরি অবস্থার মধ্যে ছিল। যোগাযোগের ঘরটিতে চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে লোক নিযুক্ত ছিল। আমি এবং আমার অনেক বন্ধুরাই জানতাম, জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে জড়িত হতে চলেছে, কিন্তু আমরা কেউই বিন্দুবিসর্গ জানতাম না যে, আক্রমণের লক্ষ্যস্থল হবে পার্ল হারবার। সঠিক তারিখটাও ছিল অত্যন্ত গভীর গোপন। এমনকি স্বয়ং কোয়ানটুং আর্মি কমাণ্ডারও (জেনারেল উমেজু) জানতেন কিনা সন্দেহ; জানা থাকলে আগে থেকেই ব্যাপক আক্রমণের উদ্দেশ্যে নিযুক্ত বাহিনীকে ছোট ছোট দলে ভাগ করে দেওয়া যেত, কিন্তু অজ্ঞতার জন্যেই তা করা হয় মাত্র

শেষ মুহূর্তে। কিন্তু ৮ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখে, সমগ্র দুনিয়া জানতে পারলো পার্ল হারবার-এর ওপর আক্রমণের খবর।

এটা ছিল জাপানের দিক থেকে প্রচণ্ড বিমান আক্রমণ, যা খুব সূক্ষ্মভাবে ঘটানো হয়েছিল। ডিসেম্বর ৮ তারিখ, টোকিও সময় ০·৩২ ক্ষণ—যা ছিল রবিবার, হাওয়াই সময় ০৭·৫২ ক্ষণ—নেভি কমাণ্ডার মিৎসুও ফুচিদা (Mitsuo Fuchida) বোমাটিকে চালিয়ে নিয়ে গেলেন আমেরিকান প্যাসিফিক ফ্লিটের উদ্দেশ্যে—যেটা তখন হাওয়াই দ্বীপে নোঙর করে বসেছিল ঠিক যেন পাতিহাঁসের মতো। অতঃপর কয়েক শত প্লেন বেরিয়ে পড়লো জাপানি বিমান থেকে ঐ আমেরিকান ফ্লিটের ওপর। চারখানি আমেরিকান যুদ্ধজাহাজ, তাছাড়া এক ডজনেরও বেশি অন্যান্য জাহাজ এবং দু'শোরও বেশি বিমান ধ্বংস হয়ে গেল। আমেরিকানদের পক্ষে হতাহতের সংখ্যা ২০০০ ছাড়িয়ে গেল। ঐ একই দিনে ভোরবেলায় টোকিও রেডিও থেকে প্রচারিত হলো সম্রাটের আদেশনামা :

"···ধৈর্য ধারণ করে আমরা অপেক্ষা করেছিলাম, এবং দীর্ঘকাল যাবৎ আমরা আশা পোষণ করেছিলাম যে, আমাদের গভর্নমেণ্ট পরিস্থিতিকে শান্তিপূর্ণ অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারবেন, কিন্তু আমাদের প্রতিপক্ষ আপোষের বিন্দুমাত্র আগ্রহ না দেখিয়ে ইচ্ছাকৃত ও অসংগতভাবে বিলম্বিত করে দিলেন সেই আপোষরফার সমস্ত সম্ভাবনা, এবং ইতিমধ্যে তাঁরা উদ্দেশ্যমূলকভাবে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চাপ কেন্দ্রীভূত করলেন আমাদের ওপর, যাতে আমাদের গভর্নমেণ্ট নতি স্বীকার করতে বাধ্য হন। আমরা অতএব কৃতসংকল্প হয়ে যুদ্ধঘোষণা করলাম যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেন-এর বিরুদ্ধে—কেবলমাত্র স্বদেশের অস্তিত্ব রক্ষা ও আত্মরক্ষার জন্যে এবং পূর্ব-এশিয়ায় স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বার্থে।···"

বৃহত্তর পূর্ব-এশিয়া যুদ্ধ (Greater East-Asia war) শুরু হয়ে গেল। ৯ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখে, আমি টেলিফোনে জরুরি বার্তা পেলাম কোয়ানটুং আর্মি জেনারেল স্টাফ-এর কাছ থেকে,—অবিলম্বে তাদের অফিসে যাওয়ার জন্যে। আমি শীঘ্রই বুঝতে পারলাম, আমাকে সংবাদ দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো জাপানি নৌবহর তার আক্রমণাত্মক কাজকর্ম শুরু করে দিয়েছে সিংগাপুরের বিরুদ্ধে ঐ একই দিনে, এবং ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ 'প্রিন্স-অফ ওয়েলস' ও 'রিপাল্স' কে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবং এই ঘটনাটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যে একটা শ্যাম্পেন পার্টির ব্যবস্থা করা হয়েছে। জাপানি অফিসাররা যখন তাঁদের আনন্দ উপভোগে মত্ত, তাঁরা ভাবলেন এই হলো ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের অবসানের শুরু, এবং তাই তাঁরা বললেন এই সুযোগেই আমার উচিত ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অবিলম্বে 'চরম ব্যবস্থা' (direct action) গ্রহণ করা।

এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ যে, উক্ত শ্যাম্পেন পার্টি চলাকালে, কারো মুখে কোনো

রকম কথা ছিল না, অন্তত আমার উপস্থিতিতে—পার্ল হারবারের সেই ঘটনার বিষয়ে। অবশ্য আর্মি অফিসাররা অনুমান করেছিলেন কেবলমাত্র পার্ল হারবারের ঘটনাটিই আমার পক্ষে বিশেষ কোনোরকম কৌতূহলের উদ্রেক করবে না,—যেহেতু ভারত আমেরিকার শত্রু নয়। ভারত সংগ্রাম করছে কেবলমাত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে।

দীর্ঘকাল যাবৎ উপনিবেশবাদী ব্রিটেন প্রচণ্ড মার খাচ্ছিল জাপানের কাছ থেকে। অতএব সত্যি সত্যিই সময় এসে গেল আমার কাজের ধরনধারণ বদলাবার, এবং আমি স্থির করলাম আমাকে অবশ্যই যুদ্ধমুখী কাজকর্ম পরিচালনা করতে হবে। স্ত্রী ও বাচ্চা ছেলেটির দেখাশোনা করার কাজ আমার পক্ষে খুবই চিন্তার বিষয় হলো, কিন্তু আমার স্ত্রী তাঁর নিজস্ব প্রকৃতিগতভাবে আমার এই মানসিক দুশ্চিন্তা কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাহায্য করলেন। তিনি এই পরিস্থিতি বেশ ভালোভাবেই বুঝলেন এবং একজন সামুরাই যোদ্ধার স্ত্রীর মতো প্রচণ্ড সাহসিকতার সঙ্গেই আমাকে বললেন—আমি যে কোনো কাজ নিয়ে মানচুকুও ছেড়ে যেতে পারি—ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অনুকূলে যে কোনো কাজেই প্রয়োজন হোক না কেন,—এবং তাই আমার পক্ষে স্ত্রী ও পুত্রের জন্যে কোনো রকম দুশ্চিন্তা ভোগ করার কোনোই প্রয়োজন নেই। আমি স্ত্রীকে বললাম, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে এখনই আমার কার্যকলাপের পুনর্গঠন প্রয়োজন, বিশেষত জাপানের সর্বশেষ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে, এবং আমাকে অবশ্যই আমার পক্ষে যথাসাধ্য সবকিছুই করতে হবে।

এটা পরিষ্কার বোঝা গেল যে, হংকং ও অন্যান্য কেন্দ্রগুলির খুব শীঘ্রই পতন হবে জাপানের হাতে। ১৯৪১ ডিসেম্বরের শেষদিকেই তা ঘটলো, এবং সিংগাপুর আনুষ্ঠানিকভাবে পরাজয় স্বীকার করলো ১৫ ফেবরুয়ারি ১৯৪২ তারিখে। আমি কোয়ানটুং আর্মিতে আমার বন্ধুবান্ধবদের সেদিনই শ্যাম্পেন পার্টির শেষদিকে সেকথা জানালাম, এবং বললাম যে, আমি অবশ্যই এখনি জরুরি ভাবে যাত্রা করবো দক্ষিণের দিকে। আমার অনুরোধে তাঁরা তখনি বেতারবার্তা পাঠিয়ে দিলেন সংশ্লিষ্ট জাপানি সংস্থার উদ্দেশ্যে: তিয়েনসিন, শাংহাই, নানকিং, হংকং এবং অন্যান্য স্টেশনগুলিতে, যাতে আমাকে প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার সুবিধা-সুযোগের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। অতঃপর আমার পরিবার ও বন্ধুবান্ধবদের কাছে বিদায় নিয়ে, সিংকিং রেল স্টেশন থেকে আমি ঐদিনই তিয়েনসিন-এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম, এবং সেখান থেকে গিয়ে পৌঁছলাম শাংহাইতে। জেনারেল উশিরোকু (Gen. Ushiroku), অর্থাৎ নানকিংস্থ জাপানি আর্মির চীনা কমাণ্ডের কমাণ্ডার-ইন-চিফ-কে আগেই আমার যাত্রা ও গতিবিধির কথা সিংকিং থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। জেনারেল উশিরোকুও তাঁর নির্দেশ জানিয়ে দিলেন শাংহাই কমাণ্ড-কে, যাতে বিশদভাবে বলা ছিল মেজর মিশিনা (Maj. Mishina) যেন আমার

দেখাশোনা করেন। ঐ বার্তায় আরো বলা ছিল, আমি যে কোনো সময়ে ইচ্ছেমতো যেতে পারি নানকিংস্থ জেনারেল-এর সঙ্গে দেখা করতে।

আমি শাংহাইতে দু'দিন কাটালাম—মূলত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বার্থে আনুষ্ঠানিকভাবে সেখানে একটি কেন্দ্র স্থাপনের জন্যে; কেন্দ্রটির আর্থিক দায়-দায়িত্ব ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলবে স্থানীয় ভারতীয় নেতৃবৃন্দের দ্বারা। শাংহাইতে বেশ অবস্থাপন্ন ভারতীয়দের বসতি ছিল—যাঁদের অধিকাংশই ছিলেন ব্যবসা-বাণিজ্যে রত। তাছাড়া, স্থানীয় পুলিশ বাহিনীতে ছিলেন বহুসংখ্যক শিখ। এই সমগ্র সম্প্রদায়ই ছিল দারুণ সহায়ক, এবং পুরোপুরি ভাবেই তাঁরা সহযোগিতা করেছিলেন আমার সঙ্গে—ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বার্থে সক্রিয় প্রচারকের পক্ষে একটি সংগঠন গড়ে তোলার ও পরিচালনার কাজে। আমি কয়েকজন জাপানি আর্মি অফিসারের সঙ্গেও দেখা করলাম—যাতে স্থানীয় সমস্ত ভারতীয় বাসিন্দাদের উপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যায়। কেননা, জাপানের তৎকালীন আকস্মিক অবস্থার জন্যে শাংহাইতে স্বাভাবিক জীবনে যথেষ্ট বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল। মেজর মিশিনার সঙ্গে দেখা করে আমি তাঁকে বোঝালাম, তিনি যেন এ বিষয়ে উপযুক্ত নজর দেন, যেহেতু ভারতীয়রা তখনো বাহ্যত ব্রিটিশ প্রজা এবং তাই জাপানি আর্মির দিক থেকে বিশেষ খেয়াল রাখা দরকার, অন্তত শত্রুপ্রজা অর্থাৎ বিশেষ সুবিধাভোগী সম্প্রদায় হিসেবেও ভারতীয়দের নিরাপত্তা বিষয়ে সর্বপ্রকার সুবিধা-সুযোগ দিতে যেন অসুবিধে না হয়। এইসব স্থানীয় ব্যবস্থাদির মাধ্যমে, টোকিও থেকে শীঘ্রই প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারি করা হলো—যাতে সমস্ত ভারতীয়দের উপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। শাংহাইতে বহু সংখ্যক ব্রিটিশ নাগরিকদেরও বসতি ছিল। তাদের মধ্যে অল্প কয়েকটি পরিবার স্থানত্যাগ করতে পেরেছিল, কিন্তু বাকি অধিকাংশকেই আটক করা হলো যুদ্ধবন্দী হিসেবে।

মেজর মিশিনার প্রহরাধীনে আমি নানকিঙে গেলাম জেনারেল উশিরোকুর সঙ্গে দেখা করতে। তাঁর পূর্বনির্দিষ্ট প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত উদারতার সঙ্গেই আমার জন্যে বেশ ভালো লাঞ্চের ব্যবস্থা করলেন তাঁর হেড কোয়ার্টারের মধ্যেই। এবং আমার সঙ্গে সারাক্ষণ আলোচনা চালিয়ে গেলেন; যার বিষয়বস্তু ছিল—আকাঙ্ক্ষিত ভারত জাপান যৌথ উদ্যোগের কথা—যার উদ্দেশ্য হবে ভারত, বার্মা ও প্রাচ্যখণ্ডের যে কোনো স্থান থেকেই সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তিকে উৎখাত করা।

নানকিং থেকে আমি শাংহাই হয়ে হংকং-এ যাবার এক ব্যস্ত ঝটিকা সফরের ব্যবস্থা করলাম। কর্নেল হারা (Col. Hara) ছিলেন স্থানীয় কমাণ্ডার, তিনিই সেখানে একটি ভারতীয় অফিসকেন্দ্র খোলার পক্ষে প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থাদি করে দিলেন—যেমন একটি অফিসকেন্দ্র ইতিপূর্বেই খোলা হয়েছে শাংহাইতে। হংকং ছিল ভারতীয় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এক স্নায়ুকেন্দ্র স্বরূপ। তাছাড়া, এই হংকং ছিল

সবশ্রেষ্ঠ একটা ঘাঁটি – যেখান থেকে চীনে যা কিছু ঘটনা সংঘটিত হয় তার খবর সংগ্রহ করা যায়।

স্থানীয় উপযুক্ত ভারতীয় নেতৃত্বের হাতে এই নতুন অফিসকেন্দ্রটির দায়িত্বভার হস্তান্তর করার পরে, আমি চলে গেলাম কর্নেল হারা-র অফিসে, তাঁর সঙ্গে একবার সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে এবং তাঁর সহযোগিতার জন্যে তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে। আমার সঙ্গে ছিলেন নানকিঙের উশিরোকু কমাণ্ড-এর লেঃ কর্নেল ওকাদা (Lt. Col. Okada)। তিনি এসেছিলেন অন্য কাজে, এবং সেইসঙ্গে আমার সঙ্গেও দেখা করতে। যাই হোক, অপ্রত্যাশিতভাবেই একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেল। কর্নেল হারা এবং আমার মধ্যে একটা বিবাদ ছিল। তিনি বেশ পৃষ্ঠপোষকতার ঢঙেই আমাকে বললেন, যেহেতু আমার যা খুশি করার অবাধ অধিকার আছে তবু আমি যা কিছু করি তা যেন অবশ্যই জাপান সম্রাটের নামেই করি। আমার মনে হলো, এটা যেন আমাকে গায়ে-পড়া অযাচিত উপদেশ মাত্র যা আমার কাছে কোনো দরকার ছিল না, এবং তাই স্বাভাবিক ভাবেই আমি তার প্রতিবাদ করি। আমি বেশ চড়া স্বরেই তাঁকে বললাম :

'কি বলতে চান আপনি, কর্নেল হারা? কেন আমি আমার কাজকর্ম চালনা করবো জাপান সম্রাটের নামে? আমি পরিচালনা করছি মূলত ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের কাজকর্ম, এবং তা আমি অবশ্যই করবো ভারতের নামে।'...

কর্নেল হারা-রও উত্তেজনা কমলো না, এবং আমি দেখলাম তাঁর আচরণ অত্যন্ত আপত্তিজনক। মেজাজ প্রায় খারাপ করেই বলে ফেললাম : চুলোয় যাক্ আপনার কথা। আমি যা ভালো বুঝবো তাই করবো।...

লেঃ কর্নেল ওকাদা তাঁর টু-সিটার প্লেনটি প্রস্তুত করেই রেখেছিলেন আমাকে নিয়ে শাংহাই যাত্রার জন্যে। কিন্তু আমার ও হারা-র মধ্যে বাগবিতণ্ডার জন্যে যাত্রায় দেরি হয়ে গেল। তবুও আমি রেগে ছিলাম কর্নেল হারা-র আচরণে, এবং স্থির করতে পারছিলাম না তাঁর আচরণ সম্পর্কে জেনারেল উশিরোকু কিংবা অন্য কোনো সিনিয়ার অফিসারের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করবো কিনা – হংকং পরিত্যাগ করার আগেই। যাই হোক, এই পরিস্থিতি থেকে বাঁচিয়ে দিলেন লেঃ কর্নেল ওকাদা – যিনি কোনো রকমে আমাদের মধ্যে একটা শান্তি স্থাপন করতে পেরেছিলেন।

অতঃপর প্লেনে আমাদের যাত্রাকালে, লেঃ কর্নেল ওকাদা এবং আমি, উভয়েই ছিলাম উত্তেজিত এবং তাই নির্বাক। আমরা উভয়েই চিন্তা করছিলাম কর্নেল হারা-র আচরণের কথা। যাই হোক, শাংহাইতে পৌঁছে আমরা নিশ্চিন্ত বোধ করলাম।

লেঃ জেনারেল কাশারা (Lt-Gen. Kaashara) ছিলেন জেনারেল উশিরোকুর চীনা-কমাণ্ডের ভাইস-চিফ অফ স্টাফ, এবং আমার একজন পুরনো পরিচিত জন — তিনি এবং মেজর মিশিনা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন এক বিলাসবহুল জাপানি রেস্তোর'ায়। লেঃ কর্নেল ওকাদা আমাদের হংকঙের ঘটনাটির কথা বলছিলেন উক্ত লেঃ জেনারেল কাশারা ও মেজর মিসিনার সঙ্গে। আমি অবাক হয়ে দেখলাম তাঁরা যেন আন্তরিক হাসিতে ফেটে পড়লেন। যখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম তাঁরা কেন এরকম গুরুতর বিষয় এমন হালকা ভাবে নিচ্ছেন, লেঃ জেনারেল কাশারা বললেন — কেউই এর চেয়ে ভালো কিছু আশা করেন না কর্নেল হারা-র কাছ থেকে, যেহেতু হারা একজন ছিটগ্রস্ত খ্যাপা লোক।

কেবলমাত্র তখনি আমি জানতে পারলাম, আর্মির মধ্যে কর্নেল হারা র 'খ্যাতির' কথা। তিনি অবশ্যই একজন যোগ্য অফিসার ; অন্যথায় তাঁকে কখনোই হংকঙের মতো একটা গুরুত্বপুর্ণ কমাণ্ডের দায়িত্বে রাখা হতো না। (তিনিই সেই অফিসার — যাঁর কাছে ব্রিটিশ আর্মির হংকং গ্যারিসন পরাজয় স্বীকার করেছিল।) আমাকে বলা হলো যে, আসলে তিনি মন্দলোক নন ; কিন্তু তাঁর সমস্যা হলো 'কান্নাগারা' (Kannagira, Emperor worship) অর্থাৎ সম্রাট-উপাসনার চরম সমর্থক হিসেবে তিনি কোনো কোনো সময়ে বেসামাল হয়ে পড়েন এবং কিছুটা উন্মাদের মতো হয়ে যান। আপাতদৃষ্টিতে এরকমই হয়েছে সাময়িক ভাবে হংকঙের ঘটনায় — যখন তিনি আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন। লেঃ জেনারেল কাশারা আমাকে বললেন যে, কর্নেল হারা ইতিপূর্বে কোরিয়ায় এরকম কাণ্ডই ঘটিয়েছিলেন। যদি আমি এই সমস্ত অতীত ঘটনার কথা আগেই জানতে পারতাম, তাহলে আমি সম্ভবত কর্নেল হারা-র সঙ্গে অন্যভাবে কথা বলতাম এবং ঐ অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পারতাম।

শাংহাই-এর ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের অফিসকেন্দ্রটি ভালোই কাজকর্ম চালাচ্ছিল। সময়টা ছিল ১৯৪২ জানুয়ারির শেষ সপ্তাহ, তখন আমি একজন প্রখ্যাত ব্যবসায়ী মিঃ ওসমান-এর সঙ্গে ব্যবস্থা করেছিলাম ভারতীয় পতাকা-উত্তোলন অনুষ্ঠানের জন্যে — ২৬ জানুয়ারি তারিখে। একদল পানজাবি মহিলা সমবেত কণ্ঠে গেয়েছিলেন 'বন্দেমাতরম্' সংগীত। সেই প্রথম শাংহাইবাসীরা প্রত্যক্ষ করলেন প্রকাশ্য এই জাতীয় একটা ভারতীয় উৎসবের অনুষ্ঠান। প্রায় ৫০০ স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

আমি শাংহাই থেকে জাপানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম পরদিনই। যাত্রার প্রাক্কালে, সানন্দে অবাক হয়ে দেখলাম মেজর মিশিনা এসেছেন আমাকে বিদায় জানাতে, এবং আমার হাতে তুলে দিলেন নগদ ৬ হাজার ইয়েন (জাপানি মুদ্রা) — যা পাঠিয়েছিলেন জেনারেল উশিরোকু, একটি বার্তাসহ — যাতে বলা হয়েছিল, এই অর্থ আমি আমার খরচপত্রের জন্যে এবং ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে

প্রয়োজনীয় কাজকর্ম জোরদার করার জন্যে আমার ইচ্ছেমতো খরচ করতে পারি।

টোকিওয় পৌঁছে আমি চললাম আকাসাকার সান্নো হোটেলের (Sanno Hotel, Akasaka) দিকে, এবং দু'খানি ঘর বুক করলাম – ৩০১ ও ৩০২ নম্বর ঘর। আমার অতিরিক্ত একখানি ঘরের প্রয়োজন ছিল – প্রচুর চিঠিপত্র লেখালেখির কাজের জন্যে, তাছাড়া দর্শনার্থীদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের জন্যেও। আমি জেনারেল উশিবোকুর দেওয়া সেই অর্থ থেকে আমার জন্যে রাখলাম খুব সামান্য অংশই, এবং অবশিষ্ট অংশ জমা রাখলাম হোটেল কর্তৃপক্ষের কাছে নিরাপদে তুলে রাখার জন্যে। হোটেল কর্তৃপক্ষ আমার অর্থ সম্পদ দেখে অভিভূত হলেন। আমি অবশ্যই স্বীকার করবো, আমিও স্বয়ং ক্ষণকালের জন্যে গর্বিত ও উল্লসিত হয়ে উঠেছিলাম। অথচ কী বিপরীত ঘটনা : কত দারিদ্র্যের মধ্যে আমাকে কাটাতে হয়েছে, যখন সিংকিয়াং থেকে আমি সিংকিঙে ফিরছি – এক চীনা দস্যুর হাতে পড়ে সর্বস্বান্ত হয়ে ; এবং এখন আমার হাতে এমন প্রচুর অর্থ যা আমাকে হোটেল কর্তৃপক্ষের হাতে রাখতে হচ্ছে সেফ-ডিপোজিটে জমা রাখতে, এবং তার ফলে এখন বিরাট সান্নো হোটেলের মতো সংস্থায়ও আমার যথেষ্ট ক্রেডিটের যোগ্যতা অর্জিত হয়েছে।

টোকিওয় আমার প্রথম কাজ হলো, মিলিটারি হাইকমাণ্ড-এর সঙ্গে যোগাযোগ করা, বিশেষত কুদান হিল্‌স-এ (Kudan Hills) অবস্থিত সশস্ত্র বাহিনীর হেডকোয়ার্টার্স-এর সেকেণ্ড ব্যুরোর অষ্টম সেকশানের সঙ্গে। সেখানকার বিরাট অফিস বাড়িগুলি, ইমপিরিয়াল হেডকোয়ার্টার্স এবং জেনারেল স্টাফকে – একত্রে জাপানি ভাষায় বলা হয় 'দাই হোনেই' (Dai Honyei)। জেনারেল হেডকোয়ার্টার্স-এর প্রথম ব্যুরোর ছিল চারটি সেকশান। তারা দেখাশোনা করতো সেনাবাহিনীর সক্রিয় চলাচল সংক্রান্ত বিষয়গুলি ; দ্বিতীয় ব্যুরোরও ছিল চারটি শাখা—প্রথম ব্যুরোর চারটি সেকশানের সঙ্গে সংগতি রেখে, তাদের সংখ্যাচিহ্ন ছিল পাঁচ থেকে আট। এই দ্বিতীয় ব্যুরোর প্রাথমিক কাজ ছিল দেশি-বিদেশি ইন্‌টেলিজেন্স কর্মী সংগ্রহ করা, এবং এই ব্যুরোর দায়িত্ব ছিল 'বোরিয়াকু' (Boryaku, espionage) বা গোয়েন্দাগিরি কাজকর্মের - যুদ্ধের সময়ে যা ছিল অপরিহার্য। এই দ্বিতীয় ব্যুরোর হাতেই ছিল গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ষে কার্যকরী চাবিকাঠি, এবং ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতো প্রথম ব্যুরোর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে। পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম সেকসান দেখাশোনা করতো যথাক্রমে ইয়োরোপিয়ান, আমেরিকান, রাশিয়ান, চীনা এবং সাউথ-ইস্ট এশিয়ান বিষয়গুলি। অষ্টম সেকশানের হাতে ছিল ব্যাপক ক্ষমতা ও দায়িত্ব—বিশেষত শত্রুভাবাপন্ন বিরোধী দেশগুলির মধ্যে চোরাগোপ্তা আক্রমণ চালানো, গোপন ও প্রকাশ্যে প্রচার ও জনমত গড়ে তোলার জন্যে অভিযান চালানো ইত্যাদি কাজকর্ম। সরবরাহ, পরিসেবা

ও যানবাহনের (সাপ্লাই, সার্ভিস ও ট্রান্সপার্ট) সংক্রান্ত কাজকর্মের দায়িত্ব ছিল তৃতীয় ব্যুরোর ওপর।

জাপানি মিলিটারি হাইকমাণ্ড অবশ্য বেশ কিছুকাল যাবৎ যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল। মিলিটারি হাইকমাণ্ড আরো পরিকল্পনা করেছিল যাতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বসবাসকারী বৃহত্তর ভারতীয় সম্প্রদায়ের কাছ থেকে শুভেচ্ছা অর্জন করা যায়। ১৯৪১ সেপটেম্বর এর গোড়ার দিকে এই মিলিটারি হাইকমাণ্ড একটি লিয়াজোঁ গোষ্ঠী সংগঠন করে ভারতীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্যে ; এখানকার ভারতীয়দের সংখ্যা প্রায় দুই মিলিয়ানেরও বেশি। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে স্বীকৃত ও সমর্থক সদস্য। বৃহত্তর পূর্ব-এশিয়া যুদ্ধের (Greater East Asia War) পরিপ্রেক্ষিতে, ঐসব ভারতীয়-দের সহযোগিতা হবে নানা দিক থেকেই মূল্যবান।

আর্মি স্টাফের চিফ, জেনারেল সুগিয়ামা (Gen. Sugiyama) ছিলেন রাজনৈতিক দূরদর্শী মানুষ—যদিও তিনি নিজেও তাঁর সহকর্মীদের মতোই জাপানের সামরিক ক্ষমতাকে অতিরিক্ত আস্থার দৃষ্টিতে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখেছিলেন, অন্তত পশ্চিমি যৌথশক্তির মিলিত বাহিনীর তুলনায়। জাপানের প্রাথমিক বিজয়গুলি ছিল দারুণ উত্তেজনাপূর্ণ। এটা ছিল জেনারেল সুগিয়ামার পরিকল্পনা- যিনি সমর্থন করেছিলেন, ভারতীয় সম্প্রদায়ের সুবিধা-অসুবিধার বিষয়গুলি দেখাশোনার জন্যে পৃথক একটি অফিস স্থাপন করা উচিত।

জেনারেল সুগিয়ামা স্থির করলেন এই অফিসটি নিয়মিত ভাবে স্থাপিত হবে ব্যাংককে, সেখানকার জাপানি কূটনৈতিক মিশনের মিলিটারি অ্যাটাশে কর্নেল তামুরার (Col. Tamura) অধীনে—যেহেতু ব্যাংকক হলো একটা সুবিধাজনক কেন্দ্র, সেখান থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী ভারতীয়দের বিষয়ে কাজকর্মের ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব হবে। মেজর আইওয়াইচি ফুজিওয়ারা (Maj. Iwaichi Fujiwara) নামে একজন অফিসার এবং প্রায় ২০ জনের একদল স্টাফ—যাঁরা গোয়েন্দাগিরির কাজে অভিজ্ঞ, তাঁদের পাঠানো হলো কর্নেল তামুরার কাজে সহায়তা করার জন্যে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের ইংরেজিতে বেশ ভালো জ্ঞান ছিল, এবং এমনকি অল্প কয়েকজন মোটামুটি হিন্দুস্তানিও বলতে পারতেন। আমাকে নির্বাচিত করা হলো টোকিও হাইকমাণ্ড এবং ব্যাংককে এই নতুন স্থাপিত সংস্থার মধ্যে যোগাযোগকারী অফিসার হিসেবে যে সংস্থার নাম দেওয়া হলো 'তামুরা কিকান' (Tamura Kikan, Tamura's office) বা তামুরার অফিস।

ভারতীয় সম্প্রদায় সাধারণভাবে আমার মাধ্যমে জাপানি কর্তৃপক্ষের কাছে একটা

অনুরোধ রাখলেন যে, রাসবিহারী বোসকে যেন তাঁদের নেতা বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয় জাপানে এবং সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে। জাপান সরকার তাতেই সম্মত হলেন। এক্ষেত্রেও আবার তাঁরা স্থির করলেন, প্রয়োজনীয় আলোচনা ও যোগাযোগের দ্বারা বিশেষত উভয়পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য কার্যকরী কর্মসূচি প্রস্তুত ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আমিই কাজ করবো মাধ্যম হিসেবে। এই উদ্দেশ্যে আমার অফিসিয়াল পদমর্যাদা হলো ভারতীয় বিষয় সংক্রান্ত কাজে চিফ লিয়াজোঁ অফিসার বা মুখ্য যোগাযোগকারী অফিসার হিসেবে।

বৃহত্তর পূর্ব-এশিয়া যৌথ-সমৃদ্ধি অঞ্চলের (Greater East Asia Co-prosperity sphere, Dai Toa Kyoei-ken) পরিকল্পনা ও উন্নতি করা হলো জাপান সরকার কর্তৃক, এমনকি ১৯৩৯ সনের আগেই। এই সংস্থার মূল উদ্দেশ্য হলো, অন্তত প্রাথমিক ভাবে হলেও জাপানের ওপর পশ্চিমি চাপ – যা দেখা গেছে বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণমূলক প্রতিকার ব্যবস্থার মধ্যে - তার বিরুদ্ধে একটা পাল্টা প্রতিরোধ-শক্তি গড়ে তোলা ; অর্থাৎ এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র এবং এ.বি.সি.ডি. (আমেরিকা, ব্রিটিশ, চীনা ও ডাচ) দেশগুলিতে অভিবাসন বা দেশান্তর গমন নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে – পশ্চিমিদের দিক থেকে অর্থনৈতিক প্রতিরোধ (কথনো কথনো উল্লেখ করা হয়েছে এ বি.সি.ডি চক্র নামে) ইত্যাদি কাজের দ্বারা জাপানকে দুর্বল করার মতলব ইত্যাদি কাজের পাল্টা জবাব দেওয়া। ১৯৪০ সনে, প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স কোনোয়ে-র (Prince Konoe) সময়ে এই পরিকল্পনা নির্দিষ্ট একটা কাঠামোর মধ্যে রূপ গ্রহণ করে। ভারত যেভাবেই হোক, এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয়নি। কোনেয়ে-ক্যাবিনেটের নীতি-নির্দেশ অনুসারে, পূর্বোক্ত যৌথ-সমৃদ্ধি ক্ষেত্রের আওতাভুক্ত হলো কেবলমাত্র ফিলিপাইন্স, ফরাসি, ইন্দোচীন, ডাচ ইস্ট-ইণ্ডিজ, থাইল্যাণ্ড, মালয়, হংকং, সিংগাপুর ও বার্মা। অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড এবং নিউ ক্যালোডোনিয়া ইত্যাদি দেশগুলিকে উক্ত যৌথ-সমৃদ্ধি ক্ষেত্রের আওতাভুক্ত করা হয় দীর্ঘকাল পরে।

কর্নেল তামুরার নির্দেশ ছিল যে, ফুজিওয়ারা (Fujiwara) এবং তাঁর স্টাফের কর্তব্য হলো ব্রিটিশ মিলিটারি সংগঠনের কাজকর্ম ভালোভাবে পর্যালোচনা করা – বিশেষত ভারত, মালয় এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলিতে। কিন্তু ফুজিওয়ারার হাতে প্রাথমিক কোনোরকম উপকরণ ছিল না, কিংবা এইসব অঞ্চলে ভারতীয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁর কোনো রকম সরাসরি যোগাযোগ ছিল না – একমাত্র সৌজন্যমূলক সাধারণ সম্পর্ক ছাড়া। যাই হোক, ফুজিওয়ারা একেবারে গোড়া থেকেই কাজ শুরু করলেন, অর্থাৎ টোকিওর হাইকমাণ্ড থেকে যেসব বিষয় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল, তার থেকেও ফুজিওয়ারার কাজের সীমা ছাড়িয়ে

গেল। এমনকি মঞ্জুরী ছাড়াই তিনি নিজে থেকেই একটা পরিকল্পনা করলেন, যাতে ছিল জাপানি মিলিটারি সংস্থার পক্ষে ভারতে সম্প্রসারণবাদী কাজকর্ম চালানোর ব্যবস্থা। তিনি এসব করার চেষ্টা করেছিলেন মালয়স্থিত ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের সাহায্যে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন দূরের কথা, কারো সঙ্গে কোনোরকম আলোচনা না করেই, ফুজিওয়ারা নিজেই এইসব যুদ্ধবন্দীদের বিভিন্ন স্থানে নিযুক্ত করার পরিকল্পনা করেন – ভারতীয় ক্যাপটেন মোহন সিং-এর নিয়ন্ত্রণাধীনে। এই মোহন সিং ছিলেন গোড়ার দিকে ব্রিটিশ ইনডিয়ান আর্মি ইউনিটগুলির একটির সঙ্গে যুক্ত – যে আর্মি ইউনিটগুলি পরাজয় স্বীকার করে জাপানের হাতে, মালয়ান অভিযানের সময় পেনিনসুলার উত্তরাঞ্চলে জিৎরা (Jitra), নামক স্থানে। সিংগাপুরের পরাজয়ের পরে যখন বহু সংখ্যক ভারতীয় এবং ব্রিটিশ সৈন্যদের বন্দী করা হয়, তখন একটা সন্ধি-চুক্তি হয় ফুজিওয়ারা ও মোহন সিং-এর মধ্যে। তাঁরা উভয়েই কালক্রমে বহু সমস্যার সৃষ্টি করেন ইনডিয়ান ইনডিপেনডেন্স লিগের পক্ষে। এসব বিষয়ের কথায় আমি পরে আসছি।

বেশ কয়েকখানি বই লেখা হয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে : বিশেষত এই আন্দোলনের প্রাথমিক নেতা রাসবিহারী বোস এবং পরবর্তীকালে সুভাষচন্দ্র বোসের বিষয়ে। এইসব বইগুলির বেশ কয়েকটিতে বহু তথ্যগত ভুল ও সত্যের বিকৃতি আছে—হয় ইচ্ছাকৃতভাবে কিংবা অজ্ঞতাবশে। আমার এই স্মৃতিকথার অন্যতম একটা উদ্দেশ্য হলো – ঐসব বইয়ের যেসব ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল যাবৎ ভুল ব্যাখ্যা চলে আসছে তার একটা সরাসরি সঠিক তথ্যচিত্র তুলে ধরা ও তার প্রতিষ্ঠা করা। ঐসব ঘটনায় একজন সরেজমিন অংশগ্রহণকারী বা সক্রিয় প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে আমি বিশ্বাস করি, আমার একটা নৈতিক কর্তব্য আছে জনসাধারণকে এ বিষয়ে যেসব স্থানে ভুল বোঝানো হয়েছে, সেদিকে সঠিকভাবে তাদের অবহিত করা।

প্রাচ্যখণ্ডে যুদ্ধে লিপ্ত হবার সময়ে, জাপানের হাতে এমন কোনো সুস্পষ্ট নীতি-নির্দেশ ছিল না যার দ্বারা ভারত-জাপান সম্পর্ক বিষয়ে কাযকরী ভাবে অগ্রসর হওয়া যায়। রাসবিহারী বোস ছিলেন জাপানে খুবই সক্রিয়, আমি ছিলাম মানচুকুওয়, এবং আমরা উভয়েই ব্রিটিশ-বিরোধী কাজকর্ম করছিলাম আমাদের নিজস্ব ধরনে। এদিকে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন – থাইল্যাণ্ড, মালয়, বার্মা, হংকং, শাংহাই এবং অন্যান্য অঞ্চলেও। কিন্তু ঘটনাক্রমে যা ইনডিয়ান ইনডিপেনডেন্স লিগ নামে পরিচিত হলো – তাই ক্রমশ ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামকে সুস্পষ্ট রূপ দিতে লাগলো, বিশেষত ঐসব অঞ্চলে সংহতভাবে ; এবং তার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো রাসবিহারী বোসের অধীনে, অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের অংশগ্রহণের পরে। এটা ঘটেছিল টোকিওয় জাপানি হাইকমাণ্ডের

সঙ্গে রাসবিহারী বোস এবং আমার মধ্যে বেশ কয়েক দফা আলোচনার পরে।

আমি একথা বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই বলতে পারি, কারণ ঐসব আলোচনায় রাসবিহারী বোস এবং জাপানি মিলিটারি কর্তৃপক্ষের মধ্যে আমি ছিলাম যোগাযোগকারী ; জাপানি পক্ষের নেতা ছিলেন জেনারেল স্থগিয়ামা। কেন যে রাসবিহারী আমাকেই নির্বাচিত করলেন এরকম একটা ভূমিকায়, বিশেষত অন্যান্য ভারতীয়রা থাকতে, এমনকি যাঁদের মধ্যে অনেকেই স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন, তার কারণ বোধ হয় : তাঁর সঙ্গে ছিল উচ্চ শ্রেণীর নাগরিক স্তরে গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ, এবং আমি ছিলাম একমাত্র ভারতীয় যার সঙ্গে ছিল মিলিটারি মহলের সহজ অন্তরঙ্গতা ও গতায়াত, বিশেষত জাপানি মিলিটারি সংস্থার সেকেণ্ড ব্যুরোর (Dai Honyei, দাই হোনেই) সঙ্গে। প্রকৃতপক্ষে, রাসবিহারী এবং জেনারেল স্থগিয়ামার মধ্যে প্রথম সাক্ষাতের ব্যবস্থা আমিই করেছিলাম, বিশেষত যেসব অফিসাররা ভারতীয় বিষয়-ব্যাপারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে।

আমাদের প্রচেষ্টা ছিল, জাপান ছাড়াও সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বসবাসকারী ভারতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা উপযুক্ত সংস্থা গড়ে তোলা ; এবং এক্ষেত্রে কার্যকরী একটা নীতি-নির্দেশ স্থির করা, যাতে আকস্মিক পরিবর্তিত পরিস্থিতিকে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের সপক্ষে সবচেয়ে ভালোভাবে কাজে লাগানো যায়।

আগেই বলেছি যে, ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম দীর্ঘকাল যাবৎ বিভিন্ন শক্তসমর্থ প্রবাসী নেতৃবৃন্দের হাতে বেশ বলিষ্ঠতার সঙ্গেই অগ্রসর হচ্ছিল, তাছাড়া ভারতের ভিতরকার নেতৃবৃন্দ তো আছেনই। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন কাজ করছিলেন স্বতন্ত্রভাবে, এবং অন্যান্য কয়েকজন বিভিন্ন সংস্থার প্রধান হিসেবে বিভিন্ন ভাবে। এই হলো উপযুক্ত সময় যখন এইসব বিভিন্ন ভাবে বিক্ষিপ্ত উপকরণ একত্রিত করে একটা সুসংগঠিত সুসংহত প্রতিষ্ঠানের অধীনে আনা যায় একটা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অধীনে। রাসবিহারী আমার সঙ্গে আলোচনা করে প্রস্তাব করলেন যে, প্রস্তাবিত সংস্থার নাম হওয়া উচিত—ইনডিয়ান ইনডিপেনডেন্স লিগ (Indian Independence League), এবং জেনারেল স্থগিয়ামা তাতেই সম্মত হলেন। ১৯৪২ ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে, টোকিও থেকে রেডিও যোগে ও সংবাদপত্র মারফৎ ঘোষণা করা হলো যে, ইনডিয়ান ইনডিপেনডেন্স লিগ সদর দফতর সহ স্থাপিত হয়েছে—সান্নো হোটেলের ৩০২ নং ঘরে। আমরা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের

প্রয়োজনীয় কর্মধারা এবং সক্রিয় কর্মসূচি ইত্যাদি স্থির করার কাজে লেগে পড়লাম।

আমি রাসবিহারীর সঙ্গে রোজই দেখা করতাম বিশদ আলোচনার জন্যে। আমাদের অব্যবহিত কর্মসূচি হলো, প্রায় ২ মিলিয়ান ভারতীয়দের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান করা—ঐসব অঞ্চল থেকে ইতিমধ্যেই যাদের হয় আটক করা হয়েছে, অথবা শীঘ্রই জাপানি বাহিনীর হাতে যাদের খতম করা হবে। আমি সর্বদাই মিলিটারি হেড-কোয়ার্টার্সের সঙ্গে এই পরিস্থিতি বিষয়ে যোগাযোগ রেখে চলছিলাম, অর্থাৎ যেসব অঞ্চলে ঐ বিষয়টি সেই সময় দারুণ সমস্যার রূপ ধারণ করেছিল—বিশেষত মালয়ে—যেখানে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বসবাসকারী ভারতীয়দের অর্ধেকের বসবাস ছিল। তাদের অধিকাংশই ছিল সাধারণ মজুর, তারা কাজ করতো ব্রিটিশ চা-বাগান ও কল-কারখানাগুলিতে, কিংবা নিযুক্ত ছিল ব্যবসায়ের কাজে, যদিও আরেকটি শ্রেণীর মধ্যেও ছিল বহু সংখ্যক মানুষ—যাদের মধ্যে ছিলেন উকিল, ডাক্তার, যন্ত্রকুশলী এবং বাবু শ্রেণীর কর্মীবৃন্দ। জাপানি বাহিনী তখন খতম করার কাজে লেগে পড়লো থাই সীমান্ত থেকে মালয় পেনিনসুলার মধ্য দিয়ে, এবং দ্রুত মার্চ করে চললো সিংগাপুরের দিকে। ব্রিটিশ প্রতিরোধ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে গেল এবং সিংগাপুর শীঘ্রই পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হলো। ভারতীয় অসামরিক লোকদের নিরাপত্তা ছাড়া, ভারতীয় সেনাদের কল্যাণকর্মের প্রশ্নও দেখা দিল। আমি কুদান হিল্‌স-এ অবস্থিত মিলিটারি হাইকমাণ্ডকে অত্যন্ত গোপনভাবে অনুরোধ করলাম—তাঁরা যেন এখনি অত্যন্ত জরুরি ভাবে তাদের মালয় কমাণ্ডকে নির্দেশ দেন, যাতে ঐ বাহিনী ভারতীয়দের কোনো রকম ক্ষতি না করে।

এটা অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার বিষয় যে, আমার অনুরোধ অনুসারে তখনি ঐ মর্মে আদেশ-নির্দেশ জারি করা হলো। তার ফল হলো উল্লেখযোগ্য। একমাত্র সামান্য কয়েকটি বিচ্ছিন্ন দুর্ব্যবহারের ঘটনা, এমনকি দুর্ভাগ্যজনক হত্যাহত্যের ঘটনা ব্যতীত, ভারতীয় অসামরিক সম্প্রদায় সে যাত্রা এক সর্বনাশা পরিণতির হাত থেকে রেহাই পেয়ে গেল—যে ভয়ংকর পরিণতি সংঘটিত হয়েছিল অন্যান্য সম্প্রদায়, বিশেষত চীনাদের ক্ষেত্রে। ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদেরও কোনো রকম ক্ষতি করা হয়নি, অথচ ব্রিটিশ, অস্ট্রেলিয়ান ও নিউজিল্যাণ্ড এর যুদ্ধবন্দীরা সে সুযোগ পায়নি। মালয়, ভারত বা অন্য যেখানেই হোক, যাঁরাই ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে বইপত্র লিখেছেন তাঁরাই এই ঘটনা জানেন যে, টোকিওর মিলিটারি হাইকমাণ্ডের আদেশ-নির্দেশের ফলেই ঐসব অঞ্চলে বসবাসকারী ভারতীয়দের জীবন রক্ষা পায়। এমনকি টোকিও থেকে মালয় কমাণ্ডকে বলে দেওয়া হয়েছিল

কিভাবে অন্যান্যদের মধ্য থেকে ভারতীয়দের বাছাই করে পৃথক করা যাবে, যে প্রথায় জাপানি সেনাদের কাজটা সহজ হয়ে যায়; একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল গ্রামাঞ্চল থেকে জোর করে ভর্তি করা কিছু সেনাদের কাজে— তারা ততটা দক্ষতা অর্জন করতে পারেনি। যাই হোক, বেশ সহজ একটা প্রথার প্রবর্তন করা হলো। জাপানি সশস্ত্র বাহিনীর লোকদের টোকিও থেকে সিগন্যাল দেওয়া হলো ভারতীয়দের বাছাই করার কাজে, অর্থাৎ নির্দেশ দিয়ে বলা হলো সন্দেহ হলেই তারা যেন জিজ্ঞাসা করে: 'গান্ধী' (অর্থাৎ জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি গান্ধীর দেশের লোক কিনা)? জবাবটা যদি ইতিবাচক হয়, এমনকি সামান্যতম মাথানাড়া গোছেরও হয়, তাহলেই সেসব লোকদের ভালো রকম যত্ন করা হবে। এইভাবে শত্রুপক্ষের লোক হিসেবে ভারতীয়দের না দেখার আদেশ যদি টোকিও থেকে যথাসময়ে না দেওয়া হতো, তাহলে ভারতীয় সম্প্রদায়ের অদৃষ্টে সেদিন এক অবর্ণনীয় ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হতো।

যে মুহূর্তে লিগের সদর দফতর সান্নো হোটেলে স্থাপিত হওয়ার কথা ঘোষণা করা হলো, হাজার-হাজার জাপানি যুবকেরা সেখানে এসে হাজির হতে লাগলো স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে ঐ সংস্থায় যোগ দেওয়ার জন্যে। রাসবিহারী বোস এবং আমি এরকম একটা সম্ভাবনার কথা আগেই অনুমান করেছিলাম, এবং সেজন্যে প্রস্তুত ছিলাম। প্রাথমিক পর্যায়ে, এমনকি জেনারেল স্থগিয়ামার সঙ্গে আমাদের আলোচনার আগেই, আমাদের মধ্যে নিজেরাই আলোচনা করেছিলাম, এবং ইনডিপেনডেন্স লিগের পক্ষে কার্যকরী এক প্রস্থ নীতিনির্দেশ প্রণয়ন করতে আমরা সমর্থ হয়েছিলাম।

উক্ত নীতি-নির্দেশগুলি হলো— ক. এই সংস্থার ভিত্তি হবে সর্বস্তরে 'অনাসক্ত কর্ম' অর্থাৎ কোনো কিছুই কেবলমাত্র কারো ব্যক্তিগত স্বার্থে বা কোনো গোষ্ঠীর স্বার্থে করা হবে না; খ. বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে উদ্দেশ্যগত সম্পূর্ণ অভিন্ন ঐক্য থাকবে, লিগের প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত ঐ সংস্থা সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক বা অন্য যে কোনো নামেই তা পরিচিত হোক না কেন; গ. লিগ কাজ করবে ভারতস্থ ইনডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস-এর নেতৃবৃন্দের সমর্থনেই, এবং কোনো কিছুই করবে না তার বিরুদ্ধে বা অস্বীকৃতিতে; ঘ. যদিও জাপানি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সহযোগিতা প্রয়োজন এবং তাকে স্বাগত জানানো হবে, কিন্তু নীতি-নির্দেশ স্থির করা হবে ও তা রূপায়িত করা হবে সম্পূর্ণ ভাবে লিগের দ্বারা, অর্থাৎ অন্য কারো কোনোরকম হস্তক্ষেপ ছাড়াই।

অর্থাৎ লিগের সঙ্গে জাপানি সম্পর্ক ও সহযোগিতার বিষয়টি নিরপেক্ষ ভাবে বিবেচিত ও স্থিরীকৃত হলো। আমাকে প্রায় দু-সপ্তাহেরও বেশি কাল যাবৎ রোজ প্রায় কয়েক ঘণ্টা ধরে সান্নো হোটেলের করিডোরে বসতে হতো— বিপুল সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবীদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হতো, এবং তাদের ব্যাখ্যা করে বোঝাতে

হতো কেন আমরা তাদের তালিকাভুক্ত করতে পারছি না। আমি তাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ দিতাম, কিন্তু 'নমস্তে' (প্রথাগত ভারতীয় রীতিতে দু'হাত জোড় করে, অভিবাদন জানিয়ে) বলে বোঝাতাম যে, আমরা যদিও তাদের এরকম আন্তরিক ভাবে সাড়া দেওয়ার জন্যে কৃতজ্ঞ, তবু আমাদের নীতিনির্দেশ অনুসারে লিগের সদস্যদের ভারতীয় হতে হবে। আমাদের অবশ্যই জাপানি বন্ধুদের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রয়োজন হবে, কিন্তু দুঃখের বিষয় তা আমরা সংগঠনের মাধ্যমে নিতে পারি না।

আমার মনে হয়েছিল, যারা তখন এসেছিল তাদের অধিকাংশই এসেছিল ভারতকে সাহায্য করার আন্তরিক আকাংক্ষা নিয়ে। কিন্তু এটাও সম্ভব যে, তাদের মধ্যে কিছু অংশের মনে হয়েছিল স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে লিগে নাম লেখাতে পারলে, জাপানি সশস্ত্র বাহিনীতে বাধ্যতামূলক ভাবে ভর্তি হওয়ার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। যেভাবেই হোক, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, আমাদের দিক থেকে লিগকে সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় রূপে রাখতে হবে—সংগঠন ও নিয়ন্ত্রণ, উভয়দিক থেকেই।

তারপর খুব শীঘ্রই, 'নিপ্‌পন হোসো কিওকাই' (Nippon Hoso Kyokai NHK) অর্থাৎ জাপান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন থেকে একটা শর্ট-ওয়েভ স্টেশনের উদ্বোধন করা হলো—আমাদের দিক থেকে ভারতের উদ্দেশে দৈনন্দিন প্রচারের জন্যে। রাসবিহারী বোস এই সুবিধা কাজে লাগিয়েছেন এবং প্রকৃতপক্ষে ভারতের সকল বিশিষ্ট নেতাদের উদ্দেশে ভাষণ দিয়ে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন এই ইনডিয়ান লিগের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য ইত্যাদি বিষয়ে এবং তাঁদের জানিয়েছেন: এই সংস্থা হলো একটা সংযুক্ত সংস্থা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও দূর-প্রাচ্যের ভারতীয়দের নিয়ে সংগঠিত, এবং এই সংস্থা ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে তাঁদের সংগ্রামে সর্বপ্রকারে যথাসাধ্য সমর্থন দেওয়ার জন্যে কৃতসংকল্প। তিনি তাঁর সংকটের কথা একটা খবরে জানালেন যে, মিঃ জিন্না (Mr. Jinnah কাজ করে চলেছেন মুসলিমদের স্বার্থে একটি পৃথক রাষ্ট্র-অর্থাৎ পাকিস্তান গঠনের জন্যে। তিনি রেডিও মারফৎ সুপারিশ করলেন, এমনকি মিঃ জিন্না যদি ভারতের প্রেসিডেন্ট হতেও চান আমরা সবাই তাঁর পক্ষ সমর্থন করবো, কিন্তু তাঁর উচিত হবে মাতৃভূমিকে ভাগ করার মতো কোনোরকম প্রচেষ্টা বা কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকা। রাসবিহারী ঘোষণা করলেন: আসুন, আমরা সবাই একসঙ্গে সংগ্রাম করি এবং অর্জন করি মুক্ত স্বাধীন ভারত—যা চিরকাল ঐক্যবদ্ধ থাকবে।

আমরা আমাদের মনের দিক থেকে সংস্কারমুক্ত ছিলাম যে, ভারতীয় স্বাধীনতার পক্ষে প্রচারাভিযান ইত্যাদি কার্যকলাপ জাপানি অধিকৃত বা নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবো; কেবলমাত্র আমরা টোকিওস্থ জাপানি কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা ও তাদের আঞ্চলিক কমাণ্ডের সাহায্য নেবো। সেটাই ছিল যুক্তিযুক্ত, কেননা ঐসব

অঞ্চলে ছিল জাপানের পূর্ণ কর্তৃত্ব এবং সেকথা অর্থাৎ বাস্তবকে অস্বীকার করার চেষ্টায় কোনো লাভ নেই। যেভাবেই হোক, আমরা কখনোই লিগের ওপর 'জাপানি কর্তৃত্ব' মেনে নেবার পরিকল্পনার কথা চিন্তা বা সমর্থন করিনি। পরিস্থিতি ছিল জটিল, এবং তা বিচক্ষণতার সঙ্গে অর্থাৎ আইনগত বিচার-বিবেচনা ও কূটনৈতিক দিক থেকেও জাপানি হাইকমাণ্ডের সঙ্গে বিষয়টি আলোচনার প্রয়োজন—যাতে আমাদের ইনডিয়ান লিগ কার্যকরীভাবেই তার কাজকর্ম চালাতে পারে, এবং স্বায়ত্তশাসিত ভারতীয় সংস্থা এই লিগের সংস্থাগত মর্যাদার প্রশ্নে জাপানি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কোনোরকম আপোষ করতে না হয়। আমরা সন্তোষজনক ভাবেই লক্ষ্য করলাম যে, থাইল্যাণ্ড ও মালয়ের স্থানীয় ও ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ইতিমধ্যেই তাঁদের কাজকর্ম সঠিক পথেই শুরু করে দিয়েছেন। তাঁরা ভারতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আস্থা ও বিশ্বাসের ভাব জাগানোর জন্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলিতে লিগের শাখা-অফিস স্থাপন করেছেন।

জনসভাগুলিতে ভারতীয়দের উদ্দেশে বলা হলো—ভারতের স্বাধীনতার জন্যে প্রত্যেকের আশা-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার সুযোগ এসেছে। এখন কাজকর্মের মাধ্যমে এই স্বাধীনতা সংগ্রামকে শক্তিশালী করা ও তার বিস্তার ঘটানোর দায়িত্ব ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রত্যেকের ওপর। একাজে স্বভাবতই আমাদের পক্ষে জাপানি সাহায্য-সহযোগিতা অবশ্যই প্রয়োজন। এইসব কার্যকলাপ ও জাপানি সাহায্য সহযোগিতা সর্বদাই উপযুক্ত কর্মসূচির সাহায্যে রূপায়িত করতে হবে—রাসবিহারী বোসের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সংস্থার মাধ্যমে। বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের উপযুক্ত ভাবে পরিচালিত করার জন্যে ন্যাশনাল কাউনসিল স্থাপন করা উচিত। মালয়ের জন্যে প্রথম-সারির নেতৃত্ব দেওয়া হলো প্রীতম সিং-এর ওপর, এবং থাইল্যাণ্ড-এর নেতৃত্ব দেওয়া হলো স্বামী সত্যানন্দ পুরীর ওপর।

প্রীতম সিং ছিলেন একজন মিশনারি শিখ, তিনি সঙ্গে সঙ্গে নিজে থেকেই চলে গেলেন থাইল্যাণ্ডে সেখানকার কাজের জন্যে। কিন্তু তাঁকে মেজর ফুজিওয়ারা (Maj. Fujiwara) নিয়ে গেলেন মালয়ে, এবং প্রীতমকে দিয়ে আহ্বান জানালেন যাতে ভারতীয় সেনারা ব্রিটিশ আর্মির অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করে জাপানের পক্ষে এসে যোগদান করেন। স্বামী সত্যানন্দ পুরী ছিলেন কলকাতাস্থ 'গ্রেটার ইনডিয়ান সোসাইটি'র একজন সদস্য, এবং তিনি ১৯৩০ সনে থাইল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন থাই সংস্কৃতি ও ভাষা (Thai culture and language) অধ্যয়ন করতে। তিনি সেখানে গিয়ে থেকে গেলেন এবং জড়িত হয়ে পড়লেন ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের কাজকর্মের সঙ্গে। দুর্ভাগ্যক্রমে বার্মার ভারতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাব ছিল। যখন সেখানে যুদ্ধ লেগে গেল প্রচণ্ডভাবে, তাদের একটা বড় অংশ সীমান্ত পার হয়ে চলে গেল ভারতের মধ্যে। অনেকেই নিরাপদে সীমান্তের পারে পৌঁছে যাবার ব্যবস্থা করলো, কিন্তু বাকি অধিকাংশই দুর্গম

যাত্রাপথের জন্যে নিরাপদে পৌঁছতে পারেনি এবং যাত্রাপথেই শেষ হয়ে গেছে।

জাপানি বাহিনীর হাতে সিংগাপুরের পতনের পর (১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪২), জেনারেল আরচিবাল্ড পারসিভাল (Gen. Archibald Percival নিজে এবং তাঁর বাহিনী আত্মসমর্পণ করেন জাপানের ২৫-তম বাহিনীর লেঃ জেনারেল তোমোয়ুকি ইয়ামাশিতা-র (Lt. Gen. Tomoyuki Yamashita) কাছে। যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে ছিলেন প্রায় ৪৫ হাজার ভারতীয় সেনা। তাঁদের আনুষ্ঠানিক ভাবে ব্রিটিশ আর্মির লেঃ কর্নেল হান্ট (Lt. Col. Hunt) কর্তৃক হস্তান্তর করা হয় জাপানি মেজর ফুজিয়ারা-র (Maj. Fujiwara) কাছে—ফারার পার্কে, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪২ তারিখে। এই হস্তান্তরিত যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে ছিলেন কর্নেল নিরঞ্জন সিং গিল (Col. Niranjan Singh Gill)—একজন উচ্চ স্তরের 'কিংস কমিশন'-এর অফিসার এবং পানজাবের অভিজাত মাজিথিয়া পরিবারের সন্তান। এই পরিবারেরই আরেক সন্তান, সুন্দর সিং মাজিথিয়াকে (Sunder Singh Majeethia, Kt.) ব্রিটিশ রাজ কর্তৃক 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

মেজর ফুজিওয়ারা বেশ নাটকীয়তার সঙ্গেই এই আত্মসমর্পণ এবং ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের গ্রহণ করলেন—যাঁদের তিনি 'প্রিয় ভারতীয় সেনাবৃন্দ' ('beloved Indian soldiers') বলে সম্ভাষণ করেন। তিনি এই ভারতীয় যুদ্ধবন্দী ও জাপানি বাহিনীর মধ্যে ভালো সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে কাজ করবেন বলে কথা দিলেন। এক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে এবং যুদ্ধবন্দীদের একজন অর্থাৎ ক্যাপটেন মোহন সিং-এর (Capt. Mohan Singh) মধ্যে একটা গোপন বোঝাপড়ার চুক্তি ছিল—যাঁর কথা আমি ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি। তিনি যুক্ত ছিলেন ব্রিটিশ বাহিনীর ১৪-তম পানজাব রেজিমেন্ট-এর ফার্স্ট ব্যাটালিয়ান-এর সঙ্গে—থাইল্যাণ্ডের সঙ্গে মালয় সীমান্তের জিৎরা (Jitra) নামে এক স্থানে। বলা হয়, তিনিই অগ্রসরমান জাপানি বাহিনীর হাতে পরাস্ত হন। অবশ্য এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য কোনো ঘটনার কথা জানা যায় না সঠিক কি ঘটেছিল; কোনো এক সূত্র থেকে জানা যায়, জাপানি বাহিনীর হাতে যুদ্ধবন্দী হিসেবে ধৃত হবার পরেই তিনি জাপানি বাহিনীতে যোগদান করেন; কিন্তু অন্য সূত্র থেকে বলা হয়, তিনি আগে থেকেই নিজের বাহিনী পরিত্যাগ করার পরিকল্পনা করেন, এবং সুযোগ খুঁজছিলেন যত শীঘ্র সম্ভব জাপানি বাহিনীতে যোগদান করা যায়।

মোহন সিং ইনডিয়ান আর্মিতে যোগদান করেন ১৯০৭ সনে, একজন সাধারণ পদাতিক সেনা হিসেবে, এবং দেরাদুনের ইনডিয়ান মিলিটারি অ্যাকাডেমি থেকে কমিশন পাওয়া পর্যন্ত ভালোভাবেই কাজ করে গেছেন। তাঁকে ক্যাপটেন পদে

উন্নীত করা হয় প্রায় ৩২ বছর বয়সে। মেজর ফুজিওয়ারা প্রথম সাক্ষাতেই মোহনকে দেখে খুশি হন এবং আশা করেছিলেন মোহনকে তাঁর নিজের পরিকল্পনা মতো কাজে লাগাবেন। যে কারণেই হোক, মেজর ফুজিওয়ারা যুদ্ধবন্দী মোহন সিংকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়েছিলেন অবশিষ্ট ভারতীয় যুদ্ধবন্দী সংক্রান্ত কাজকর্ম করার ক্ষেত্রে, যাতে যুদ্ধবন্দীদের দেখাশোনা করার অবশ্য করণীয় কর্তব্য থেকে তিনি নিজে রেহাই পান।

মোহন সিং সম্ভবত মেজর ফুজিওয়ারার সঙ্গে সহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময়ে উচ্চাকাংক্ষা পোষণ করেছিলেন। কোনো এক সূত্রের অনুমান অনুসারে জানা যায়, তিনি বিশ্বাস করেছিলেন জাপানি পক্ষ যদি যুদ্ধে জয়ী হয়, তাহলে জাপানি পক্ষে যোগদানকারী প্রথম ইনডিয়ান আর্মি অফিসার হিসেবে তিনিই ভারতের প্রথম মিলিটারি ডিকটেটার হবেন বলে আশা করেছিলেন। এদিকে ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের অন্যান্যরা ভাবছিলেন, ফুজিওয়ারা-মোহন সিং সম্পর্কের মধ্যে সম্ভবত সাংঘাতিক রকমের অস্বাভাবিক ও সন্দেহজনক কিছু আছে। কেননা, তাঁরা ভাবছিলেন এটা যদি কেবলমাত্র ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের দেখাশোনা করার ব্যাপার হয়, তাহলে তো একজন সিনিয়ার অফিসারকে নিযুক্ত করলেই হয়, এক্ষেত্রে যা সাধারণত করা হয়ে থাকে, এবং তাঁদের মধ্যে অনেকেই আছেন যাঁরা মোহন সিং-এর চেয়ে পদমর্যাদায় অনেক উপরের স্তরের।

আপাতদৃষ্টে মেজর ফুজিওয়ারার পক্ষে মোহন সিংকে পছন্দ করার কারণ হলো, ব্রিটিশ আর্মির প্রথম ভারতীয় অফিসার হিসেবে জাপানি বাহিনীর সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন ও বাহিনীতে যোগদানের ভূমিকা। যেভাবেই হোক এটা ছিল একটা রহস্যময় ঘটনা, যখন মেজর ফুজিওয়ারা ক্যাপটেন মোহন সিংকে একজন জেনারেল পর্যায়ে উন্নীত করলেন এবং তাঁর ওপরেই ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের দেখাশোনা করার উপযুক্ত কমাণ্ড বা কর্তব্যের দায়িত্বভার দিলেন, এবং তার ঘোষিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো ঐ যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে ইনডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি গঠন করা এবং প্রয়োজন হলে তারাই চেষ্টা করবে ভারতে উপযুক্ত অভিযান চালিয়ে ভারতকে মুক্ত করতে। পরিকল্পনা হিসেবে এটা অবাস্তব। এবং এমন ঘটনা যা অবশ্যই সিনিয়ার অফিসারদের মনোবল ভেঙে দেবে ; অথচ এর পেছনে প্রকৃত ঘটনাটা কি, তা যে কোনো মিলিটারি পর্যায়ে আপাতদৃষ্টে অজ্ঞাতই রয়ে গেল। উচ্চস্তরের জাপানি আর্মি কমাণ্ডারদের হাতে সম্ভবত এমন সময় ছিল না যে, তাঁরা একজন মেজরের দ্বারা সংঘটিত ও সৃষ্ট এই ধরনের অদ্ভুত পরিস্থিতির দিকে নজর দেবেন। এমনকি যদি তাঁরা এবিষয়ে জানতেনও তাঁরা সম্ভবত তা উপেক্ষা করতেন এই বলে যে, এই ধরনের কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনার স্থান হলো তাঁদের কর্তব্যকর্মের তালিকার সবচেয়ে নিচে। সবচেয়ে উচ্চস্তরের জাপানি অফিসারদের মধ্যে যাঁর সঙ্গে এই নবনিযুক্ত 'জেনারেল' মোহন সিং সাক্ষাৎ করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তিনি হলেন একজন 'কর্নেল' এবং তাও

দেখা করা সম্ভব হয়েছিল যখন মোহন সিংকে মেজর ফুজিওয়ারার কাছ থেকে পাঠানো হয়েছিল। সাধারণত মোহন সিং-এর যোগাযোগ ছিল মেজরদের এবং অতি নিম্ন পর্যায়ের অফিসারদের সঙ্গে।

সিংগাপুর পতনের পরদিন, জেনারেল তোজো এক বিবৃতি দিলেন জাপানি পার্লামেণ্টে (Diet 'ডায়েট')। তিনি বললেন, জাপান কখনো ভারতবাসীদের শত্রু বলে বিবেচনা করে না, এবং জাপান সরকার তাদের সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে — ব্রিটিশ শাসনের হাত থেকে স্বাধীনতা অর্জনের প্রচেষ্টায়। জেনারেল তোজো বললেন যে, ভারতীয়দের পক্ষে এখন উপযুক্ত সময় এসেছে, যখন প্রত্যেক ভারতবাসীকে উঠে দাঁড়াতে হবে এবং ভারত থেকে ব্রিটিশদের দেশছাড়া করতে হবে। তিনি আরো বললেন যে, একাজে জাপানের সাহায্য-সহযোগিতার ধরন-ধারণ হবে নিরপেক্ষ, অর্থাৎ জাপানের দিক থেকে ভারত-জয় করার কোনো পরিকল্পনা নেই। এই নিরপেক্ষতার ধরন বোঝাতে তিনি যে জাপানি প্রবচনের উল্লেখ করলেন তা হলো—'মুশুচাকুনো এন্জো' (Mushu-chakuno Enjo)। এই প্রবচনের পেছনে একটা উপভোগ্য পটভূমি ছিল।

কিছুকাল পূর্বে জেনারেল তোজোর কথা ছিল, তিনি সিংগাপুরের ব্রিটিশ, বাহিনীর আত্মসমর্পণের কথা ঘোষণা করবেন; এবং ভারতের উদ্দেশ্যে তাঁর বক্তব্য জানানোর জন্যে মিলিটারি হেড-কোয়ার্টার্সে একটা অধিবেশন হয়েছিল — যেখানে আমি উপস্থিত ছিলাম। ডক্টর নিকি কিমুরা (Dr. Niki Kimura) ছিলেন ভারতীয় বিষয়ে গঠিত কমাণ্ডের একজন উপদেষ্টা। তিনি ছিলেন রিশো ইউনিভার্সিটিতে (Risho University) ভারতীয় দর্শনের অধ্যাপক এবং তিনি বহুকাল কাটিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় — শান্তিনিকেতনে। তিনি ছিলেন একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। তিনি সান্নো হোটেলে ৪১৫ নং ঘর নিয়ে বসবাস করছিলেন— ইনডিয়ান ইনডিপেনডেন্স লিগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রাখার জন্যে। যেহেতু লিগের মূলনীতি ছিল 'অনাসক্ত কর্ম' (গীতায় কথিত, আসক্তিহীন কর্ম), আমি জেনারেল তোজোর বিবৃতি রচনাকারী অফিসারদের কাছে প্রস্তাব দিয়েছিলাম: জাপানি পার্লামেণ্টে প্রধানমন্ত্রীর দেয় ভাষণের মধ্যে যদি ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নে জাপানি দৃষ্টিভঙ্গির কথা একই রকম গুরুত্ব ও জোর দিয়ে ঘোষিত হয়, তাহলে খুবই ভালো হয়।

অধ্যাপক কিমুরা এবং জেনারেল তোজোর বিবৃতি রচনাকারী অফিসারবৃন্দ, উভয়েই আমার এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন। কিন্তু অধ্যাপক কিমুরার পক্ষে কিছু সময় লেগেছিল সংস্কৃত প্রবচনের (অনাসক্ত কর্ম) সমার্থক সঠিক জাপানি শব্দ নির্বাচনে। ঘটনাক্রমে তিনি সংস্কৃত প্রবচনের সঠিক জাপানি শব্দ নির্বাচন করতে

পেরেছিলেন, কিন্তু একাজে তাঁর প্রায় ৪০ মিনিট সময় লেগেছিল, এবং ঐ সময়ের জন্যে জেনারেল তোজোর বিবৃতি দান স্থগিত ছিল। এই বিলম্ব অবশ্য উপযুক্তই হয়েছিল। পূর্ববর্তী আলোচনার সময়ে আমি জাপানি আর্মি কর্তৃপক্ষকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম - ভারতের বিষয়ে তাঁদের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণার আন্তরিকতা ও গুরুত্বের কথা। কেননা, চীনে তাঁদের ত্রুটিপূর্ণ নীতি ও কর্মধারা বিশ্বের বিভিন্ন মহলে যথেষ্ট অনাস্থার গুঞ্জন তুলেছে, এবং তার ফলে অনিবার্য ভাবেই কয়েকটি সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে যা নিয়ন্ত্রণের পক্ষে অসাধ্য; এবং আমি সেকথা, কর্তৃপক্ষের অনুরোধে মানচুকুও গিয়ে সরেজমিন তদন্তের পরে প্রদত্ত আমার রিপোর্টের মধ্যেই বলেছি। অতএব ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি জাপানের উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে ভারতের দিক থেকে কোনোরকম সন্দেহ থাকলে, গোড়া থেকে তা দূর করা জাপানের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভারত সংগ্রাম করছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে, তাই তারা কিছুতেই চাইবে না জাপানের দিক থেকে কোনোরকম ঔপনিবেশিক প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা বরদাস্ত করতে। এবং তাই সর্বপ্রকার সম্ভাব্য সন্দেহের ভাব—কেবলমাত্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের মধ্যেই নয়—খোদ ভারতের মধ্য থেকেও—নিরসন করা বিশেষ প্রয়োজন।

আমরাও এই সুযোগ কাজে লাগিয়েছিলাম, এবং আগে থেকেই জাপান সরকারকে বিশেষভাবে পরামর্শ দিয়েছিলাম যে, কোনোরকম ভুল বোঝাবুঝি এড়ানোর জন্যে, ভারতীয় বিষয় ব্যাপারে সর্বপ্রকার আলাপ-আলোচনা ও কর্মসূচি গ্রহণের সময় ভারতের পক্ষে ইনডিপেনডেন্স লিগের সঙ্গে এবং জাপানের দিক থেকে মিলিটারি লিয়াজোঁ গোষ্ঠীর মধ্যে সংযোগ রক্ষা করেই সেকাজ করা উচিত।

২০.

টোকিও কনফারেন্স: ইনডিয়ান ইনডিপেনডেন্স লিগ

জেনারেল তোজো কর্তৃক জাপানের পার্লামেন্টে (Diet) ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি জাপান সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির কথা ঘোষণা করার পরই, রাসবিহারী বোস এবং আমি ভাবলাম: টোকিওতে একটা অধিবেশন ডাকা দরকার ইনডিয়ান ইনডিপেনডেন্স লিগের সমস্ত আঞ্চলিক নেতাদের নিয়ে, তার উদ্দেশ্য হবে সকলের মধ্যে মতামত বিনিময় করা ও একটি সুস্পষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ করা। প্রাথমিক ভাবে

ঐ অধিবেশনের দিন স্থির হয় ১০ মার্চ ১৯৪২, কিন্তু যানবাহনের অসুবিধের জন্যে ঐ তারিখ পরিবর্তন করে ধার্য করা হলো ২৮ মার্চ।

রাসবিহারী এবং আমার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দেখা-সাক্ষাৎ ও আলোচনাগুলির মধ্যে একবার তিনি স্থির করলেন যে, তিনিই লিগের ফাউণ্ডার বা প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট হবেন এবং প্রস্তাবিত টোকিও কনফারেন্স-এর চেয়ারম্যান হবেন, কিন্তু সেক্ষেত্রে একজন কো-ফাউণ্ডার বা সহযোগী প্রেসিডেন্ট এবং তাঁর একজন বিকল্প থাকা দরকার, যিনি তাঁর দায়িত্ব নেবেন জরুরি কোনো প্রয়োজনে। তিনি স্থির করলেন যে, আমিই এই দুই পদের বিকল্প দায়িত্ব নেবো যখনই এরকম কোনো প্রয়োজন দেখা দেবে। আমি এতে খুবই সম্মানিত বোধ করলাম, অর্থাৎ তিনি আমার ওপর যে আস্থা স্থাপন করলেন এবং সেই বিরাট সংস্থার প্রধান হিসেবে তাঁর পরই যে আমাকে বিকল্প দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবে মনোনীত করলেন, তা আমার পক্ষে খুবই মর্যাদার বিষয়। তাছাড়া, আমাকেই নিযুক্ত করা হলো চিফ লিয়াজোঁ অফিসার; আমার কাজ হবে ইনডিয়ান ইনডিপেনডেন্স লিগ ও জাপান গভর্নমেণ্টের কর্তৃপক্ষের মধ্যে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম সংক্রান্ত যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তা ও আলাপ-আলোচনা চালানো, এবং সাধারণভাবে মিলিটারি হাইকমাণ্ডের সঙ্গে, দূরপ্রাচ্যে ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বসবাসকারী ভারতীয় সম্প্রদায় সংক্রান্ত যখন যেমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, প্রয়োজন মতো সেই বিষয়েও আলোচনা করাও হবে আমার কাজ।

প্রস্তাবিত টোকিও কনফারেন্সের জন্যে, টোকিওবাসী ভারতীয়রা স্থির করলেন যে, মালয়বাসী ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করবেন—মেসার্স এন. রাঘবন, পেনাং-এর একজন বিশিষ্ট আইনজীবী ও মালয়ের ইনডিয়ান অ্যাসোসিয়েশান-এর প্রেসিডেন্ট ; কে. পি. কেশব মেনন, (জাপানি অধিকারের পূর্বেকার) সিংগাপুরের সুপ্রিম কোর্টে একজন পেশাদার ব্যারিস্টার ; এস. সি. গোহো—সিংগাপুরের একজন অ্যাডভোকেট এবং ঐ শহরেরই ইয়ুথ লিগ (Youth League) ও অন্যান্য সংস্থার প্রধান কর্মকর্তা। বার্মা এবং ফিলিপাইন্স কোনো প্রতিনিধি পাঠাতে পারেনি, কিন্তু হংকং, শাংহাই এবং অন্যান্য অল্প কয়েকটি অঞ্চল থেকে ডেলিগেটরা এসেছিলেন।

জাপানবাসী ভারতীয়রা ব্যতীত (অবশ্যই রাসবিহারী সহ), নির্বাচিত অংশ-গ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন—ডি. এস. দেশপাণ্ডে, ভি. সি. লিংগম, বি. ডি. গুপ্ত, এস. এন সেন, রাজা শেরনিয়ান, এল. আর মিগলানি এবং কে ভি. নারায়ণ। যদিও আমি মানচুকুও গিয়েছিলাম দীর্ঘকালের জন্যে, কিন্তু আমি সেখানে স্থায়ীভাবে চলে যাইনি। সুতরাং আমিও টোকিওবাসী ভারতীয় সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হতে লাগলাম, এবং জাপান থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের তালিকাভুক্ত হলাম। প্রকৃতপক্ষে, ঐ অধিবেশনে আমার ভূমিকা ছিল বহুমুখী। পূর্বোল্লিখিত

বিভিন্ন পদে নির্বাচিত ও নিযুক্ত হওয়া ছাড়া, ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্যে মানচুকুওর কেন্দ্রগুলি ও সেখানকার ভারতীয় সম্প্রদায়ের পক্ষেও আমাকে প্রতিনিধিত্ব করতে হয়েছিল। চীনের বিভিন্ন শহরেও ভারতীয়দের বসবাস ছিল, কিন্তু একমাত্র শাংহাই ছাড়া অন্যান্য কেন্দ্রগুলির পক্ষে কথা বলার কেউ ছিল না, বা উপযুক্ত প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা ছিল না। আমাকে সুতরাং ঐসব এলাকার ভারতীয় সম্প্রদায়ের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করতে হয়েছিল। অধিকন্তু, আমার ওপর দায়িত্ব দেওয়া হলো এই অধিবেশনের চিফ কনভেনার-কাম সেক্রেটারি হিসেবে এইসব বিষয়ে ও এইজাতীয় অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ে ইনডিয়ান লিগের কো-ফাউণ্ডার ও বিকল্প প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমাকে রাসবিহারীর সঙ্গে যাবতীয় কাজের দেখাশোনা করতে হবে, এমনকি রাসবিহারী এ বিষয়ে অন্য যে কোনো কাজ সংশ্লিষ্ট বলে মনে করবেন, সে কাজও আমাকে দেখতে হবে।

হংকঙের ডেলিগেট ছিলেন ডি. এন. খান এবং এম. আর. মল্লিক ; শাংহাইবাসী ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করেন ও আসমান এবং পিয়ারা সিং।

উক্ত অধিবেশনের আয়োজনপর্ব শেষ হবার আগেই আমরা লক্ষ্য করলাম যে, মেজর ফুজিওয়ারা ও ক্যাপেটন মোহন সিং মিলিতভাবে ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন ; চেষ্টা করছেন যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে একটা সংস্থা গড়ে তুলতে, যার নাম হবে—ইনডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি (I N A)। এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন কেবলমাত্র দু'জন জুনিয়ার আর্মি অফিসার, এক্ষেত্রে যাঁদের কোনোরকম অভিজ্ঞতা আছে কিনা সন্দেহ রাসবিহারী এবং আমাদের অন্যান্য সকলেই এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ছিলাম ; তাছাড়া মালয়ের ভারতীয় সম্প্রদায়ের নাগরিক নেতৃবৃন্দও আমাদের সঙ্গে ছিলেন।

আমরা শুনেছিলাম যে, যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে ভারতীয় আর্মি অফিসারবৃন্দ যাঁদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক ছিলেন মোহন সিং-এর থেকে সিনিয়ার—তাঁরা স্বভাবতই মেজর ফুজিওয়ারা কর্তৃক একাজে, অর্থাৎ একটা গুরুত্বপূর্ণ নতুন সংস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একজন জুনিয়ার মোহন সিংকে নির্বাচনের ফলে বিক্ষুব্ধ ছিলেন। কিন্তু পরিস্থিতি ছিল তখনো পর্যন্ত অস্পষ্ট পরিকল্পনার পর্যায়ে, কেননা আমরা জানতে পারলাম খুব ছোট আকারেই ইনডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি স্থাপিত হবে বলে স্থির হয়েছে ; কেবলমাত্র কিছু অফিসার এবং অন্যান্য শ্রেণীর পদমর্যাদা যুক্ত ব্যক্তিরাই একাজে তাঁদের সম্মতির কথা জানিয়েছেন।

ব্যাংককের 'তামুরা-কিকান'এর (Tamura Kikan) পরামর্শ অনুসারে, অর্থাৎ যার অধীনে মেজর ফুজিওয়ারা সিংগাপুরে কাজ করছিলেন, তার মাধ্যমে আমরা মিলিটারি হেড-কোয়ার্টারে প্রস্তাব করে পাঠালাম যে, ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের মধ্য থেকে দু'জন প্রতিনিধিকে পাঠানো হোক আসন্ন এই অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্যে—যেহেতু তার ফলে, আত্মসমর্পণে বাধ্য যুদ্ধবন্দীদের মনোবল বাড়বে, এবং

ভবিষ্যতের কোনো কর্মসূচির মধ্যে তাদের উপযুক্তভাবে কাজে লাগানো যাবে। ফলে, মেজর ফুজিওয়ারার ব্যবস্থা অনুসারে যুদ্ধবন্দীদের মধ্য থেকে দু'জন প্রতিনিধি এলেন – ক্যাপটেন মোহন সিং (Capt. Mohan Singh) ও কর্নেল এন. এস. গিল (Col. N. S. Gill)।

অধিবেশনের সূচনায় এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটলো। অর্থাৎ যে বিমানে করে থাইল্যাণ্ড থেকে স্বামী সত্যনন্দ পুরী প্রমুখ ডেলিগেটরা আসছিলেন, এবং মালয় থেকে আসছিলেন আরো তিনজন, যথা – গিয়ানি প্রীতম সিং, ক্যাপটেন আকরাম খান ও কে. এ. নীলকান্ত আয়ার (অনারারি সেক্রেটারি, সেনট্রাল ইনডিয়ান অ্যাসোসিয়েশান, মালয় ও কুয়ালালামপুর) এবং কয়েকজন জাপানি মিলিটারি অফিসার, সেই বিমানখানি জাপানের কোনো এক জায়গায় ভেঙে পড়লো, সম্ভবত মাউন্ট ফুজি (Mt. Fuji) পর্বতের উপর।

বলা হলো যে, জাপানের দিকে যাত্রাপথে খারাপ আবহাওয়ার জন্যে বিমানের পাইলট পূর্ববর্তী বিমানপোত থেকেই তাঁর বিমানযাত্রা দেরিতে করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি পূর্বনির্দিষ্ট সময়েই বিমান ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন একজন সিনিয়ার মিলিটারি অফিসারের আদেশে – যে অফিসার চিন্তিত ছিলেন, টোকিওতে পূর্বোক্ত অধিবেশনে যোগদানেচ্ছু ডেলিগেটরা যাতে যথাসময়ে পৌঁছতে পারেন ; তাই তিনি এই বিমানের পাইলটকে আদেশ দিয়েছিলেন খারাপ আবহাওয়া উপেক্ষা করেও থাসময়েই বিমানযাত্রা শুরু করতে হবে। বিমানটিকে আর দেখা গেল না, কিংবা তার যাত্রীদেরও কারো আর হদিশ পাওয়া গেল না। এই শোচনীয় ঘটনায় সমগ্র অধিবেশনটার ওপর এক গভীর দুঃখের ছায়া নেমে এলো। এবং অধিবেশনের প্রথম কর্তব্যই হলো : যোগদানেচ্ছু ডেলিগেটদের মৃত্যুতে শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা এবং তাঁদের সঙ্গীসাথীদের আশংকাজনক ভবিষ্যতের জন্যে উদ্বেগ প্রকাশ করা।

প্রায় ২৫ জন ডেলিগেট সান্নো হোটেলে মিলিত হলেন অধিবেশনের জন্যে : হোটেলটি প্রকৃতপক্ষে পুরোপুরিভাবেই লিগের কর্তৃপক্ষদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছিল ২-৩ দিনের জন্যে। রাসবিহারী বোস সর্বসম্মতভাবেই প্রেসিডেন্ট রূপে নির্বাচিত হলেন। এই অধিবেশন সংগঠন করতে আমাকে যেসব অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল এবং তার প্রতিকার করে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে হয়েছিল, এখানে আমি বিশদভাবে সে-সব কথা বলতে চাই না। এক্ষেত্রে বহু সমস্যা ছিল যার একটা, আশ্চর্যের বিষয়, জাপানি মিলিটারি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকেই অনুরোধ এসেছিল : অধিবেশনটি যাতে সান্নো হোটেলে না করে ইমপিরিয়াল হোটেলেই অনুষ্ঠিত হয়।

ইতিপূর্বেই আমার সঙ্গে জাপানি হাইকমাণ্ড-এর কিছু আলাপ-আলোচনা হয়েছিল, এই অধিবেশনের স্বার্থে ন্যূনতম কয়েকটি সুবিধা-সুযোগ পাওয়ার জন্যে আমার অনুরোধের ভিত্তিতে ও তার ফয়সালা করতে। আমি জাপানি হাইকমাণ্ডের

এই নতুন অপ্রয়োজনীয় প্রস্তাব বিবেচনা করতে প্রস্তুত ছিলাম না। তাই আমি তাঁদের এই প্রস্তাবে রাজী হলাম না, এবং তাঁদের বুঝিয়ে দিলাম যে এখন তাঁদের কথামতো স্থান পরিবর্তনের কোনো প্রয়োজন নেই। অধিকন্তু, আমরা অধিবেশনের স্থান হোটেলের সঙ্গে 'ইমপিরিয়াল' শব্দটি পছন্দ করি না, বিশেষত ইনডিয়ান ইনডিপেনডেন্স লিগের অধিবেশনের জন্যে। টোকিওতে অবশ্য আমরা স্থানীয়ভাবে এরকম প্রস্তাবের অর্থ বুঝতে পারি, কিন্তু দূর-দূরান্তের বিভিন্ন স্থানে বসবাসকারী আমাদের স্বদেশবাসীদের দিক থেকে আমরা এরকম প্রস্তাবের কথা চিন্তা করতে পারি না। ভারতীয়দের মধ্যে যাঁরা জাপানের সঙ্গে অপরিচিত, তাঁদের কাছে এই 'ইমপিরিয়াল' শব্দযুক্ত হোটেলে অনুষ্ঠানের প্রস্তাবের কথা 'আপাত্তজনক' হতে পারে 'উপনিবেশবাদের' সঙ্গে তার সম্পর্কের ও তজ্জনিত অরুচিকর মনোভাবের জন্যে। বিভিন্ন স্থানের প্রবাসী ভারতীয়রা ভাবতে পারেন, আমরাও (ইনডিয়ান ইনডিপেনডেন্স লিগের সদস্যরা) 'ইমপিরিয়াল' তথা রাজকীয় উপনিবেশবাদের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়েছি। এজন্যে আমাকে বেশ কিছু তর্কবিতর্ক করতে হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি জাপানি হাইকমাণ্ড অফিসারদের আমার মতাদর্শ বুঝিয়ে আমার পক্ষে আনতে সমর্থ হয়েছিলাম; এবং সান্নো হোটেলেই ঐ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তবে, চায়ের কাপে যে ঝড় উঠেছিল তা সুখপ্রদ হয়নি।

এম· শিবরাম তাঁর 'রোড টু দিল্লি' (Road to Delhi, by M. Sivaram) নামক বইতে আমার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন ঐ অধিবেশন সংগঠন ও তার ব্যবস্থাপনা করার কাজে আমার সক্রিয় ভূমিকার জন্যে। তিনি অন্যান্য কথার মধ্যে একথাও বলেছিলেন যে, ঐ অধিবেশনের ফলে যা কিছু অর্জন করা সম্ভব হয়েছিল, তা আমার জন্যেই। এটা অবশ্য শিবরামেরই সহৃদয়তা ও সৌজন্যতা। শিবরাম আরো অনেক কথা বলেছেন—ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে আমার নানাবিধ কার্যকলাপ এবং সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গে আমার বহুমুখী ভূমিকার কথা প্রসঙ্গে। স্বাভাবিক ভাবেই আমার ভারতে ফিরে এসে একজন এনজিনিয়ার হিসেবে কাজের দায়িত্ব নেওয়ার কথা, কিন্তু সেক্ষেত্রে বহু সাংঘাতিক সব বাধাবিপত্তি - যেহেতু আমি ছিলাম ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কুনজরে। ফলে, আমি এমন এক পরিস্থিতির মধ্যে ছিলাম—যেখানে কেবলমাত্র ভারতের বাইরে থেকেই আমি সর্বান্তঃকরণে আমার আকাংক্ষা অনুসারে স্বদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্যে যথাসাধ্য কাজ করতে পারি।

একথা সত্যি যখন শিবরাম বলেন যে, জাপানে এবং অন্যত্র আমি বহুমুখী কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত ছিলাম : আমি কাজ করছিলাম একজন 'বিদ্রোহী'র (Ronin) মতো এবং মংগোলিয়ায় ভ্রমণ করছিলাম একজন 'জীবন্ত বুদ্ধ', একজন 'উট বিক্রেতা' প্রভৃতির মতো। এটাও একটা ঘটনা যে, মংগোলিয়ান রাজকুমার প্রিন্স তে'র সঙ্গে জাপানিদের সংযোগ ঘটেছিল আমার জন্যেই, এবং চীনা রাজনৈতিক

নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ও জাপানিদের মধ্যে আমার ছিল যোগাযোগকারীর ভূমিকা। শিবরাম আমার বিষয়ে আরো যেসব প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছিলেন তাঁর বইতে, তার মধ্যে ছিল : ব্লাক ড্রাগন সোসাইটি (Black Dragon Society) এবং জাপানের অন্যান্য দক্ষিণপন্থী সংস্থার সঙ্গে আমার যোগাযোগ ও কার্যকলাপের কথা—যেসব সংস্থার সহযোগিতায় আমি সম্ভাব্য সকল প্রকার কাজকর্ম চালিয়ে যাবার চেষ্টা করছিলাম,—যেভাবেই হোক এশিয়ায় ব্রিটিশ রাজত্বের অবসান ঘটানো জন্যে। শিবরাম আরো উল্লেখ করেছেন—রাসবিহারী বোসের পেছনে যে মানুষটি আড়ালে থেকে কাজ করে চলেছেন, তিনিও আমি এবং আমার সঙ্গে জাপানি মিলিটারি কর্তৃপক্ষের উঁচুমহলের সঙ্গে গভীর সম্পর্কের ফলশ্রুতি।

কিন্তু অধিবেশনের ফলে যা কিছু অর্জন করা সম্ভব হয়েছিল, তা খুব একটা সহজসাধ্য ছিল না। মালয় থেকে আগত ডেলিগেটদের, অর্থাৎ অসামরিক ও সামরিক উভয় পক্ষের মধ্যেই জাপানিদের তরফ থেকে প্রস্তাবিত বন্ধুত্ব ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতির বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। বেশ কিছু উত্তেজনাকর মুহূর্ত বা সংকট দেখা দিয়েছিল, যখন রাসবিহারী বোসের সঙ্গে আমাকে যথেষ্ট চেষ্টা করতে হয়েছে—যাতে সমাগত ডেলিগেটরা সন্দেহ ও উত্তেজনা ইত্যাদি পরিহার করে বাস্তব দৃষ্টিতে সবকিছু খতিয়ে দেখেন, বিশেষত বর্তমান এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে।

মালয় থেকে আগত ডেলিগেটরা, ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে জাপানিদের সঙ্গে ভারতের সহযোগিতা এবং তার জবাবে জাপানের দিক থেকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ের আইনসংগত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা প্রায়ই এমন ভাবে কথাবার্তা বলতেন, মনে হতো যেন আদালত কক্ষে সওয়াল-জবাব করছেন। যেমন. যুদ্ধবন্দীদের প্রতিনিধি হিসেবে ক্যাপটেন মোহন সিং ঐ অধিবেশন চলাকালে সর্বক্ষণই ছিলেন চুপচাপ স্বল্পভাষী। বাহ্যত, তাঁকে অধিকাংশ সময় মেজর ফুজিওয়ারার সঙ্গে কথাবার্তায় ব্যস্ত থাকতে দেখা যেত, কিন্তু তিনি কখনো তাঁর চিন্তাভাবনার আভাসমাত্র দিতেন না—আমাদের সঙ্গে কিংবা অন্যান্য ডেলিগেটদের সঙ্গেও না। তিনি ছিলেন এই অধিবেশনের ক্ষেত্রে প্রবাদের সেই 'ডার্ক হর্স' বা কালো ঘোড়ার মতো—যার গুণপনার পরিচয় তখনো পাওয়া যায়নি।

কর্নেল গিল এমনভাবে কাজ করছিলেন যাতে মনে হচ্ছিল তিনি দুই নৌকোয় পা দিয়ে চলছেন, অর্থাৎ কোথায় কোনদিকে সুস্থির ভাবে দাঁড়াবেন তা অনিশ্চিত ছিল। তাঁর ছিল এক ধরনের হঠকারিতা, যার ফলে তিনি রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপকে খুঁজে বের করতে এবং তাঁর সঙ্গে লিগ ও জাপানের মধ্যেকার সম্পর্ক নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে চেয়েছিলেন। তাঁর জানা উচিত ছিল যে, মহেন্দ্রপ্রতাপের সঙ্গে জাপানি কর্তৃপক্ষের সম্পর্ক ভালো ছিল না, এবং তাঁর সঙ্গে

যোগাযোগ থাকলে কর্নেল গিলকে হয়তো জাপানি মিলিটারি পুলিশের হাতে পড়তে হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, ঘটনাগত পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছল যে আমাকে কুদানস্থ সেকেণ্ড ব্যুরোর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হলো এবং আমি কর্নেল গিলকে সে যাত্রা রক্ষা করলাম।

রাসবিহারী এবং আমি কর্নেল গিলকে একটা ভালো সুযোগ দিতে চেয়েছিলাম, যাতে তিনি বুঝতে পারেন আমরা তাঁর সম্পর্কে কী ভাবি: অর্থাৎ রাজনৈতিক বিষয়ে তাঁর 'অ্যামেচারি' শৌখিন মনোভাব পরিত্যাগ করে তিনি যাতে কার্যকরী মনোভাব গ্রহণ করেন, এবং তাঁকে আমরা লিগের একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে পেতে পারি ; কারণ আমরা দেখেছিলাম তাঁর মধ্যে শক্তি ও ক্ষমতা আছে। তিনি ছিলেন একজন প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের অধিকারী, এবং মূলত একজন উচ্চস্তরের যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ। উপযুক্ত ভাবে গড়েপিটে নিতে পারলে, ইনডিয়ান ইনডিপেনডেন্স লিগের পক্ষে তিনি প্রভূত সাহায্যকারী একজন হয়ে উঠতে পারেন। আমাদের কাছ থেকে কিছু পরামর্শ পাবার পর মনে হলো, তিনি আমাদের পক্ষেই তাঁর মত পরিবর্তন করবেন, কিন্তু মেজর ফুজিওয়ারাকে ছায়ার মতো অনুসরণকারী ক্যাপটেন মোহন সিং-কে মনে হলো নিশ্চিত একজন নৃশংস ও অসহযোগী বলে।

যুদ্ধবন্দীদের এই দুই প্রতিনিধির আচরণে একটা বিষয় স্পষ্ট হলো যে, তাঁদের নিজেদের মধ্যেই গভীর সন্দেহের মনোভাব ছিল। কর্নেল গিল কাউকেই ক্যাপটেন মোহন সিং ও তাঁর ক্ষমতা সম্পর্কে কোনো সন্দেহের অবকাশ দেননি, অর্থাৎ মোহন সিং-এর দ্বারা যে ইনডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি সংগঠনের কাজ হবে না, এ বিষয়ে কর্নেল গিল-এর মনে কোনো সন্দেহ ছিল না।

রাসবিহারী প্রায়ই তাঁর চিন্তাভাবনার কথা আমাকে বলতেন। তাঁর অভিমত হলো. মালয় থেকে আগত ডেলিগেটরাই অপেক্ষাকৃত সহায়ক। তিনি আশা করেছিলেন, অধিবেশনে সমাগত প্রত্যেকেই আমাদের উদ্দেশ্য বিষয়ে একসূত্রে ঐক্যবদ্ধ হয়ে চিন্তাভাবনা করতে সমর্থ হবেন। কিন্তু এটা খুবই দুঃখের বিষয় যে, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিতে ও আচরণে তাঁরা প্রচণ্ড মতপার্থক্য প্রদর্শন করেছিলেন। এমনকি তাঁদের কয়েকজন রীতিমতো অবিশ্বাস ও সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন 'টোকিও গ প'-এর 'জাতীয়তাবাদী পরিচয়পত্র' ইত্যাদি বিষয়ে।

মালয় থেকে আগত ডেলিগেটদের এই মনোভাব, যদিও তা প্রকাশ্যে উচ্চারিত হয়নি, কিন্তু রাসবিহারী একজন জাপানি নাগরিক হিসেবে ইনডিয়ান ইনডিপেনডেন্স লিগের একজন প্রকৃত নেতা হতে পারেন না, তাঁদের এই মনোভাব প্রচণ্ড রকমের দায়িত্বহীন। সুবুদ্ধি সম্পন্ন যে কোনো মানুষের কাছ থেকে আশা করা যায়, তাঁরা রাসবিহারীকে ভালোভাবেই বুঝবেন। অর্থাৎ রাসবিহারী জাপানি নাগরিক হয়েছিলেন বাধ্য হয়েই, তাঁর অস্তিত্ব বজায় রাখতে বা বেঁচে থাকার জন্যেই। কিন্তু তিনি ছিলেন, প্রতি রক্তবিন্দুতেই একজন খাঁটি

ভারতীয়; সম্ভবত অধিবেশনে সমাগত অন্যান্য অনেকের থেকেই স্বদেশী, অন্তত যাঁদের অনেকেরই শিক্ষাদীক্ষা ও লালনপালন হয়েছিল ব্রিটিশ কেতায়—তাঁদের থেকেও—ব্রিটিশ ও ব্রিটিশ কেতাকে রাসবিহারী অপছন্দ করতেন সর্বান্তঃকরণে। এসব চিন্তাভাবনার কথা সুখপ্রদ বা আনন্দদায়ক নয়, কিন্তু কোনো রকম 'কার্পেট চাপা' দিয়েই এই সত্যকে চাপা দেওয়া যাবে না।

রাসবিহারী ঐ অধিবেশন পরিচালনা করেছিলেন যথেষ্ট মর্যাদা ও কৃতিত্বের সঙ্গে। অন্য কারো পক্ষেই সে কাজ এর চেয়ে ভালো ভাবে করা সম্ভব ছিল না। মালয় থেকে আগত প্রতিনিধিদের তরফ থেকে কিছু মতভেদের প্রকাশ সত্ত্বেও, ডেলিগেটদের দিক থেকে একটা কাজ ছিল সাধারণভাবে পরস্পরের মধ্যে পরিচয় করা, এবং টোকিওতে আমরা অন্যান্যদের মধ্যে মালয়ের ডেলিগেটদের সঙ্গে পরিচয় ও যোগাযোগ করে উপকৃতই হয়েছিলাম। আমাদের অনেকেই চিন্তিত ছিলাম তাঁদের ঐ 'কেতাবি' পক্ষ অবলম্বন ও চালচলনের জন্যে, এবং তার ফলে যুদ্ধকালীন অবস্থায় চুপচাপ নীরব থাকাও সম্ভব ছিল না, অন্তত আইনের মোড়কে সমস্যাকে ফেলে রাখা যায় না। কিন্তু রাসবিহারীর কর্মকৌশল এমনই ছিল যে, লিগের সংকল্প তথা উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে একটা সর্বসম্মত প্রস্তাব পাশ করানো সম্ভব হয়েছিল—যাতে জোর দেওয়া হয়েছিল ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে সকলের কর্মোদ্যোগকে দ্বিগুণ করতে হবে বলে।

একথাও স্থির হয়েছিল যে, লিগের আরেকটি প্লেনারি সেশনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আরো আলোচনা করা হবে; এবং সেই সেশনের অনুষ্ঠান হবে টোকিও থেকে আরো সুবিধাজনক কেন্দ্রীয় কোনো এক স্থানে—যেখানে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বসবাসকারী ভারতীয়দের পক্ষে আরো ব্যাপক ভাবে মিলিত হওয়া ও সেই সেশনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়। এই হিসেবে পরবর্তী অধিবেশনের স্থান নির্বাচিত হলো ব্যাংকক, যে অধিবেশন পরবর্তী ৬ মাসের মধ্যেই হওয়া চাই। এই সূত্রে একটি কর্মপরিষদ বা 'কাউনসিল অফ অ্যাকশান' নিযুক্ত হলো, যার মধ্যে ছিলেন—রাসবিহারী বোস, প্রেসিডেন্ট, এবং এন. রাঘবন, কে পি. কেশবন মেনন, এস. সি. গোহো এবং ক্যাপটেন মোহন সিং প্রমুখ এই কর্মপরিষদের সদস্য মনোনীত হলেন সাময়িকভাবে অর্থাৎ ব্যাংকক কনফারেন্স-এর দ্বারা পাকাপাকি ভাবে নিয়োগ সাপেক্ষে।

সান্নো হোটেলে অনুষ্ঠিত অধিবেশন শেষ হলো তিন দিন পরে। তারপর জেনারেল তোজোর কাছ থেকে এক সৌজন্য সাক্ষাৎকারের আমন্ত্রণ এলো—রাসবিহারী বোস ও অন্যান্য সমস্ত ডেলিগেটদের নিয়ে তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে। সানন্দে লক্ষ্য করা গেল, এই সময় সিংগাপুর ও পেনাং থেকে আগত ডেলিগেটরা অধিবেশন চলার সময় থেকে এখন বেশ ভালো মেজাজে আছেন। এন. রাঘবন পরে জানালেন যে, টোকিও কনফারেন্স চলাকালে, মালয় থেকে আগত ডেলিগেটরা খুবই অসদাচরণ

করেছেন 'টোকিওবাসী ভারতীয়দের' পরিচয়পত্র অস্বীকার করে এবং তাদেরকে জাপান সরকারের শক্তিশালী 'স্টুজ' (stooge) বা অধীনস্থ ভাঁড় বলে সন্দেহ করে। রাঘবনের পক্ষে এটা খুবই ভালো হয়েছিল যে, এজন্যে তিনি সকলের কাছেই প্রকাশ্যে ত্রুটি স্বীকার করেছিলেন, যাতে সমাগত প্রতিনিধিরা তাঁকে বা তাঁর অন্যান্য সহকর্মীদের ভুল না বোঝেন, এবং ব্যাপারটা ভালোভাবে মিটে যায়।

পরবর্তীকালে, আমার সুযোগ হয়েছিল রাঘবন এবং অন্যান্য যাঁরা আমাদের সঙ্গে কাজ করতে শুরু করেছিলেন, তাঁদের ও অন্যান্যদের কিছু পরামর্শ দেবার। কেননা তাঁরা অন্যান্যদের সন্দেহ করতে শুরু করেছিলেন, বিশেষত অসামরিক ব্যক্তিদের চিন্তাধারা ও তাদের স্বাভাবিক কাজকর্ম, এবং সামরিক ব্যক্তিদের কাজ-কর্ম বিশেষত যাঁরা যুদ্ধের মতো জরুরিকালীন অবস্থায় কাজ করেন, তাঁদের সন্দেহ করছিলেন। আমি রাঘবন ও অন্যান্যদের আরো বলেছিলাম, এটা চিন্তা করা মোটেই ঠিক নয় যে কেবল তাঁরাই বিবেচক ও সবকিছু বোঝেন, আর অন্যেরা তেমন নন বা কিছু বোঝেন না।

আমি রাঘবন ও অন্যান্যদের যা বলেছিলাম তা সংক্ষেপে এই রকম : "আমাদের দুটি চোখ আছে যা দিয়ে আমরা অন্যদের দেখি। দর্পণের অভাবে আমাদের অন্য কাউকে বিশ্বাস করা উচিত, যারা আমাদের বলবে আমাদের কেমন দেখতে। যারা নিজেদের ছাড়া অন্য সকলকেই অবিশ্বাস করে কোনোরকম যুক্তিসংগত কারণ ছাড়াই, তারা সম্ভবত লঘুচিত্ত হালকা স্বভাবযুক্ত হতে পারে। ভারতীয় যে-কেউই হোন না কেন, তিনি যদি রাসবিহারী বোসের সততায় বিশেষত তাঁকে ভারতীয় স্বদেশপ্রেমিক হিসেবে কোনোরকম সন্দেহ প্রকাশ করেন, তিনি নিজেকে কোনো-রকমেই স্বদেশপ্রেমিক বলে দাবি করতে পারেন না। অধিকন্তু, সাধারণ সংকট-কালীন পরিস্থিতিতে, পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে মৌখিক আলাপ-আলোচনা ও বোঝাপড়াই সুসম্পর্ক স্থাপন ও বজায় রাখার ভালো উপায়। এই তুলনায় বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে 'বোচো' বা গোপনীয়তার ভিত্তিতে কালি-কলমের লেখাপড়া ও গোপন লুকোচুরি করা 'নোটবুক' প্রথা মোটেই তেমন ভালো উপায় নয়।

"যেমন যুদ্ধে, যদি কোনো শক্তিশালী মিত্রশক্তি লিখিত চুক্তির বিরুদ্ধে যায় এবং ইচ্ছে করে অপর পক্ষের বিরুদ্ধাচরণ করতে, তাহলে লিখিত চুক্তিপত্র আর দলিলপত্র নিয়ে আপনি কিভাবে কি করতে পারেন? অপরদিকে, উভয়পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা যদি থাকে, তাহলে মৌখিক বোঝাপড়াই লিখিত চুক্তির মতোই কার্যকরী হয়। সৈন্যরা যারা সশস্ত্র যুদ্ধ করছে, তাদের খুব কম সময়ই থাকে আইন-আদালতের মতো গাদা-গাদা কাগজপত্র লেখালেখি করার। আমার অবশ্যই বহু সমস্যা ছিল জাপানি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে, তবু আমরা একত্রে কাজ করতে পারি, যেহেতু আমাদের মধ্যে মূলত আস্থা ও বিশ্বাসের সম্পর্ক ছিল। কাউকেই অপর

কারো 'স্টুজ' বা ভাঁড়, হবার দরকার হয়নি ; যা দরকার তা হলো অন্যকে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করা ও সৌজন্য দেখানো, এবং অপরপক্ষকেও সেই সুযোগ দেওয়া।

''দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য অনিবার্যভাবেই থাকবে, কিন্তু সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যযুক্ত বন্ধুবান্ধবগণ নিজেদের মধ্যেই সে-সব মতপার্থক্যের সমাধান করে নিতে পারে। এবং এমনকি যদি কোনো কোনো সমস্যা নাও মেটাতে পারা যায়, তবুও বন্ধুত্ব বজায় রাখা যায়। অন্য কথায়, যদি প্রয়োজন হয়, দু'পক্ষই কোনো বিষয়ে অসম্মত হতে বা 'অসম্মতি জানাতেও একমত হতে পারে' (agree to disagree)—যে কথা আমি প্রায়ই মানচুকুওতে আমার ছাত্রদের বলে থাকি। অধিকন্তু, যদি কেউ আন্তরিকভাবেই 'অনাসক্ত কর্মে' বিশ্বাস করে, তাহলে প্রায়ই সম্ভব হয় অপর পক্ষকেও সেই একই মতাদর্শে বিশ্বাস করানো।''

আমার নিজের কথা বলতে গেলে, আমি ছোটবেলা থেকেই সর্বদাই আমি যা সঠিক ও সংগত বলে মনে করি তা-ই কাজে খাটাতে চেষ্টা করেছি। এমনকি বড়-রকমের রাজনীতির মধ্যেও, যার মধ্যেও আমি জড়িত ছিলাম (কিংবা, সম্ভবত আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে, আমি যে-রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত), বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমার স্নাতক হবার পরেও, আমার মধ্যে এই স্বভাবধারাই রয়ে গেল। কিন্তু কেউ কেউ ছিলেন যাঁরা কেবল অজ্ঞতাবশেই ভাবলেন যে, আমি জাপানি মিলিটারি ফোর্সের সঙ্গে তাদের স্বার্থে ও সুবিধার্থেই সহযোগিতা করছি। তবে অন্যান্যরা, বিশেষত টোকিওর ব্রিটিশ এমব্যাসি অফিসের কর্নেল ফিগ্‌স (Col. Figges) প্রমুখ সর্বদাই ছিলেন সন্দিগ্ধ, এবং যেভাবেই হোক ভারতে আমাকে বন্দী করে রাখতে চেয়েছিলেন একজন সাংঘাতিক রকমের ব্রিটিশ-বিরোধী সক্রিয় কর্মী হিসেবে ! সত্যি কথা বলতে গেলে, জাপানি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমার বেশ কয়েকটি 'অসম্মতি জানানোর চুক্তি' (agreements to disagree) ছিল। কিন্তু তবুও তাঁদের সঙ্গে আমি সুসম্পর্ক বজায় রাখতে পেরেছিলাম—বিশেষত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাজকর্ম আরো জোরদার করার ব্যাপারে।

ঠিক যেমনটি হয়েছিল রাসবিহারী বোসের ক্ষেত্রে, তেমন একথা বলা বা প্রস্তাব করাও বোধ হয় অধার্মিকের মতোই হবে যে, আমি এমনকি খুঁটিনাটি বিষয়েও কখনো আমার প্রাথমিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য—ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের কাজ থেকে বিচ্যুত হয়েছি কিনা সন্দেহ। একথা বলা আরো সত্যি হবে, যদি কেউ অবশ্য বলে যে, আমি উচ্চস্তরের জাপানি মহলে বহুসংখ্যক বন্ধু পেয়েছিলাম—যাঁরা আমার সঙ্গে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বার্থেও কাজ করতে সম্মত হয়েছিলেন। সেই অর্থে, আমার বহু ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবরাও যুদ্ধের পরে প্রায়ই আমার কানে-কানে ফিসফিস করে বলতেন যে, ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে এবং জাপানি বন্ধুবান্ধবদেরও সেই একই কাজ করতে উৎসাহ দেওয়ার জন্যে, আমাকে ১ নম্বর

যুদ্ধাপরাধী (war criminal no. 1) হিসেবে চিহ্নিত করা উচিত ছিল ; এবং জেনারেল ম্যাকার্থার বোধ হয় কোনোক্রমে আমাকে ধরতে ভুলে গেছেন।

২১.

ব্যাংকক কনফারেন্স

টোকিও অধিবেশনের শেষে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে ব্যাংককে অনুষ্ঠিতব্য পরবর্তী বৃহত্তর এক অধিবেশনের প্রস্তুতির জন্যেও আমার ওপর দায়িত্বভার দিয়েছিলেন রাসবিহারী বোস। এই ব্যাংকক অধিবেশন হওয়ার কথা যেমন বড আকারে তেমন বিশদভাবে, কেননা টোকিও অধিবেশনের জমায়েতে ঐ রকমই কথা হয়েছিল। কিন্তু এই অধিবেশনের প্রস্তুতির কাজে বহু রকম সমস্যা দেখা দিল। আমি আরো চিন্তিত ছিলাম যাতে অধিবেশনের সময়সূচি সাধ্যমতো আরো এগিয়ে আনা যায়, এবং গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্তগুলি প্রয়োজনমতো গ্রহণ করা যায়। প্রচারাভিযান সংগঠিত হলো টোকিওতে, জাপান রেডিওর সহযোগিতায় তা চলতে লাগলো ঠিকমতো, এবং অতিরিক্ত প্রচারের কাজের ব্যবস্থা করা হলো ব্যাংকক থেকে। রাসবিহারী বোস ও আমি উভয়েই প্রকৃতপক্ষে চব্বিশ ঘণ্টাই কাজ করতে লাগলাম—এপ্রিল থেকে জুন ১৯৪২ পর্যন্ত।

ইতিমধ্যে যুদ্ধ বেশ ভালোই চলছিল জাপানের পক্ষে। ১৯৪২ ফেবরুয়ারিতে সিংগাপুরের আত্মসমর্পণের পরে, রেংগুনের পতন হলো মার্চ মাসে। ঐ একই মাসে ডাচ ইস্ট-ইণ্ডিজও জয় করা হলো। বাতান ও কোরেগিদর (Bataan and Corregidor) শীঘ্রই স্তব্ধ হয়ে প্রায় পতনোন্মুখ হলো এবং গুয়াদালকানাল-এর (Guadalcanal) ওপর প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি করা হলো। (ঘটনাক্রমে গুয়াদালকানাল জয় করা হলো আগস্ট মাসে।)

জুন মাসের গোড়ার দিকে আমরা ব্যাংককে পৌছলাম। আমাদের সঙ্গে ছিলেন দেশপাণ্ডে, এ. এম. সহায়, ভি. সি. লিংগম; রাজা শেরমান এবং অন্যান্য কয়েকজন। এবং তারপর শীঘ্রই শুরু হয়ে গেল ব্যাংককের সেই বৃহৎ অধিবেশনের প্রস্তুতিপর্ব। সর্বপ্রথমেই রাসবিহারী স্থির করলেন একটি প্রেস কনফারেন্সের অনুষ্ঠান করতে। অন্যান্যদের মধ্যে দু'জন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রেসম্যান ছিলেন : একজন এম. শিবরাম, যিনি বিশ্বযুদ্ধে জাপানের জড়িত হবার পূর্ব পর্যন্ত অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন, এবং তারপর থেকে 'ব্যাংকক টাইম্স'-এর (Bangkok

Times) সম্পাদক ছিলেন ; অন্যজন হলেন থাইল্যাণ্ডের রাজার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও প্রধানমন্ত্রী মার্শাল পিবুলসনগ্রাম (Marshall Pibulsonggram) – 'থাই মেডাল ফর হোম ডিফেন্স'-এর প্রাপক (ব্রিটিশ 'জর্জ ক্রস' এরা সমতুল) ; তিনি ছিলেন একজন উচ্চ সম্মানিত ও যোগ্যতর সাংবাদিক।

আমি তাঁর সম্পর্কে আগেই শুনেছিলাম, যদিও আমাদের এই প্রথম সাক্ষাৎ হলো ব্যাংককে। আমি রাসবিহারীকে বললাম যে, শিবরাম হলেন এক রত্ন বিশেষ, আমরা যদি তাঁকে আমাদের লিগের কাজের পক্ষে পাই তো খুবই ভালো হয়। রাসবিহারী তখনি রাজী হয়ে গেলেন এবং স্থির করলেন তাঁকেই লিগের পক্ষে মনোনীত করবেন লিগের মুখপাত্র ও প্রচারকর্তা হিসেবে। শিবরামও অভিভূত হলেন রাসবিহারীর মনভোলানো ব্যক্তিত্বে ও তাঁর বিনয়ী আচরণে, তাই শিবরাম তাঁর অন্য সমস্ত কাজকর্ম ছেড়ে দিলেন এবং সর্বান্তঃকরণে যোগ দিলেন ইনডিয়ান ইনডিপেনডেন্স লিগের কাজে—বিশেষত তার গুরুত্বপূর্ণ প্রচার দফতরের কাজে।

ব্যাংককে আরেকজন সুপরিচিত ভারতীয় সাংবাদিক ছিলেন এম. এ. আয়ার, যিনি তখন রয়টার নিউজ এজেন্সির (Reuter news agency) প্রতিনিধিত্ব করছিলেন, যাঁকে রয়টারের তরফ থেকে কমিশন করা হয়েছিল পূর্ব-এশিয়ার সংবাদ-সংগ্রহ ও পরিবেশনের জন্যে। শিবরাম প্রথমেই নিজে থেকে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ব্যর্থ হন তাঁকে আমাদের স্বাধানতা সংগ্রামের পক্ষে আনার কাজে ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঘটনাক্রমে এই আয়ারও আমাদের লিগের সঙ্গে যোগদান করেছিলেন, তবে সর্বান্তঃকরণে নয়, আধাআধিভাবে। আয়ারের নিজের কথায় জানা যায়, রাসবিহারী তাঁর নিজস্ব অননুকরণীয় ভঙ্গিতে আয়ারকে অনুরোধ করেছিলেন তিনি যেন কেবলমাত্র রয়টারের প্রতিনিধিত্ব করেই ক্ষান্ত না থাকেন, বরং তিনি তাঁর প্রতিভা ও কর্মদক্ষতার বেশ কিছুটা যেন ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বার্থে কাজে লাগান। আয়ার তাই রাসবিহারীর সম্মোহনী ব্যক্তিত্ব ও জ্বলন্ত দেশপ্রেমের আহ্বানকে অগ্রাহ্য করতে পারেন নি। আয়ার আমাদের সঙ্গে যোগদান করলেন, কিন্তু তিনি রয়ে গেলেন এক অনিশ্চিত মনোভাব নিয়ে, অর্থাৎ তাঁর সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না।

যাই হোক, অধিবেশন শুরু করতে গেলে যেসব সমস্যার সমাধান করতে হবে তার সংখ্যা বেড়েই চললো, এবং ক্রমেই তা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। প্রথমত – বিভিন্ন ন্যাশনাল কাউনসিল থেকে যতজন ডেলিগেটকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে সেটা আগেই স্থির করতে হবে ; অধিকন্তু কোথায় ও কিভাবে তাঁদের এবং অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের বাসস্থান ও সংশ্লিষ্ট সুবিধা-সুযোগের ব্যবস্থা করা যাবে, সেকথাও স্থির করতে হবে ও তার আয়োজন পাকা করতে হবে। এবং জাপানিদের ভূমিকা নিয়ে কী করা হবে ? অবশ্যই তাঁদের সাহায্য আমাদের পেতে হবে, অন্যথায় কিছুই হতে পারবে না। কিন্তু তাঁদের কি প্রতিনিধিত্ব করতে দেওয়া উচিত

হবে, না কেবলমাত্র 'পর্যবেক্ষক' হিসেবে তাঁদের যোগদান করতে অনুমতি দেওয়া হবে ? কিংবা এই অধিবেশনে কিছু বলতে বা যোগদান করা থেকে তাঁদের বাদ দেওয়া হবে ? যদি তাঁদের এ বিষয়ে জড়িত করাও হয়, তাহলে কিভাবে তাঁদের আমন্ত্রণ জানানো হবে ? কী পরিমাণে এবং কতদূর পর্যন্ত এই অধিবেশনে 'গোপনীয় বিষয়াদি' নিয়ে প্রকাশ্যে আলোচনা করা যেতে পারে ? প্রকৃতপক্ষে, সঠিকভাবে কোন কোন বিষয় এই অধিবেশনে আলোচ্য তালিকাভুক্ত হবে এবং তা নিয়ে তর্কবিতর্ক হতে পারবে ? কে এই অধিবেশনের কর্মসূচি প্রস্তুত করবে ? এই রকম আরো বহু প্রশ্ন দেখা দিল। সর্বাপেক্ষা জটিল ও সূক্ষ্ম বিষয় হলো, জাপানি মিলিটারি বিভাগের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন। বহু চিন্তাভাবনার পর আমরা অন্তত কাজ শুরু করার মতো একটি 'প্রিপারেটোরি কমিটি' গঠন করলাম – যার কাজ হলো এইসব খুঁটিনাটি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা ও বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

ইতিমধ্যে, টোকিও কনফারেন্স থেকে ক্যাপটেন মোহন সিং ফিরে আসার পরে, তিনি গুরুত্ব সহকারে আন্তরিক ভাবেই তাঁর পরিকল্পনা মাফিক ইনডিয়ান ন্যাশনাল আর্মিতে যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিদের নাম তালিকাভুক্ত করার কাজে লেগে গেলেন। মনে হলো, তিনি কেবলমাত্র স্বেচ্ছাসেবী সংগ্রহেরই কাজ করছেন, কিন্তু আমাদের কাছে খবর এসে পৌঁছলো যে তিনি একাজে জোর-জবরদস্তিও করছেন। বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে যে হিসেব পাওয়া গেল, তাতে স্বেচ্ছাসেবীর সংখ্যাগত হেরফেরও ছিল বেশ কিছু পরিমাণে।

প্রাথমিক ভাবে খুব কম সংখ্যক অফিসারই মোহন সিং-এর সঙ্গে যোগ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন, এবং যোগদানেচ্ছু অন্যান্য পদমর্যাদার অফিসারদের সংখ্যাও মোটামুটি হাজার চারেকের বেশি হবে না। ঘটনাক্রমে ঐ সংখ্যা বেড়ে গিয়ে ১২ হাজারের মতো দাঁড়ায় বলে শোনা যায়, কিন্তু এই হিসেব অনুসারে কোনো সঠিক তালিকা রাখা হতো বলে মনে হয় না। তাছাড়া, অতিরিক্ত মাত্রায় মাতব্বরি করার জন্যে মোহন সিং-এর বিরুদ্ধে অভিযোগও ছিল। মোহন সিং জোর দিতেন আনুগত্যের শপথ গ্রহণের সময় যেন ব্যাক্তিগত ভাবে তাঁর নামেই শপথ নেওয়া হয় – যে কোনো আর্মির পক্ষেই তা সম্পূর্ণ ভাবে একটা অস্বাভাবিক প্রথা।

পূর্ব-এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াবাসী ভারতীয়দের অধিবেশনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের দিনক্ষণ স্থির হলো – ব্যাংকক, ১৫ জুন ১৯৪২ ; রাসবিহারী বোস তার প্রেসিডেন্ট। কিন্তু এই অধিবেশনের আগের দিন অদ্ভুত এক ঘটনা ঘটলো। –

অধিবেশনের শেষ মুহূর্তে, মালয় থেকে আগত ডেলিগেটদের কয়েকজন আইন-জীবী সদস্য সন্দেহ করলেন যে, জাপানি আর্মি কর্তৃপক্ষ, প্রস্তাবিত অধিবেশন-

স্থানের অর্থাৎ শিল্পাকরন থিয়েটার-এর (Silpakorn Theatre) নিয়ন্ত্রণাধীনে গোপনে এই অধিবেশনের কার্যবিবরণী 'টেপ.' করার ব্যবস্থা করেছেন। সুতরাং তাঁরা বললেন, অধিবেশনের স্থান পরিবর্তন করতে হবে। আমি ভাবলাম, এটা হলো কোনো বিষয়ে অ্যামেচারি / দৃষ্টিতে দেখার ভঙ্গি।

কিন্তু সেখানে কোনো রকম আড়ি পাতার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না, কিংবা তার কোনো আয়োজনের ভাবভঙ্গি বোঝা গেল না। এটা নিছক একটা কাল্পনিক সন্দেহ মাত্র। দ্বিতীয়ত—জাপানিরা যদি সত্যিই এই অধিবেশনের কার্যক্রম ইত্যাদি বিষয়ে জানতে ইচ্ছে করতো, তাহলে তারা অন্তত 'রেডিও টেপ.' ব্যবস্থা ব্যতীত অন্যান্য বহু ব্যবস্থা করতে পারতো। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, তাদের পক্ষে খুব সহজ ছিল এই অধিবেশনে তাদের নিযুক্ত এজেন্টদের অনুপ্রবেশ ঘটানো, এবং যদি তারা এই ব্যবস্থা নিতে ইচ্ছে করতো তবে কেউই সেকথা সম্ভবত জানতেই পারতো না। এইসব কলকৌশল এবং অধিবেশনের পক্ষে অন্যান্য ব্যবস্থাদির জন্যে তাদের সাহায্য-সহযোগিতাই নিতে হবে, তাছাডা বিকল্প কোনো উপায় ছিল না। অতএব, তারা ইচ্ছে করলে তাদের উপস্থিতিতেই অধিবেশনের কার্যক্রমে অনুষ্ঠানের ওপর জোর দিতে পারতো, অথবা এমনকি এই অধিবেশন নিষিদ্ধ করে দিতে পারতো। কিন্তু তারা এরকম কোনো চেষ্টাই করেনি। প্রকৃতপক্ষে, তারা চিন্তিত ছিল যাতে এই অনুষ্ঠানটি সার্থক ভাবে পরিচালিত হয়, এবং তার ফলে ভারতীয় সম্প্রদায়ের সংহতি আরো জোরদার হয়।

যাই হোক, যখন ঐ বিষয়ে রাঘবন এক প্রস্তাব আকারে কথা তুললেন অধিবেশনের স্থান পরিবর্তন করাই উচিত, রাসবিহারী সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলেন। এমনকি যদিও তাঁকে সেকাজ করার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে বোঝানো হয়নি, তিনি স্থির করলেন যেহেতু রাঘবন নিরাপত্তার বিষয়ে কিছু সংগত সন্দেহ করছেন, তাঁর আন্তরিকতাকে মান্য করা উচিত। রাসবিহারী তখন আমাকে বললেন বিকল্প ব্যবস্থা করতে। বিষয় হিসেবে এটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু শেষ মুহূর্তে এই ধরনের কোনো পরিবর্তন আদৌ সহজ ছিল না। যাই হোক, আমি কোনো রকমে ঐ থিয়েটারের অন্য একটি উপযুক্ত হলঘর (Hall) পাওয়ার ব্যবস্থা করলাম, এবং ঐ অধিবেশন পূর্বনির্দিষ্ট সময়েই শুরু হলো।

রাঘবন পরবর্তীকালে এই ঘটনাটির উল্লেখ করেছিলেন তাঁর দৃঢ় বিশ্বাসের প্রমাণ হিসেবে (টোকিওতে তাঁর সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে) যে, রাসবিহারী ছিলেন একজন খাঁটি ভারতীয় স্বদেশপ্রেমিক, যিনি অধিবেশনের অনুষ্ঠান ও কার্যক্রমের গোপনীয়তা অবলম্বনের ক্ষেত্রে এবং স্বদেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিন্দু-মাত্র সন্দেহের ঝুঁকি নিতে চান নি।

টোকিও কনফারেন্সের পরই, টোকিওয় মিলিটারি হেড-কোয়ার্টার্স স্থাপিত হলো—ঐ সান্নো হোটেলেরই একাংশে ; সেখানে একটি 'স্পেশাল অফিস' খোলা

হলো, যার কাজ হলো লিগের (IIL, ইনডিয়ান ইনডিপেনডেন্স লিগ) সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে আসন্ন ব্যাংকক অধিবেশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি নিয়ে কাজ করা। 'তামুরা কিকান' (Tamura Kikan) ব্যবস্থা কার্যত যথেষ্ট ছিল না, অন্তত তার অবস্থান কেন্দ্রের দৃষ্টিতে, যাতে প্রস্তাবিত অধিবেশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ক্ষেত্রে টোকিওর মিলিটারি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত ইত্যাদি দ্রুততার সঙ্গে গ্রহণ করা যায়। টোকিওর মিলিটারি অফিসের প্রধান ছিলেন কর্নেল হিদেও আইওয়াকুরো (Col. Hideo Iwakuro), একজন উচ্চ-স্তরের অফিসার, যিনি আগে ছিলেন ইমপিরিয়াল গার্ডস-এর কমাণ্ডার। তাঁরও ছিল উচ্চ স্তরের রাজনৈতিক যোগাযোগ এবং ব্যাপক অভিজ্ঞতা। এহেন অভিজ্ঞ ও যোগ্য একজন অফিসারের নিয়োগ থেকেই বোঝা যায়, জাপান সরকার ঐ ব্যাংকক কনফারেন্সের সংগঠনের সাফল্যের ঘটনায় কতখানি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাঁরা জানতেন, এই কনফারেন্সের ফলশ্রুতি—অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে তা হবে বেশ শক্তিশালী—যে বিষয়টি হলো তাদের দিক থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

ব্যাংকক কনফারেন্সের ব্যবস্থাদি যখন প্রায় সম্পূর্ণ তখন লিগ কর্তৃপক্ষ (IIL সংস্থা) স্থির করলেন যে, লিগের হেড-কোয়ার্টার্স ব্যাংককে স্থানান্তরিত করা উচিত। সেটাই হবে যুক্তিসংগত পদক্ষেপ, যেহেতু ব্যাংকক এমন একটা উপযুক্ত কেন্দ্র যেখানে থেকে কার্যক্রম এবং অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে কার্যকলাপ বেশ সুবিধাজনক ভাবে অনুসরণ করে তা রূপায়িত করা যায়।

জাপান সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে কর্নেল আইওয়াকুরো-ও তাঁর সংস্থা ব্যাংককে বদলি করে নিলেন। 'তামুরা কিকান' বন্ধ করে দিয়ে তার বদলে স্থাপন করা হলো 'আইওয়াকুরো কিকান' ('Iwakuro kikan')। অল্পকাল পরে কর্নেল আইওয়াকুরো স্থির করলেন, তাঁর অফিস কোনো ব্যক্তিগত নামেই চিহ্নিত করা উচিত হবে না, বরং অন্য কোনো পৃথক নামকরণই সংগত। তাই তাঁর অফিসের নাম হলো 'হিকারি-কিকান' (Hikari kikan)।

এই 'হিকারি কিকান' অফিসের মুখ্য উপদেষ্টা নিযুক্ত হলেন—মিঃ সেনদা (Mr. Senda —তিনি প্রায় ২৫ বছর ভারতে বসবাস করেছেন, অধিকাংশ সময় ছিলেন কলকাতায় পাট-ব্যবসায়ে নিযুক্ত। তিনি ভারতকে সত্যিই খুব ভালো ভাবেই জানতেন, এবং তিনি ছিলেন ভারতের একজন সহৃদয় বন্ধু। তিনি ছিলেন সত্যিই ধনী, কিন্তু পছন্দ করতেন সরল জীবনযাপন।

'হিকারি-কিকান' সংস্থার প্রকৃত সংগঠনের কথা প্রকাশ্যে কখনো বলা হয়নি, অনিবার্য ভাবেই নিরাপত্তার কারণে। কিন্তু কর্নেল আইওয়াকুরো ব্যক্তিগত ভাবে

আমাকে বিশদভাবে বলেছিলেন তার বিভিন্ন দিকের খুঁটিনাটি সহ, যেহেতু রাসবিহারী ও আমি উভয়েই ছিলাম ইনডিয়ান ইনডিপেনডেন্স লিগের অন্যতম মুখ্য সংগঠক। অর্থাৎ আইওয়াকুরো চান না যে, তিনি আমাদের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় গোপন করছেন, একথা আমরা কখনো ভাবি।

এই 'হিকারি-কিকান' সংস্থার রাজনৈতিক বিষয়ক একটি পৃথক বিভাগ ছিল, আরেকটি বিভাগ ছিল মিলিটারি বিষয়ের। এই সংস্থার তৃতীয় আরেকটি বিভাগ ছিল ইনটেলিজেন্স ও পাল্টা-গোয়েন্দাগিরি (Intelligence and counter-espionage) এবং প্রচার ও প্রোপাগাণ্ডা বিষয়ে—যার শাখা-অফিস ছিল সিংগাপুরে। চতুর্থ বিভাগের দায়িত্ব ছিল প্রশাসনগত। এক্ষেত্রে একটা অলিখিত ব্যবস্থা ছিল, যার ফলে জাপানি কর্তৃপক্ষ এবং ভারতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ভালো সম্পর্ক স্থাপনের পক্ষে প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদির আদান-প্রদান করা হতো—ভারতীয় লিগের পক্ষে রাসবিহারী বা আমার সঙ্গে, এবং জাপানের পক্ষে 'হিকারি কিকান'-এর কর্নেল আইওয়াকুরোর সঙ্গে; এই ব্যবস্থার ভিত্তি হলো 'বোচো' (Bocho) অর্থাৎ তথ্য বিনিময়ের গোপন ব্যবস্থা। নীতিগত ব্যাপারে গোপনীয় বিষয় সংক্রান্ত ক্ষেত্রে কেবলমাত্র আমাদের তিনজনের মধ্যেই আলাপ আলোচনা হবে। মৌখিক চুক্তি মতো কাজকর্ম ভালোই চলছিল, যার ফলে লিখিত চুক্তি ইত্যাদি এড়িয়ে চলা সম্ভব হচ্ছিল—যেদিকে মালয় থেকে আগত ডেলিগেটদের আইনজীবী সদস্যরা খুবই জোর দিতেন, বিশেষত জাপানিদের কাছ থেকে লিখিত নির্দেশ ইত্যাদি পাওয়ার ওপরেই তাঁদের ঝোঁক ছিল বেশি।

ভারতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশ কয়েকজন কৌতুহলী সদস্য ছিলেন, যাঁরা প্রায়ই আমার কাছে কর্নেল আইওয়াকুরোর কাজকর্মের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। তিনি ছিলেন একজন ক্ষমতাশালী মানুষ, কিন্তু প্রত্যেকের সঙ্গে আচরণে খুবই সহৃদয়। ভারতীয় সম্প্রদায় লক্ষ্য করেছিল, তিনি কেবল আমার সঙ্গেই আচরণের ক্ষেত্রে খুব আফিসিয়াল বা কেতাদুরস্ত। অনেকেই খুব কৌতুহলী ছিলেন, আমাদের মধ্যে কি কি বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হয় তা জানতে। আমি অবশ্য রাসবিহারীকে প্রত্যেক সময়েই সম্পূর্ণ অবহিত রাখতাম, কিন্তু আমাদের কথাবার্তার বিষয়ে অন্য কারো সঙ্গে সাধ্যমতো কিছুই জানতে দিতাম না। আমাকে যথেষ্ট সাবধান থাকতে হতো, এবং সাধারণত কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে কোনোরকমে এটা-সেটা বলে এড়িয়ে যাওয়ার মতো জবাব দিতাম। কিন্তু বিশেষত একদল বন্ধুরা অত্যন্ত নাছোড়বান্দা হয়ে উঠলেন, এবং আমিও বেশ বিরক্ত হয়ে গেলাম। তাঁরা যখন আমাকে দারুণ পীড়াপীড়ি করতেন, আমি তাঁদের বেশ আন্তরিকভাবে ও গুরুত্ব সহকারে বলতাম যে, 'হিকারি-কিকান' সংস্থা হলো একটা 'গ্যাসোলিন স্টেশন'। প্রকৃতপক্ষে, আমরা ইনডিয়ান লিগের অফিসের গাড়ির জন্যে পেট্রোল নিতাম ঐ 'হিকারি-কিকান' থেকেই; সুতরাং কেউই বলতে পারতো না আমি ভুল বলছি।

যেভাবেই হোক, আমি তখন আরো জিজ্ঞাসাবাদের হাত থেকে রেহাই পেলাম।

ব্যাংকক কনফারেন্স শুরু হলো পূর্বনির্দিষ্ট ১৫ জুন তারিখেই। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ছিল খুবই সাধারণ। রাসবিহারী সভাপতিত্ব করলেন এবং অধিবেশনের কার্যক্রম পরিচালনা করলেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মর্যাদার সঙ্গে (দ্রষ্টব্য, পরিশিষ্ট-২)। শুভেচ্ছার একটি বার্তা পাওয়া গেল জেনারেল তোজোর কাছ থেকে। এই অধিবেশনে সবসুদ্ধ প্রায় ১২০ জন ডেলিগেট ছিলেন, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ছিলেন মালয় থেকে—তাঁদের সংখ্যাই হবে প্রায় ৫০ জন, এঁদের মধ্যে ছিলেন ইনডিয়ান আর্মি পার্সোনেলদের প্রতিনিধিরাও—যাঁরা জাপানিদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। রাসবিহারীর ইনডিয়ান ইনডিপেনডেন্স লিগের সভাপতিত্ব পদে নিযুক্তি পাকাপাকি হয়ে গেল, যেমন তাঁর সদস্যপদের মনোনয়ন ইতিপূর্বেই টোকিও কনফারেন্সেই প্রস্তাবিত হয়েছিল তার 'অ্যাকশান কাউনসিল'-এর পক্ষে। বার্মা পাঠিয়েছিল প্রায় ১০ জন ডেলিগেট, এবং অবশিষ্ট সংখ্যার মধ্যে বিভিন্ন আনুপাতিক হারে ডেলিগেট এসেছিল জাপান, থাইল্যাণ্ড, চীন, মানচুকুও, ফিলিপাইন্স ও বোর্নিও ইত্যাদি দেশ থেকে।

প্রথম দিনের কার্যক্রম পণ্ড হয়ে গেল কয়েকটি প্রসঙ্গের ওপর তর্কবিতর্কে, যা অপ্রত্যাশিত ভাবে সূচনা করলেন মালয়ের আর্মি গ্রুপের প্রতিনিধি হিসেবে ক্যাপটেন মোহন সিং। তিনি ছিলেন প্রথম থেকেই অধিকাংশ ডেলিগেটদের কাছেই প্রচুর বিরক্তি ও উত্তেজনার মূল কারণ স্বরূপ। তাঁর ভাবভঙ্গি ছিল অত্যন্ত উদ্ধত মেজাজের এবং আচরণ ছিল অত্যন্ত মাতব্বরী ধরনের। তিনি দুটি প্রস্তাব করলেন: ১ INA (ইনডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি) সংস্থা সংগঠনের যে প্রস্তাব হয়েছে তা হবে সম্পূর্ণ তাঁরই এখতিয়ারভুক্ত, এ বিষয়ে IIL সংস্থার (ইনডিয়ান ইনডিপেনডেন্স লিগ) কোনো রকম নিয়ন্ত্রণ/কর্তৃত্ব থাকবে না; ২. সমস্ত অফিসার ও অন্যান্য যাঁরা এই বাহিনীতে যোগদান করছেন ও করবেন, তাঁরা আনুগত্যের শপথ নেবেন ব্যক্তিগতভাবে তাঁরই নামে—অন্য কোনো কমাণ্ডার পদাধিকারীর কাছে নয়, কিংবা কোনো সংস্থার কাছেও নয়।

এরকম অসংগত প্রস্তাবের ফলে স্বভাবতই চারদিক থেকে গুঞ্জন ও আপত্তিকর মন্তব্য শুরু হলো। এরকম আপত্তিকর প্রস্তাবের একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারে যে, মোহন সিং চেয়েছিলেন একমাত্র ডিক্‌টেটার হতে—যাঁকে অন্য কারো কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে না। ডেলিগেটরা স্বভাবতই এই আপত্তিকর প্রস্তাবের প্রতিবাদ করলেন, কিন্তু যে ব্যক্তি তখনি উঠে দাঁড়িয়ে এইসব প্রস্তাবের সমালোচনা করলেন তিনি হলেন—এন. রাঘবন, পেনাং-এর ডেলিগেট ও অ্যাকশান কাউনসিলের একজন সদস্য। তিনি মোহন সিং-এর উভয় প্রস্তাবেরই

বিরোধিতা করলেন, যেহেতু এই প্রস্তাব দুটি ছিল অগণতান্ত্রিক এবং তাই এই অধিবেশনে বিবেচনার অযোগ্য। অর্থাৎ INA থাকবে সম্পূর্ণতই IIL-এর নিয়ন্ত্রণাধীনে, এবং এর সদস্যরা তাঁদের আনুগত্যের শপথ নেবেন এই IIL-সংস্থার নামেই—অন্য কোনো ব্যক্তিবিশেষের কাছে বা কমাণ্ডিং অফিসারদের নামে নয়—যেহেতু এই সংস্থা হলো একটা বেসরকারি বা প্রাইভেট আর্মি। রাঘবনের এই সংগত আপত্তির জবাবে অতঃপর মোহন সিং কিছু পরিমাণে চিৎকার চেঁচামেচি ও অমর্যাদাকর গোলমালের সৃষ্টি করলেন বন্য/হিংস্র ভাবভঙ্গি সহকারে; অবস্থা এমন স্তরে গেল যখন রাঘবন প্রেসিডেন্টের কাছে ঘোষণা করলেন যে, মোহন সিং যেসব প্রস্তাব তুলেছেন তা নিয়ে যদি বিতর্ক চলতে দেওয়া হয়, তাহলে তিনি এই অধিবেশনের সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেতে চান। রাসবিহারী লক্ষ্য করলেন, এ ব্যাপারে বহু ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। তিনি তখন অধিবেশন স্থগিত রাখলেন এবং ঘোষণা করলেন যে, অধিবেশন আবার কখন চালু হবে সেকথা পরে জানিয়ে দেওয়া হবে।

ক্যাপটেন মোহন সিং তাঁর বইতে এই ব্যাংকক কনফারেন্স সংশ্লিষ্ট বহু প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তাঁর এই প্রস্তাব দুটি সংক্রান্ত কোনো কথাই বলেন নি। প্রসঙ্গক্রমে তিনি তাঁর ঐ বইতে এক বিবৃতিতে (ঐ, পৃ. ১২২) বলেছেন, প্রথম দিন 'তাঁর বক্তব্য প্রায় সাড়ে-সাত ঘণ্টা যাবৎ গভীর মনোযোগের সঙ্গে অন্যেরা শুনেছেন'—একথা স্রেফ ডাহা মিথ্যে। তিনি খুব বেশি হলে মাত্র আধ ঘণ্টা বলেছিলেন, এবং তাও ঐ দুটি অবিশ্বাস্য প্রস্তাব উত্থাপন উপলক্ষে—যে প্রস্তাবের কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। যাই হোক, সমাগত শ্রোতামণ্ডলী মোহন সিং-এর প্রস্তাবে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন।

ব্যাংকক কনফারেন্সের আরো একটি ঘটনার কথাও মোহন সিং উল্লেখ করেন নি। অধিবেশনের সূচনাতেই রাঘবনের সঙ্গে তাঁর বাদ-প্রতিবাদ ঘটিত কুরুচিকর আচরণ তাঁর দিক থেকে একটা অত্যন্ত অবিবেচকের মতো কাজ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রইলো। তিনি সহজেই তাঁর প্রস্তাবের কথা বন্ধুত্বপূর্ণ ভাবেই সরাসরি রাঘবনের সঙ্গে আলোচনা করে নিতে পারতেন, অথবা রাসবিহারী কিংবা আমার মাধ্যমেই করতে পারতেন। কিন্তু তা না করে তিনি যোগাযোগ করলেন 'হিকারি-কিকান' এর সাংবাদিক / লিয়াজোঁ অফিসার লেঃ কুনিসুকা-র (Lt. Kunisuka) সঙ্গে। এই লেঃ কুনিসুকা-র মাধ্যমেই তিনি জাপানি আর্মির সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করলেন তাঁর পরিকল্পিত ইনডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি সংগঠনের কাজে।

লেঃ কুনিসুকার সরকারি ভূমিকা ছিল কেবলমাত্র ধরাবাঁধা রুটিন মাফিক বিভিন্ন বিষয়ে অর্থাৎ এই অধিবেশনের সঙ্গে ডেলিগেটদের যাঁরা জাপানি ভাষা জানেন না, এবং 'হিকারি-কিকান' এর প্রশাসনিক দফতরের বিষয়ে কিছু জানেন না, তাঁদের

যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া। গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো বিষয়ে IIL সংস্থা এবং 'হিকারি-কিকান' এর কর্নেল আইওয়াকুরোর সঙ্গে আলোচনা করতে হলে তা করতে হবে—হয় রাসবিহারী অথবা আমার মাধ্যমে। 'হিকারি-কিকান' সংস্থায় লেঃ কুনিসুকা-র অন্তর্ভূক্তির পক্ষে যে যোগ্যতা ছিল, তা হলো এখানে তিনিই কিছুটা ইংরেজি জানতেন। তিনি আগে ছিলেন কানেমাৎসু/কোবের বৃহৎ পশমশিল্প সংস্থায় একজন কেরানি মাত্র। যেহেতু তিনি ছিলেন প্রাথমিক মিলিটারি ট্রেনিং প্রাপ্ত (প্রাক্-যুদ্ধকালীন জাপানের হাই-ইস্কুল শিক্ষার আবশ্যিক অংশ ছিল), তাই তাঁকে আর্মিতে আনা হয় এবং হিকারি-কিকান সংস্থায় নিয়োগ করা হয়।

এটা একটা আশ্চর্যের ব্যাপার যে, ক্যাপটেন মোহন সিং যিনি একজন জেনারেল পদের দায়িত্বে ছিলেন, তাঁরই উচিত ছিল অফিসিয়ালি একজন লেফটেনান্টের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করা, বিশেষত 'হিকারি-কিকান' এর সঙ্গে অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁর সাহায্য-সহযোগিতা পাবার ক্ষেত্রে। কিন্তু তা না করে তিনি যা করলেন তার চেয়ে দায়িত্বহীনতার কথা চিন্তাও করা কঠিন। এবং এটা আরো আশ্চর্যের বিষয় যে, লেঃ কুনিসুকা নিজের ঘাড়ে মোহন সিং-এর সঙ্গে রাঘবনের বাদ-বিসংবাদ নেবেন - দায়িত্ব মেটানোর। কিন্তু ঘটনা তো কাহিনীর চেয়েও আশ্চর্য-জনক হতে পারে, যা প্রমাণিত হলো লেঃ কুনিসুকা-র সিদ্ধান্তে—যার ফলে তিনি নিজেই সোজা চলে গেলেন হোটেলে রাঘবনের ঘরে, এবং তাঁর সঙ্গে তর্ক শুরু করে দিলেন - INA সংগঠনের প্রশ্নে রাঘবনের বক্তব্যের বিরুদ্ধেই।

যেদিন মোহন সিং ও রাঘবনের সঙ্গে অধিবেশনে ঐ বাদানুবাদের ঘটনা ঘটলো, সেদিন প্রায় দুপুরের দিকে যখন আমি হোটেলে রাঘবনের ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন রাঘবনের ঘর থেকে কিছু চেঁচামেচি ও ক্রুদ্ধ আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি সঙ্গে সঙ্গেই রাঘবনের গলা চিনতে পারলাম। কিন্তু বুঝতে পারলাম না অপর পক্ষটি কে। আমি ঘরে ঢুকে গেলাম এবং লক্ষ্য করলাম যে, তখন পুরোদমে তর্ক-বিতর্ক চলছে রাঘবন ও কুনিসুকার মধ্যে। আমি অত্যন্ত অবাক হয়ে গেলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম: এসব কি হচ্ছে এখানে?

রাঘবন তখন আমাকে বললেন যে, লেঃ কুনিসুকা এসেছেন সকালের অধিবেশনে ক্যাপটেন মোহন সিং-এর প্রস্তাবের তিনি যে বিরোধিতা করেছিলেন তার প্রতিবাদ জানাতে, এবং তাই তিনি এহেন পরিস্থিতিতে ব্যাংকক পরিত্যাগ করে পেনাং-এ ফিরে যেতে প্রস্তুত হচ্ছেন।

আমি তখন লেঃ কুনিসুকা-র দিকে ফিরে বললাম: লেঃ কুনিসুকা, এ বিষয়ে আপনার কিছু করার নেই; আমিই এ বিষয়ে যা করার করবো; আপনি এখন এ ঘর ছেড়ে চলে যান। লেঃ কুনিসুকা তখন চলে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়ালেন।

আমি খুশি হলাম এই দেখে যে, লেঃ কুনিসুকা আমার কথা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছেন। তিনি 'অ্যাটেনশান' ভঙ্গিতে দাঁড়ালেন, আমাকে স্যালুট করলেন এবং

ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। আমি অবশ্য জানি না তিনি জানেন কিনা যে, আমার কাজকর্মের স্বার্থে ও তাঁদের সঙ্গে আলোচনার সুবিধার জন্যে জাপানি মিলিটারি হাইকমাণ্ড থেকে আমাকে একজন লেঃ জেনারেল-এর সমান পদমর্যাদা দেওয়া হয়েছে। আমি কখনো সেই ঘটনার কথা জাহির করিনি, এবং এটা সম্ভব নয় যে, লেঃ কুনিসুকা-র মতো কর্মচারিও সেকথা জানবেন। বরং তাঁর আচরণ দেখে এটা পরিষ্কার হলো যে, তিনি তাঁর অভিজ্ঞতায় আমাকে অন্তত তাঁর চেয়ে উচ্চ পদাধিকারী বলে বুঝতে পেরেছেন, এবং সেই পরিস্থিতিতে সেটাই যথেষ্ট ছিল।

যে মুহূর্তে লেঃ কুনিসুকা ঘর ছেড়ে চলে গেলেন, আমি রাঘবনের টেলিফোন তুলে নিলাম এবং হিকারি-কিকান সংস্থার কর্নেল আইওয়াকুরোর সঙ্গে কথা বললাম। আমি তাঁকে বললাম, আমার কিছু জরুরি কথা আলোচনা করার আছে ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর সঙ্গে, আমি কি এখনি চলে আসতে পারি? সম্ভবত আমি ওখানে মিঃ সেনদাকেও (Mr. Senda) দেখতে পাবো। সেটা ছিল প্রায় লাঞ্চের সময়, এবং আমি প্রস্তাব করলাম যদি সম্ভব হয়, আমি তাঁর লাঞ্চে যাওয়ার আগেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই। ওদিক থেকে কর্নেল আইওয়াকুরোর জবাব এলো—হ্যাঁ, মিঃ নায়ার, প্লিজ এখনি চলে আসুন; আমরা উভয়েই এখানে আপনার জন্যে অপেক্ষা করবো।—অতঃপর আর দেরি না করে আমি তাঁর অফিসে চলে গেলাম এবং তাঁকে বললাম আমি যা দেখেছি এবং শুনেছি একটু আগে রাঘবনের ঘরে, এবং আরো বললাম ঐ অধিবেশনে সকালের সভায় যেসব তর্কবিতর্ক হয়েছে সে কথাও। আমি কর্নেল আইওয়াকুরোকে বললাম, রাঘবন এই ব্যাপারে এত অখুশি হয়েছেন যে, তিনি পেনাং-এ ফিরে যাবার জন্যে জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করেছেন।

কর্নেল আইওয়াকুরো পরামর্শ করলেন মিঃ সেনদার সঙ্গে, এবং জলদি সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি আমাকে বললেন যে, মোহন সিং ও কুনিসুকা উভয়েরই কার্য-কলাপ আপত্তি জনক। তিনি লেঃ কুনিসুকাকে ভালো ভাবেই বুঝিয়ে দেবেন তাঁর সরকারি কর্তব্যের বিষয়ে এবং তিনি দেখবেন যাতে লেঃ কুনিসুকা ঐ ধরনের ভুল কোনো ক্রমেই আর ভবিষ্যতে না করেন। কিন্তু তিনি আরো বললেন যে, আমি যেন লেঃ কুনিসুকার তরফে রাঘবনের কাছে ত্রুটি স্বীকারের ও ক্ষমা প্রার্থনার কথা মিঃ রাঘবনকে জানিয়ে দিই, এবং আমি যেন তাঁকে অনুরোধ করি মিঃ রাঘবন যেন অধিবেশন চলাকালীন পুরো সময়টাই থেকে যান এবং অধিবেশনে উপস্থিত থাকেন। কর্নেল আইওয়াকুরো আরো বললেন যে, আমি যেন সব কিছুই রাসবিহারী বোসকে জানাই এবং যেন সুপারিশ করি, তিনি ইচ্ছে করলে এই অধিবেশন নতুন করে আহ্বান করতে পারেন, এবং আদেশের আকারে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিতে পারেন যে, ইনডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি যদি ও যখন সংগঠিত হবে, তখন তা সম্পূর্ণতই ইনডিয়ান ইনডিপেনডেন্স লিগের নিয়ন্ত্রনাধীনেই থাকবে।

কর্নেল আইওয়াকুরোর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার ও আলোচনা দ্ব্যর্থহীন পরিষ্কার এই মর্মে শেষ হলো যে : যদি কখনো তেমন প্রশ্ন ওঠে কোনো পক্ষের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করার, তবে তাঁর প্রস্তাব হলো, বরং মোহন সিং তাঁর তলপি-তল্‌পা গুটিয়ে চলে যেতে পারেন ; কিন্তু মিঃ রাঘবনকে যেন অনুরোধ করা হয় যাতে তিনি লিগের সঙ্গেই থাকেন। তাছাড়া, আমি যেন এসব কথা রাসবিহারী বোসকেও জানিয়ে রাখি। তিনি আবার অনুরোধ করছেন, রাসবিহারী যেন তাঁর অধিবেশন ও সংশ্লিষ্ট কার্যকলাপ চালিয়ে যান।

অতঃপর আমি তখন আর লাঞ্চের কথা চিন্তা করলাম না। সোজা গিয়ে রাসবিহারীর সঙ্গে দেখা করলাম এবং তাঁকে সমস্ত ঘটনার কথা বললাম, এ পর্যন্ত যা যা ঘটেছে। তিনি রাজী হয়ে গেলেন ঐ অধিবেশন নতুন করে আহ্বান করতে, ঐ দিন বিকেলের দিকেই। আমিও সেইভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করে ফেললাম, এবং প্রকৃতপক্ষে আমি সেই হোটেলে অবস্থানরত ডেলিগেটদের প্রত্যেকের ঘরে ঘরে গিয়ে জানালাম এবং তাঁদের আশ্বস্ত করলাম যে, অধিবেশন ভেঙে যাচ্ছে না বরং তা চালু রয়েছে, যদিও এই নতুন ভাবে।

যখন ডেলিগেটরা লাঞ্চের পরে আবার মিলিত হলেন, রাসবিহারী অধিবেশনের কার্যক্রম শুরু করলেন এই বলে যে, তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা আছে : এবং ঘোষণাটি প্রকৃতপক্ষে হবে প্রেসিডেন্টের তরফ থেকে একটি রুলিং বা নির্দেশের আকারে ('কিংবা আমি বলবো, একটি আদেশ')। ঘোষণাটি হলো অধিবেশনের সকালের সভার আলোচনার সূত্রে, এবং ইনডিয়ান ন্যাশন্যাল আর্মির সংগঠনের প্রশ্নে। প্রেসিডেন্ট বললেন : "আমি এতদ্বারা একটি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, ইনডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি যখন সংগঠিত হবে তখন এটা হবে ইনডিয়ান ইনডিপেন-ডেন্স লিগের একটি 'মিলিটারি উইং'বা সামরিক বিভাগ। এই মিলিটারি উইং সম্পূর্ণত এবং সমস্ত দিক থেকেই থাকবে লিগের নিয়ন্ত্রণাধীনে। আমি আশা করি, এ বিষয়ে আর কোনো বিতর্ক হবে না।"

যাই হোক, এ বিষয়ে আরো কিছু 'কথা হয়েছিল'। ক্যাপটেন হাবিবুর রহমান, যুদ্ধবন্দীদের তরফে একজন ডেলিগেট, কিন্তু INA-র একজন গুরুত্বপূর্ণ অফিসার, উঠে দাঁড়িয়ে বললেন : "মিঃ প্রেসিডেন্ট, আমি ক্যাপটেন মোহন সিং-এর প্রস্তাব-গুলিতে সমর্থন জানাতে চাই। আমি মনে করি, মিঃ এ. এম. নায়ার অসুবিধে সৃষ্টি করছেন ক্যাপটেন মোহন সিং-এর বিপক্ষে। মোহন সিং-এর প্রস্তাবগুলি গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত, খুবই অসুবিধে হবে ইনডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি সংগঠন করতে।"

যদিও আমার বন্ধুদের কয়েকজন প্রায়ই আমাকে বলেছেন যে, ঐ সময়ে

আমাকে অত্যন্ত 'কঠোর' দেখাচ্ছিল, তবে কেউই বলেন নি যে, আমাকে কোনো ক্রমেই 'ক্রুদ্ধ' দেখাচ্ছিল। কিন্তু আমি অবশ্যই স্বীকার করবো, যখন আমি হাবিবুর রহমানের কথা শুনলাম, আমি সত্যিই যেন ক্ষেপে গেলাম। এমনকি হাবিবুর তাঁর কথা শেষ করার আগেই, আমি আমার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম এবং সেই বোধ হয় একবারই (অনিচ্ছাসত্ত্বেই), স্বাভাবিক নিয়মে কেবলমাত্র সভাপতিকে সম্বোধন করে কথা বলার প্রথা ভঙ্গ করেছিলাম। আমি সোজা হাবিবুর রহমানের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললাম: দেখুন ক্যাপটেন, আপনি একজন যুদ্ধবন্দী মাত্র, যাঁকে ইনডিয়ান ইনডিপেনডেন্স লিগ এবং জাপানি কর্তৃপক্ষ সাহায্য করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু যুদ্ধবন্দী হিসেবে আপনি ভুলে যাবেন না যে, আপনার আনুগত্য ছিল ঔপনিবেশিক ব্রিটেনের কাছে। আমরা ভেবে-ছিলাম, আপনার মত পরিবর্তন করে আপনি একজন ভারতীয় অফিসারের মতো আচরণ করবেন, এবং সেজন্যেই আমরা আপনাকে এই কনফারেন্সে যোগদানে অনুমতি দিয়েছি। কিন্তু আমার প্রতি আপনার আচরণের বিরুদ্ধে আমি অত্যন্ত কঠোর ভাবেই প্রতিবাদ করছি। আমি একজন ভারতীয় স্বদেশপ্রেমিক, এবং আমি এখন ভাবতে শুরু করেছি আপনি সম্ভবত কখনোই একজন খাঁটি ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী হতে পারবেন না। আপনি কখনোই চেয়ারম্যানের অর্ডার অগ্রাহ্য করবেন না। যদি অগ্রাহ্য করেন তবে, 'ওয়াক আউট' করুন। আর যদি 'মেনে নেন' তবে বসে পড়ুন।

এই কথা বলে আমিও বসে পড়লাম। আমার দেখাদেখি হাবিবুর রহমানও তাই করলেন। সেকথা বলতে গেলে মনে হয়, তখন অধিবেশন কক্ষে একটা চাপা আতংক ও উত্তেজনার ভাব বিরাজ করছিল, কিন্তু তাকে সৌজন্যের সঙ্গে নরম করে আনতে হবে। সেই সময়কার উত্তেজনার কথা আমার পক্ষে ভাষায় বর্ণনা করা, সংক্ষেপে হলেও কোনো ক্রমেই সম্ভব নয়। যাই হোক, অধিবেশন কক্ষে তখন একটা ইচ্ছে সবার মনেই চরম আকার ধারণ করেছিল, যথা: সভার আলোচ্য বিষয়টি তখনি পরিবর্তন করা দরকার। সমবেত সকলের সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছিল। হাবিবুর রহনান এবং আমি উভয়েই যে যার জায়গায় বসার পরেই, চেয়ারম্যান তখনি অধিবেশনের কর্মসূচি অনুসারে ভিন্ন আলোচ্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন।

সৌভাগ্যক্রমে, ঐ অধিবেশনে আর কোনো বড় রকমের ঝড় ওঠেনি। একটানা ৯ দিন আলোচনা চলেছিল, এই সময়ের মধ্যে বিচিত্র বহু বিষয়ে নীতিনির্দেশ নিয়ে তর্কবিতর্ক হয়েছিল, এবং তারপরে বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, যার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো—

১. IIL-সংস্থা পরিচালিত হবে যে নীতির ভিত্তিতে তা হলো: ক)

একতা, বিশ্বাস ও স্বার্থত্যাগ হবে এই সংস্থার আদর্শ ; খ) ভারতকে দেখতে হবে এক ও অবিভাজ্য রূপে ; গ) এই আন্দোলনের সমস্ত কার্যকলাপ পরিচালিত হবে একটি জাতীয় ভিত্তিতে, কোনো গোষ্ঠীগত বা সাম্প্রদায়িক বা ধর্মীয় বিবেচনার দৃষ্টিতে নয় ; ঘ) ইনডিয়ান ন্যাশানাল কংগ্রেস হলো একমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন এবং সেই সংস্থাই ভারতবাসীদের স্বার্থরক্ষার প্রতিনিধিত্ব দাবি করতে পারে এবং তাই সেই সংস্থাকেই আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতীয়দের পক্ষে চূড়ান্ত কথা বলার অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে হবে ; ঙ) ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান প্রণয়ন করতে হবে ভারতবাসীদের দ্বারাই ; চ) IIL-সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন ; ছ) IIL-সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রূপায়ণে জাপানের সঙ্গে বোঝাপড়া, সহযোগিতা ও তাদের সমর্থন লাভ হবে বিশেষ মূল্যবান ; জ) বিদেশি সূত্রে প্রাপ্ত সমস্ত সাহায্য হবে সংশ্লিষ্ট পক্ষের কোনোরকম নিয়ন্ত্রণ, কর্তৃত্ব ও হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত ;

২. IIL-সংস্থায় থাকবে— ক) একটি কাউনসিল অফ অ্যাকশান ; খ) একটি কমিটি অফ রিপ্রেজেনটেটিভ্স ; গ) টেরিটোরিয়াল ব্রাঞ্চ ও লোকাল ব্রাঞ্চ সমূহ ;

৩, সমস্ত ভারতীয় যাদেরই বয়স ১৮ বছরের উর্ধ্বে, তারাই এই IIL-সংস্থার সদস্য হতে পারবে ;

৪. কমিটি অফ রিপ্রেজেনটেটিভ্স গঠিত হবে অসামরিক প্রার্থীদের দ্বারা— যাঁরা নির্বাচিত হবে টেরিটোরিয়াল কমিটিগুলির দ্বারা (এই কমিটিগুলির প্রতিটি থেকে কতজন করে সদস্য নেওয়া হবে, তাও ঠিক করা হলো) ;

৫. কাউনসিল অফ অ্যাকশান গঠিত হবে IIL-সংস্থার প্রেসিডেন্টকে (মিঃ রাসবিহারী বোস) নিয়ে, এবং সাময়িক ভাবে তাঁর সঙ্গে আরো থাকবেন—এন. রাঘবন, কে. পি. কেশব মেনন, কর্নেল জি. কিউ. গিলানি, ক্যাপটেন মোহন সিং প্রমুখ ;

৬. কাউনসিল অফ অ্যাকশান-এর কাজ হবে কমিটি অফ রিপ্রেজেনটেটিভ্স কর্তৃক গৃহীত নীতি ও কর্মসূচির রূপায়ণ, এবং তারা আরো দেখবে যাবতীয় নতুন বিষয়াদি যা মাঝে মাঝেই পরিস্থিতি অনুযায়ী উদ্ভব হবে, এবং আগে থেকে যা কর্মসূচিতে রাখা যাবে না, বা যে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব নাও হতে পারে ;

৭. IIL-সংস্থাই স্বীকৃত সংস্থা, কেবল যারই আর্মি সংগঠনের অধিকার থাকবে এবং যে সংগঠনের নাম হবে ইনডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি (INA)—ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে গঠিত, যে সেনাদলে থাকবে আক্রমণকারী ও অনাক্রমণকারী উভয় প্রকার সেনা ; তাছাড়া, এই সংগঠনে মিলিটারি সার্ভিসের প্রয়োজনে থাকবে অসামরিক ব্যক্তি—ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের স্বার্থে ;

৮. প্রস্তাবিত INA-র সমস্ত অফিসার ও অন্যান্য ব্যক্তি হবে IIL-সংস্থার

সদস্য, এবং তাদের আনুগত্য থাকবে কেবল লিগের প্রতি, এবং তাদের ব্যবহার করা হবে—ক ইনডিয়ান ন্যাশনাল ইনডিপেনডেন্স অর্জন ও নিশ্চিত করার কাজে, এবং এই ধরনের অন্যান্য কাজে যা ঐ লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে ; খ) তারা হবে সরাসরি কাউনসিল অফ অ্যাকশানের নিয়ন্ত্রণাধীন, যে কাউনসিল চলবে একজন কমানডিং অফিসারের নির্দেশে, এবং ঐ অফিসার চলবেন কাউনসিল অফ অ্যাকশানের নীতিনির্দেশ অনুসারে ;

৯. ভারতে যখন ব্রিটিশ অথবা অন্য কোনো বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধে কোনো-রকম মিলিটারি অ্যাকশান নেওয়া হবে, কাউনসিল অফ অ্যাকশান-এর স্বাধীনতা থাকবে প্রাপ্ত মিলিটারি শক্তিকে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কাজে লাগানোর ; এবং একাজ তারা করবে যুক্ত কমাণ্ডের নেতৃত্বে—যে কমাণ্ডে থাকবে ভারতীয় ও জাপানি মিলিটারি অফিসারবৃন্দ, এবং তাঁরাও চলবেন কাউনসিল অফ অ্যাকশান-এর নির্দেশে;

১০. ভারতে ব্রিটিশ বা অন্য কোনো বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধে কোনোরকম অ্যাকশান নেওয়ার পূর্বে, কাউনসিল অফ অ্যাকশান এ বিষয়ে নিশ্চিত হবে যে, এই ধরনের অ্যাকশান নেওয়াটা ইনডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অভিপ্রায়ের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ;

১১. কাউনসিল অফ অ্যাকশান সর্বপ্রকারে চেষ্টা করবে ভারতে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে, যাতে সেখানকার ইনডিয়ান আর্মি ও ভারতবাসীদের মধ্যে একটি বিদ্রোহ সংগঠিত করা যায় এবং তাকে এগিয়ে নেওয়া যায়, এবং এক্ষেত্রে কোনোরকম মিলিটারি অ্যাকশান নেওয়ার পূর্বে কাউনসিল অফ অ্যাকশান এ বিষয়ে নিশ্চিত হবে যে, ভারতে এরকম অবস্থা অর্থাৎ বিদ্রোহের অনুকূল পরিবেশ বিদ্যমান রয়েছে ;

১২. ভারতে এবং ভারতের বাইরের ভারতীয়দের মধ্যে এই ধরনের স্বাধীনতা আন্দোলন সংগঠনের অর্থ ও উদ্দেশ্য ইত্যাদি বিষয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে বোঝানো ও প্রচারের জরুরি প্রয়োজনে, তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, এবং কাউনসিলের নির্দেশে সক্রিয় প্রোপাগাণ্ডা চালাতে হবে বেতার বার্তা, পুস্তিকা, ভাষণ, সংবাদপত্র, এবং এই ধরনের অন্যান্য মাধ্যমের সাহায্যে, যেসবের সাহায্য বাস্তবক্ষেত্রে পাওয়া সম্ভব হবে ;

১৩. বিদেশি সহায়তা যে কোনো ধরনেরই হোক না কেন, তা হবে কেবলমাত্র কাউনসিল অফ অ্যাকশানের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুসারে ;

১৪. স্বাধীনতা আন্দোলনের কাজে আর্থিক সহায়তা দেবার জন্যে কাউনসিল অফ অ্যাকশানই অর্থ সংগ্রহ করতে পারবে—পূর্ব এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বসবাসকারী ভারতীয়দের কাছ থেকে ;

১৫. জাপান গভর্নমেন্টের কাছে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকা সমূহের মধ্যে প্রোপাগাণ্ডা, যাতায়াত, যানবাহন ও যোগাযোগ ইত্যাদি বিষয়ে কাজের ক্ষেত্রে

সর্বপ্রকার সুবিধা-সুযোগ চাওয়া যেতে পারে। অবশ্য এক্ষেত্রে কাউনসিল অফ অ্যাকশান যেভাবে সাহায্য চাওয়া সংগত মনে করবে সেভাবেই অনুরোধ করা হবে, এবং এই সমস্ত সুবিধা-সুযোগ পাওয়ার ব্যাপারে অবশ্যই ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ, কর্মীবৃন্দ ও সংস্থা সমূহের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে ;

১৬. ব্রিটিশ এম্পায়ারের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার প্রশ্নে জাপান গভর্নমেণ্ট দেশের আঞ্চলিক সংহতিকে মর্যাদা দেয় এবং ভারতের সার্বভৌমত্বকে স্বীকৃতি দেবে—যে সার্বভৌমত্ব হবে যে কোনো রকম বিদেশি প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ মুক্ত, এবং রাজনৈতিক, সামরিক বা অর্থ নৈতিক ধরনের হস্তক্ষেপ মুক্ত ;

১৭. জাপান গভর্নমেণ্ট নিজে তার প্রভাব খাটাবে এবং অন্যান্য বিদেশি শক্তি, যাদের সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে, তাদের উৎসাহ দেবে—যাতে তারা ভারতের স্বাধীনতাকে এবং সম্পূর্ণ সার্বভৌম ভারতকে স্বীকৃতি ও মর্যাদা দেয় ;

১৮. জাপানি বাহিনীর অধিকৃত এলাকাগুলিতে বসবাসকারী ভারতীয়দের শত্রু-পক্ষের লোক বলে গণ্য করা উচিত হবে না, অন্তত যতক্ষণ তারা IIL-সংস্থা বা জাপানের স্বার্থ বিরোধী কোনো কাজ না করছে ;

১৯. ভারতে এবং অন্য যেকোনো স্থানে বসবাসকারী ভারতীয়দের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তিও (ভারতীয় কোম্পানি ফার্ম ও অংশীদারি সংস্থার সম্পত্তি সহ) জাপান কর্তৃক শত্রু-সম্পত্তি বলে গণ্য করা উচিত হবে না, অন্তত যতক্ষণ সংশ্লিষ্ট কোম্পানি ও সংস্থা সমূহের কর্তৃপক্ষ তাদের সম্পত্তি জাপানে বা জাপানি বাহিনীর অধিকৃত বা প্রভাবাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকা সমূহে বসবাসকারী কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবৃন্দের হাতে তার দায়িত্ব ভার অর্পণ করবে ;

২০. IIL-সংস্থা ভারতের চলতি ন্যাশনাল ফ্লাগ (জাতীয় পতাকা) গ্রহণ করছে এবং এই সংস্থা বন্ধুত্বপূর্ণ অন্যান্য সকল রাষ্ট্রকে অনুরোধ জানাবে এই জাতীয় পতাকাকে স্বীকৃতি দিতে ;

২১. কনফারেন্সের অনুমোদিত কোনো ভাষণ বা সিদ্ধান্তকে উপযুক্ত স্বীকৃতি ছাড়া কোনো ক্রমেই বেআইনি ভাবে প্রচারের সুযোগ দেওয়া হবে না।

[নোট: বিভিন্ন সংগঠন ও গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে প্রাপ্ত সাহায্য-সহযোগিতার জন্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ; জাপান ও থাই গভর্নমেণ্টের কাছে কিছু রুটিন মাফিক সাহায্য প্রদানের জন্যে ছোটখাটো অনুরোধ জ্ঞাপন ইত্যাদির কথা, এই তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে ; উল্লিখিত সিদ্ধান্তগুলি হলো অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ, এবং যেগুলি আলোচিত হয়েছে ও সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়েছে ।]

উক্ত সিদ্ধান্ত সমূহের একটি কপি IIL-সংস্থার প্রেসিডেণ্ট হিসেবে রাসবিহারী বোস কর্তৃক কর্নেল আইওয়াকুরোর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হলো—টোকিওর

জাপান গভর্নমেণ্টের অবগতির জন্যে। প্রায় এক পক্ষকালের মধ্যেই কর্নেল আইওয়াকুরো অফিসিয়ালি রাসবিহারীকে লিখিত ভাবে পাকাপাকি জানিয়ে দিলেন যে, প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজো কর্তৃক ইতিপূর্বে ঘোষিত ভারতের প্রতি জাপান গভর্নমেণ্টের নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, ব্যাংকক কনফারেন্সে গৃহীত এই সিদ্ধান্তগুলি সমর্থন করেছেন। এই সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে একটিতে যেমন অনুরোধ করা হয়েছে সেই অনুসারে, এই কনফারেন্সের সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ সহ রেকর্ডপত্র জাপান গভর্নমেণ্ট কর্তৃক 'গোপন' রাখা হবে। কর্নেল আইওয়াকুরো এই সঙ্গে অনুরোধ জানালেন, IIL-সংস্থার প্রেসিডেণ্ট হিসেবে রাসবিহারীও যেন এই জবাবটির বিষয়েও 'গোপনীয়তা' অবলম্বন করেন। রাসবিহারী জানালেন, তিনি এই পারস্পরিক বোঝাপড়াকে যথোচিত মর্যাদা দেবেন।

কনফারেন্সের শেষে, ২৩ জুন তারিখে, ডেলিগেটদের কয়েকজন, কার্যবিবরণীর কথা স্মরণ করে এখনো তিক্ততার ভাব অনুভব করেন, বিশেষত অধিবেশনের সূচনায় প্রথম দিনেই সংঘটিত ক্যাপটেন মোহন সিং-এর অসংগত কার্যকলাপে। কিন্তু রাসবিহারী চেয়েছিলেন এই ঘটনার কথা ভুলে যাওয়াই উচিত। তিনি নিজে এবং অন্যান্য কয়েকজন, তার মধ্যে আমিও আছি, আমাদের সকলের অভিমত এই যে, ঐসব অপ্রীতিকর ঘটনা ও কাহিনীর প্রচার না হওয়াই উচিত। তাই আমরাও সেইভাবে অনুরোধ করলাম, যাঁরা স্বভাবতই ইনডিয়ান আর্মির প্রতিনিধিত্বের সমালোচনা করে থাকেন বা করতে আগ্রহী তাঁদেরও। আমি তাঁদের একটি চীনা প্রবাদের কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম: বিরাট ঝগড়াঝাঁটিকে ছোট করে আনো, এবং ছোটকে শূন্যে পরিণত করো; এবং তাঁদের আমি বললাম যে, আমরাও এরকম চেষ্টা করে দেখতে পারি। আমার সত্যিই চিন্তা ছিল, এই ঘটনার কথা যদি জানাজানি হয়ে পড়ে, তাহলে এ বিষয়ে চারিদিকে নানা রকম জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে যাবে। প্রকাশ্যে কোনো রকম নোংরামির কথা আমাদের দিক থেকে জানাজানি করা উচিত হবে না। আমাদের শত্রু ব্রিটেনের কাছে আমাদের শক্তি-সামর্থ্যের বা ঐক্যের ফাটলের কথা জানতে দেওয়া উচিত নয়। অধিকন্তু এমন কিছুই করা উচিত হবে না যাতে যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে দুর্বল চিন্তাভাবনা দেখা দেয়, কিংবা যাতে তাদের মানসিক শক্তি হ্রাস পায়।

কিন্তু রাসবিহারী ও আমার মধ্যে একটা বোঝাপড়া ছিল, লিগের মধ্যে কোনো দায়িত্বশীল পদে ক্যাপটেন মোহন সিংকে রাখার বিষয়ে IIL-সংস্থার ইচ্ছা বা অভিমত হবে স্বাধীন, তাতে আমরা কিছু বলবো না। মোহন সিং-এর কার্যকলাপ নিয়ে পর্যালোচনা করা হবে এবং সে বিষয়ে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে, যদি সে রকম কোনো পরিস্থিতির কখনো উদ্ভব হয়।

২২.

ইনডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি

ইনডিয়ান ইনডিপেনডেন্স লিগের (IIL) সংস্থার অনলস প্রচেষ্টার ফলে জাপান গভর্নমেন্টের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একটা উপযুক্ত যোগাযোগ সাধনের প্রয়াস সফল হলো। জাপান সরকার বারবার ঘোষণা করলো যে, ভারত সম্পর্কে তাদের কোনো রকম অসংগত মতলব বা অভিসন্ধি নেই, কিংবা IIL – সংস্থাকেও তারা নিজেদের স্বার্থে কোনোক্রমেই কাজে লাগাতে চায় না ;

এম. শিবরাম-এর সাহায্যে এবং এস. এ. আয়ার-এর সমর্থনে আমরা ভালো একটি প্রচারাভিযান সংগঠন করেছিলাম ব্যাংককে,—সংবাদপত্র ও বেতার, উভয় মাধ্যমেই। ভারতের মধ্যেকার ঘটনাবলীর সংবাদের জন্যে লনডন নয়া দিল্লি ইত্যাদি জায়গা থেকে শর্ট-ওয়েভ নিউজ ব্রডকাস্টই ছিল তাৎক্ষণিকভাবে সংবাদপ্রাপ্তির একমাত্র সূত্র। ভারতের মধ্যেকার রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের সংবাদ ক্রমশই সুস্পষ্ট জোরোলো ও শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। এমনকি ব্যাংকক কনফারেন্সের পূর্বেই আমরা শুনেছিলাম যে, উইনস্টন চার্চিল (Winston Churchill) কর্তৃক স্যার স্ট্যাফার্ড ক্রিপ্‌স-এর যে মিশনকে (Sir Stafford Cripps' mission) ভারতে পাঠানো হয়েছিল অচলাবস্থার সমাধান কল্পে, তা ব্যর্থ হয়েছে।

১৯৪২-এর এপ্রিল মাসে, বার্মা দখলের সঙ্গে সঙ্গেই, জাপানি সেনারা বঙ্গোপসাগরের দিকে অগ্রসর হলো এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করে নিল। ইনডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস সর্বপ্রকারেই ছিল জাপানের ভারত সম্পর্কিত 'কো-প্রসপারিটি স্ফিয়ার' (Co-Prosperity sphere) বা সহ-সমৃদ্ধির অঞ্চল নীতির কোনোরকম সম্প্রসারণের বিরোধী। ৮ আগস্ট ১৯৪২ তারিখে আমরা গান্ধীজীর বিখ্যাত সেই, 'কুইট ইনডিয়া' (ভারত ছাড়ো' সিদ্ধান্তের ঘোষণা শুনলাম। তাতে বলা হয়েছিল, সমস্ত ভারতীয়দেরই উচিত ভারতের পবিত্র ভূমি থেকে ব্রিটিশদের তাড়িয়ে দেওয়ার কাজে যোগদান করা। ব্রিটেনও প্রতিশোধ নিল তার জবাবে মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে। গান্ধীজী আগেই বলেছিলেন: যদি ব্রিটিশরা ভারতের হাতেই দেশটাকে রেখে চলে যায়, যেমন তারা সিংগাপুর ছেড়ে চলে গেছে, অহিংস ভারতের তবে কিছুই হারাতে হবে না, এবং জাপানও সম্ভবত ভারত ছেড়ে চলে যাবে। – গান্ধীজীর মতে, ভারতে ব্রিটিশের উপস্থিতিই হবে ভারতের দিকে জাপানের অগ্রসর হওয়ার একমাত্র উত্তেজনার কারণ।

এটা খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, ব্যাংকক থেকে ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই ক্যাপটেন মোহন সিং ব্যাংকক কনফারেন্সে গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহের বিরুদ্ধাচরণ করতে লাগলেন, বিশেষত ইনডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি সংগঠনের ব্যাপারে। তিনি প্রবল উৎসাহে এই আর্মির কাজে 'ভলানটিয়ার' বা স্বেচ্ছাসেবী নিয়োগ করতে লাগলেন, কাউনসিল অফ অ্যাকশান-এর কোনোরকম অনুমোদন ছাড়াই। কিছু সংখ্যক অফিসার ও অন্যান্য কিছু লোকের এ বিষয়ে অনিচ্ছা ও আপত্তি ছিল, যাঁদের মোহন সিং-এর ব্যক্তিগত উচ্চাকাংক্ষার বিষয়ে সন্দেহ ছিল। স্বেচ্ছাসেবী নিয়োগে যে পদ্ধতিতে তিনি নাম তালিকাভুক্ত করছিলেন, তার ফলে প্রচুর আপত্তি ও প্রতিবাদ হয়েছিল।

আমরা ব্যাংককে শুনেছিলাম যে, মোহন সিং সিংগাপুরে ও অন্যত্র বিভিন্ন 'যুদ্ধবন্দী' ক্যাম্পে যাতায়াত করছিলেন, বন্দী সেনাদের মধ্যে কারা 'তাঁর পক্ষে' যোগ দিতে রাজী, আর কারা রাজী নয় তা দেখতে ও খোঁজখবর নিতে। মোহন সিং নিজে থেকেই নানা রকম সন্দেহজনক ব্যবস্থাদি করে আদর-আপ্যায়নমূলক বিশেষ ব্যবহার আদায় করতেন, যেখানে অন্যেরা হয়রানি হতেন, এমনকি তাঁদের প্রায় উপোসের পর্যায়ে থাকতে হতো। জানা যায়, বন্দীদের কারো কারো ওপর এমন কি অত্যাচারও করা হতো। একটি রিপোর্ট অনুসারে জানা যায়, যেসব অফিসার ও ও অন্যান্যদের মধ্যে যাঁরা তাঁর পক্ষে যেতে ইতস্তত করতেন, কনসেনট্রেশান ক্যাম্পে তাঁদের কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘিরে প্রহার করার তিনি আদেশ দিতেন। অন্য একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে, তিনি অনিচ্ছুক বন্দীদের ওপর এমনকি সাংঘাতিক রকমের থার্ড-ডিগ্রি ব্যবস্থাও প্রয়োগ করতেন। আমরা শুনেছিলাম ; ক্রানজি (Kranji) নামে একটি ক্যাম্পে যেখানে স্বেচ্ছাসেবীর সংখ্যা তেমন বেশি নয়, সেখানে তিনি মেশিনগান বসানোর ব্যবস্থা করেছিলেন সহ-বন্দীদের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি করতে, এবং একবার কি দু'বার মেশিনগান চালানোও হয়েছিল। যার ফলে কিছু হতাহত হয়েছিল। ভারতীয় যুদ্ধবন্দীরা একটা ত্রাসের মধ্যে অবস্থান করছিল।

অপরদিকে, নানারকম দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটছিল মোহন সিং ও জাপানি কর্তৃপক্ষের মধ্যে। ব্যাংককের হিকারি-কিকান সংস্থা আমাদের জানিয়েছিল, মোহন সিং ক্রমেই একটা বাধাস্বরূপ হয়ে উঠছেন—ভারতীয় ও জাপানি পক্ষের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের পথে।

এটা পরিষ্কার যে, কাউনসিল অফ অ্যাকশানের পেনাং ও সিংগাপুরস্থ সদস্যরা, যথা—এন. রাঘবন, কে. পি. কেশব মেনন প্রমুখেরা মোহন সিংকে আর সংযত রাখতে পারছিলেন না। কর্নেল গিলানি (Col. Gilani) আপাতদৃষ্টিতে এসব কলঙ্কজনক ঘটনা সহ্য করছিলেন তাঁর একদা জুনিয়ারের হাতে, তার একমাত্র কারণ জনৈক খ্যাপা জাপানি মেজর মোহন সিংকে অনুপযুক্ত ভাবেই ক্যাপটেন থেকে একজন তথাকথিত জেনারেল পদে উন্নীত করেছিলেন ; তৎসত্ত্বেও যে

কর্নেল গিলানি মোহন সিং-এর পক্ষে রয়ে গেলেন, তার একমাত্র কারণ ব্যক্তিগত সুবিধাজনক কৌশল।

এই সমস্ত ঘটনাই অত্যন্ত বিরক্তিকর। যদি এইসব ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার ঘটনা প্রকাশ্য ঝগড়াঝাঁটির দিকে যায়, তাহলে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না, কে জিতবে আর কে হারবে। তাই, বিশদ আলোচনার পরে আমরা স্থির করলাম রাসবিহারী বোসকে অনুরোধ করতে, যাতে তিনি অফিস বদল করে সিংগাপুরে গিয়ে অবিলম্বে সেখানকার পরিস্থিতি সামলানোর দায়িত্ব নেন। তিনি সম্মত হলেন। হিকারি-কিকান সংস্থাও রাজী হয়ে গেল তার সদর দফতর সিংগাপুরে স্থানান্তরিত করতে।

রাসবিহারী বোসের থাকার জায়গা হলো পার্ক ভিউ হোটেলে (Park View Hotel)। টোকিওবাসী দু'জন দক্ষ ভারতীয় যুবককে নিযুক্ত করা হলো তাঁকে সাহায্য করার জন্যে। তাঁদের মধ্যে একজন—ডি. এস. দেশপাণ্ডে, বেশ মেধাবী ও নানান খোঁজ খবর রাখেন; তাছাড়াও তিনি একজন দক্ষ 'জুডো' বাজ (তিনি ছিলেন ২য় শ্রেণী ভুক্ত, এক্ষেত্রে যা উচ্চস্তরের যোগ্যতা)। যদি প্রয়োজন হয়, তিনি বেশ ভালো ভাবেই রাসবিহারীর দৈহিক নিরাপত্তার ব্যবস্থাও করতে পারবেন। অন্য জন—ভি. সি. লিংগম, মালয়ের একজন ধনী চেট্টিয়ারের পুত্র। ইংরেজি ও জাপানি ছাড়া তামিল ভাষায় তাঁর জ্ঞান, রাসবিহারীর কাজে প্রচুর সহায়ক হতে বাধ্য।

সরেজমিনে সমস্যাদির পর্যালোচনার পরে, রাসবিহারীর কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, মোহন সিং-এর মাতব্বরি সহ্যসীমার বাইরে চলে যাচ্ছে। এবং মোহন সিং যদি ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের ও জাপানি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের উন্নতি না ঘটান, তাহলে ঘটনাবলী আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে। কাউনসিল অফ অ্যাকশানের অন্যান্য সদস্যদের আপাতদৃষ্টিতে মনে হলো ক্ষমতাহীন। কর্নেল আইওয়া-কুরো ছিলেন ভালো মানুষ, তিনিও বিরক্ত হয়ে গেলেন। মোহন সিং 'হিকারি-কিকান' সংস্থা এবং জাপানি কর্তৃপক্ষের অন্যান্য প্রত্যেককে—যাঁদের সংস্পর্শেই তিনি এসেছিলেন—তাঁদের কাছে এমন একটা ভাব দেখাতে লাগলেন যে, সিংগাপুরে জাপানি উপস্থিতি একটা বিশেষ সুবিধা, এবং সেটা মোহন সিং-এর দ্বারাই সম্ভব হয়েছে। অবশ্য কেউই চায় না যে, মোহন সিং জাপানিদের কাছে গিয়ে তাদের ওপর কোনো রকম মাতব্বরি বা মন্তব্য করবে; কিন্তু এটা সর্ব প্রকার নিয়মকানুন এবং সাধারণ জ্ঞান ও বিবেচনা বহির্ভূত যে, মোহন সিং 'হিকারি-কিকান' সংস্থা ও জাপানি কর্তৃ পক্ষের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষের পথ বেছে নেবেন। কর্নেল আইওয়া-কুরো দেখলেন, মোহন সিং-এর সঙ্গে কাজ করা বা তাঁকে সংযত করা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার।

ঘটনাবলী ক্রমশই খারাপ থেকে আরো খারাপ হতে লাগলো। সাংঘাতিক রকমের উত্তেজনা তীব্রতর হয়ে উঠলো কর্নেল আইওয়াকুরো এবং মোহন সিং-এর মধ্যে। মোহন সিং, ব্যাংকক কনফারেন্সে গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহের একেবারে বিপরীত ভাবে, কাউনসিল অফ অ্যাকশানকে সম্পূর্ণতই অগ্রাহ্য করলেন। ইনডিয়ান ইনডিপেনডেন্স লিগ বা অ্যাকশান কাউনসিল, কারো সঙ্গেই কোনো রকম আলোচনা ছাড়াই, বহু সংখ্যক INA সেনাদেরকে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করলেন— মালয় থেকে বার্মায় 'ট্রেনিং-এর জন্যে', সম্ভবত জাপানি কর্তৃপক্ষের অনুরোধে। ইনডিপেনডেন্স লিগ (IIL) সংস্থার হেড-কোয়ার্টার্সের কাছে বেশ কয়েকটি রিপোর্ট আসে— সাংঘাতিক অত্যাচার ও অন্যান্য উৎপীড়নের ঘটনাদির, যা সংঘটিত হয়েছিল INA-সংস্থার বেশ কয়েকজন অফিসার ও অন্যান্য লোকজনের উপর,— যার জন্যে অনিবার্য ভাবেই মোহন সিংকেই দায়ী করা হলো।

রাঘবন কাউনসিল অফ অ্যাকশান থেকে তাঁর পদত্যাগপত্র দাখিল করলেন রাসবিহারীর কাছে, ৪ ডিসেম্বর তারিখের এক চিঠিতে। তাঁর কিছু ক্ষোভের কারণ ছিল জাপান গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে, যেহেতু তাঁকে কাউনসিল অফ অ্যাকশানের অভিপ্রায় অনুসারে 'লিখিত আশ্বাস' দেওয়া হয়নি; কিন্তু তাঁর একটা প্রধান অভিযোগ ছিল মোহন সিং-এর বিরুদ্ধে যে, মোহন সিং ব্যাংকক কনফারেন্সের সিদ্ধান্ত অনুসারে অ্যাকশান কাউনসিলের সঙ্গে কোনো রকম আলোচনা ছাড়াই ইচ্ছেমতো কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন।

অথচ কোনো অসুবিধেই হতো না যদি মোহন সিং তাঁর কাজকর্ম দায়িত্বের সঙ্গে ও যুক্তিসংগত ভাবে করতেন, ডিকটেটারের মতো কোনো রকম ভাবভঙ্গি বা ভণিতা না করতেন। তিনি অত্যন্ত অপমানজনক আচরণ করেছেন IIL-সংস্থার প্রেসিডেন্ট রাসবিহারীর সঙ্গে। তিনি রাসবিহারীকে অগ্রাহ্য করেন এবং এমনকি রাসবিহারীর সঙ্গে INA সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও কোনো কথা বলতেন না। তিনি সমান অপ্রিয় ছিলেন কর্নেল আইওয়াকুরোর কাছেও, তিনি বুঝতেন না যে 'এভাবে' তিনি সহজে চলতে পারেন না। এমনকি, একবার কর্নেল আইওয়াকুরো তাঁর অফিসে ডেকে পাঠালেন মোহন সিংকে ('জেনারেল' তখন অগ্রাহ্য না করে 'কর্নেল'-এর সমন গ্রাহ্য করলেন) এবং তাঁকে বললেন: জেনারেল তোজো ইতিপূর্বেই যে ঘোষণা করেছেন, সেই অনুসারে জানানো হচ্ছে, টোকিও কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ভারতীয়দের পক্ষে সব সময়েই লিখিত জবাবের জন্যে কোনো রকম চাপ দেবার প্রয়োজন নেই, কেননা সেখানে সবাই অত্যন্ত কর্মব্যস্ত; এবং তাই যে কোনো ব্যাখ্যা নির্দেশ মোহন সিং পেতে চান, তা রাসবিহারী বোসের কাছ থেকেই নেওয়া উচিত, যেহেতু তিনিই IIL-সংস্থার প্রেসিডেন্ট, এবং তাঁর অধীনস্থ হয়েই মোহন সিং কাজ করবেন আশা করা যায়। তিনি মোহন সিংকে আশ্বাস দিলেন যে, এখনো উভয় পক্ষের দিক থেকে একত্রে আপোষের সঙ্গে

কাজ করা সম্ভব, যদি কেবলমাত্র তিনিই (মোহন সিং) তাঁর উদ্ধত ভাব ত্যাগ করেন।

কেবল যেকথা কর্নেল আইওয়াকুরো মোহন সিংকে বলেন নি তা হলো, তিনি ইতিমধ্যেই তাঁর লিখিত জবাব পাঠিয়ে দিয়েছেন রাসবিহারীর কাছে ১৯৪২ জুলাই মাসে যে, এ বিষয়ে জাপান গভর্নমেণ্টের পূর্ণ সমর্থন আছে IIL-সংস্থার প্রতি এবং ব্যাংকক কনফারেন্সে গৃহীত সিদ্ধান্ত চুক্তি ইত্যাদি অনুসারে তার মর্যাদার প্রতি। যে কারণে কর্নেল আইওয়াকুরো এ বিষয়ে মোহন সিংকে কিছু বলেন নি তা হলো, তাঁর সঙ্গে রাসবিহারীর একটা চুক্তি ছিল, এই চিঠিপত্রের বিষয়টি গোপন রাখা হবে। রাসবিহারীর অবস্থাও এক্ষেত্রে অন্যরকম ছিল না, একই রকম ছিল। কিন্তু এ বিষয়ে রাসবিহারী সংশ্লিষ্ট সকলকেই যথেষ্ট আভাস ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, জাপানিদের সঙ্গে কার্যত সুসম্পর্ক, ইতিপূর্বে ঘোষিত নীতি-নির্দেশের মধ্যেই সম্ভব, অযথা কাগুজে-যুদ্ধ বা কাগজ চালাচালি না করেই। কিন্তু বলতে গেলে দুঃখের বিষয়, অ্যাকশান কাউনসিলের তিনজন সদস্যই (অর্থাৎ রাঘবন ব্যতীত) বোঝাপড়ার বাস্তববোধের কোনো পরিচয় দেননি।

মোহন সিং-এর হঠকারিতার একটি ব্যাপার ব্যাংককে আমাদের সকলের কাছেই সত্যিই অত্যন্ত খারাপ লেগেছিল। ব্যাংকক কনফারেন্সে গৃহীত সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত ছিল- INA সদস্যদের আনুগত্য থাকবে IIL-সংস্থার প্রতি, তা সত্ত্বেও মোহন সিং INA-তে যোগদানকারী প্রত্যেক যুদ্ধবন্দী সেনার কাছ থেকেই আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেছিলেন ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর নামেই, অন্য কারো কাছেই নয়। অনেকেই অবাক হয়ে যাচ্ছিলেন এই ভেবে, এহেন আচরণকারী ব্যক্তিকে এখনই কেন তাঁর সমস্ত দায়িত্বপূর্ণ পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে না। প্রকৃতপক্ষে, কয়েকজন মুসলিম সেনা অস্বীকার করলেন একজন শিখের কাছে ব্যক্তিগত নামে শপথ গ্রহণ করতে, এবং এই পরিস্থিতি দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি করলো অফিসার ও অন্যান্য লোকজনের মধ্যে। রাসবিহারীর সহ্যশক্তি ও ধৈর্যের পরিমাণ ছিল এমনই যে, মোহন সিং-এর মাত্রাছাড়া অবাধ্যতা সত্ত্বেও তাঁকে রাসবিহারী সর্বপ্রকারে সুযোগ দিচ্ছিলেন তাঁর আচরণের উন্নতি করার জন্যে।

সম্ভবত মোহন সিং, যিনি অবিরত নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন রাসবিহারী ও জাপানি কর্তৃপক্ষকে অপদস্থ করার কাজে, তিনি তা করেছিলেন ইচ্ছাকৃত ভাবেই একটা সংকট সৃষ্টির জন্যে এক ধরনের বিবাদগ্রস্ত মনোভাব থেকে। আমরা তাঁর বহু কার্যকলাপেরই কোনোরকম যুক্তিসংগত ব্যাখ্যাই পাচ্ছিলাম না।

ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে কেশব মেনন, গিলানি ও মোহন সিং পদত্যাগ করলেন কাউনসিল অফ অ্যাকশান থেকে। তাঁদের অভিযোগ ছিল, জাপান গভর্নমেণ্ট INA-সংস্থার স্বায়ত্তশাসন সংক্রান্ত বিষয়ে এঁদের চাহিদামতো বিভিন্ন প্রশ্নের গ্যারাণ্টি বা নিশ্চয়তাসূচক লিখিত জবাব দিচ্ছে না। তবে এই সমস্ত বিষয়েই

প্রকৃতপক্ষে মৌখিক বোঝাপড়ার মাধ্যমেই জাপান গভর্নমেণ্টের সঙ্গে ভালোভাবেই আলোচিত হয়েছে এবং সন্তোষজনক ভাবেই তা মীমাংসিত হয়েছে। শেষ চেষ্টা হিসেবে, রাসবিহারী চেষ্টা করলেন উক্ত বিষয়গুলি ব্যক্তিগতভাবে মোহন সিংকে বুঝিয়ে বলতে, কেননা তদন্তের ফলে জানা গিয়েছিল মোহনই ছিলেন ঐ যৌথ পদত্যাগের পাণ্ডা, কিন্তু মোহন সিং অস্বীকার করলেন রাসবিহারীর সঙ্গে দেখা করতে। এমনকি মোহন সিং তাঁর পক্ষ থেকে রাসবিহারীর কাছে কোনো প্রতিনিধি পাঠাতেও অস্বীকার করলেন। এটা স্রেফ প্রথম সারির কর্তৃপক্ষকে অস্বীকার করার ঘটনা।

মোহন সিং-এর এই আচরণের প্রশ্নেই, রাসবিহারী দেখলেন মোহনের বিরুদ্ধে শৃংখলাভঙ্গের দায়ে শাস্তিদানের ব্যবস্থা করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। তিনি একটি মিটিং ডাকলেন ২৯ ডিসেম্বর ১৯৪২ তারিখে, কর্নেল আইওয়াকুরোর বাসায়। মোহন সিং-এর কাছে একটি সমন পাঠানো হলো কর্নেল আইওয়াকুরোর কাছ থেকে—মিটিংএ উপস্থিত থাকতে, এবং তিনি এসেছিলেন। রাসবিহারী মোহন সিংকে বললেন, তিনি এমনভাবে কার্যকলাপ চালাচ্ছেন যা IIL-সংস্থা এবং ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে ক্ষতিকর, এবং তাই তাঁকে IIL-সংস্থা ও INA কমাণ্ড থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো। যাই হোক, তাঁর সম্পর্কে ভালো ব্যবস্থাই করা হবে; তাঁকে একটি প্রাইভেট বাসস্থান দেওয়া হবে, এবং তাঁকে জেলে পাঠানো হবে না। তাছাড়া তিনি কিছু আর্থিক ভাতা পাবেন, ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ব্যবস্থা ও সুবিধা সুযোগও থাকবে; কিন্তু তিনি থাকবেন গৃহবন্দী—রাসবিহারীর এই সিদ্ধান্তে কর্নেল আইওয়াকুরো সম্মত হলেন।

অতঃপর মোহন সিংকে নিয়ে যাওয়া হলো সিংগাপুরের কাছাকাছি এক দ্বীপে, এবং তাঁকে সেখানে আটক রাখা হলো সংগত স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে।

মোহন সিং এবং অন্যান্যদের কাউনসিল অফ অ্যাকশান থেকে পদত্যাগের ২।১ দিন আগে কর্নেল গিল-কে গ্রেফতার করা হলো—ব্রিটিশের পক্ষে গোয়েন্দা-গিরির অভিযোগে। এটা দুঃখজনক ঘটনা। আমরা (রাসবিহারী ও আমি) IIL-সংস্থায় কর্নেল গিল-এর বলিষ্ঠ ভূমিকার ব্যাপারে অনেক আশা করেছিলাম। এবং ব্যবস্থা করেছিলাম তাঁকে যুদ্ধবন্দীদের থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে ও ব্যাংককে রাখতে, যাতে তিনি IIL-সংস্থাকে মিলিটারি লিয়াজোঁর কাজে সহায়তা করতে পারেন। তাঁকে গ্রেফতার করা হয় যখন তিনি হেড-কোয়ার্টার্সে ব্যাংকক থেকে সিংগাপুরে সফর করছিলেন এবং ব্যাংককে যখন আমরা তাঁর জন্যে একটা ভালো বাড়ির ও ক্যাপটেন, ধীলন নামে এক যুবক ও বুদ্ধিমান অফিসারকে নিয়োগের ব্যবস্থা করেছিলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে, কর্নেল গিল ও ক্যাপটেন ধীলন, এই উভয় অফিসারই তাঁদের প্রতি আমাদের বিশ্বাসের মর্যাদা দিলেন না।

আমাদের বলা হয়েছিল যে, লিগকে সাহায্য করার পরিবর্তে ঐ অফিসার দু'জন

গোপন তথ্যাদি ব্রিটিশের কাছে পাচার করতে চেষ্টা করছিলেন। সিংগাপুরও ব্যাংকক, উভয় স্থানেই একটি নিরাপত্তা সংস্থা কাজ করছিল হিকারি-কিকান সংস্থার সঙ্গে। এই সংস্থাটি ছিল কর্নেল সাকাই-এর (Col. Sakai) অধীনে, এবং সাকাই ছিলেন 'নাকানো গাক্‌কো' (Nakano Gakko) সংস্থার একজন কৃতী অফিসার ; 'নাকানো গাক্‌কো' হলো একটি মিলিটারি অ্যাকাডেমি, জাপান গভর্নমেণ্ট মানচুরিয়া ঘটনার সময়ে যে অ্যাকাডেমির উদ্বোধন করেছিল। তারা মানচুকুওয় তাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দেখেছিল যে, একটি মিলিটারি কলেজ স্থাপন করা বিশেষ প্রয়োজন, যার ফলে উচ্চস্তরের অফিসার তৈরি করা যাবে। এখানকার শিক্ষাক্রম হবে উচ্চমানের, তাতে জোর দেওয়া হবে ইনটেলিজেন্স ট্রেনিং এবং অন্যান্য বিশেষ ধরনের বিষয়ের উপর। কেবলমাত্র যারা উচ্চমানের ফল দেখাতে পারবে, তারাই কমিশন পাবে। কর্নেল সাকাই ছিলেন প্রথম গ্রুপের অফিসারদের একজন, যিনি এই 'নাকানো-গাক্‌কো' মিলিটারি অ্যাকাডেমি থেকে গ্রাজুয়েট হয়েছিলেন।

কর্নেল সাকাই-এর অফিসের কাজ ছিল প্রধানত IIL-সংস্থাকে—মিলিটারি সংক্রান্ত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ দিয়ে সহায়তা করা। একই সঙ্গে, সংগতভাবেই তিনি নিরাপত্তার দৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় নজর রাখবেন ভারতীয় সম্প্রদায় এবং ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে কী হচ্ছে না হচ্ছে ইত্যাদি ব্যাপারে। যেহেতু কর্নেল গিল ও ক্যাপটেন ধীলন এই উভয় অফিসারই ছিলেন IIL-সংস্থার দ্বারা নির্বাচিত, কর্নেল সাকাই-এর অফিস তাই তাঁদের দু'জনের ওপর প্রচুর বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। সাকাই-এর অফিস কেবলমাত্র ঐ দু'জনেরই গতিবিধি ও কার্যকলাপ লক্ষ্য করতেন না, তাঁদের মারফৎ মূল্যবান গোপন মিলিটারি ডকুমেণ্ট ইত্যাদিও আমাদের কাছে পাঠাতেন।

একদিন দেখা গেল, ক্যাপটেন ধীলন উধাও হয়েছেন। যে মুহূর্তে এটা জানাজানি হলো কর্নেল সাকাই-এর অফিসে, তখনি সেখান থেকে অনুসন্ধান শুরু হয়ে গেল, এবং শুরু হলো গিল ও ধীলন উভয়ের সম্পর্কে সন্দেহ করা। আমাকে বলা হলো যে, কর্নেল সাকাই-এর হাতে এই দু'জন অফিসার কর্তৃক ব্রিটিশের পক্ষে এজেণ্ট হিসেবে কাজ করার যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে। যেহেতু ধীলন ইতিমধ্যেই সীমান্ত পার হয়ে ভারত ভূখণ্ডে চলে গেছেন, তাই তাঁর ক্ষেত্রে কিছুই করা যাবে না। কিন্তু গিলকে কর্নেল সাকাই বেয়োনেট উঁচিয়ে আটকে রাখেন। জাপানি প্রথানুসারে স্বাভাবিক ভাবেই কর্নেল গিল সাংঘাতিক অসুবিধায় পড়তে পারতেন। এমনকি ফাঁসিও অসম্ভব ছিল না। এতদসত্ত্বেও IIL-সংস্থা ও জাপানি কর্তৃপক্ষের মধ্যেকার বোঝাপড়া-কোনো ভারতীয় অফিসারের সঙ্গেই কঠোর ব্যবহার করা হবে না, এই প্রচলিত ব্যবস্থা অনুসারে কর্নেল গিল-এর শাস্তি কেবলমাত্র গৃহবন্দীত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হলো।

এটা ছিল রাসবিহারীর পক্ষে চরম দুশ্চিন্তার সময়। মোহন সিং বুঝতে পেরে-

ছিলেন বেশ যুক্তিসংগত কারণেই যে, তিনি গ্রেফতার হবেন। তিনি তাঁর কমিশনচ্যুত হওয়া ও আটক হওয়ার প্রায় এক সপ্তাহ আগেই, তাঁর বাহিনীর কাছে এক আদেশ জারি করে দিলেন যে, তিনি গ্রেফতার হবার দিন থেকেই INA-সংস্থা ভেঙে দেওয়া হবে। বাহিনীর মধ্যে তখন সর্বত্রই একটা গোলমেলে ভাব দেখা গেল, যতক্ষণ না তারা জানতে পারলো যে, প্রকৃতপক্ষে কে তাদের দেখাশোনা করবে, কিংবা কে তাদের ওপর কমাণ্ড করবে ইত্যাদি। INA-সংস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সম্পূর্ণভাবেই।

গোলযোগ দেখা দিল বার্মাতেও, যেখানে হিকারি-কিকান সংস্থা ছিল কর্নেল কিতাবে-র (Col. Kitabe) অধীনে—যিনি আগে ছিলেন মানচুকুওতে। বার্মায় ভারতীয় সম্প্রদায়ের কোনো উপযুক্ত নেতৃত্ব ছিল না। একটা আধা-মনোযোগী বা অসম্পূর্ণ সংস্থা কাজ করছিল মিঃ বালেশ্বর প্রসাদ-এর অধীনে। আমরা দেশ-পাণ্ডেকে সিংগাপুর থেকে পাঠালাম বালেশ্বর প্রসাদকে সাহায্য করতে, কিন্তু কয়েকজন স্বঘোষিত নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কর্নেল কিতাবে-র সঙ্গে বচসা হলো, যখন কিতাবে বাস্তুত্যাগী ভারতীয়দের বিষয়-সম্পত্তি দখল করার সিদ্ধান্ত করলেন। ভারতীয় পক্ষ চেয়েছিলেন, এইসব সম্পত্তি হস্তান্তর করা হোক একটি গ্রুপ বা গোষ্ঠীর হাতে—যার নেতৃত্বে ছিলেন বালেশ্বর প্রসাদ ও দেশপাণ্ডে। কিন্তু কর্নেল কিতাবে ছিলেন একজন কঠিন প্রকৃতির মানুষ; তিনি যুক্তি দেখালেন এই বলে যে, এই বিষয়টির ব্যবস্থা করবেন জাপানি দখলদার কর্তৃপক্ষ।

আমরা লক্ষ্য করলাম যে, বার্মায় সাংগঠনিক স্বাভাবিক অভাব ছাড়াও বালেশ্বর প্রসাদ ও কর্নেল কিতাবের এধ্যে একটা পারস্পরিক অপছন্দের ভাব ছিল। উত্তেজনা প্রশমনের একমাত্র বাস্তব উপায় হিসেবে, আমরা বালেশ্বর প্রসাদকে বললাম, কর্নেল কিতাবে-র সঙ্গে আদান-প্রদান বন্ধ রাখতে। ফলে অবস্থাগত উন্নতি হলো দেশপাণ্ডের হাতে। তিনি ছিলেন একজন সমর্থ এবং নিবেদিত চিত্তের মানুষ। দুর্ভাগ্যক্রমে, যুদ্ধের সামান্য কিছু আগে, নাগাসাকির কাছে জাহাজ 'আওয়া মারু'র (Awa Maru) উপর আমেরিকান আক্রমণের ফলে তিনি মারা যান।

ব্যাংককে বসে, আমি বড় অসহায় বোধ করতে লাগলাম, নানান রকম যেসব খবর আসছিল তার ফলে। বিশেষত সিংগাপুরে, সব কিছুই মনে হতে লাগলো কেমন যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। আমি চেয়েছিলাম সেখানে গিয়ে দেখবো যাতে অবস্থার কোনো উন্নতি করা যায়। কিন্তু আমি তখন স্থান ত্যাগ করতে পারলাম না, অন্তত যতক্ষণ না সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয় যে IIL-সংস্থার হেড-কোয়ার্টার্স সেক্রেটারিয়েট সিংগাপুরে স্থানান্তরিত করা হবে। মোহন সিং-এর ঘটনার পরে,

রাসবিহারী দেখলেন মালয়ের সমস্ত কাজকর্ম একা তাঁর নিজের পক্ষে দেখাশোনা করা খুবই কঠিন, বিশেষত যখন তাঁর স্বাস্থ্য ভালো ছিল না, এবং তাই তিনি স্থির করলেন হেড-কোয়ার্টার্স সিংগাপুরে স্থানান্তরিত করবেন। এ বিষয়ে আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ এবং অন্যান্য সমস্যাও ছিল, কিন্তু সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকলের সহযোগিতায়, আমি সদর দফতর সিংগাপুরে বদলি করার কাজ সমাধা করে ফেললাম খুব অল্প সময়ের মধ্যেই।

সিংগাপুরে গিয়ে আমার তাৎক্ষণিক কাজ হলো, INA-সংস্থার প্রশাসনিক পুনর্গঠনের ব্যবস্থা করা। ঐ সংস্থায় তখন বেশ গোলমেলে অবস্থা চলছিল। এটা ক্রমেই পরিষ্কার হয়ে গেল যে, বেশ কয়েক হাজার লোক যারা INA-সংস্থায় যোগদান করেছিল তা হলো মোহন সিং ও তাঁর সমর্থকদের জোর জবরদস্তির ফলেই। মোহন সিং দাবি করেন, ঐ বাহিনীতে প্রায় ৪০ হাজার লোক আছেন। কিন্তু আমরা দেখলাম, ঐ সংখ্যা হবে মাত্র ১০ হাজারের মতো। অবশিষ্ট লোক, যদি আদৌ আগে তালিকাভুক্ত হয়ে থাকে, এখন আবার ফিরে গেছে যুদ্ধবন্দী ক্যাম্পে! যাই হোক, 'হিকারি-কিকান' সংস্থার সঙ্গে আমাদের বরাবরের ব্যবস্থা অনুসারে INA-সংস্থার এইসব লোকজন এবং আগেকার যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে সন্তোষজনক আচরণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। (ব্রিটিশ, অস্ট্রেলিয়ান, নিউজিল্যাণ্ডার প্রভৃতির পক্ষে সময়টা খুব কঠিন ছিল।) মোহন সিং এক আঘাতেই INA-সংস্থাটি তো ভেঙে দিলেন, কিন্তু তা IIL-সংস্থা আবার গড়ে তুললেন—ভারতীয় সেনাদের এই বৃহৎ সংস্থাকে দেখাশোনার কাজ করতে। তাই প্রয়োজন ছিল সংস্থাটির পুনর্গঠন করা।

একজন নতুন কমাণ্ডিং অফিসার এবং একদল স্টাফ অফিসারকে নতুন করে নির্বাচিত করতে হলো। এটা দেখাও আবশ্যিক ছিল যে, ঐসব অফিসারদের প্রত্যেকেই আগ্রহী ভাবে IIL-সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীনে কাজ করতে ইচ্ছুক। দ্বিতীয়ত—এই নতুন নেতৃত্বে INA-সংস্থার বিপুল সংখ্যক অফিসার ও অন্যান্য লোকজনদের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হবে, যাতে কোনো অসুবিধা ইত্যাদি আবার মাথাচাড়া দিয়ে না ওঠে।

কে. পি. কেশব মেনন, যাঁকে আমরা সবাই খুবই শ্রদ্ধা করতাম, তিনি আমাদের পক্ষে খুবই কাজের হতে পারতেন; কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যের বিষয় তবুও তিনি ছিলেন মোহন সিং-এর পক্ষে, এবং তার ফলে ক্রমেই তিনি বিপদ স্বরূপ হয়ে উঠছিলেন। রাঘবন ছিলেন মোটামুটি ভাবে সহায়ক ধরনের। যদিও আমরা তাঁর কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট কোনো রকম সুপারিশ চাইনি, যেহেতু তিনি অ্যাকশান কাউনসিল থেকে পদত্যাগ করেছিলেন, তবুও আমরা তাঁকে উৎসাহিত করেছিলাম তাঁর মন বদল করার জন্যে, এবং মোহন সিং-এর প্রস্থানের পরে যাতে তিনি সহযোগিতার নতুন মনোভাব নিয়ে, আমাদের সঙ্গে থাকেন।

দুটি নাম বিবেচিত হলো INA সংস্থার নতুন নেতৃত্বের জন্যে : কর্নেল জে. কে. ভোঁসলে (Col. J.K. Bhonsle) এবং কর্নেল জি. ও. গিলানি (Col. G. O. Gilani)। রাসবিহারী, আমি এবং শিবরাম (যিনি আমার আগেই এসেছেন সিংগাপুরে, সেখানে প্রচার বিভাগ সংগঠন করতে) – সম্মত হলাম যে, ঐ দু'জন কর্নেলের মধ্যে কর্নেল ভোঁসলে হবেন অধিকতর উপযুক্ত। তিনিই INA-সংস্থার সবচেয়ে বেশি সংখ্যক অফিসার ও অন্যান্য লোকজনদের কাছেই গ্রহণযোগ্য হবেন। অফিসার হিসেবে তাঁর উচ্চস্তরের যোগ্যতা ছাড়া, তিনি সম্ভবত কমাণ্ডারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সিনিয়ার, এবং এটা সর্বদাই সবচেয়ে ভালো হয় INA-সংস্থার নেতৃত্বে এরকম একজন লোককে নিযুক্ত করলে।

আমরা জেনে খুশি হলাম যে, কর্নেল গিলানি নিজেও কর্নেল ভোঁসলের নির্বাচনের পক্ষেই ছিলেন, যেহেতু নতুন চিফ রাঘবনও সেরকমই ভেবেছিলেন। তবুও আর্মির আরো বহু ছোটখাটো বিভাগের সঙ্গে ঘরোয়া আলোচনার পরে (অন্যান্য অসামরিক নেতৃত্বের সঙ্গেও), কর্নেল ভোঁসলে নিযুক্ত হলেন INA সংস্থার নতুন কমাণ্ডিং অফিসার হিসেবে। তাঁকে সাহায্য করবেন একজন দক্ষ স্টাফ অফিসারদের একদল স্টাফ, যাঁদের মধ্যে ছিলেন কর্নেল এ. সি. চ্যাটার্জি (Col. A. C. Chatterjee), কর্নেল এ. ডি. লোগানাথন (Col. A. D. Loganathan), কর্নেল এম. জেড. কিয়ানি (Col. M. Z. Kiani) এবং কর্নেল এইসান খাদির (Col. Eisan Khadir,)। কর্নেল চ্যাটার্জি ও কর্নেল লোগানাথন ছিলেন বাহিনীর মেডিক্যাল অফিসার। কর্নেল খাদিরের ছিল প্রচার কর্মের অভিজ্ঞতা – তখন তিনি ছিলেন সায়গনে, এবং সেখান থেকে প্রায়ই বেতার সম্প্রচার করতেন সেখানকার ফ্রি ইনডিয়া রেডিও স্টেশন থেকে। কর্নেল কিয়ানির বিশেষ খ্যাতি ছিল একজন সাহসী অফিসার ও একজন জনপ্রিয় নেতা হিসেবে।

এই নতুন অফিসারদের দলটি তাঁদের নিজেদের মধ্যে সমতার এবং সুসম্পর্কের ভাবধারা বজায় রেখেছিলেন। কয়েকজন সেনা, যাঁরা যুদ্ধবন্দী ক্যাম্পে ফিরে গিয়েছিলেন INA-সংস্থার বিচ্ছিন্নতার কালে, তাঁরা আবার ফিরে এলেন এবং পুনর্গঠিত-INA-সংস্থায় যোগদান করলেন। 'হিকারি-কিকান' সংস্থার সঙ্গে কর্নেল ভোঁসলের কাজকর্ম ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ, এবং সংস্থার নষ্ট সুনাম আবার ফিরে এলো।

কয়েকজন লেখক ছিলেন, এস. এ. আয়ার (S. A. Iyer) তাঁদের অন্যতম, যিনি জনসাধারণকে এমন একটা ধারণা দিয়েছিলেন যে, INA-সংস্থা সৃষ্টি হয়েছিল সুভাষচন্দ্র বোসেরই একান্ত নিজস্ব সংগঠন হিসেবে। এই ধারণা ছিল বিভ্রান্তি-মূলক। INA-সংস্থা এই সর্বপ্রথম সেনাদের একটি শৃংখলাপূর্ণ, সুসংগঠিত সংস্থা

হিসেবে সংস্থাপিত হলো—IIL সংস্থার প্রেসিডেন্ট এবং দূরপ্রাচ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইনডিয়ান ফ্রিডম মুভমেন্ট-এর প্রধান রাসবিহারী বোসের দ্বারা। রাসবিহারী বোসকে দক্ষতার সঙ্গেই সাহায্য করতেন কর্নেল ভোঁসলে এবং তাঁর স্টাফ অফিসার বৃন্দ। সেটা ছিল ১৯৪৩ সনের গোড়ার দিক। নতুন নেতৃত্ব যেদিন ক্ষমতায় এলো, তখন সিটি অফিসের সামনের মাঠে বিশাল এক প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়, এবং রাসবিহারী বোস তার অভিবাদন গ্রহণ করেন INA-সংস্থার অফিসারবৃন্দ ও অন্যান্য লোকজনদের কাছ থেকে।

রাসবিহারী INA-সংস্থার অফিসারবৃন্দ ও অন্যান্য লোকজনদের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে বললেন, এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে যাতে, সংস্থাটি ঐক্যবদ্ধ ভাবে এবং দক্ষতার সঙ্গে তার কাজকর্ম চলে। রীতিমতো মর্যাদার সঙ্গেই এবং হিন্দুস্থানি ভাষায় তিনি সেই বিশাল জমায়েতের উদ্দেশে বললেন—পুনর্গঠিত INA-সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা, বিশেষত ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের স্বার্থে তাকে অগ্রগতি দান করার কাজে। তিনি পরিষ্কার করে বললেন যে, INA-সংস্থা হলো IIL-সংস্থার মিলিটারি শাখা—এবং যে IIL-সংস্থা হলো নীতি-নির্ধারণ ও নির্দেশ-দান, উভয় ক্ষেত্রেই সর্বোচ্চ সংস্থা।

রাসবিহারী যাই হোক, বাস্তবক্ষেত্রে INA-সংস্থা কার্যকরী সংগ্রামী শক্তি হিসেবে সংগঠনের পক্ষে সন্দেহবাহী ছিলেন। তাঁর যুক্তি ছিল খুবই সরল: এহেন সংস্থার জন্যে যা কিছু প্রয়োজন, তা অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ হিসেবে হোক আর সরবরাহ ও পরিসেবা হিসেবেই হোক, তা পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে জাপানিদের কাছ থেকে, এবং সেই ধরনের নির্ভরশীলতা সুখকর পরিস্থিতির কথা নয়। যেমন, ঐসব ভারতীয় সেনাদের সাহায্যে ভারতে সশস্ত্র অভিযানের মাধ্যমে, ভারতের মুক্তি প্রচেষ্টার জন্যে রাসবিহারীর কোনো অলীক মোহ ছিল না। যদি সেরকম কোনো সম্ভাবনা থাকতো, তাহলে তাঁর ব্রিটিশ-বিরোধী সন্ত্রাসবাদী পটভূমিকার ভিত্তিতে তিনিই সর্বপ্রথম সেই সুযোগ নিতেন। কিন্তু তিনি বাস্তব অবস্থা বুঝতে পেরেছিলেন। ভারতকে জাপানিদের কাছ থেকে পাওয়া অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে INA বাহিনীর দ্বারা মুক্ত করা যাবে না।

একই সঙ্গে, সম্পূর্ণত ভারতীয়দের দ্বারা পরিচালিত একটি উপযুক্ত সংস্থা সংগঠন করা আবশ্যিক ছিল, যেসব ভারতীয় সেনারা সিংগাপুর ও মালয়ের অন্যত্র আত্ম-সমর্পণ করেছিল তাদের দেখাশোনা করার জন্যে। এরকম একটি সংস্থার অস্তিত্বের একটা কল্যাণকর প্রভাব আছে ভারতীয় অসামরিক সম্প্রদায়ের নৈতিক অবস্থার ওপর। রাসবিহারীও দেখলেন, IIL এবং INA-সংস্থারও উপযোগিতার একটা ভূমিকা আছে—ভারতের মধ্যে স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে একটা বড় রকম নৈতিক সমর্থনের ক্ষেত্রে। যেহেতু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তাদের স্বদেশবাসীদের জন্যে একটা বড় আকারের সংস্থা আছে এবং তাদের পিছনে দৃঢ় সমর্থন আছে, তাই সেই

সংস্থা মাতৃভূমির মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাছে একটা শক্তিশালী প্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করতে পারে। এবং সেটাই তাদের শক্তিকে বিশাল ভাবে বৃদ্ধি করতে পারে।

রাসবিহারীর নীতি সুফলপ্রসূ হয়েছিল। IIL-সংস্থা জাপান গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে আশ্বাস পেয়েছিল যে, ইনডিয়ান আর্মির কর্মীবৃন্দকে অন্যান্য যুদ্ধবন্দীদের মতো কোনো রকম দৈহিক পরিশ্রমের কাজ করার প্রয়োজন হবে না। এটা কোনো রকম ছোটখাটো কৃতিত্বের কথা নয়। বেশ কিছু সংখ্যক INA কর্মী নানা ভাবেই সাহায্যকারী ছিলেন IIL-সংস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রের কাজকর্মের ব্যাপারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন প্রচার দফতরে শিবরামের অধীনে মূল্যবান পরিসেবার কাজ করেছেন: অনুবাদক, ঘোষক, টাইপিস্ট প্রভৃতির কাজ করে। এছাড়া আরেকটি সুবিধে ছিল, যেহেতু এর ফলে স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে ভারতীয়দের দৃষ্টিতে একটা সম মনোভাবের অবস্থার সৃষ্টি করেছিল—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ও ভারতের মধ্যে উভয় ক্ষেত্রেই। এবং ব্রিটিশ কমাণ্ডের অধীনে কর্মরত ভারতীয় সেনাদের মধ্যেও। সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতের পক্ষে জনমত লাভ করা ছিল IIL-সংস্থার পক্ষে একটা বড় রকমের কৃতিত্বের কথা।

২৩.

ব্যাংকক থেকে সিংগাপুর—
IIL সংস্থার স্থানান্তরণ

আগেই আমি বলেছি যে, ব্যাংকক থেকে সিংগাপুরে রাসবিহারীর বদলির পরে, IIL-সংস্থার হেড-কোয়ার্টার্স নতুন জায়গায় অর্থাৎ সিংগাপুরে স্থানান্তরণের কাজের দায়িত্ব দেওয়া হলো আমার ওপর। শিবরাম এবং এস. এ. আয়ারকে বিমানপথে সিংগাপুরে পাঠানো হয়েছিল, সেখানে গিয়ে রাসবিহারীর সঙ্গে পরামর্শ করে প্রচারের কাজকর্ম সংগঠন করার জন্যে।

সদর দফতর স্থানান্তরণের কাজের সঙ্গে নানান সমস্যা জড়িত ছিল। কিন্তু আমি শেসান-এর (Seshan) যোগ্য সহায়তা পেয়েছিলাম, তিনি ছিলেন কেরালার একজন কর্মঠ ব্রাহ্মণ যুবক—এবং লিগের অফিসে কাজ করছিলেন রাসবিহারীর সেক্রেটারি হিসেবে। এটা এক আনন্দদায়ক স্মৃতি যে, কর্নেল ভোঁসলে (Col.

Bhonsle) যখন কিছুকালের জন্যে মন্ত্রী ছিলেন স্বাধীন ভারতে, তখন শেসান তাঁর সঙ্গে কাজ করেছিলেন। শেসান সবদিক থেকেই একজন চমৎকার প্রকৃতির মানুষ।

ব্যাংকক থেকে মালয় সীমান্ত পর্যন্ত আমরা একটি প্যাসেনজার ট্রেনে ঘুরে বেড়ালাম ; এই ট্রেনের সঙ্গে ৫ খানি ওয়াগন যুক্ত করা ছিল এবং তাতে বোঝাই ছিল লিগের সম্পত্তি : আসবাবপত্র, অন্যান্য অফিস সরঞ্জাম, দলিলপত্র ইত্যাদি। শেসান এবং আমাকে দেওয়া হয়েছিল প্রথম শ্রেণীর অফিসার-কামরা, ঐ একই ট্রেনে। ব্যাংকক স্টেশন থেকে আমাদের যাত্রার পূর্বেই 'হিকারি-ককান' সংস্থার একজন সিনিয়ার অফিসার, আমাদের সঙ্গে ভ্রমণরত জাপানি অফিসারদের নির্দেশ দিয়েছিলেন — আমাদের বিষয়ে যত্ন নিতে এবং আমাদের সঙ্গের ওয়াগন বোঝাই লিগের মালপত্রের নিরাপত্তার বিষয়ে খেয়াল রাখতে।

লিগের জিনিসপত্রের মধ্যে ছিল প্রচুর পরিমাণে অর্থ। ব্যাংকক কারেনসির কোনো দাম নেই মালয়ে, এবং তাই 'হিকারি কিকান' সংস্থা আমাদের সাহায্য করেছিল ঐ ব্যাংকক কারেনসির সবটাই সিংগাপুর মিলিটারি এক্সচেনজ থেকে বদলে নিতে। আইপো (Ipoh) নামে এক স্থানে পৌঁছানোর আগে কোনো এক জায়গায় আমাদের সঙ্গের সমস্ত জিনিসপত্রাদি ও অফিস সরঞ্জামাদি নিয়ে অন্য একটি মালগাড়িতে গিয়ে উঠতে হয় আমাদেরও, যেহেতু সেখান থেকে আরো আগে যাবার মতো আর কোনো প্যাসেনজার ট্রেন ছিল না। এই মালগাড়ির একটি বগিতেই আমাদের ঘুমোতে হয়েছিল।

আমরা যখন পশুর খাঁচার মতো সংকীর্ণ সেই মালগাড়ির কামরা থেকে একটু দম নিতে বেরোলাম আইপো স্টেশনে, আমি লক্ষ্য করলাম বিরাট একদল কর্মী কাজ করছে সেখানে ; তাদের মধ্যে ছিল : মালয়ী, চীনা, ভারতীয় এবং সিংহলী। শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ কর্মীদেরই মনে হচ্ছিল ভারতীয় এবং সিংহলীর মতো। এটা একটা কৌতূহলজনক দৃশ্য : একজন জুনিয়ার জাপানি মিলিটারি অফিসার, সম্ভবত হাবিলদার স্তরের অথবা এমনকি তার নিচের পর্যায়ের, সেই স্টেশন প্লাটফর্মে কর্মরত সমস্ত কর্মীকেই লাইনে সারিবদ্ধ করে দাঁড় করিয়ে সবার পক্ষে করণীয় কিছু কর্তব্যকর্মের আদেশ দিচ্ছিলেন। আমি সেই সারিবদ্ধ কর্মীদের একজন যাঁকে কেরালার লোক বলে মনে হচ্ছিল, তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম — এসব কী হচ্ছে। আমি তাঁকে মালয়ালম ভাষায় বলেছিলাম এবং সানন্দে অবাক হয়ে শুনলাম তাঁর জবাব সেই একই ভাষায়, যার অর্থ হলো অবশ্যই আমি যা অনুমান করেছি ঠিক তাই। আমি জানতে পারলাম যে, প্লাটফর্মে দৈনন্দিন রুটিন মাফিক কাজের অংশ হিসেবে। সেই জাপানি হাবিলদার পর্যায়ের অফিসারটি আশা করেন প্রত্যেক কর্মীই লাইনে 'ফল্ ইন' করে দাঁড়াবে, ভারপ্রাপ্ত অফিসারের কমাণ্ড অনুসারে চলবে : জাপান সম্রাটের প্রতীকের প্রতি নত হয়ে অভিবাদন করে সম্মান প্রদর্শন করবে। কেউই

অবাধ্য হবার সাহস করেনি, যেহেতু তার ফল হবে তৎক্ষণাৎ কঠিন শাস্তি, এমনকি মুণ্ডচ্ছেদ পর্যন্ত।

এটা একটা শোচনীয় ব্যাপার। আমার মনে পড়ে গেল অতীতের এক অভিজ্ঞতার কথা, যে অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল কর্নেল হারা-র (Col. Hara) সঙ্গে হংকঙে থাকা কালে—বিশ্বযুদ্ধে জাপানের জড়িত হবার মাত্র কয়েকদিন পরে। তাঁরও এমনই ঔদ্ধত্য হয়েছিল যার ফলে তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, যা কিছু আমি করিনা কেন তা করা উচিত জাপান সম্রাটের নামে। অবশ্য এটা বিশেষভাবে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে কিছু নয়, কিংবা ইনডিয়ান ইনডিপেনডেন্স লিগের বিরুদ্ধেও কিছু নয়; কিন্তু এটা ছল তখনকার জাপানি অধিকৃত এলাকায় প্রচলিত জাপানি প্রশাসনের জলজ্যান্ত নিদর্শন। সম্রাটের পূজা অবশ্য জাপানি সেনাদের পক্ষে ছিল বাধ্যতামূলক, এবং তারা তা পালন করতো আন্তরিকভাবেই তাদের কর্তব্যের অংশ হিসেবে। কিন্তু তাদের করণীয় কর্তব্যের অন্যান্য ছোটখাটো অনুষ্ঠানগুলি ছিল জাপানি ব্যতীত অন্যান্য দেশীয়দের পক্ষেও এমনই বাধ্যতামূলক যাতে তারা বিশ্বাস করতে পারে যে, সেই আচরণ তাদের পক্ষেও অবশ্য প্রয়োজনীয়।

সেটাই ছিল সেকালীন জাপানি সেনাদের মনস্তত্ত্ব, তা উচ্চতর কর্তৃপক্ষের আদেশ হোক বা না হোক। এটা ছিল তাদের একটা বড দুর্বলতা যে, তারা ছিল একপেশে মনোভাব সম্পন্ন। তারা কখনোই, তাদের কাজের ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, তা বুঝতে পারে না। এটা ছিল তাদের সাধারণ মানসিকতার একটা বড় দিক, বিশেষত যুদ্ধকালীন সময়ে, যা ঘটনাক্রমে তাদের পতনেরও কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সিংগাপুরকে ইতিমধ্যেই জাপানিদের দ্বারা 'শোনান' Shonan) নামে নতুন ভাবে নামকরণ করা হয়েছে। 'শোনান' নামের গূঢ় অর্থ হলো: সম্রাট শোয়া-র (Emperor Showa, i.e Hirohito) দক্ষিণ রাজধানী। আমি 'হিকারি কিকান' সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করলাম এবং লিগের নতুন অফিস সংগঠনের কাজে লেগে পড়লাম। যে জায়গাটি আমাদের জন্যে নির্দিষ্ট করা হলো তা ছিল চ্যানসেরি লেন-এর ওপর, ম্যালকম রোড ছাড়িয়ে—'বুকিৎ তিন্না' Bukit Tinna) এলাকায়। 'হিকারি কিকান' সংস্থার অফিস আমাদের থেকে বেশি দূরে ছিল না। রাসবিহারী বোসের নিজের জন্যে একটা বাড়ি ছিল, এবং সেখানে অন্যান্য কয়েকজন বাসিন্দা ছিলেন যাঁদের মধ্যে ছিলেন কয়েকজন সিনিয়ার অফিসার। কর্নেল ভোঁসলে এবং তাঁর ব্যক্তিগত স্টাফদের জন্যে নির্দিষ্ট করা হলো কয়েকটি পৃথক বাংলো, রাসবিহারীর বাড়ির ঠিক পরেই। আমার সঙ্গে ছিলেন শিবরাম এবং আয়ার, এবং আমাদের বাড়িটি ছিল ঠিক হেড-কোয়ার্টার্সের অফিসের পরেই। সেটাই ছিল আমাদের কাজের পক্ষে সুবিধাজনক—যার জন্যে প্রকৃতপক্ষে প্রয়োজন ছিল চব্বিশ

ঘণ্টার মনোযোগ। শিবরাম শুনতেন বিদেশি স্টেশনের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ রেডিও ব্রডকাস্ট এবং তা থেকে প্রস্তুত করতেন সংবাদ প্রচারের মূলকপি—যা প্রচার করা হতো লিগের রেডিও স্টেশন থেকে।

রেডিও প্রচার ছাড়া, আমরা একটি সংবাদপত্র প্রকাশেরও কর্মসূচি নিয়েছিলাম চার ভাষায় প্রচারের: ইংরেজি, হিন্দি, তামিল ও মালয়ালাম। সংবাদপত্রটি মুদ্রিত হয়েছিল আমাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় অধীনে এবং তা ব্যাপকভাবে বিতরণ করা হয়েছিল সমগ্র মালয়ের বিপুল সংখ্যক ভারতীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। আমাদের রেডিও প্রচার ছিল দৈনিক প্রায় ছ'ঘণ্টা ব্যাপী এবং তার অন্তর্ভুক্ত ছিল প্রায় ১০টি ভারতীয় ভাষা, ইংরেজি ছাড়া। তা চলতো প্রায় সন্ধ্যার শেষ পর্যন্ত। শিবরাম কাজ করতেন একজন ট্রোজান-এর (Trojan) মতো, খুবই সামান্য কয়েকজন কর্মীকে নিয়ে। আমি প্রায়ই অবাক হয়ে যেতাম, কেমন করে তিনি তাঁর দুর্বল গড়নের শরীর নিয়ে, এমন বিপুল পরিমাণ কাজকর্ম তিনি সমাধা করতে পারতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত পাতলা গড়নের মানুষ এবং যা ছিল আরো সাংঘাতিক, তা হলো তিনি ছিলেন নিরামিষাশী। আমার মনে হয়, তিনি তাঁর কর্মশক্তির সবটাই পেতেন 'বিয়ার' পানের মাধ্যমে, যা তিনি প্রায়ই একটু একটু করে চুমুক দিতেন তাঁর প্রচণ্ড কাজের চাপের মধ্যেই। তিনি যেখানেই গেছেন সেখানেই জনপ্রিয় ছিলেন।

আয়ার-ও ভালো কাজ করতেন। কিন্তু তাঁর ছিল বদমেজাজ, ফলে অধিকাংশ স্টাফের কাছেই তিনি ছিলেন অসহ্য। ফলে কোনো কোনো সময়ে, আমাকে তাঁর অফিসে শান্তি স্থাপনের কাজ করতে হয়েছে—যাতে তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ পর্যন্ত না গড়ায়। আমার নানান ধরনের মাথাব্যথার মধ্যে একটা কর্তব্য ছিল এই অফিসের মধ্যে 'থারাবাদ করনাভন' এর (Tharavad Karana-an) দায়িত্ব পালন করা, অর্থাৎ সবাইকে নিয়ে যৌথ পরিবারের মতো চলা।

এ বিষয়ে একটা সাংঘাতিক অসুবিধে ছিল, লিগের অফিসের অফিসারদের প্রয়োজন মতো বিভিন্ন জিনিসপত্রের ন্যূনতম চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে দারুণ ঘাটতি। এখানে প্রকৃতপক্ষে চাল, চিনি ছিল না, এমনকি না ছিল শিবরামের জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে কোনো রকম 'বিয়ার'। সৌভাগ্যক্রমে আমার কয়েকজন ভালো জাপানি বন্ধু ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন মিঃ সুগাওয়ারা Mr. Sugawara), ইয়ামাগাতা অঞ্চলের মানুষ, এবং তিনি ছিলেন কাঠের নৌকোর ব্যবসায়ে নিযুক্ত; ৫০০ টন নিট ওজনের এই নৌকোগুলি ব্যবহার হতো জাপান ও সিংগাপুরের মধ্যে মাল পরিবহনের কাজে। তিনি এবং তাঁর সহযোগীরা যেভাবে হোক, আমাদের ভাণ্ডারে ঐসব প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ভালো মজুত রাখার ব্যাপারে সাহায্য করতেন বিনামূল্যে। তাছাড়া ছিলেন স্থানীয় বন্ধুরা, তাঁরাও সাহায্য করতেন। 'স্মাগলিং' (বা চোরাকারবার) হলো একটা খারাপ শব্দ, কিন্তু কোনো কোনো

সময়ে (আম অবশ্যই স্বীকার করবো), আমি ঐসবের সরবরাহ পেয়েছি কয়েকটি অনিয়মিত সূত্র থেকে, এবং সুগাওয়ারা-র নৌকোর মাধ্যমে। আমি জানতাম এটা কুপথ বা বদভ্যাস, কিন্তু সান্ত্বনা দিতাম নিজেকে এই বলে যে, উচ্চ নীতিসমূহ থেকে সামান্য বিচ্যুতি, যা আমার ব্যক্তিগত স্বার্থে নয় বরং যা সংগঠনকে চালু রাখার স্বার্থে প্রয়োজন, তা যুক্তিসংগত ভাবেই ভালো ঐ পরিস্থিতিতে।

আমাদের কাজের ধারাধরণ ছিল খুবই সরল। শিবরাম, আয়ার এবং আমি একত্রে মিলে রাসবিহারীকে দেখতে যেতাম রোজ সকালে, এবং ১৫-২০ মিনিট সেখানে থেকে তাঁর সঙ্গে আমাদের প্রস্তাবিত দৈনিক প্রচারকর্মের কর্মসূচি ব্যাখ্যা ও আলোচনা করতাম তাঁর অনুমোদনের জন্যে। একবার সেই কর্মসূচির মোটামুটি খসড়া তাঁর দ্বারা গৃহীত ও সমর্থিত হয়ে গেলে, সেই খসড়া অনুসারে অন্যান্য খুঁটিনাটি বিষয়ে রূপদানের কাজের ভার আমাদের তিনজনের ওপর ছেড়ে দিতেন। রাসবিহারীর ছিল আমাদের ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস। ঐ কর্মসূচির নীতি-গত দিক স্থির হতো আমার নির্দেশ অনুসারে। তাছাড়াও 'মর্স কোড' (morse code) মারফৎ সংবাদ সংগ্রহের এবং তদনুসারে আমাদের গৃহীত ব্যবস্থাদি প্রচারের সাংকেতিক লিপি নিয়ন্ত্রণের কাজকর্মের দায়িত্ব ছিল আমার ওপরেই ; কারণ আমার সঙ্গে দোমেই নিউজ এজেন্সির (Domei News Agency) ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল—যে সংস্থা এই সার্ভিস নিয়ন্ত্রণ করতো। এই সংস্থার একটি অফিস ছিল সিংগাপুরে, তার সঙ্গে সংযোগ ছিল টোকিওয় অবস্থিত তার হেড-কোয়ার্টার্স প্রশাসনের। এটা ছিল একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সংযোগপথ, বেশ যোগ্যতর, সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান হিসেবে খ্যাত অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (Associated Press) অথবা ইউনাইটেড প্রেস-এর (United Press) মতো যোগ্যতর যদি নাও হয়।

রাসবিহারী কর্তৃক পুনর্গঠিত এই INA সংস্থার একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, মালয়ের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে থাকা অসামরিক যুব সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে প্রচুর সংখ্যক অসামরিক স্বেচ্ছাসেবীকে এই সংস্থার মধ্যে অন্তর্ভুক্তি করণ। এবিষয়ে তাঁর একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা ছিল, অতীতে মোহন সিং ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পত্তির মতো আচরণ করে যে আতংক সৃষ্টি করেছিলেন সে বিষয়ে। রাসবিহারী বুঝেছিলেন, মালয়ের ভারতীয় বাসিন্দাদের মধ্য থেকে INA-সংস্থা স্বেচ্ছাসেবী নিয়োগ করার কাজটা একটা ক্রস-সেকশনের মাধ্যমেই করাটা গুরুত্বপূর্ণ। তাদের জন্যে ট্রেনিং ক্যাম্প স্থাপন করা হলো কুয়ালালামপুর, আইপো, সেরানবান এবং সিংগাপুরেও। তাছাড়াও আংশিক সময়ের মিলিটারি ট্রেনিং-এর ব্যবস্থাও করা হলো শক্তসমর্থ ভারতীয়দের জন্যে, যারা নিয়মিতভাবে পেশায় নিযুক্ত ছিল, কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনে সাহায্য করতেও প্রস্তুত ছিল। এছাড়া,

অফিসারদের জন্যেও একটা ইস্কুল খোলা হলো—কৌশলগত এবং অন্যান্য উচ্চ স্তরের ট্রেনিং দেবার জন্যে। প্রয়োজনীয় সাধারণ বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া ছাড়াও, এই ট্রেনিং-এর অঙ্গ হিসেবে প্রচারকর্মের দায়িত্বও ছিল আমারই সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণে।

আমরা প্রায়ই এইসব ক্যাম্প পরিদর্শনে যেতাম। এখানে এটা উল্লেখ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, এরকম কয়েকটি উপলক্ষে আমরা এন. রাঘবনের মূল্যবান সহযোগিতা পেয়েছিলাম, যিনি পেনাং থেকে আমাদের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করছিলেন। রাঘবন আমাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন আগ্রহের সঙ্গে এবং আন্তরিক ভাবেই, এমনকি যদিও তিনি লিগের অ্যাকশান কাউনসিল-এর সদস্যপদ গ্রহণ থেকে বিরত ছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে কে. পি কেশব মেনন একটু দূরে সরে রইলেন, এবং এমন একটা ধারণা দিলেন যাতে মনে হলো তিনি এখনো মোহন সিং এর দিকেই আছেন —যে মোহন সিং তাঁর দিক থেকে সবচেয়ে খারাপ কাজ করেছেন এই INA-সংস্থাকে নষ্ট করে দিতে, এবং স্বভাবতই একাধারে ভারতীয় সেনাদের ও ভারতীয় সম্প্রদায়ের মঙ্গলের কাজকর্মকে অসুবিধাজনক ভাবেই গোলমেলে করে দিতে। আমাদের অনেকেই অত্যন্ত দুঃখ পেলাম মেনন কর্তৃক আমাদের সঙ্গে অসহযোগিতার এই মনোভাব দেখে, এমনকি রাঘবন কর্তৃক শুরুতে গৃহীত বিরোধিতার মনোভাব ত্যাগ করে পরবর্তী কালে আমাদের সঙ্গে সক্রিয় সমর্থনের মনোভাব গ্রহণ করার পরেও।

আমাদের IIL-সংস্থার আরো কয়েকজন বন্ধু ছিলেন যাঁরা মনে করতেন, মোহন সিং-এর প্রতি কেশব মেননের সমর্থনের কারণ হলো তাঁর এই ধারণা যে, অ্যাকশান কাউসিল-এর সদস্য হিসেবে তাঁর নির্বাচন সম্ভব হচ্ছিল প্রাথমিক ভাবেই INA অফিসারদের ভোটের ফলে। সেটা ছিল মোহন সিং-এর দিক থেকে একটা দারুণ অতিরঞ্জিত ঘটনা, যদি তা আগাগোড়াই একটা ভুল নাও হয়। প্রকৃতপক্ষে, বাস্তব ক্ষেত্রে কেশব মেননের পক্ষে মোহন সিংকে ধন্যবাদ দেবার মতো সেরকম 'কিছুই ছিল না'।

যাই হোক, হেড-কোয়ার্টার্স প্রচুর সাহায্য পেয়েছিল মিঃ ইয়েলাপ্পার (Mr. Yellappa) কাছ থেকে, ইনি ছিলেন IIL-সংস্থার সিংগাপুর শাখার প্রেসিডেন্ট। এক সময়ে তাঁর একটা বিচিত্র সমস্যা দেখা দেয়। তখন আমি তাঁর অফিসেই ছিলাম কোনো কাজ উপলক্ষে, এবং দেখলাম তিনি দারুণ উত্তেজনার ও বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছেন। তখন তিনি কোনো বিষয়েই বিশেষভাবে মনোযোগ দিতে পারছিলেন না, এবং তিনি হতবুদ্ধি হয়ে ছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, গোলমালটা কিসের। তিনি আমাকে বললেন যে, স্থানীয় মিলিটারি ইউনিটের কয়েকজন কর্মী এসে তাঁকে বলেছেন, ৩ হাজার ভারতীয়কে জড়ো করতে হবে এবং তাদের যেতে হবে 'শোনান জিনজা' (Shonan Jinja) অর্থাৎ জাপানি শিন্টো মন্দিরে উপাসনা করতে—যে মন্দিরটি জাপানি আর্মি তৈরি করেছে সিংগাপুরের উপান্ত অঞ্চলে।

তাদের অবশ্যই সেই মন্দিরে পৌঁছতে হবে পরদিন সকাল ৪ টায়। স্থানীয় অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতিও ঐ একই নির্দেশ ছিল। চীনা সম্প্রদায়ের প্রতি নির্দেশ ছিল, অন্যান্য সম্প্রদায়ের থেকে অনেক বেশি সংখ্যক লোক পাঠানোর জন্যে।

আমি অবাক হলাম এবং মিঃ ইয়েলাপ্‌পাকে বললাম, জাপানি অফিসাররা তাঁকে যাই বলুন এবং তাঁরা যেই হোন না কেন, তাঁর সেরকম কিছু করা উচিত হবে না। আমি তাঁকে বললাম, ব্যাংকক থেকে সিংগাপুরে যাবার পথে আইপো-তে আমি যা দেখেছি সেকথা। মিঃ ইয়েলাপ্‌পা অবশ্যই জাপানি আর্মির কর্মপদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে জানেন না, কিন্তু আমি সে বিষয়ে ভালোভাবেই পরিচিত ছিলাম। আমি অনুমান করতে পারি, এইভাবে লোক জড়ো করার (mobilisation) চিন্তা অবশ্যই কোনো জুনিয়ার অফিসারের মস্তিষ্কপ্রসূত লোক-দেখানো চেষ্টা করা মাত্র।

মিঃ ইয়েলাপ্‌পা বিস্মিত হয়ে গেলেন এবং আরো চিন্তিত হলেন, তাঁকে যে 'অর্ডার' বা আদেশ দেওয়া হয়েছে, সে বিষয়ে আমার আপত্তি প্রকাশ ও বাধা দেওয়ায়। তিনি আশংকা করলেন যে, কেবলমাত্র তিনিই নন, ভারতীয় সম্প্রদায়ও হয়তো অসুবিধেয় পড়বেন যদি তাঁকে প্রদত্ত সেই আদেশ ঠিকমতো পালিত না হয়; মিলিটারি কর্তৃপক্ষ এমনকি তাঁর মুণ্ডচ্ছেদ করতে পারে। আমি নিজের মনে হেসে উঠলাম এবং আমার বন্ধুকে বললাম, চিন্তার কিছু নেই। যদি কোনো আর্মির লোক অথবা অন্য যে কেউ আসে তাঁর মুণ্ডচ্ছেদ করতে তবে আমার মুণ্ডই তাঁকে কাটতে হবে সর্বাগ্রে। এই কথাতেই বাহ্যত মিঃ ইয়েলাপ্‌পাকে নিশ্চিন্ত মনে হলো, যদিও তাঁর সমস্ত মুখখানাই চিন্তাগ্রস্ত দেখাচ্ছিল। আমি আমার বক্তব্যে অটল রইলাম, এবং বারবার তাঁকে বললাম যে, ভারতীয় সম্প্রদায়ের কাউকেই সেই 'শোনান জিনজা' মন্দিরে উপাসনা করতে যেতে বলা উচিত হবে না, ঠিক এই কারণেই যে, কোনো একজন এসে তাঁকে বলে গেছেন ৩ হাজার লোক পাঠাতে হবে। আমি তাঁকে বললাম যে, এটা কোনো ভারতীয় মন্দির নয়, এবং কোনো দায়িত্বশীল জাপানিই ঐ রকম আদেশ জারি করবেন না, যেরকম অর্ডারের কথা তিনি এখন বলছেন। এটা অবশ্যই কোনো গুরুত্বহীন সাধারণ কর্মচারির মনগড়া কার্যকলাপ এবং তাকে উপেক্ষা করাই উচিত।

কোনো ভারতীয়ই সেখানে যায়নি। কিন্তু খবর রটে গেল যে, আমিই মিঃ ইয়েলাপ্‌পাকে পরামর্শ দিয়েছি সেই 'নির্দেশ'কে উপেক্ষা করতে। আমি যেমন অনুমান করেছিলাম ঠিক তাই, কয়েকজন নিম্নস্তরের কর্মীই এভাবে চেষ্টা করছিল তাদের গুরুত্বহীন অস্তিত্বকে লোকসমক্ষে তুলে ধরতে। এই ঘটনা লোকে ভুলে গেল। মিঃ ইয়েলাপ্‌পা তখন বলতে শুরু করলেন যে, আমি একজন 'রহস্যময়' ('mysterious') ধরনের মানুষ। একথা স্মরণ করা যেতে পারে যে, এম. শিবরাম তাঁর বইতেও (Road to Delhi) আমার কথা উল্লেখ করেছেন

একজন 'রহস্যময় মানুষ' হিসেবে। এই প্রবচনের সূচনাকারী প্রকৃতপক্ষে সিংগাপুরের সেই মিঃ ইয়েলাপ্পা।

শিবরাম অবশ্যই যথাসময়ে জেনেছিলেন যে, আমার বিষয়ে কোনো 'রহস্য' বা যাদু ছিল না। ঘটনা হলো এই যে, উচ্চস্তরের জাপানি কর্তৃপক্ষ মহলে আমার সদুদ্দেশ্য ও আন্তরিকতায় সম্পূর্ণ আস্থা ছিল। নিজেরা জাতীয়তাবাদী হিসেবে, তাঁরা সমপর্যায়ের অন্য একজনের মধ্যেকার জাতীয়তাবাদকেও স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ভাব থাকার জন্যে, আমাকে গোলামের মতো হীন বশ্যতা স্বীকার করতে হয়নি। দু'জন ব্যক্তির মধ্যে সৎ ও আন্তরিকতাপূর্ণ মতভেদ থাকতে পারে, এবং তা সত্ত্বেও পরস্পরের মধ্যে সুসম্পর্ক থাকতে পারে, অবশ্য যদি পরস্পরের প্রতি প্রকৃত মর্যাদাবোধ ও শুভেচ্ছার ভাব থাকে। এটাই ছিল মূল ভিত্তি, যে ভিত্তির উপরে নির্ভর করেই আমি সর্বদাই আমার জাপানি বন্ধুদের মধ্যেকার বিভিন্ন পদমর্যাদা যুক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে কাজকর্ম করেছি—তা অসামরিক বা সামরিক, যাই হোক না কেন। আমি বিশ্বাস করি সেটাই হলো সম্পর্কের ক্ষেত্রে সঠিক ভিত্তি, এবং জাপানি পক্ষও সর্বদাই সেই ভিত্তিকে তদনুসারে স্বীকৃতি দিয়েছে।

পুনর্গঠিত INA সংস্থার ক্ষেত্রে রাসবিহারীর একটা বড় দান হলো, সংস্থার অফিসার ও কর্মীদের মধ্যে ভারতের বৈচিত্র্য সত্ত্বেও মূলগত ঐক্যের ধারণার বিষয়ে বারবার সেকথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া। INA-সংস্থার সদস্যদের মধ্যে ছিল ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মানুষ এবং তাদের ধর্ম আচারপ্রথা, রীতিনীতি, এবং পটভূমিও ছিল বিচিত্র। এদেশ বিচিত্র উপাদানে গঠিত গোষ্ঠীর মধ্যে রাসবিহারী, সর্বপ্রকার পার্থক্য সত্ত্বেও পরস্পরের প্রতি সচেতনতা ও শ্রদ্ধার ভাব জাগাতে সমর্থ হয়েছিলেন যে, ভারতবাসী মাত্রেই সকলেই সমান এবং সকলেই একই মহান দেশের অধিবাসী ; তাই সকলেরই কেবল একই দায়িত্ব নয়, তাদের একই শক্তি-সামর্থ্য আছে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, ভারতে 'সামরিক' জাতি এবং 'অসামরিক' লোক বলে কিছুই নেই। এসব হলো গল্পকথা, ব্রিটেন কর্তৃক ইচ্ছাকৃত ভাবেই চালু করা হয়েছে তার সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য ও মতলবকে আরো এগিয়ে নেবার জন্যে। সমান সুবিধা-সুযোগ দিলে, যে কোনো ভারতীয়ই যুদ্ধে বা অন্য কাজে অন্য যে কোনো লোকের মতো ভালো ফল করতে পারে। এক্ষেত্রে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব বা পশ্চিমের কোনো প্রশ্ন নেই। এক্ষেত্রে রাসবিহারীর আবেদন বা পরামর্শের ভালো ফল হয়েছিল, কেবলমাত্র INA অফিসার ও কর্মীদের নৈতিক ক্ষেত্রের ওপরেই নয়, বরং সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমস্ত ভারতীয়দের ওপরেও, বিশেষত মালয়ে, যেখানে ভারতীয় বাসিন্দাদের অধিকাংশই হলো দক্ষিণ-ভারতের অধিবাসী।

২৪.

সুভাষ-যুগ এবং দ্বিতীয় আই-এন-এ

ভারতে ও ইংল্যাণ্ডে সুভাষচন্দ্র বোসের প্রথম জীবন সম্পর্কে, এবং উপনিবেশবাদী ব্রিটিনের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতার স্বার্থে সংগ্রামের জন্যে সম্মানজনক ইনডিয়ান সিভিল সার্ভিস উপাধি বর্জন করা ইত্যাদি বিষয়ে ইতিমধ্যেই বাজারে যে বিপুল সংখ্যক বইপত্র পাওয়া যায়, তার সঙ্গে আরো কিছু যোগ করা, এই অধ্যায়ে আমার উদ্দেশ্য নয়। একথা সুবিদিত যে, সুভাষচন্দ্র ছিলেন একজন মহান স্বদেশপ্রেমিক, এবং তিনি বেশ কয়েক বছর কাজ করেছিলেন গান্ধীজী, জওহরলাল নেহরু ও ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের সঙ্গে একযোগে— যতদিন না তাঁদের সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শগত সাংঘাতিক মতপার্থক্য দেখা দেয়।

ভারত থেকে তাঁর নাটকীয় অন্তর্ধান উপকথার মতোই। সার্থক ছদ্মবেশে তাঁর বেপরোয়া দেশত্যাগের কথা বিশদ ভাবেই প্রকাশিত হয়েছে। কলকাতায় গৃহবন্দী থাকা অবস্থায় পাহারারত ব্রিটিশ-ভারতীয় পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে তিনি 'জিয়াউদ্দিন' ছদ্মনামে প্রথমেই চলে যান আফগানিস্তানে। পরে তিনি বার্লিনে যান সমরকন্দ ও মসকো হয়ে—সিগনর অরলান্ডো মাজোত্তা (Signor Orlando Mazotta) ছদ্মনামে, এবং ভুয়ো ফটোগ্রাফ সহ জাল ইটালিয়ান কূটনৈতিক পাশপোর্ট নিয়ে।

আমার বক্তব্য সীমাবদ্ধ প্রকৃতির. দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাসবিহারী বোস কর্তৃক ও আমার সক্রিয় সহযোগিতায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সৃষ্টি ও সংগঠন, এবং তার নেতৃত্ব রাসবিহারীর অসুস্থতার কালে তাঁর হাত থেকে সুভাষচন্দ্রের হাতে অর্পণ ইত্যাদি।

ইনডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হবার পরে, সুভাষচন্দ্র তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক দল গড়ে তুললেন ভারতে, নাম তার 'ফরওয়ার্ড ব্লক' (Forward Block), যা সম্ভবত গড়ে উঠলো কংগ্রেসের মূল সংগঠনের মধ্য থেকে বামপন্থী গোষ্ঠী হিসেবে। এই গোষ্ঠীর মধ্যে তাঁর অনুগামীর সংখ্যা যথেষ্ট ছিল না, এবং তিনি নিজেকে প্রকৃতপক্ষে রাজনীতিগত ভাবেই নিঃসঙ্গ বলে মনে করলেন। তাঁর মতো ক্ষমতাশালী ব্যক্তিত্বের পক্ষে এটা খুবই স্বাভাবিক যে, ভারতের স্বাধীনতার জন্যে তিনি বিপ্লবী পন্থাই গ্রহণ করবেন ভারতের বাইরে থেকে কার্যকলাপ চালিয়ে, এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে কোনো বিদেশি কর্মক্ষেত্র বেছে নিয়ে সেখানেই

চলে যাবেন। এক্ষেত্রে কয়েকজন লেখক আছেন যাঁরা তাঁর সঙ্গে তুলনা করতে চেষ্টা করেছেন—সান ইয়াৎসেন, ডি' ভ্যালেরা, গ্যারিবালডি ও মাসারিক প্রমুখের। আমি অবশ্যই স্বীকার করি যে, আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই সেরকম কোনো তুলনা করতে। ভারতের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ পৃথক।

সুভাষচন্দ্র নিঃসন্দেহে একজন মহান দেশপ্রেমিক এবং নিবেদিতপ্রাণ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের শ্রেষ্ঠ একজন। কিন্তু যে কেউই গান্ধীজীর নেতৃত্বের সঙ্গে, কিংবা তাঁর অনুগামী যথা জওহরলাল নেহরু, বল্লভভাই প্যাটেল এবং তৎকালীন কংগ্রেসের অন্যান্যদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হোন, তিনি প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে বেশি দূরে যেতে পারেন না। বৃহত্তর জনসাধারণের পক্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিনিধিত্ব কংগ্রেসই করেছিল।

যা হবার তাই হলো—সুভাষচন্দ্র বার্লিনে ছিলেন প্রায় বৎসরাধিক কাল, এবং দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ সময়ে ভারতের জন্যে যথার্থ কিছু অর্জন করতে তিনি ব্যর্থ হলেন। তিনি চেষ্টা করেছিলেন জার্মান ও ইটালিয়ানদের হাতে যুদ্ধবন্দী ভারতীয় সেনাদের মধ্য থেকে একটি আর্মি সংগঠন করতে, কিন্তু ব্যর্থ হন। হিটলারের প্রাধান্যই ছিল সব, অথবা প্রায় সব, অন্তত ইয়োরোপ সম্পর্কে। হিটলার কদাচিৎ ভারত সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন। সুভাষচন্দ্র জার্মানিতে গিয়েছিলেন অনেক উচ্চাশা নিয়ে, কিন্তু দারুণভাবে হতাশ হয়েছিলেন। বলা হয়, তাঁকে বহুদিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল, এমনকি হিটলারের সঙ্গে কেবল সাক্ষাৎ করতেই। জার্মান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর অধিকাংশ যোগাযোগই ছিল অতএব অপেক্ষাকৃত নিম্ন পর্যায়ে। তিনি দেখলেন যে, বার্লিন থেকে অন্তত এক সংক্ষিপ্ত রেডিও প্রোগ্রামের অনুমতি লাভ ব্যতীত, জার্মানিতে তাঁর থাকার কোনো কার্যকরী সার্থকতা নেই।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনা করতে যে পরিস্থিতিতে জাপানে সুভাষচন্দ্রের উপস্থিতি, সে বিষয়ে নানা কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে। এই সমস্ত কাহিনীর যেগুলি আমার নজরে এসেছে, তার প্রতিটিই আনুমানিক বা মনগড়া। কাহিনীগুলি হয় সম্পূর্ণত মিথ্যা, কিংবা অর্ধসত্য নিয়ে রচিত। তাদের মধ্যে কয়েকটি হয়তো প্রকৃত অভিজ্ঞতা থেকে লিখিত, কিন্তু অন্য কতকগুলি স্বেচ্ছাকৃত বিকৃতি হতে পারে।

মোহন সিং বলেছেন যে, 'জাপানিদের সঙ্গে তাঁর নিয়মমাফিক আলোচনার পরে' তিনিই তাঁদের অনুরোধ করেছিলেন সুভাষচন্দ্রকে দূরপ্রাচ্যে নিয়ে আসতে।' (Soldiers' Contribution to Indian Independence, p. 228.) এটা হলো একটা মজাদার বিবৃতি মাত্র। তিনি বলেন নি যে, কার সঙ্গে ঐ বিষয়ে তিনি আলোচনা করেছিলেন। আমার জানত, এ বিষয়ে 'কখনোই' কোনো রকম রীতি-মাফিক আলোচনাই হয়নি—মোহন সিং ও 'জাপানি' কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। জাপানি লিয়াজোঁ গ্রুপ সর্বদাই এ বিষয়ে জোর দিত যে, ভারতীয় বিষয়ে যে কোনো রকম

অফিসিয়াল আলোচনাদি করতে হবে কেবলমাত্র ইনডিয়ান ইনডিপেনডেন্স লিগের প্রেসিডেন্ট রাসবিহারী বোস, অথবা তার চিফ লিয়াজোঁ অফিসার, অর্থাৎ আমার সঙ্গে, এবং অন্য কারো সঙ্গেই নয়। যদি মোহন সিং এ বিষয়ে আলোচনা করতেন ফুজিওয়ারার সঙ্গে, যে আলোচনা কোনোক্রমেই 'রীতিমাফিক' হতে পারে না, ফুজিওয়ারা তাহলে সে বিষয়ে কোনো খবরই পাঠাতেন না জাপান গভর্নমেন্টের কাছে : তিনি সাহসই করতেন না তা করতে, কেননা এ বিষয়ে তিনি তা করার অধিকারী ছিলেন না।

সে যাই হোক, মোহন সিং তাঁর বইতে সম্ভবত না বুঝে যেসব কথা বলেছেন, তাতে তাঁর নিজের প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা কৌতূহলোদ্দীপক আলোকপাত করেছেন। এটা পড়তে খুবই আশ্চর্য লাগে যে, ১৯৪৩ ডিসেম্বরে (?) যখন তিনি গৃহবন্দী, অথচ বলেছেন তিনি সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে একবার দেখা করতে পেরেছিলেন এবং সুভাষচন্দ্র তাঁকে প্রশ্ন করেন, তিনি ভারতে সুভাষচন্দ্রকে তাঁর নেতা হিসেবে মেনে নিতে রাজী কিনা ; জবাবে তিনি বলেছিলেন 'তিনি সেই অবস্থায় তা পারেন না'। (Soldiers' Contribution to Indian Independence, p. 264) ভারতে তাঁর নায়ক ছিলেন জওহরলাল নেহরু যাঁর 'গ্লিমপ্‌সেস অফ ওয়ার্লড হিসটোরি' 'অটোবায়োগ্রাফি' ইত্যাদি (Glimpses of World History, Autobiography, etc.) ইত্যাদি বইপত্র তিনি পড়েছিলেন। স্থূলবুদ্ধি হিসেবে তিনি যা বলেছেন তার অর্থ একমাত্র এই হতে পারে, যখন মোহন সিং তাঁর নেতা হিসেবে সুভাষচন্দ্রকে মেনে নিচ্ছেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় (জাপানি দখলের কালে, মনে করা যাক) তিনি তাঁর আনুগত্য বদল করবেন, তাঁকে বেকায়দায় ফেলবেন, এবং নেহরুর দিকে চলে যাবেন যে মুহূর্তে তিনি ভারতে যেতে পারবেন। ইচ্ছাকৃত দু'মুখো নীতির কী স্বীকৃতি। সুবিধাবাদ কোনো কোনো লোকের সম্ভবত অভ্যেস হতে পারে। এটা আশ্চর্যের নয় যে, মোহন সিং যাকে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ বলে দাবি করছেন, সেটা হয়তো সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর শেষ সাক্ষাৎও হতে পারে।

মালয়ালামে একটি প্রবাদ আছে : পালম্ কতক্কুমপোল নারায়ণা ; পালম্ কতন্নেতচাল কুরায়ণা '(Palam Katakkumpal Narayana, Palam Kakannetchal kurayana)। প্রবাদটিতে বলা হয়েছে : একটি লোক বিপজ্জনক একটি সেতু পার হচ্ছে ; যখন পার হচ্ছে, সে তখন খুব ধার্মিক, এবং প্রার্থনা করছে প্রভু নারায়ণের (কৃষ্ণের) কাছে, কিন্তু যে মুহূর্তে সে সেতুর অপর পারে পৌঁছে গেল বিনা বিপদে, তখন সে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন প্রকৃতির লোক। সংক্ষেপে (সঠিক বা আক্ষরিক অনুবাদ নয়), একথার অর্থ হলো এইরকম : (ক. যখন সেতু পার হচ্ছে —হে ঈশ্বর, আমাকে রক্ষা করো ; (খ. নিরাপদে সেতু পার হবার পরে) —তুমি গোল্লায় যাও!

প্রকৃত কথা হলো, সুভাষচন্দ্রকে 'বিকল্প নেতা' হিসেবে আনার প্রস্তাবটা আমারই চিন্তাপ্রসূত, ১৯৪২ জানুয়ারির গোড়ার দিকে। এই প্রস্তাব করেছিলাম জাপান গভর্নমেন্টের যুদ্ধ-মন্ত্রকের সঙ্গে আমার লেখা চিঠিপত্রের একটিতে, জেনারেল তোজোর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে, শাংহাই থেকে,—তখন সেখানে আমি সিংকিং থেকে গিয়ে পৌঁচেছি ১৯৪১ ডিসেম্বরে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের যোগদানের ঠিক পরেই।

আমার সেই প্রস্তাবের সারকথা হলো যে, জাপানে ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সর্বময় নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা তখনি রাসবিহারীর হাতে নেওয়া উচিত; কিন্তু যুদ্ধের সময়ে যে কোনো রকম আকস্মিক ঘটনার ক্ষেত্রে, একজন 'বিকল্প নেতা'র কথা মনে রাখা সর্বদাই স্বাভাবিক বিচক্ষণতার কাজ। তৎকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এমন একজন লোকেরই প্রয়োজন ছিল যিনি অবশ্যই ইতিমধ্যে ভারতের বাইরে আছেন, কেননা তখন কোনো জাতীয় নেতা যেমন গান্ধীজী বা জওহরলাল নেহরুর পক্ষে ভারতের বাইরে আসা অনিবার্যভাবেই অসম্ভব ছিল। সুভাষচন্দ্র বোস ইতিমধ্যেই জার্মানিতে ছিলেন বলে বিকল্প নেতা হিসেবে তিনি ছিলেন অনিবার্য, প্রকৃতপক্ষে একমাত্র বিকল্প, সেই পরিস্থিতিতে পছন্দসই দু'নম্বর (আকস্মিক ক্ষেত্রে) ব্যক্তি হিসেবে উপযুক্ত।

যে মুহূর্তে আমি শাংহাই থেকে টোকিওতে পৌঁছলাম এবং রাসবিহারীর সঙ্গে দেখা করলাম, আমি তাঁকে আমার প্রস্তাবের কথা বললাম। তিনি সম্পূর্ণভাবেই তা অনুমোদন করলেন।

জাপান গভর্নমেন্ট সেই প্রস্তাব বার্লিনে তাঁদের মিলিটারি অ্যাটাশের কাছে পাঠিয়ে দিলেন, এবং তাঁকে সুভাষচন্দ্র বোসের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রেখে চলতে নির্দেশ দিলেন। যে কোনো ইতিবাচক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে মিলিটারি অ্যাটাশে যেন টোকিও থেকে যথাসময়ে পরবর্তী নির্দেশ পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। এটা আমার ও রাসবিহারী বোসেরও জানা ছিল যে, জাপানি মিলিটারি অ্যাটাশে (কর্নেল ইয়ামামোতো) সেই অনুসারে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সর্বদাই যোগাযোগ রেখে চলছিলেন, কিন্তু পরবর্তী কোনো ব্যবস্থা তিনি হাতে নেন নি। এটাই হলো প্রকৃতপক্ষে সেই পরিকল্পনার কথা যে, কোনো এক তারিখে সুভাষচন্দ্রকে আমন্ত্রণ জানানো হতে পারে—পূর্ব-এশিয়ায় ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্বভার গ্রহণ করতে। এ বিষয়ে অন্য সমস্ত বিবরণই অসত্য বলে বর্জন করাই উচিত।

১৯৪৩ সনের গোড়ার দিকে, রাসবিহারীর স্বাস্থ্য স্পষ্টতই ভেঙে পড়ে। প্রবল কাজের চাপ এবং চরম উত্তেজনার ফলেই তাঁর স্বাস্থ্যের ঐ সাংঘাতিক অবস্থা হয়। তিনি ভুগছিলেন বহুমূত্ররোগে বহুদিন যাবৎ এবং তা বেড়ে যায় কাজ ও উত্তেজনার

প্রবল চাপের জন্যে। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁকে ফুসফুসের টিউবারকুলোসিস রোগেও ধরেছিল। ১৯৪৩ সনের গোড়ার দিকে তিনি দারুণ দুর্বল হয়ে পড়লেন।

কিছুকালের জন্যে রাসবিহারী জানতেন না যে, তাঁর মধ্যে টিবি রোগ দেখা দিয়েছে। ডাক্তার আওকি (Dr. Aoki) নামে জাপানি আর্মি মেডিক্যাল কর্পস-এর একজন তরুণ মেডিক্যাল অফিসারকে 'হিকারি কিকান' সংস্থায় পাঠানো হলো; তিনি আবিষ্কার করেন যে, প্রকৃতপক্ষে রাসবিহারী ভুগছেন সেই ভয়ংকর রোগের অসুস্থতায়। এটা ছিল সাংঘাতিক এক পরিস্থিতি। রাসবিহারী তাঁর দুশ্চিন্তার কথা আমাকে বলেন ডাক্তার কর্তৃক রোগ নির্ণয়ের ঠিক পরেই। অতএব পূর্ব-এশিয়ায় সুভাষচন্দ্রকে আনার ব্যাপারে ইতিবাচক কিছু করার প্রয়োজন তাই সত্যিই জরুরি হয়ে পড়লো।

আমাদের প্রিয় নেতার সাংঘাতিক অসুস্থ অবস্থার কথা শুনে আমি দারুণ ভাবে নাড়া খেলাম। কিন্তু বাস্তবের মুখোমুখি তো হতেই হবে। আমি তৎক্ষণাৎ 'হিকারি-কিকান'এর দিকে রওনা হলাম সংস্থার তরফ থেকে টোকিওস্থ জাপানি মিলিটারি হাইকমাণ্ডের কাছে অনুরোধ জানাতে যে, একটা কিছু উপায় চিন্তা করে এবং জার্মানদের সঙ্গে পরামর্শ করে যাতে সুভাষচন্দ্রকে জাপানে আনা যায় এবং তারপর সেখান থেকে যথাশীঘ্র সম্ভব সিংগাপুরে আনা যায়, তাঁর ব্যবস্থা করা দরকার।

পরিস্থিতির গুরুত্ব স্বীকার করে, 'হিকারি-কিকান' সংস্থা একটা জরুরি বার্তা পাঠালো টোকিওয়। জরুরি পরামর্শ হলো জাপান গভর্নমেন্ট ও হিটলারের প্রশাসনের মধ্যে। সুভাষচন্দ্রকে জাপানে পাঠানোর পদ্ধতি-প্রকরণ নিয়ে প্রায় দুই বা তিন মাস ধরে, আলোচনা চললো যৌথভাবে – বার্লিনে জাপানি অ্যামবাসাডার (জেনারেল ওশিমা, Gen. Oshima) এবং জার্মান বিশারদদের মধ্যে। এই ঠিক হলো যে, জার্মান নেভি একটা সাবমেরিনের ব্যবস্থা করবে ভারত মহাসাগরের কোনো এক নির্দিষ্ট স্থান পর্যন্ত যাত্রাপথের জন্যে – সেখান থেকে জাপানি কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব থাকবে সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে জাপানে আসার ব্যাপারে।

এটা ছিল একটা ঐতিহাসিক যাত্রা। জার্মান নেভি ও জাপানি নেভির মধ্যে সমন্বয়ের এক বিরাট ঘটনা; তা সত্ত্বেও এটা ছিল চরম এক বিপজ্জনক ব্যাপার – অর্থাৎ সুভাষচন্দ্রের দিক থেকে দৈহিক সাহসিকতার দারুণ এক ঘটনা। তাঁর সঙ্গে ভ্রমণসঙ্গী হিসেবে ছিলেন দু'জন সাথী: আবিদ হাসান এবং স্বামী। জার্মান ইউ-বোট (U-boat) যে পথ ধরে তা হলো – ইংলিশ চ্যানেল ও বে-অফ বিসকে হয়ে এবং তারপরে পশ্চিম আফরিকা বরাবর আটলান্টিক মহাসাগর হয়ে এবং দক্ষিণ আফরিকা পাড়ি দিয়ে ভারত মহাসাগরের পথে মাদাগাসকার দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণ দিকে একটা কেন্দ্রে আসার লক্ষ্যে। সেখানে সুভাষচন্দ্রকে হস্তান্তর করা হলো দারুণ বিপজ্জনক দায়িত্বের মধ্যে এক জাপানি সাবমেরিনের মধ্যে – যে সাবমেরিন তাঁকে

নিয়ে এলো সুমাত্রায়—যেখানে তিনি নামলেন ১ মে ১৯৪৩ তারিখে। তারপর ১৬ মে তারিখে তিনি বিমানযোগে পৌঁছলেন টোকিওতে।

টোকিওতে কিছুদিন থাকার পর এবং জেনারেল তোজোর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকারের পরে, সুভাষচন্দ্র সিংগাপুরে পৌঁছলেন ২ জুলাই ১৯৪৩ তারিখে। এই ঘটনাটিকে ভারতীয়দের দ্বারা অত্যন্ত আন্তরিকভাবে স্বাগত জানালেনা হলো সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিশেষত মালয়ে, কারণ এটা একটা অবিসংবাদিত ঘটনা যে, সুভাষচন্দ্রের ছিল অসাধারণ বিরাট এক ব্যক্তিত্ব, যদিও একজন র‍্যাডিক্যাল হিসেবে তাঁর লক্ষ্য ছিল জনপ্রিয় ইনডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সঙ্গে দ্বিমুখী উদ্দেশ্য সাধন।

যে মানুষটি এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি সুখী হয়েছিলেন তিনি হলেন রাসবিহারী স্বয়ং। তাঁর অত্যন্ত খারাপ স্বাস্থ্য এবং কাজের প্রচণ্ড চাপ সত্ত্বেও, তিনি টোকিও গিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্রকে সঙ্গে করে সিংগাপুরে নিয়ে আসতে। তিনি ছিলেন কঠোর শৃংখলা পরায়ণ এবং তাই তিনি চিন্তিত ছিলেন যাতে তাঁর উত্তরসূরীকে সম্ভাব্য সর্বপ্রকার সৌজন্য প্রদর্শন করা হয়। তাঁরা উভয়েই সিংগাপুরে এসে পৌঁছলেন ঐ একই বিমানে।

তাঁর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সিংগাপুরে পৌঁছানোর দু'দিন পরে রাসবিহারী এক প্রতিনিধিত্ব মূলক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করলেন ক্যাথে হলে (Cathay Hall)—যেখানে ভারতীয়দের এক বিশাল জনতা উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালো এই উভয় নেতাকে —অবসরপ্রাপ্ত রাসবিহারী ও নবাগত সুভাষচন্দ্রকে, এবং তাদের মিশ্র আবেগ প্রদর্শন করলো সেই অনুষ্ঠানের মুহূর্তে। রাসবিহারী ছিলেন খুবই সদাশয়। তিনি সমবেত শ্রোতাদের বললেন যে, তিনি তাঁদের জন্যে এনেছেন 'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান এক উপহার'। এবং সুভাষচন্দ্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে ঘোষণা করলেন : এই সেই উপহার যা আমি এনেছি।

সুভাষচন্দ্রের হাতে নতুন দায়িত্বভার অর্পণ, রাসবিহারীর দিক থেকে সবচেয়ে সুন্দর একটা কাজ হয়েছিল। সেই অনুষ্ঠানে তিনি ছিলেন চমৎকার মেজাজে। আমাকে বলা হয়েছিল, এরকম আরেকটি অনুষ্ঠানের কোনো নজির আগে কখনো দেখা যায়নি, যেখানে এতবড় একজন নেতা সানন্দে, স্বেচ্ছায় ও সত্যিকারের খুশি মনে তাঁর নিজের কর্তৃত্বাধীন এতবড় দায়িত্ব যা এতদিন তিনি ভোগ করে আসছিলেন তা অন্যের হাতে তুলে দিচ্ছেন। এবং টোকিও পর্যন্ত যাওয়া ও সেখানে থেকে তাঁর উত্তরসূরী সুভাষচন্দ্রকে সঙ্গে করে সিংগাপুর নিয়ে আসা পর্যন্ত সমস্ত রাস্তার কষ্টও রাসবিহারী সহ্য করেছিলেন।

সুভাষচন্দ্র এক জোরালো ভাষণ দিয়েছিলেন সেই বিশাল জনতার উদ্দেশে ;

শৃংখলা, একতা ও ভারতে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে প্রত্যেক ভারতবাসী যে যেখানে আছে তার সর্বশক্তি দিয়ে সংগ্রামের আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ঘোষণা করলেন, প্রবাসে থেকে মুক্ত ভারতের জন্যে তাঁর এক অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পরিকল্পনার কথা, যে সরকার ঘটনাক্রমে একদিন দিল্লি পর্যন্ত অগ্রসর হবে।

ক্যাথে হলের ঐ অনুষ্ঠানের ঠিক পরেই শিবরাম এক প্রেস কনফারেন্স-এর ব্যবস্থা করেছিলেন সিংগাপুর প্রেস ক্লাবে (Singapore Press Club), এবং আমাকেও আমন্ত্রণ করেছিলেন সেখানে উপস্থিত থাকতে।

আমরা দেখে অবাক হলাম যে, বেশকিছু সংখ্যক জাপানি প্রেস সদস্যরা ঐ ক্যাথে হলের অনুষ্ঠান যেভাবে সম্পন্ন হলো তাতে অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠলেন। সুভাষচন্দ্রকে এই অনুষ্ঠানের সভায় কয়েকজন বক্তা কর্তৃক 'নেতাজী' বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। প্রেসের লোকেরা এই 'নেতাজী' শব্দের তুল্য প্রতিশব্দ ঠিক বুঝতে পারেন নি, এবং যেভাবে হোক ভুল করে 'ফ্যুয়েরার' (Fuhrer বা 'একনায়ক' শব্দে ভাষান্তরিত করেন। সম্ভবত অবচেতনভাবেই তাঁরা এই শব্দটির অর্থ করলেন—মোটামুটি ভাবে জাপানি কর্তৃপক্ষের প্রতি অবমাননামূলক মনোভাবযুক্ত।

সুভাষচন্দ্র ছিলেন বিস্ময়কর ব্যক্তিত্বমণ্ডিত এবং যে কোনো লোকের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তার ধরনধারণ ছিল বেশ বলিষ্ঠ। এসব ছিল তাঁর কাছে স্বাভাবিক এবং সংশ্লিষ্ট ভারতীয়দের নেতৃত্বের ক্ষেত্রে ছিল মূল্যবান সম্পদ স্বরূপ। কিন্তু ঘটনা হলো এই যে, জাপানিরা ভিন্ন ধরনের আচার-আচরণে অভ্যস্ত, দুর্ভাগ্যক্রমে তারা তাই সুভাষচন্দ্রের ধরনধারণকে একরকমের আগ্রাসী মনোভাব ও মুরুব্বিয়ানা বলে মনে করলো—যা তারা ঠিক বুঝতে পারলো না। আরেকটি নিরানন্দের ঘটনা জাপানিদের মনে যা ছাপ ফেলেছিল তা হলো, সুভাষচন্দ্র ছিলেন অত্যন্ত জার্মানি-ঘেঁষা। এমনকি যদিও জাপান যুদ্ধের সময় জার্মানির সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল, তবুও জাপানিদের মধ্যে ভিতরে ভিতরে একটা সন্দেহের ভাব ছিল হিটলারের নীতির বিষয়ে। জাপান ছিল রাজতন্ত্রের দেশ, যেখানে সাধারণ লোকেরা সম্রাটকে 'ঈশ্বর' বলে মনে করতো। হিটলার তাঁর দিক থেকে, নাৎসি পার্টির (Nazi party) নেতা হিসেবে ছিলেন একেবারেই ভিন্ন প্রকৃতির ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ। নাৎসি প্রথা এবং জাপানি ঐতিহ্য ছিল মূলত ভিন্ন প্রকৃতির।

যখন দেখলাম শিবরামের পক্ষে কাজ চালানো খুবই অসুবিধাজনক, আমি স্থির করলাম প্রেস প্রতিনিধিদের সঙ্গে একটা পৃথক বেসরকারি সভা করবো হিকারি-কিকান সংস্থায়। কাজ শুরু করার পক্ষে আবহাওয়া ছিল ভারি, অর্থাৎ পরিবেশ অনুকূল ছিল না। যেভাবেই হোক, জাপানি গণমাধ্যমগুলি সুভাষচন্দ্রকে প্রসন্নভাবে নেয়নি। বরং তারা এক আশ্চর্য রকমের বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করেছিল, যদিও তারা কেউই নির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ নিয়ে এগিয়ে আসেনি। কারণ যাই হোক,

ঐ সভাটি সম্পন্ন হয় এক শান্ত পরিবেশে। শিবরাম পরে বলেছিলেন যে, জাপানি ভাষায় আমার দক্ষতার ফলেই সেই পরিবেশের পরিবর্তন সম্ভব হয়েছিল।

এক্ষেত্রে প্রাথমিক ভাবে একটা ঘোষণা করার প্রশ্ন ছিল যা সুভাষচন্দ্র করেছিলেন ঐ ক্যাথে-হলের সভায়, অর্থাৎ বিষয়টি হলো মুক্ত ভারতের জন্যে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের কথা। এ বিষয়ে জাপানিদের তেমন বেশি চিন্তিত মনে হয়নি; কিন্তু 'নেতাজী' শব্দটিই তাদের কাছে নিয়ত বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারা ভেবেছিল সুভাষচন্দ্রই বোধ হয় জাপানিদের পরিবর্তে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ও পূর্ব-এশিয়ার 'নেতা' হতে চেষ্টা করছেন। ঘটনা হলো এই যে, সুভাষচন্দ্রের নিজেরই মনে ছিল এই উপাখ্যানটি তাঁর সাবমেরিন যাত্রাকালে, এবং শিবরামও বলতে গেলে একভাবে তা প্রচার করেছিলেন। এবং সেই প্রচারের ফলে জাপানি প্রেসের মনে যে ধারণা গেড়ে বসেছিল, সেই বিষয়ে বোঝানোর দায়িত্ব পড়লো এখন আমার অদৃষ্টে। আমি সেই নির্দোষ 'নেতাজী' শব্দটির অর্থ সম্পর্কে এক ভাষণে প্রচুর আলোচনা করলাম। হিন্দিতে এই শব্দটি যে কোনো নেতার প্রতি প্রযুক্ত হতে পারে। এবং আমি ব্যাখ্যা করে বললাম যে, শব্দটি বলার অভিপ্রায় ছিল সুভাষচন্দ্রকে কেবলমাত্র ভারতীয় সম্প্রদায়ের নেতা হিসেবে বর্ণনা করা। সাংবাদিকদের কয়েকজন কিন্তু পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারেন নি এই ব্যাখ্যায়, কিন্তু ঘটনাক্রমে তাঁদের কেউই তাঁদের আপত্তির বিষয়ে চাপ দেননি।

এছাড়া আরেকটি অভ্যন্তরীণ প্রকৃতির সমস্যা ছিল আমাদের মধ্যে। মালয়ে প্রচুর সংখ্যায় মুসলিম ছিলেন, ইনডিয়ান ন্যাশানাল আর্মিতেও ছিলেন; তাঁদের সন্দেহ ছিল যে কোনো রকম 'হিন্দু' ভাবধারার বিষয়ে। এবং 'নেতাজী' শব্দ তাঁদের মতে একটি সংস্কৃত শব্দ। কিন্তু এটা অবশ্যই বলতে হবে যে, তা ছিল সুভাষচন্দ্রের বিরাট ব্যক্তিত্বের কৃতিত্ব—যার ফলে ঐ বিষয়ে মুসলিমদের মধ্যে আর খুব বেশি গুঞ্জন ওঠেনি—সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাঁর তীব্র প্রতিবাদের ফলে।

যেদিন থেকেই তিনি রাসবিহারীর কাছ থেকে দায়িত্বভার বুঝে নিলেন, সেদিন থেকেই সুভাষচন্দ্রের একমাত্র চিন্তা হলো সশস্ত্র অভিযানের দ্বারা ভারতকে মুক্ত করতে INA-কে একটি শক্তিশালী সংস্থা হিসেবে গড়ে তোলা। অতএব তাঁর প্রধান উদ্যোগ হলো মনপ্রাণ দিয়ে সর্বপ্রকারে প্রচেষ্টা চালিয়ে INA বাহিনীর প্রায় ১০ হাজার কর্মীর জন্যে ট্রেনিং ও অন্যান্য সুবিধা-সুযোগ লাভের ব্যবস্থা করা, এবং যুদ্ধবন্দী ক্যাম্প থেকে ও মালয়বাসী ভারতীয় বাসিন্দাদের মধ্য থেকে নতুনভাবে নিয়োগ করে INA বাহিনীর সংখ্যাগত শক্তি বাড়ানো।

৫ জুলাই তারিখে, অর্থাৎ ক্যাথে-হলের সেই অনুষ্ঠানের পরদিনই, তিনি অসামরিক পোশাক-পরিচ্ছদ বর্জন করে তিনি গ্রহণ করলেন পুরোপুরি মিলিটারি

ইউনিফর্ম ও ভারি বুটযুক্ত পোশাক (তখন থেকে এটাই হয়ে দাঁড়ালো তাঁর অফিসিয়াল ড্রেস, তাঁর অন্তর্ধানের কাল ১৫ আগস্ট ১৯৪৫ পর্যন্ত), এবং সিটি-হল ময়দানে (City Hall) এক ভাষণ দিলেন ভারতীয় সেনা ও অসামরিক ব্যক্তিদের এক বিরাট সভায়। তিনি আবেগের সঙ্গেই বললেন এবং ঘোষণা করলেন যে, ভারতকে অবশ্যই মুক্ত করতে হবে INA বাহিনী কর্তৃক সশস্ত্র আক্রমণের দ্বারা, এবং অন্যান্য যারা তা চায় তাদের সাহায্য নিয়ে। তিনি সেনাদের মুখে জোগালেন যুদ্ধের স্লোগান : চলো দিল্লি (On to Delhi)!

এবং সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন চার্চিলের সেই স্মরণীয় ভাষায়; শহিদ হবার স্বার্থে এই পন্থায় স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে, তিনি তাঁর অনুগামীদের প্রস্তাব দিলেন : ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও ভোগসুখ থেকে বঞ্চিত হতে, এমনকি অত্যাচার ও মৃত্যুবরণ করতে। সেই ভাষণটি দুর্ভাগ্যক্রমে হয়ে দাঁড়িয়েছিল দারুণ এক ঐশ্বরিক প্রেরণাযুক্ত ভবিষ্যদ্‌বাণী তুল্য – ইম্ফল অভিযানের (Imphal campaign) পরিপ্রেক্ষিতে – যে অভিযান সংঘটিত হবার কথা ছিল এক বছরের কিছু কম সময় পরে।

৬ জুলাই তারিখে INA অফিসার ও কর্মীদের এক আনুষ্ঠানিক প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে সুভাষচন্দ্র তাঁদের অভিবাদন গ্রহণ করেন এবং আবার সেখানে তাঁদের উদ্দেশে এক ভাষণ দেন – আগের দিনের মতো সেই একই বক্তব্যের ধরনে। জেনারেল তোজো তখন সিংগাপুরে ছিলেন মালয়ের জাপানি অধিকৃত এলাকায় এক পরিদর্শন-সফরে, তিনিও সুভাষচন্দ্রের ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তখন তাঁর কর্মসূচি অনুসারে বিভিন্ন অঞ্চল সফরে এসেছিলেন ম্যানিলা থেকে। তিনি বারবার বলেছিলেন, ব্রিটিশের হাত থেকে ভারতের স্বাধীনতা লাভে জাপানের তৎপরতার সঙ্গে সাহায্য করার কথা।

ঐ প্যারেডের সময়ে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল, যা দর্শকদের মধ্যে সংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তিদের মনে দারুণ এক ওলটপালট করে দিল। প্যারেডের সময় সামনের সারিতে একটি জাপানি ট্যাঙ্ক ছিল এবং তার উপরে ছিল ভারতের জাতীয় পতাকা। দুর্ঘটনা ক্রমে পতাকাটি রাস্তায় টাঙানো তারের সঙ্গে জড়িয়ে যায়, ফলে কলকব্জা থেকে নড়বড়ে ঢিলে হয়ে মাটিতে পড়ে যায় এবং সঙ্গের একখানি গাড়ির চাপে তা বিচূর্ণ হয়ে যায়। সুভাষচন্দ্র দৃশ্যত রেগে যান। কিন্তু জেনারেল তোজোর মুখে গড়পড়তা জাপানিদের মতোই কোনোরকম আবেগ উত্তেজনা দেখা যায়নি।

প্রায় ছ'মাসের কিছু বেশি সময়ের মধ্যে, INA বাহিনী অফিসিয়ালি তার কর্মীসংখ্যা বাড়িয়ে ফেললো প্রায় ২৫ থেকে ৩০ হাজারের মধ্যে। দুঃখের বিষয়, এমন এক বাহিনীর পক্ষে সেনা চলাচল ও সরবরাহের নিয়মকানুন এবং অন্যান্য সাংগঠনিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে কর্নেল ভোঁসলে ও তাঁর স্টাফ অফিসারদের ভালো কাজকর্ম সত্ত্বেও, তা ছিল শোচনীয় ভাবেই অপর্যাপ্ত। ভারতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে হাজার হাজার যুবক ও মাঝ বয়সী অসামরিক লোক ছিলেন, যাঁরা যুদ্ধ ইত্যাদি

বিষয়ে কিছু না জেনেই শুধুমাত্রই INA বাহিনীর ইউনিফর্ম পরেছিলেন, তাঁরা শিখেছিলেন কেবলমাত্র স্যালুট করতে ও তদনুযায়ী চলাফেরা করতে, এবং তাঁরা এমনভাবে আচরণ করতেন যেন তাঁরা ঐ নতুন সম্প্রসারিত INA বাহিনীর সদস্য। তাঁরা তা করতেন কেবলমাত্র জাপানিদের কাছ থেকে বিশেষ সুবিধা আদায়ের জন্যে। সুভাষচন্দ্রের এই INA বাহিনীর কার্যকরী শক্তি অতএব বিশেষভাবেই কম ছিল, অন্তত যে সংখ্যার কথা আগেই আমি উল্লেখ করেছি তার থেকে। কেউই এই সঠিক সংখ্যার বিষয়ে নিশ্চিত ছিল না।

ব্রিটিশ যখন বার্মা পুনর্দখল করলো ১৯৪৫ সনে, এবং থাইল্যাণ্ড, ইন্দো-চীন ইত্যাদির পতন ঘটলো মিত্র বাহিনীর হাতে, দেখা গেল INA বাহিনীর সদস্য যাঁরা হাজির হয়েছেন, তাঁদের সংখ্যা সর্বশ্রেণীর অফিসার ও কর্মীসংখ্যা সমেত হবে প্রায় ২৩ হাজার।

সুভাষচন্দ্র এবং হিকারি-কিকান সংস্থা এবং জাপান গভর্নমেন্টের অন্যান্য কর্তৃপক্ষের মধ্যে সংযোগ ছিল প্রকৃতপক্ষে INA বাহিনীর পক্ষে অনুরোধ-উপরোধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বাহিনীর দাবিদাওয়া অধিকাংশই অপূর্ণ ছিল জাপানের নিজস্ব অসুবিধার জন্যে—যে অসুবিধে প্রতিদিনই ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছিল তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ সংক্রান্ত কার্যকারণে। তথাপি, সুভাষচন্দ্র প্রশংসনীয় অধ্যবসায় ও নিষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন।

যাই হোক যেটা দুঃখের বিষয় তা হলো, অসামরিক সম্প্রদায়ের বিষয়গুলি সর্বময় নেতার কাছে অবহেলিত রয়ে গেল। সুতরাং জাপানি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করে এই বিষয়গুলির ব্যবস্থা করাই হলো সম্পূর্ণ ভাবেই আমার দায়িত্ব।

রাসবিহারীকে বারবার বোঝানো হয়েছিল চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে, যাতে তিনি কিছুকাল বিশ্রাম করেন পেনাং এলাকায়—যেখানকার আবহাওয়া ছিল সিংগাপুরের থেকে আরো ভালো। কিন্তু মাস দুয়েকের মধ্যেই আমরা ফিরে এলাম, এবং রাসবিহারী শুরু করে দিলেন টোকিও ত্যাগ করে যাবার প্রস্তুতিপর্ব।

তাঁর প্রস্থানের প্রাক্কালে, আমি সারাদিন তাঁর বাসায় ছিলাম। তাঁর সঙ্গে যাঁরাই কাজ করেছেন, সকলের কাছেই সেদিনটা ছিল এক তীব্র অনুভূতিময় দিন। সুভাষচন্দ্রের কাছে বিদায় জানাবার জন্যে, তিনি তাঁর সেক্রেটারি শেসানকে বললেন টেলিফোনে সুভাষচন্দ্রকে জানিয়ে দিতে যে, তিনি সেদিন সন্ধ্যায় সুভাষচন্দ্রের বাংলোয় যাচ্ছেন বাঙালি খানা খাবার জন্যে। সুভাষচন্দ্র তখনি বললেন : 'না না, আমিই যাবো এবং তাঁকে সঙ্গে করে নেবো; দয়া করে তাঁকে অনুরোধ করুন আমার জন্যে অপেক্ষা করতে।' সুভাষচন্দ্র এলেন তাঁর লাক্সারি শেভ্রোলেট গাড়িতে ৬টায় সময়ে, এবং রাসবিহারীকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়িতে।

রাসবিহারী আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন বরাবরের মতো, টোকিও ত্যাগের আগে

সুভাষচন্দ্রকে কী পরামর্শ দেওয়া কর্তব্য। আমি জানতাম, এটাই হলো রাসবিহারীর ধরনধারণ। এমনকি যখন তাঁর সত্যিই কোনো সাহায্যের দরকার হয় না কারো কাছ থেকে (এবং এটাও সেরকম এক উপলক্ষ) তাঁর কী কর্তব্য তা স্থির করতে, তখনো তিনি জিজ্ঞাসা করেন তাঁর বিশ্বস্ত সহকর্মীদের কাছে তাঁদের মতামত জানার জন্যে। আমি কেবলমাত্র তাঁকে বললাম: 'আপনিই জানেন তাঁকে কী বলতে হবে; আমার পক্ষে কিছু বলার প্রয়োজনটা কী?' রাসবিহারী মৃদু হাসলেন বোঝাপড়ার ভঙ্গিতে এবং মন্তব্য করলেন: 'হ্যাঁ, এটাই ঠিক আপনার মতো কথা, আমি নিশ্চিত জানতাম যে আপনি কী বলবেন।'

পরে তিনি আমাকে সংক্ষেপে জানিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের কী কথাবার্তা হয়েছিল। রাসবিহারী তাঁকে বিশদভাবে জানালেন যুদ্ধের পরিস্থিতির বিষয়ে। জাপান তখন সাংঘাতিক অসুবিধের মধ্যে রয়েছে: সর্বত্রই দারুণ খাদ্যাভাবের সংকট চলছে, এবং রেশন বরাদ্দ নির্মমভাবে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। জরুরি সময়ের যুদ্ধের ট্রেনিং চালু করা হয়েছে এমনকি মেয়েদের জন্যেও। অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদেরও ঘাটতি চলছে; বাঁশের তৈরি অস্ত্রাদির ব্যবহার চলতে লাগলো অনুশীলনের কাজে—রাইফেল ও বেয়োনেটের বিকল্প হিসেবে। রাসবিহারী সুভাষচন্দ্রকে বললেন যে, INA বাহিনী ব্রিটেনের সঙ্গে যুদ্ধ করবে এবং জয়লাভ করবে, এমন কোনো রকম চিন্তা ত্যাগ করাই হবে বিবেচনার কাজ।

'আমাদের দু'জোড়া চোখ থাকা উচিত'—রাসবিহারী বললেন সুভাষকে: এক-জোড়া সামনের দিকে, এবং একজোড়া পিছন দিকে। পিছনের চোখের কাজ হবে কাছাকাছি যা ঘটছে তা দেখা (অর্থাৎ, যুদ্ধের মঞ্চে ও খোদ জাপানে যা ঘটছে); এবং সামনের চোখের কাজ হবে বর্তমানে যা ঘটছে তা দেখা এবং সামনে যা আসছে তার বিচার করা

রাসবিহারী সুভাষচন্দ্রকে আরো সাবধান করে দিলেন, তিনি অবশ্যই যেন মানচুকুও ঘটনার কথা এবং জাপানি অধিকৃত অন্যান্য অঞ্চলের কথা মনে রাখেন, বিশেষত চীনের ঘটনাবলীর কথা। এক্ষেত্রে বিশেষ মুশকিল হলো, প্রণালী বেষ্টিত জাপানের বিশেষ মনস্তত্ত্ব (strait-laced psychology)। অধিকন্তু জাপানিরা যদি কোনো স্বার্থত্যাগ করে কোনো দেশে, তবে তারা সেজন্যে নানান রকমের দাবি উত্থাপন করবে। যদি কোনো জাপানি সশস্ত্র বাহিনী ভারতে প্রবেশ করে ব্রিটিশের সঙ্গে যুদ্ধ করতে, টোকিওস্থ জাপান সরকার তাহলে অবশ্যই বিবেচনা করবে যে, তারা এ বিষয়ে অর্থাৎ একটা যুদ্ধ করার পরিবর্তে কিছু দাবি করার একটা অধিকার অর্জন করেছে। এটাই হলো স্বাভাবিক মনুষ্যোচিত মনস্তত্ত্ব; কিন্তু আমাদের বক্তব্য হলো যে আমরা চাই না কোনো বিদেশি সেনা বা অসামরিক লোক তার জীবন বিপন্ন করুক ভারতের স্বাধীনতার স্বার্থে। ভারতকে মুক্ত করা উচিত সম্পূর্ণ তার স্বদেশবাসীর সাহায্যে। তবে, বাইরে থেকে যে কোনো রকম উপকরণগত সাহায্য

আসুক তার সুযোগ নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু যেহেতু সুভাষচন্দ্রের বড় রকমের পরিকল্পনা আছে INA ও জাপানি বাহিনীর যৌথ উদ্যোগে ভারতে সশস্ত্র অভিযানের প্রস্তুতি চালানোর, তাই রাসবিহারী তাঁকে গুরুত্ব সহকারে পরামর্শ দিচ্ছেন অবিলম্বে সেরকম কোনো চিন্তা পরিত্যাগ করতে ; কারণ INA বাহিনী কখনোই কার্যকরী ভাবে সেরকম যুদ্ধ করতে সমর্থ হবে না ; জাপানিরাও সেকাজে সফল হবে না, যদি তারা মিত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে কোনো রকম সামরিক ব্যবস্থা নিয়ে অভিযান চালায়।

আমি চুপ করে রইলাম যাতে রাসবিহারী তাঁর কথাবার্তা চালিয়ে যেতে পারেন অবাধে। তিনি বললেন যে, সুভাষচন্দ্রকে তিনি গান্ধীজীর 'কুইট ইনডিয়া' (Quit India, ভারত-ছাড়ো) আন্দোলনের বিষয়ে মনে করিয়ে দেন। ব্রিটেন অবশ্য খুবই বিরক্ত হয়েছিল, কিন্তু যতক্ষণ এটা ইনডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের নীতি ছিল যে ভারতের উচিত ব্রিটিশ প্রভুত্বের হাত থেকে মুক্ত হওয়া, সেক্ষেত্রে তাহলে প্রশ্নই ওঠে না এবং অন্য কোনো দেশকে যেন কোনো ভাবেই সুযোগ দেওয়া না হয়, অর্থাৎ যাতে তারা কোনোভাবেই ভারতে ঢুকে পড়ে ব্রিটিশের স্থান দখল না করে। সব কথা বলা হলো। অতঃপর সুভাষচন্দ্রের প্রতি রাসবিহারীর আন্তরিক পরামর্শ হলো যে, INA-কে গড়ে তোলা উচিত একটা কার্যকরী ও শৃংখলাপূর্ণ সংস্থা হিসেবে; তার কাজ হবে খোদ সংস্থার দেখাশোনা করা এবং তার নৈতিক সমর্থন সম্প্রসারিত করতে হবে ভারতের মধ্যেকার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উদ্দেশ্যেও ; এই সংস্থা কখনোই অ্যাংলো-আমেরিকানদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্যে শক্তিশালী আঘাত হানার মতো বাহিনী হিসেবে নিজেকে চিন্তা করবে না।

রাসবিহারী কিছুক্ষণের জন্যে থামলেন, সম্ভবত আশা করেছিলেন যে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করবো সুভাষচন্দ্রের প্রতিক্রিয়া কেমন হয়েছিল, কিন্তু আমি ইচ্ছাকৃত ভাবেই চুপ করে ছিলাম কোনো রকম জিজ্ঞাসাবাদ না করে। আমি যেমন অনুমান করেছিলাম, ঠিক তারপর রাসবিহারী নিজেই মুখ খুললেন আমি যা জানতে চেয়েছিলাম সেই বিষয়ে। তিনি বললেন যে, সুভাষচন্দ্র কোনোরকন মন্তব্য করেন নি। 'সুভাষের মুখে খুশির ভাব ছিল না' – রাসবিহারী বললেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ধরণে। এর নিহিত অর্থ ছিল পরিষ্কার।

সুভাষচন্দ্র শ্রদ্ধা করতেন রাসবিহারীকে, কিন্তু তাঁর পরামর্শ মেনে চলেন নি। তিনি অবশ্যই অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করেছেন এবং আন্তরিকতার সঙ্গেই করেছেন, কিন্তু হায়, তা করেছেন সামনের পরিস্থিতির দিকে একচোখা দৃষ্টিতে, এবং ঠিকমতো কান দেননি তাঁর চিন্তাশীল ও নিজস্ব মতামতের অধিকারী সহকর্মীদের যুক্তিপূর্ণ মতামতের প্রতি। তিনি তাঁর নিজস্ব পথেই এগিয়ে ছিলেন এবং তিন মাসের মধ্যেই প্রস্তুত করেছিলেন আজাদ হিন্দ-এর (স্বাধীন ভারত) অধীনে 'প্রভিসনাল গভর্নমেন্ট'-এর সংবিধান (Constitution for the Provisional Govern-

ment)। মনোভাবের দিক থেকে অন্তত তা ছিল, ব্যাংকক কনফারেন্সে গৃহীত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের বিরোধী—যে সিদ্ধান্তে বলা হয়েছিল যে, ভবিষ্যতে ভারতের সংবিধান তৈরি করা হবে ভারতবাসীর দ্বারা—যার অর্থ ভারতের 'মধ্যে' বসবাসরত দেশবাসীর দ্বারা।

২১ অকটোবর ১৯৪৩ তারিখে তিনি ঐ সংবিধানের সারকথা ঘোষণা করলেন—ক্যাথে সিনেমার মঞ্চে (Cathay cinema's auditoirium) সমবেত বিশাল জমায়েতের সামনে। ১৩ জন মন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত একটি ক্যাবিনেটের কথাও ঘোষণা করা হলো। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ক্যাপটেন (ডক্টর) লক্ষ্মী, মহিলা সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত; কর্নেল জে. কে. ভোঁসলে, INA বাহিনীর চিফ অফ স্টাফ, এস. এ. আয়ার, প্রচারমন্ত্রী। তাঁরই কাছে 'ঈশ্বরের নামে' শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করে সুভাষচন্দ্র নিজের হাতেই নিলেন সেই 'প্রভিসনাল গভর্নমেণ্ট' বা অন্তর্বর্তী সরকারের রাষ্ট্রপ্রধানের ('হেড অফ স্টেট') দায়িত্ব—তিনিই হলেন প্রধানমন্ত্রী, যুদ্ধমন্ত্রী, বহির্বিষয়ক মন্ত্রী এবং INA বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। রাসবিহারী যদিও তখন টোকিওতে অনুপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তাঁকে করা হলো 'সর্বোচ্চ পরামর্শদাতা'।

আমার বাড়িই ছিল এই নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কিত বহু আলাপ-আলোচনার জন্যে নির্দিষ্ট স্থান। কারোরই বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না সুভাষচন্দ্রের শক্তি-সামর্থ্যের যথার্থতার বিষয়ে। কিন্তু যাঁরাই IIL-সংস্থার সূচনা ও অগ্রগতি লক্ষ্য করেছেন, এবং যুদ্ধের গতি যেদিকে মোড় নিচ্ছিল সে বিষয়ে জানতেন, তাঁরাই দেখেছেন জাপানিদের সাহায্য নিয়ে সশস্ত্র উপায়ে ভারতকে মুক্ত করার মোহগ্রস্ত সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পনা মূলত ভ্রান্ত। এমনকি জাপানি বাহিনীকেও কাজে লাগাতে পারা যাবে একথা ধরে নিলেও বলা যায়, তাঁর চিন্তা ছিল অবাস্তব, কারণ যুদ্ধের পরিস্থিতি ক্রমশই সর্বত্র জাপানের পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধাজনক ভাবেই খারাপের দিকে যাচ্ছিল।

সুভাষচন্দ্র আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির কথা ভালোভাবেই জানতেন। শিবরাম এবং আমি বেশ কয়েকটি উপলক্ষে তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করেছি তাঁর পরিকল্পনার বিষয়ে নতুন করে চিন্তাভাবনা করতে। কিন্তু তাঁর প্রকৃতি, যদিও খুবই আন্তরিকতাপূর্ণ কিন্তু তা এমনই অনমনীয় ও একগুঁয়েমি ভাবের ছিল যে তিনি কিছুতেই তাঁর স্বভাব সংশোধন করবেন না, যদি সেক্ষেত্রে সংগত যুক্তি থাকে তবুও না। আমাদের একটা মালয়ালাম প্রবাদের কথা মনে পড়লো যাতে বলা হয়েছে, একজন মানুষ জোর দিয়ে বলছে—'যে ঘোড়াটি সে ধরেছে তার দুটি শিং আছে' এমনকি যদিও কেউই ঘোড়ার একটি শিং-ও দেখেনি।

একদিন তিনি হঠাৎ স্থির করলেন, ভারতের উদ্দেশে তিনি নিজে থেকেই একটি বেতার-ঘোষণা করবেন। এবং তিনি নিজেই সেই বেতার-ভাষণের

মূল বক্তব্য প্রস্তুত করলেন। IIL-সংস্থার প্রচার দফতরের বরাবরের ব্যবস্থা মতো – যে ব্যবস্থা তখনো ছিল আমার নিয়ন্ত্রণে – সেই অনুসারে বেতার-প্রচারের মূল বক্তব্যের কপি আমার কাছেই এলো আমার বিবেচনার জন্যে। আমি মনে অত্যন্ত আঘাত পেলাম – ঐ বক্তব্যের কয়েকটি অনুচ্ছেদে মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহরু এবং অন্যান্য শ্রদ্ধেয় ভারতীয় জাতীয় নেতৃবৃন্দের প্রতি অত্যন্ত কড়া ভাবে ও অমর্যাদাকর ভাষায় রচিত আক্রমণাত্মক উক্তি, যেসব উক্তি ছিল এক ধরনের 'ব্যক্তিগত কুৎসার ইঙ্গিতপূর্ণ' – এহেন বক্তব্যপূর্ণ উক্তি দেখে কিছুতেই নিজেকে সংযত রাখতে পারলাম না – আমি কোনোরকম ব্যস্ততা না দেখিয়ে অর্থাৎ যা করার ফল হতো সংঘাত/সংঘর্ষ, তার মধ্যে না গিয়ে আমি স্রেফ ঐ বক্তব্য থেকে আপত্তিকর অংশগুলি বাদ দিয়ে দিলাম, এবং সেই বক্তব্যের কাগজটি নতুন করে টাইপ করলাম এবং পাঠিয়ে দিলাম সুভাষচন্দ্রের কাছে।

সুভাষচন্দ্র যখন সেই বক্তব্যটি প্রচার করতে শুরু করলেন, এমন সময় তিনি লক্ষ্য করলেন ঐ পরিবর্তনগুলি এবং অবাক হয়ে গেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন এস. এ. আয়ারকে—তাঁর বক্তব্যের মধ্যে কিছু বাদ গেছে কিনা, কিংবা সেই পরিবর্তন প্রচার-দফতরের কেউ করেছেন কিনা। আয়ার অবশ্যই তা জানতেন এবং সুভাষচন্দ্রকে সত্য কথাই বললেন যে আমি কাটছাঁট করেছি কয়েকটি অনুচ্ছেদে। সুভাষচন্দ্র মন্তব্য করলেন, —'ওঃ, নায়ার-সাহেবই এসব কাটছাঁট করেছেন, এঃ ?' তিনি আর কিছু এ বিষয়ে বলেন নি, এবং সেই বক্তব্যই প্রচার করলেন যে বক্তব্য আমি কাটছাঁট করে তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলাম।

পরদিনই সুভাষচন্দ্র বলে পাঠালেন আমাকে আয়ারের মাধ্যমে যেভাবেই হোক আয়ার নিজেকে সুভাষচন্দ্রের কাছে অনুগ্রহভাজন করে তুলে বেশ ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন এবং প্রকৃতপক্ষে তাঁর সব কাজই করছিলেন, একমাত্র সুভাষচন্দ্রের উপর ন্যস্ত IIL সংস্থার নীতিগত কাজকর্ম ছাড়া) তিনি জানতে চান কেন আমি তাঁর সেই বক্তব্যের খসড়া থেকে কয়েকটি অনুচ্ছেদ বাদ দিয়েছি। আমি আয়ারকে বললাম যে, ঐ অনুচ্ছেদগুলি কখনোই বক্তব্যের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত হয়নি। ভারতের জাতীয় নেতাদের কাউকেই আক্রমণ করা লিগের নীতি নয়। আমি আয়ারকে বলে সুভাষচন্দ্রকে আরো মনে করিয়ে দিতে চাই যে, তিনি যেখানে জাপানিদের ব্যবস্থা অনুসারে রাজপ্রাসাদে বিলাসব্যসনের মধ্যে থাকার মতো ভাগ্যবান, সেখানে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে যাঁদের উদ্দেশে তিনি কটূকথাপূর্ণ মন্তব্য করেছেন তাঁরা ভারতে ব্রিটিশের জেলে যন্ত্রণাময় জীবন কাটাচ্ছেন। আমরা অবশ্যই তাঁদের পক্ষে কোনো রকম অমর্যাদাকর ও বেসামাল কাজ কিছুই করবো না ; কিংবা কখনোই আমাদের দেশের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে যাবো না। অত্যন্ত গুরুত্ব-পূর্ণ বলে বিষয়টির এখানেই পরিসমাপ্তি হয়েছিল।

সুভাষচন্দ্রের কার্যকলাপের ধরনধারণ ছিল রাসবিহারীর থেকে প্রচুর তফাৎ।

রাসবিহারী যদিও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ছিলেন কঠোর শৃংখলা পরায়ণ, তবুও ব্যক্তিগত ভাবে ছিলেন খোলাখুলি এবং এমনকি সহকর্মীদের সঙ্গেও হাসিঠাট্টায় ফেটে পড়তেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র সর্বদাই একটা দূরত্ব বজায় রাখতেন নিজের সহকর্মীদের মধ্যে : তিনি পছন্দ করতেন প্রভু-ভৃত্যের একটা ভাব বজায় রেখে চলতে। অধিকন্তু এটা খুবই দুর্ভাগ্যের কথা যে, তিনি সর্বদাই একটা সন্দেহের ভাব পোষণ ও প্রদর্শন করতেন, বিশেষত যাঁদের সঙ্গে রাসবিহারীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল তাঁদের প্রতি : এই তালিকায় ছিলাম আমি ও শিবরাম।

আমার কাছে খবর ছিল, জার্মান সিক্রেট সার্ভিসের কোনো রকম সুনজর ছিল না আমার প্রতি — যেহেতু তাদের চেয়ে আমার অনেক বেশি প্রভাব ছিল জাপানি হাইকমাণ্ড-এর সঙ্গে ; তারা আমার বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্রের মন বিষিয়ে দিয়ে তাঁর মগজ ধোলাই করার চেষ্টা করেছিল। একই সঙ্গে তারা সুভাষকে বলেছিল, IIL-সংস্থার চিফ লিয়াজোঁ অফিসার হিসেবে আমাকে উপেক্ষা করাও অবিবেচকের কাজ হবে। আমাদের নতুন নেতা সুভাষচন্দ্র তাই উভয় সংকটে পড়লেন এবং এবিষয়েঅনিশ্চিত ছিলেন কিভাবে আমাকে নিয়ে কাজ করবেন। তবে, তাঁর কোনো চিন্তার কারণ ছিল না। আমি সর্বদাই তাঁর ও লিগের পক্ষে ছিলাম সর্বপ্রকারে, অন্তত ব্যাংককে গৃহীত নীতিগত সিদ্ধান্ত অনুসারে এবং তা রূপায়ণের ক্ষেত্রে। আমি সুভাষচন্দ্রের প্রতিযোগী ছিলাম না, কিন্তু ছিলাম সংগঠনের একজন প্রকৃত সেবক, যে সংগঠন রাসবিহারী এবং অন্যান্যদের দ্বারা গঠিত হয়েছে — যার মধ্যে মুখ্যত আমিও আছি। আমি মোহন সিং নই — যে চায় সর্বোচ্চ নেতৃত্ব, অথবা একমাত্র ডিক্‌টেটার হবার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু এটা খুবই মর্মান্তিক যে, সুভাষচন্দ্র শুরুতেই শিবরাম ও আমার মতো ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় ভাবে জানতে চেষ্টা করেন নি। ঘটনাক্রমে পরে তিনি তা করেছিলেন।

এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত আমি এবং আমার ঘনিষ্ঠ সহযোগীরা মোসাহেবির কায়দাকানুন রপ্ত করতে পারিনি। কিন্তু এক্ষেত্রে কয়েকজন ছিলেন যাঁরা তা ভালোভাবেই রপ্ত করেছিলেন তাঁদের আপন স্বার্থে। তাদের মধ্যে ছিলেন এস. এ আয়ার, এ এম সহায়, এবং ডক্টর (কর্নেল) এ. সি. চ্যাটার্জি। কর্নেল ডি এস. রাজু বিশেষভাবে চিহ্নিত ও মনোনীত হয়েছিলেন সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিগত চিকিৎসক হিসেবে। দুর্ভাগ্যক্রমে এই নবগঠিত বিশ্বস্তদের অধিকাংশেরই ছিল 'জী-হুজুর'-এর ভূমিকা, যাঁদের প্রাথমিক কাজই ছিল নেতাকে খুশি করা — তিনি তাঁর পছন্দমতো চিন্তাভাবনার কথা তাঁদের কাছ থেকে যা শুনতে চান। তাঁরা কোনোক্রমেই নিরপেক্ষ পরামর্শ দিতে আগ্রহী ছিলেন না।

প্রচার দফতরটি শিবরাম ও আমি অত্যন্ত পরিশ্রম করে সংগঠিত

করেছিলাম একটি কার্যকরী সংস্থা হিসেবে, কিন্তু সব ওলট-পালট হয়ে গেল। আমাদের ব্যাপকভাবে বিতরিত বিভিন্ন ভাষায় 'নিউজ বুলেটিন' এবং আমাদের ব্যাপক রেডিও-প্রচারের মাধ্যমে আমরা একটি নিয়মানুগ প্রচারাভিযানের কর্মসূচি রূপায়িত করেছিলাম—ইনডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের স্বার্থে। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হলো সুভাষচন্দ্রের হাতে। মনে হলো, প্রচারের বিষয়ে তিনি কোনো কাজই কোনো নীতি অনুসারে করতে চান না। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির ধরনধারণই ছিল কেবলমাত্র যুদ্ধবাজ মারমুখী, থেকে থেকে সাড়া জাগানো চমক লাগানো ধরনের।

নিঃসন্দেহে তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সর্বদাই আকর্ষণ করতো বিশাল জনতা। জনতা ও তাঁর জাঁকজমকের দৃশ্য যেভাবেই হোক প্রায়ই তাঁকে উত্তেজিত করে তুলতো এবং তিনি অজানতেই বিচার-বিবেচনার পথ ছেড়ে নিজেকে পরিচালিত করতেন আবেগ-উচ্ছ্বাসের দ্বারা, তার পরিণতির কথা চিন্তা না করেই। তাঁর প্রকাশ্য অধিবেশনগুলির একটিতে, অর্থাৎ ১৯৪৩ সনের শরৎকালে তিনি ঘোষণা করলেন যে, INA বাহিনী ভারতের মাটিতেই গিয়ে পৌছবে ঐ বছর শেষ হবার আগেই। জনতার ওপর তাঁর এই ভাষণের বিরাট প্রভাব পড়েছিল, কিন্তু তা ছিল সম্পূর্ণতই অবিজ্ঞোচিত। INA বাহিনীর অন্তত একটি কারণেই ভারতের মাটিতে ১৯৪৩-এর আগেই পৌছনোর মতো অবস্থা ছিল না। দ্বিতীয়ত—যদি সত্যিই তা INA-র পক্ষে ভারতের ওপর আক্রমণ প্রস্তুতির প্রশ্ন হয়, এবং তা আগাম ঘোষণা করার প্রয়োজন হয়, তবে তা কখনোই কমাণ্ডার-ইন-চিফের পক্ষে করা উপযুক্ত নয়। এইভাবে সুভাষচন্দ্র শত্রুপক্ষকে একটি সুবিধাজনক বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ফেললেন, যার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে তারা উপযুক্ত আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করলো।

শিবরাম এবং আমি উঠে পড়ে লেগে গেলাম—প্রেস থেকে সারা দুনিয়ায় যেকথা প্রচার করা হচ্ছিল তা বন্ধ করতে। কিন্তু আমরা পুরোপুরি সকাল হইনি। ক্ষতি যা হবার তা হয়ে গেল। বিশাল জনতা আর উত্তেজিত শ্রোতামণ্ডলী দেখে সেই মুহূর্তে সুভাষচন্দ্র যেন আত্মহারা হয়ে বেসামাল হয়ে পড়লেন এবং তিনি গভীর আবেগের বশীভূত হয়ে পড়লেন। ঐ রকম আবেগতাড়িত এক ভাষণে তিনি অজ্ঞাতসারেই তাঁর সেই প্রিয় পরিকল্পনার কথা অর্থাৎ ইমফল ও কোহিমা অভিযানের সমস্ত সম্ভাবনার ভবিষ্যৎ (যদি আদৌ তা থাকে) নষ্ট করে দিলেন—আগে থেকে সেকথা বলে দিয়ে। ফলে, মিত্রবাহিনীর সাউথ-ইস্ট এশিয়া কমাণ্ড দারুণভাবে তার শক্তিবৃদ্ধি করলো সুভাষচন্দ্রের সেই যুদ্ধ-পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির আহ্বানের সম্মুখীন হতে ও তাকে একেবারে গুঁড়িয়ে দিতে।

আয়ার ছিলেন একজন দক্ষ সাংবাদিক এবং প্রচারকর্মে অভিজ্ঞ। সুভাষচন্দ্র যদি আমাকে বা শিবরামকে না চান, তবে তিনি আয়ারকে ভালোভাবেই কাজে লাগাতে পারেন সংস্থার মঙ্গলের জন্যে। আমরা এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র কিছুই মনে করতাম

না, যেহেতু আমরা কোনো বিষয়েই একচেটিয়া ভাব বজায় রাখতে চাইনি। আমাদের আরো যথেষ্ট কাজ ছিল করার মতো। আমাদের স্বার্থ ছিল একমাত্র আন্দোলনের পক্ষে ভালো কিছু করা। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, আমার একজন মন্ত্রী অথচ তাঁকে ব্যবহার করা হতো একজন বার্তাবাহী ভৃত্যের মতো, তাঁকে আড়ম্বরপূর্ণ গালভরা পদাধিকারী হিসেবে কখনো বলা হতো 'ফার্স্ট মিনিস্টার' বা প্রথম মন্ত্রী হিসেবে, তার অর্থ যাই হোক। তিনি নানারকম কাজ করতেন, কিন্তু তার সঠিক প্রকৃতি কি তা কেউই পরিষ্কারভাবে জানতে না।

আমার একটা সমস্যা হলো, যেসব লোক আমাকে খোঁচা দিয়ে মনোভাব ও মতামত জানতে চান – সুভাষচন্দ্র 'সত্যিই' জার্মান-ঘেঁষা কিনা সেই বিষয়ে। এটা কখনোকখনো বিরক্তিকর। সত্যিকথা হলো, তিনি তা ছিলেন কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল খুব সামান্যই, কিন্তু স্বভাবতই যাঁরা সে বিষয়ে ভুল বুঝতে পারেন বা তাঁদের ভুল ধারণা থাকতে পারে, সে ব্যাপারে আমি কিছুই বলতে পারিনে। দুঃখের বিষয়, সুভাষচন্দ্রই এরকম ধারণা গড়ে উঠতে দিয়েছেন প্রথম থেকেই, জার্মান সংক্রান্ত যে কোনো বিষয়ে। একথা হিটলারের রাজনৈতিক, সামরিক এবং প্রশাসনিক রীতি সম্পর্কেও প্রযোজ্য। একটি সাধারণ কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ দৃষ্টান্ত হলো যে, সিংগাপুরে তাঁর উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আদেশ দিলেন – তাঁর নিজের জন্যে ঠিক একজন জার্মান আর্মি অফিসারের ইউনিফর্মের কাটছাঁটের ধরনেই ইউনিফর্ম তৈরি করতে হবে। যখন আমি এবং আমার কয়েকজন সহকর্মী একথা জানতে পারলাম, আমরা তাঁকে পরামর্শ দিলাম এরকম পোশাক তৈরি করার বিরুদ্ধেই। কয়েকজন জাপানি অফিসারও তাঁর এই আদেশের কথা কোনোভাবে জানতে পেরেছিলেন, এবং তাঁদের মধ্যে লঘুচিত্তের কয়েকজন আমাদের নেতা সুভাষচন্দ্রকে 'নিও-ফুরার' (Neo-Fuhrer) বা 'নয়া-ফুরার' বলে উল্লেখ করতে শুরু করলেন। দর্জি ইউনিফর্ম তৈরি করে দিল, কিন্তু দ্বিতীয় বার চিন্তা করে সুভাষচন্দ্র স্থির করলেন তা পরবেন না। তিনি পছন্দ করলেন তার পরিবর্তে অনেকটা ইনডিয়ান আর্মি অফিসারের পোশাকের কাছাকাছি ধরনের ইউনিফর্ম।

মিলিটারি সাজপোশাক বা কর্তৃত্বের অন্যান্য কায়দাকানুন ছিল রাসবিহারীর কাছে সম্পূর্ণ গুরুত্বহীন। তিনি ছিলেন একজন 'জাত নেতা' (born leader)— যাঁর কোনো লোক-দেখানো ভাবের প্রয়োজন ছিল না, যা সুভাষচন্দ্র দারুণভাবে পছন্দ করতেন। সুভাষচন্দ্র বসবাস করতেন কাতোং এলাকার সমুদ্রতীরে একটা বিরাট ও অভিজাত ধরনের ('posh') বাড়িতে, সঙ্গে কড়া দেহরক্ষী, এবং তিনি ঘোরাঘুরি করতেন রাজকীয় চালে, সঙ্গে লোকলস্করের বাহিনী (একজন 'volet' বা সাজপোশাকের তদারককারী ভৃত্য সমেত)। তিনি জেনারেল তোজোর কাছ থেকে আরো পেয়েছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যে ১২-আসনযুক্ত একখানি বিমান। এই বিমানের বিষয়ে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো যে, সুভাষচন্দ্র অনুমতি

চেয়েছিলেন ঐ বিমানের জন্যে একজন ভারতীয় পাইলট নিয়োগ করতে, কিন্তু জেনারেল তোজো সঙ্গে সঙ্গেই অস্বীকার করেন ; তিনি মৃদু হেসে বলেন, বিমানটি 'ভুল পথে চালিত হোক' এই ঝুঁকি তিনি নিতে চান না। আমাদের নেতার মর্যাদার প্রতীকচিহ্নের বিষয়ে আমাদের কারোরই কোনো আপত্তি ছিল না: প্রকৃতপক্ষে, তিনি অবশ্যই আরামে থাকবেন, কিন্তু এসব বিষয়ে তিনি এমন মোহগ্রস্তহবেন কেন এবং অশোভন বিরক্তিই বা প্রকাশ করবেন কেন।

আমি এসবের উল্লেখ করলাম কোনো রকম পাল্টা অভিযোগের মনোভাব থেকে নয়, কিন্তু তা করলাম কেবল এবিষয়ে আমার পাঠকরা হয়তো জানতে চাইতে পাবেন এইজন্যে : যে ব্যক্তিত্বপূর্ণ মানুষটি যিনি আত্মবিসর্জনের মনোভাব নিয়ে কিন্তু গতিশীলতার সঙ্গেই গড়ে তুলেছিলেন ইনডিয়ান ইনডিপেনডেন্স লিগ ও ইনডিয়ান ন্যাশনাল আর্মিকে এক শক্ত ভিত্তির উপরে, তাঁর সঙ্গে এবং তাঁর উত্তরসূরী যাঁর হাতে তিনি আপন-হাতে গড়া এই দক্ষ সংস্থাটিকে ভালো অবস্থায় ও কোনো রকম ব্যস্ততার সঙ্গে নয় বরং ধীরস্থিরভাবে এই সংস্থাটিকে তুলে দিলেন – এই দুই ব্যক্তির মধ্যে যে বৈপরীত্য রয়েছে সেই বিষয়ে আলোকপাত করতে।

১৯৪৩ আগস্টে কর্নেল আইওয়াকুরো (Col. Iwakuro) সিংগাপুর থেকে বদলি হলেন, এবং তাঁর জায়গায় এলেন কর্নেল সাতোশি ইয়ামামোতো (Col. Satoshi Yamamoto), বার্লিনের প্রাক্তন মিলিটারি অ্যাটাশে, সুভাষচন্দ্র তাঁকে জানতেন সেখান থেকেই। এটা দুর্ভাগ্যের কথা যে, যদিও সুভাষচন্দ্র বার্লিন থেকে কর্নেল ইয়ামামোতোকে জানতেন, কিন্তু তিনি সিংগাপুরে বদলি হয়ে আসার পরে সেই অবস্থা আর তেমন দেখা গেল না। 'হিকারি-কিকান' সংস্থার মনোভাবে কিছুটা পরিবর্তন এলো, আগে কর্নেল আইওয়াকুরোর সময়ে যে ভাব ছিল অন্তত তার থেকে। আগেকার সেই সৌহার্দ্য ক্রমশ তেমন আর রইলো না।

সুভাষচন্দ্র যখন জাপান গভর্নমেন্টের কাছে স্বাধীন ভারতের জন্যে গঠিত প্রভিশনাল গভর্নমেন্টের পক্ষে প্রথাগত স্বীকৃতি চাইলেন, কর্নেল ইয়ামামোতো স্রেফ সেই বিষয়টি এড়িয়ে গেলেন ঐ বিষয়ে টোকিওস্থ জাপান সরকার সিদ্ধান্ত নেবেন বলে। ডু'ম্বর ব্যুরোর ৮ম সেকশান কর্নেল নাগি-কে (Col Nagi) ঐ বিষয়ে সরেজমিনে তদন্ত করে দেখতে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা করতে বললো। কর্নেল নাগির ধারণা তেমন ভালো ছিল না, কিন্তু তিনি এ বিষয়ে 'যত্ন না নেওয়া ঠিক হবে না এই নীতি গ্রহণ করেন এবং স্বীকৃতির বিষয়ে সুপারিশ করেন। জেনারেল তোজো তখন সে বিষয়ে তাঁর সম্মতি জানান, এবং কেবল তারপরই সুভাষচন্দ্র প্রথামাফিক ঘোষণা করেন - ক্যাথে হলে ২১ অকটোবর ১৯৪৩ তারিখে।

ইতিমধ্যে কর্নেল ভোঁসলের অধীনে INA বাহিনীর পুনর্গঠনের কাজ চলতে

লাগলো, যদিও পরিকল্পনার তুলনায় খুবই ধীর গতিতে এবং অনেক নিচু মানের সরঞ্জাম নিয়ে। এটা ছিল অনিবার্য, যেহেতু তখন জাপানিরা সামরিক বা রাজনৈতিক অবস্থার দিক থেকে তেমন সন্তোষজনক পর্যায়ে ছিল না। তাদের তখন বড় রকমের বিপর্যয়কর অবস্থা চলছিল। ফলে, INA বাহিনীকে যেসব অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করা হয়েছিল তাঁর অধিকাংশই ছিল ব্রিটিশ ও ইনডিয়ান আর্মি কর্তৃক সিংগাপুরে আত্মসমর্পণের সময়কার বাজেয়াপ্ত করা অস্ত্রের মজুত ভাণ্ডার থেকে প্রদত্ত।

পুনর্গঠিত INA বাহিনীর শক্তিসামর্থ্য কোথাও সুভাষচন্দ্রের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে পারেনি – অন্তত যে কথা তিনি কয়েকটি উপলক্ষে উল্লেখ করেছেন : অর্থাৎ ৩ লক্ষ বলে। (একটি উপলক্ষে আবেগের ঘোরে তিনি প্রকৃতপক্ষে উল্লেখ করেছিলেন '৩ লক্ষ' বলে, যা অবশ্যই তিনি নিজেই পরে স্বীকার করেছিলেন 'মুখ ফসকে গেছে' বলে।) সর্বোচ্চ সংখ্যক কর্মী যা সংগ্রহ করতে পারা গিয়েছিল – তা ছিল ২৫ থেকে ৩০ হাজারের মধ্যে, এবং তারও অনেকটা ছিল কাগজে কলমে। প্রয়োজন হলে যুদ্ধ করতে সমর্থ এমন লোকের অর্থাৎ কার্যকরী শক্তি সংখ্যা, এবং যারা সেকেলে ধরনের হালকা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল, তাদের সংখ্যা ১২ থেকে ১৫ হাজারের বেশি ছিল না।

২৫ আগস্ট ১৯৪৩ তারিখে, সুভাষচন্দ্র সরাসরি নিজের হাতেই তুলে নিলেন INA বাহিনীর সর্বাধিনায়কের দায়িত্বভার। আর্মি সংক্রান্ত বিশেষ একপ্রস্থ নিয়মকানুন প্রস্তুত করা হয়েছিল। যাই হোক, জাপানি আর্মি থেকে পৃথক এবং স্বাধীন বাহিনী হিসেবে তার নিজস্ব সংগ্রামী ভূমিকাসহ INA বাহিনীর জন্যে জাপানি স্বীকৃতি লাভের আশায় যে উদ্যোগ-উদ্যম নেওয়া হয়েছিল, তা প্রবল চাপের সম্মুখীন হলো। ফিল্ড-মার্শাল কাউন্ট জুইচি তেরাউচি (Field-Marshall Count Juichi Terauchi), সাদার্ন এক্সপিডিশান ফোর্স-এর কমাণ্ডার-ইন-চিফ এ বিষয়ে ছিলেন অনিচ্ছুক। তিনি মনে করলেন যে, INA বাহিনী সংগ্রামী শক্তি হিসেবে যথেষ্ট শক্তিশালী নয় এবং তাকে কেবলমাত্র সাহায্যকারী শক্তি হিসেবেই সাহায্য-সমর্থন দেওয়া যেতে পারে। তিনি এমনকি আশংকা প্রকাশও করেছিলেন যে, এই INA বাহিনীকে যদি নিজস্বভাবে কোনো যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হয়, তাহলে তার ওপর কোনো জাপানি নিয়ন্ত্রণ রাখা যাবে না, এমনকি ঐ বাহিনী যদি ব্রিটিশ পক্ষে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেয়, সেক্ষেত্রেও না। ফিল্ড-মার্শাল তেরাউচি, সুতরাং জাপানি সুপারভাইসরি কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের সঙ্গে এ বিষয়ে একমত হতে পারেন নি কিংবা এরকম দায়িত্বের শরিক হতে চাননি।

কিছুকাল আগের কথায় পিছিয়ে গেলে, একথা স্মরণ করাই ভালো যে, সুভাষচন্দ্র যখন পূর্ব-এশিয়ায় এসে পৌঁচেছেন সেই সময়ে জাপান যুদ্ধে দারুণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে শুরু করেছে। প্রকৃতপক্ষে, তার প্রাথমিক সাফল্য হঠাৎ থেমে গেল মাঝপথে।

এসে। অ্যাডমিরাল ইসোরোকু ইয়ামামোতো-র (Adm. Isoroku Yamamoto) নৌবাহিনী আমেরিকান নেভির হাতে দারুণভাবে পরাস্ত হলো। সময়টা ছিল ১৯৪২-এর জুন মাসের গোড়ার দিকের কথা। জাপানি কর্তৃপক্ষের ক্ষতি ছিল শোচনীয় ভাবেই প্রচণ্ড : চারখানি বিমানবাহী জাহাজ, একটি ভারি যুদ্ধের ক্রুজার, এবং তিনশত খানিরও বেশি বিমান ; অথচ সেই তুলনায় আমেরিকান নৌবাহিনীর ক্ষতি অপেক্ষাকৃত সামান্যই।

মাঝপথে জাপানি পক্ষের পরাজয়ের সংবাদ জনসাধারণের কাছ থেকে চেপে রাখা হয়েছিল সামরিক নিষেধাজ্ঞার আদেশবলে। ১৯৪৩ সনের গোড়ার দিকে আমেরিকান পক্ষ থেকে প্রচণ্ড চাপ আসতে থাকে, প্রায় সমস্ত ফ্রন্ট থেকেই—উত্তর ও দক্ষিণ উভয় দিক থেকেই। ১৯৪৩ ফেবরুয়ারিতে গুয়াদালকানাল নামক স্থানে জাপানি আর্মি প্রচুর সংখ্যক হতাহতের ঘটনার মধ্যেই পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিল। শীঘ্রই সংবাদ এলো অত্যন্ত মারাত্মক ধরনের—যখন অ্যাডমিরাল ইয়ামামোতোকে একটি আমেরিকান বিমান থেকে গুলী করে মারা হয়, ১৪ এপ্রিল ১৯৪৩ তারিখে। আমেরিকা থেকে জাপানি মিলিটারি যোগাযোগের সাংকেতিক ব্যবস্থাকে নষ্ট করে দেওয়া হলো, এবং তার ফলে তারা শত্রুপক্ষ অর্থাৎ জাপানি বাহিনীর নৌবাহিনীর ও বিমানবাহিনীর গতিবিধির কথা, প্রায় দৈনন্দিন খবরের ভিত্তিতেই জেনে ফেললো।

ইয়োরোপে, সবকিছুই অত্যন্ত গোলমেলে অবস্থায় চলছিল জার্মানদের পক্ষে। ১লা ফেবরুয়ারি তারিখেই এলো স্তালিনগ্রাদে জার্মানির পক্ষে শোচনীয় পরাজয়ের সংবাদ, যে স্তালিনগ্রাদকে হিটলার খুব সহজেই দখল করতে পারবেন বলে ভেবেছিলেন। কিন্তু স্তালিনগ্রাদ চিহ্নিত হলো অসংখ্য জার্মান সেনার কবরখানা হিসেবে, এবং তা রাশিয়ান প্রতিরোধের ইতিহাসে এক কিংবদন্তি হয়ে দাঁড়ালো।

এসব সত্ত্বেও, জাপানিদের কাছে তাঁর আরো অস্ত্রশস্ত্র এবং অন্যান্য সুবিধা-সুযোগ লাভের জন্যে দাবিদাওয়ার পক্ষে সুভাষচন্দ্র ছিলেন নাছোড়বান্দা—যাতে তিনি INA বাহিনীকে তার তৎকালীন অবস্থা থেকে আরো বড় আকারে গড়ে তুলতে পারেন। দুঃখের কথা, তিনি জাপানিদের কাছে এমন একটা ধারণার ভাব দেখাচ্ছিলেন যাতে মনে হয় চারিদিককার এইসব ঘটনার প্রতি হয় তিনি বিস্মৃতিশীল, অথবা নিজের ওপর তিনি অত্যন্ত আস্থাশীল। কিন্তু নিজের সম্পর্কে তাঁর একটা বিশেষ নিজস্ব ধরনধারণ ছিল, এবং জাপানিরা তাঁর সম্পর্কে তাদের সমালোচনার মনোভাব খুব খোলাখুলি ভাবে জোর গলায় প্রকাশ করতো না, এবং তারা চেষ্টা করতো সুভাষচন্দ্রের ইচ্ছা আকাংক্ষার সঙ্গে যথাসাধ্য মনুষ্যোচিত ভাবে মানিয়ে চলতে।

ভিতরে ভিতরে সুভাষচন্দ্র দারুণ ভাবে প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন INA বাহিনীর

সংখ্যাগত শক্তি বাড়িয়ে তুলতে। তিনি এমনকি একটা নারী-বাহিনীও গড়ে তুললেন, তার নাম 'ঝাঁসির রাণী বাহিনী', ক্যাপটেন (ডক্‌টর) লক্ষ্মীর অধীনে। সুভাষচন্দ্র ছিলেন একজন ভালো বক্তা, যিনি তাঁর শ্রোতামণ্ডলীর মধ্যে একটা চরম আবেগের ভাবও জাগাতে পারেন। তিনি প্রায়ই অর্থ-ভাণ্ডারের জন্যে চাঁদা তোলার অভিযানও চালাতেন মাঝে মাঝে। 'তিন কোটি পাউণ্ড' ছিল তার লক্ষ্যমাত্রা। এবং 'আমি তা পাবো' এই দাবি তিনি করতেন। প্রকৃত-পক্ষে তিনি সফল হয়েছিলেন মোটা অঙ্কের টাকা সংগ্রহ করতে, তার অধিকাংশই জিনিসপত্রে : এমনকি গরিব মজুরশ্রেণীর মহিলারাও দান করেছিলেন তাঁদের সামান্য যা কিছু পুঁজি ছিল তা থেকে, কারণ তাঁরা অনুভব করেছিলেন তাঁরা যা করছেন তা তাঁদের মাতৃভূমির সেবার্থেই করছেন। এটা ছিল একটা অত্যন্ত আবেগময় দৃশ্য, যখন অনেকেই দান করে দিতেন তাঁদের একমাত্র 'মঙ্গলসূত্র' (তাকে বলা হয় 'থালি', তামিল ভাষায় : ছোট্ট একটা অলংকার, যা হলো তাদের বিবাহের পবিত্র চিহ্ন স্বরূপ), -- সুভাষচন্দ্রের যুদ্ধ-তহবিলের জন্যে।

কিন্তু সুভাষচন্দ্রের এই অর্থ-সংগ্রহ প্রচেষ্টার সবচেয়ে দুঃখের ঘটনা হলো যে, তিনি এই অর্থ-সংগ্রহের কোনো উপযুক্ত হিসাব রাখার প্রয়োজন বোধ করেন নি। কেউই জানে না কত টাকা কত ভাবে অপব্যব্যহার করা হয়েছিল, তাঁর চারপাশে যারা লোলুপদৃষ্টি নিয়ে ঘিরে থাকতো তাদের দ্বারা। এবং সবচেয়ে পরিহাসের কথা এই যে, যেসব ধনী ব্যক্তিরা খুব সহজেই মোটা অঙ্কের অর্থ দান করতে পারতেন তাঁরা অত্যন্ত সামান্য দান করে অব্যাহতি পেলেন, অথচ সুভাষচন্দ্র সেখানে অত্যন্ত গরিবশ্রেণীর কাছ থেকেও অর্থ আদায় করতে রেহাই দিলেন না। আমি একবার সুভাষচন্দ্রকে বলেছিলাম যে, তাঁর উচিত ধনীদের কাছ থেকে বেশি পরিমাণে এবং গরিবদের কাছ থেকে কম করে সংগ্রহ করতে। তিনি বলেছিলেন, অবশ্যই তিনি আমার সঙ্গে একমত, এবং এ ব্যাপারে তাঁর কাজের ধারা পবিবর্তন করবেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাঁর কাজের ধারা পরিবর্তন হয়নি।

আমি পিছন পানে তাকিয়ে দেখি অতীতের সেই যন্ত্রণাময় দিনগুলির দিকে। তখন বহু কথা হয়েছিল বড় আকারের দুর্নীতির বিষয়ে। দুঃখের কথা, সুভাষচন্দ্র নিজে সেই পরিস্থিতি সংশোধনের ক্ষেত্রে কিছুই করেন নি। গরিব ভারতীয় মজুরশ্রেণী, যাদের অধিকাংশই এসেছে তামিলনাড়ু থেকে, তারা অনেক বেশি দান করেছিল তাদের সামর্থ্যের তুলনায়, তারা জানতোই না কোনো একজন বা অন্য কেউ তার একটা মোটা অঙ্কের অর্থ অপহরণ করে নিচ্ছে -- যে অর্থ তাদের মাথার ঘাম ঝরিয়ে অর্জিত হয়েছে। সুভাষচন্দ্র ছিলেন একজন অত্যন্ত স্বদেশপ্রেমিক মানুষ। কিন্তু এটা দুঃখের বিষয় যে, তার ভিতরকার সেই

বৈশিষ্ট্যকে তিনি তাঁর পছন্দমতো কোটারির লোকদের কাজে লাগানোর সুযোগ দিয়েছিলেন তাদের অসংখ্য পাপ ও অপকর্ম ঢাকা দেবার কাজে। সাধারণত একথা বলা হয়ে থাকে যে, সোনার অলংকার এবং অন্যান্য মূল্যবান জিনিস-পত্রাদির অধিকাংশই মজুত করা হয়েছিল এস. এ আয়ারের তত্ত্বাবধানে,— একমাত্র তিনিই জানতেন সেই ভাণ্ডারে কী পরিমাণ সম্পদ ছিল এবং কোথায় ছিল সেই ভাণ্ডার।

১৯৪৩ নভেম্বরে রুজভেল্ট, চার্চিল, স্টালিন এবং চিয়াং কাইশেক মিলিত হলেন কায়রোতে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে যে, জাপানকে হঠিয়ে দিতে হবে ফরমোজা, মানচুরিয়া, পেসাডোরা এবং অন্যান্য অঞ্চল থেকে- যেসব অঞ্চল জাপান জোর করে দখল করেছিল, তার মধ্যে কোরিয়াও ছিল। ঐ নেতৃবৃন্দ পরে মিলিত হয়েছিলেন তেহেরানে—সেখানে এক গোপন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, রাশিয়াও আমেরিকান ও ব্রিটিশদের সঙ্গে যোগ দেবে জাপানিদের আক্রমণ করতে, যে মুহূর্তে ইয়োরোপিয়ান যুদ্ধজয় সম্পন্ন হয়ে যাবে।

মিত্র বাহিনীর এইসব পদক্ষেপের পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে জেনারেল তোজো, ঐ একই মাসে একটা অধিবেশনের ব্যবস্থা করলেন, যার নাম - গ্রেটার ইস্ট-এশিয়া কনফারেন্স (Grater East Asia Conference, Tokyo)।

একটি ঘটনা যা দুনিয়ার দৃষ্টি এড়ায়নি তা হলো, যেখানে কায়রো কনফারেন্স (Cairo conference) অনুষ্ঠিত হয় চারটি স্বাধীন বিশ্বশক্তির নেতৃবৃন্দের মধ্যে, সেখানে গ্রেটার ইস্ট-এশিয়া কনফারেন্স-এর অংশগ্রহণকারীরা সবাই এসেছিলেন জাপানি অধিকৃত এলাকা থেকেই। সুভাষচন্দ্র এসেছিলেন সিংগাপুর থেকে, ডক্টর বা মা (Dr. Ba Maw) এসেছিলেন বার্মা থেকে, পিবুলসনগ্রাম (Pibulson-ggram) থাইল্যাণ্ড থেকে, সুখারনো (Sukarno) ইনদোনেশিয়া থেকে, লরেল (Larel) ফিলিপাইন্‌স থেকে, এবং ওয়াং চিং-ওয়েই (Wang Ching-wei) এসেছিলেন চীন থেকে। আরেকজন ডেলিগেট ছিলেন মানচুকুওর প্রধানমন্ত্রী। সভাপতিত্ব করেছিলেন জেনরেল তোজো। সিদ্ধান্ত যা গৃহীত হয়েছিল তা খুবই সরল ও সাধারণ: গ্রেটার ইস্ট এশিয়া কো-প্রসপারিটি স্কিম (Greater East AsiaCo-Prosperity Scheme) বা বৃহত্তর পূর্ব-এশিয়া সহ-সমৃদ্ধি প্রকল্প সংস্থার উচিত সংহতি বজায় রেখে চলা এবং পশ্চিমি উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া – যতক্ষণ না জয়লাভ করা যাচ্ছে।

কায়রো কনফারেন্সে যেখানে জাপানের মধ্যে তার সংবাদ প্রচারের ওপর কড়া নিষেধাজ্ঞা ছিল, বিপরীতভাবে টোকিও কনফারেন্স প্রসঙ্গে সেখানে ব্যাপক প্রচারাভিযান চালানো হয়েছিল যাতে জনসাধারণের মধ্যেকার হতাশার মনোভাবকে চাপা

করে তোলা যায়। এটা অবশ্যই বলতে হবে যে, টোকিও কনফারেন্স-এর কালে সুভাষচন্দ্র ছিলেন একজন জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব, এবং তিনি প্রেসের কাছ থেকে সংবাদ বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি প্রকাশের ক্ষেত্রে বেশ গুরুত্বপূর্ণ প্রাধান্য পেয়েছিলেন। তিনি নিজেকে উপযুক্তভাবে চিহ্নিত করতে ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে যাঁদের ওপর তাঁর সম্পর্কে ভালো ধারণা সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন জেনারেল তোজো; যদিও তার ফলে সেই সময়কার সাধারণ পরিস্থিতির অবস্থাগত তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি।

সুভাষচন্দ্রের পক্ষে রাজনৈতিক ভাবে উন্নতিকল্পে, জেনারেল তোজো সেই কনফারেন্সের শেষে ঘোষণা করেন যে, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ যা জাপান কর্তৃক দখল করা হয়েছিল তা হস্তান্তর করা হবে প্রস্তাবিত স্বাধীন ভারতের প্রভিশনাল গভর্নমেন্টের হাতে। তার ফলে ঐ অন্তর্বর্তী সংস্থাকে এক 'সার্বভৌম অঞ্চলকে'-এর মর্যাদা এনে দেবে তার সাময়িক ভিত্তি হিসেবে। তা ছিল অবশ্যই একটা প্রতীক ঘোষণা স্বরূপ। জেনারেল তোজোর কোনো রকম ইচ্ছাই ছিল না সেই দ্বীপপুঞ্জের ওপর গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা অন্যের হাতে ছেড়ে দেওয়ার। কিন্তু ঐ ঘোষণার ফল নিঃসন্দেহে একটা অনুকূল প্রভাব সৃষ্টি করেছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াবাদী ভারতীয়দের ওপর।

টোকিও কনফারেন্সের প্রাক্‌কালের একটি কাহিনী, যদিও তার মধ্যে খুব বেশি রকম গুরুত্বপূর্ণ কিছু ছিল না তবুও তা উল্লেখযোগ্য, যেহেতু তার ফলে IIL সংস্থার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীদের মধ্যে সুভাষচন্দ্রের সহকর্মীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করতে পারে। সুভাষচন্দ্র যখন টোকিওতে পৌঁছলেন, তিনি দেখলেন যে, আমি ইতিমধ্যেই সেখানে হাজির রয়েছি। তিনি তাঁর সিংগাপুর ত্যাগের দু'দিন আগেই সেখানে আমাকে দেখেছেন, এবং তিনি জেনে অবাক হলেন যে তাঁর পৌঁছানোর আগেই আমি টোকিওতে পৌঁছে গেছি। তৎ-কালীন যানবাহনগত দারুণ অসুবিধার মধ্যেও একটা স্বাভাবিক কৌতূহল জাগা সম্ভব, অন্তত একটা আকস্মিক প্রশ্ন উঠতে পারে, কিভাবে আমি অত তাড়াতাড়ি সেখানে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে পেরেছিলাম। কিন্তু সুভাষচন্দ্র আমার যাত্রাপথের বিষয়ে সেরকম কোনো প্রশ্নই আমাকে করার প্রয়োজনই বোধ করেন নি।

আমারও কোনোরকম ক্ষোভ ছিল না সে বিষয়ে, এহেন উপেক্ষার জন্যে। কিন্তু রাসবিহারী যে ধরনের মনুষ্যোচিত আন্তরিক আগ্রহ দেখাতে কখনোই ভুলতেন না প্রত্যেকেরই প্রতি, এমনকি যখন তিনি প্রবল কাজের চাপের মধ্যে আছেন তখনো,—সেকথা আমি এক্ষেত্রে না বলে পারছি না। দুর্ভাগ্যক্রমে সুভাষচন্দ্র প্রায়ই, যদি সর্বদা নাও হয়, এমন একটা ভাব দেখাতেন তাঁর সহকর্মীদের কাছেও যে, তাঁর ও সহকর্মীদের মধ্যে একটা বাধার প্রাচীর রয়েছে।

কিভাবে আমি অত তাড়াতাড়ি টোকিও পৌঁচেছিলাম, তা খুবই সরল। জাপান

গভর্নমেন্ট এ বিষয়ে খুবই আগ্রহী ছিল যাতে টোকিওতে আমাকে সহজেই পাওয়া যায়, কনফারেন্স চলাকালে আলোচনার জন্যে এবং প্রয়োজনমতো সরাসরি আমাকে খবর দেওয়া যায়। আমার পক্ষে সুভাষচন্দ্রকে খবর দেওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না, যেহেতু তিনি ইতিমধ্যেই সিংগাপুর ত্যাগ করেছেন একটি বিমানে যে বিমান যাবে ঘুরপথে বৃত্তাকারে, অতএব সময়সাপেক্ষ যাত্রাপথ। কিন্তু আমি একটি সীমিত যাত্রাবিরতি সম্পন্ন বিমানের ব্যবস্থা করতে পেরেছিলাম। আমার একটি আসন সংগ্রহেরও সুযোগ হয়েছিল, যদি পাওয়া যায় তবে যেকোনো জাপানি যুদ্ধ বিমানে এবং অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে।

ইন্ডিয়ান ইনডিপেনডেন্স লিগের মতো এহেন বৃহৎ সংস্থায় দলগতভাবে কাজকর্ম করাই প্রাথমিকভাবে বিশেষ প্রয়োজন। সুভাষচন্দ্র তাঁর সহকর্মীদের অনেককে আরো ভালোভাবেই কাজে লাগাতে পারতেন, অন্তত কার্যত তিনি তাদের যেভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন তার চেয়েও ভালো ভাবেই। দুর্ভাগ্যক্রমে, নেতা হিসেবে তাঁর বিভিন্ন মহৎ গুণাবলী সত্ত্বেও আমার ধারণা, মানুষকে পরিচালনার কায়দা-কানুনের ক্ষেত্রে তিনি তেমন ভালো ছিলেন না। আমি অবশ্য একই সঙ্গে স্বীকার করবো, তিনি কখনোই আমার প্রতি কোনো অসম্মান প্রদর্শন করেন নি। আমি যা বলতে চাই তা হলো যে, এক্ষেত্রে আমার সঙ্গে যোগাযোগের ব্যাপারে ব্যাখ্যার অতীত এবং যেভাবেই হোক সম্পূর্ণ অকারণ একটা 'সতর্কতা'র ভাব ছিল তাঁর দিক থেকে। তবুও আমার দিক থেকে সর্বদাই আন্তরিক প্রচেষ্টা ছিল যাতে তিনি মনে করতে না পারেন যে আমি তাঁর সমতুল্য কোনো পদমর্যাদা লাভের চেষ্টা করছি। সম্ভবত তাঁর মনে হয়েছিল যে, জাপানি হাইকমাণ্ড আমাকে অনেক বেশি মর্যাদা দিচ্ছেন, অন্তত তাঁর চিন্তায় যেটুকু করা উচিত তার চেয়েও বেশি। তাঁর কাছে অখুশির কথা যে, ঐ ব্যাপারে তাঁর কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না।

আমার কয়েকজন বন্ধুরা আমার বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্র কর্তৃক জার্মান গেস্টাপোর দ্বারা সম্ভাব্য এইসব অযৌক্তিক আচরণের কথা মাঝে মাঝেই বলে আসছিলেন। সেসব ঘটনা যাই হোক, আমি আমার দিক থেকে ব্যক্তিগতভাবে কোনোক্রমেই নিজস্ব সত্তা বিসর্জন দিয়ে অন্যের কথায় নির্বিচারে চলার মনোভাবকে প্রশ্রয় দিইনি; অর্থাৎ কোনো ভাবেই আমার কর্তব্যকর্ম করার পথে কোনো রকম বাধা হয়ে দাঁড়াতে দিইনি, যেহেতু আমি তাঁদের দেখেছিলাম আমার নিজস্ব বিবেকবুদ্ধির দৃষ্টিতে। আমি বিশ্বাস করতাম যে, সংস্থা সর্বদাই যে-কোনো ব্যক্তি বিশেষের চেয়ে অনেক বড়। আমি তাই নিজেকে কেবলমাত্র সংস্থার প্রধানের কাছেই নয়, বরং সাধারণ ভাবে যেসব মানুষ আমার প্রতি তাঁদের আস্থা স্থাপন করেছেন, রাসবিহারীর নির্দেশে IIL-সংস্থা গঠনের দিন থেকেই, তাঁদের কাছেও আমি নিজেকে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছি।

টোকিও কনফারেন্সের পরে, সুভাষচন্দ্র কয়েকদিনের জন্যে টোকিওয় থেকে গেলেন জাপানি কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাদের কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য যুদ্ধ সংক্রান্ত সুবিধা-সুযোগ আদায় করে ভারতে একটি আক্রমণ প্রস্তুতির ব্যবস্থা করার জন্যে। কিন্তু তিনি ব্যর্থ হলেন। সিংগাপুরে ২৫ নভেম্বর ১৯৪৩ তারিখে তাঁর ফিরে আসার পরে, তিনি সম্ভবত অফিস-রেকর্ডের জন্যেই একটা 'গোপনীয় নোট' প্রস্তুত করলেন 'জাপানের অসহযোগী মনোভাব' সম্পর্কে। যখন ঐ কাগজটি আমার নজরে এলো, আমি ভাবলাম যদি তা কখনো জাপানিদের হাতে পড়ে, তবে তার ফলে অযথা প্রচুর ভুল বোঝাবুঝি হবে। এবং যদি শত্রুপক্ষ তা হাতে পায় তাদের গোয়েন্দাদের মারফৎ, তাহলে তা আরো বিপজ্জনক হতে পারে। ঐ দলিলটিতে ছিল সামরিক জিনিসপত্রের একটি তালিকা, জাপানের কাছে যার জন্যে অনুরোধ করা হয়েছিল, এবং যে সামান্য কিছু জিনিসপত্র দেবার কথা হয়েছিল তার উল্লেখ, এবং তাতে পরিষ্কার বক্তব্য ছিল যেসব নির্দিষ্ট জিনিসপত্রাদি জাপানিদের হাতে আদৌ ছিল না।

যুদ্ধের সময়ে সর্বদাই, গোপন তথ্যাদি অবশ্যই গোপনই রাখতে হবে। উপরি-উক্ত গুরুত্বপূর্ণ কাগজখানি অবশ্যই ওখানে থাকা উচিত হয়নি—যেখানে আমি সেটিকে দেখেছিলাম। এবিষয়ে আর কোনো হইচই না করে আমি চুপচাপ শান্তভাবে সেই কাগজখানিকে বেপাত্তা করে দেবার ব্যবস্থা করলাম। সেই পরিস্থিতিতে অনিবার্য আলোচনা করে দেখা গেল, সেই গোপন দলিলটির মূল্য হয়তো খুব বেশি ছিল না। তবুও আমি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কাগজপত্রাদির নিরাপত্তার গুরুত্বের প্রয়োজন বোঝাতে চেয়েছিলাম। আমি সেই দলিলের বিষয়টি ভালোভাবে মনে রেখে কাগজটি নষ্ট করে ফেললাম, এবং মনে মনে নিশ্চিত হলাম যে প্রয়োজন হলে আমি তা স্মরণ করতে পারবো। পরে যখন একদিন সুভাষচন্দ্র সেই কাগজখানির খোঁজ করছিলেন এবং তা দেখতে পেলেন না, আমি ভাবলাম আমি অবশ্যই তাঁকে বলবো ঘটনাটা কি ঘটেছে। আমি তাই করলাম, এবং দেখে খুশি হলাম যে তিনি সে বিষয়ে আর সন্ধান করলেন না বা কিছু বললেন না।

'হিকারি-কিকান'-এর প্রতিটি সভাতেই সুভাষচন্দ্রের চিন্তা হলো ভারতে সশস্ত্র অভিযান করা। মিঃ সেনদা (Mr. Senda) অনিবার্য ভাবেই সেই পরিকল্পনার প্রতিবাদ করেন কড়া ভাবে। তাঁর কোনো সন্দেহই ছিল না যে, ভারতে জাপানিদের দ্বারা বা INA সেনাদের দ্বারা কোনো রকম সশস্ত্র অভিযানের পরিণাম হবে আত্মঘাতী। কিন্তু সুভাষচন্দ্র তাতে সম্মত নন। তাঁর প্রতিবাদে মিঃ সেনদা সিংগাপুর ত্যাগ করলেন টোকিওর উদ্দেশে, 'হিকারি-কিকান'কে জানিয়ে গেলেন এ বিষয়ে তাঁর কাছ থেকে আর কোনোরকম পরামর্শই তিনি জানাবেন টোকিও থেকেই, যদি তাঁকে অনুরোধ করা হয়।

কিছুকাল আগে, ১৯৪৩ অকটোবরের কাছাকাছি সময়ে, শিবরাম এবং তাঁর অধীনে প্রচারকর্মের জন্যে ছোট একটি দল রেংগুনের দিক থেকে রওনা হলো স্থভাষচন্দ্রের নির্দেশক্রমে সেখানে প্রচারকর্মের ব্যবস্থাদির পুনর্গঠন করতে। প্রাথমিক ভাবে, লেঃ কর্নেল কিতাবে (Lt. Col. Kitabe) বার্মায় 'হিকারি-কিকান' সংস্থার প্রধান, এক্ষেত্রে সহায়ক ছিলেন না; কিন্তু শিবরাম শীঘ্রই লেঃ কর্নেল কিতাবে-র থেকে ভালো কাজ করলেন তাঁর কৌশলী ক্ষমতার সাহায্যে, এবং সেখানে একটি কার্যকরী প্রচার সংস্থা গড়ে তুলতে সমর্থ হলেন -- রেডিও রেংগুন থেকে প্রোগ্রাম পরিচালনার পক্ষে। এটা ছিল খুবই দায়িত্বপূর্ণ ঝুঁকির কাজ, যেহেতু ঐ সমগ্র এলাকাটিই ছিল ব্রিটিশ বোমাবাজির আওতার মধ্যে। এরকম একটি অভিযানের সময় শিবরামের বাড়িতে বোমার আঘাত হানা হয়েছিল। তবু এটা ছিল ভেলকি-বাজির মতো যে, শিবরাম রেহাই পেয়েছিলেন।

শিবরাম রেংগুনে ছিলেন প্রায় ৫-৬ মাসের জন্যে, এবং তিনি ছিলেন স্থভাষ-চন্দ্রের হেড-কোয়ার্টার্সে যা সেখানে স্থানান্তরিত হয়েছিল ১৯৪৪ জান্তয়ারিতে। স্থভাষচন্দ্রের অফিসে অবস্থানকালে, শিবরামের খুবই অস্থবিধা হয়েছিল প্রচারমন্ত্রী আয়ারের সঙ্গে – যাঁর প্রধান কাজই ছিল মনে হয় স্থভাষচন্দ্রকেই খুশি করা, এবং সাধারণত লোকে যা আশা করে না তাই, অর্থাৎ তিনি কোনোরকম গঠনমূলক প্রস্তাব, বা অন্তত শিবরামের কাছ থেকে প্রচারকর্ম বিষয়ে কোনোরকম ভালো পরামর্শ ইত্যাদি স্থভাষচন্দ্রকে দিতেন না। এক্ষেত্রে যা ছিল তা হলো বিভিন্ন মন্ত্রীদের মধ্যে তুচ্ছ ব্যাপারে ঝগড়াঝাঁটির ব্যাপার, এবং কয়েকজন মন্ত্রীদের মধ্যে ঢালাও দুর্নীতির ঘটনা। তাঁদের মধ্যে একজন স্থভাষচন্দ্রের আদেশে INA বাহিনীর সিক্রেট সার্ভিসের হাতে এমনকি গ্রেফতারও হয়েছিলেন, যেহেতু তিনি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিপজ্জনক বলে বিবেচিত হন। শিবরাম আমাকে একবার বলেছিলেন যে, তিনি তাঁর জীবনে এমন খারাপ প্রশাসন কখনো দেখেন নি, যেমনটি তিনি দেখেছেন স্থভাষচন্দ্রের হেড-কোয়ার্টার্স রেংগুনে থাকাকালে।

আমি সিংগাপুরে ছিলাম IIL-সংস্থার হেড-কোয়ার্টার্সের দায়িত্বে। আমার অফিসই তখন পর্যন্ত ছিল টোকিওস্থ জাপান সরকারের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রধান মাধ্যম। তাছাড়া এই অফিসই ছিল লিগের পক্ষে একমাত্র যোগসূত্র, যেখান থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় বাসিন্দাদের কাছে বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা ও ভারতের ভিতরকার ঘটনাবলীর সাংবাদাদি জানানো যায়। সংবাদ সরবরাহ এবং সিংগাপুর থেকে প্রচারমূলক বেতারবার্তাদি চালু রাখা হলো। স্থভাষচন্দ্রের মনো-যোগ নিবদ্ধ ছিল 'চলো দিল্লি' নামক সামরিক পরিকল্পনার মধ্যে, তাঁর কোনো-রকম সময় ছিল না ভারতীয় অসামরিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে জাপানি দখলদার বাহিনীর (Japanese Occupation forces) মধ্যেকার অসংখ্য সমস্যাদির বিষয়ে দেখা-শোনা করার মতো, অথচ তা ছিল অত্যন্ত বড় রকমের উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনায়

উৎস। আমি নিজে দারুণভাবে জড়িত ছিলাম 'হিকারি কিকান' সংস্থার সাহায্যে এইসব সমস্যাদির সমাধানের জন্যে।

প্রত্যেক নববর্ষের প্রথম সপ্তাহ ছিল (এবং এখনো আছে) জাপানে প্রচুর উৎসব অনুষ্ঠানের সময়। কিন্তু ১৯৪৪ জানুয়ারিতে মানুষজন হয়ে গেল বিষণ্ণ ও হতাশাগ্রস্ত। নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও যুদ্ধে জাপানের বিপর্যয়ের দুঃসংবাদ আসতে লাগলো স্বরাষ্ট্র দফতরে।

স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনী সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্র থেকেই জাপান পিছু হঠতে লাগলো প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায়। সরবরাহ ও পরিসেবা ব্যবস্থা বজায় রাখা মুশকিল হয়ে উঠলো। বিমানবাহিনী প্রচণ্ড রকম মার খাচ্ছিল, এবং একটা পর্যায়ে বিমানের কাঠামো তৈরি হতে লাগলো প্লাইউড দিয়ে এবং বার্মা থেকে প্রাপ্ত বিশেষ এক ধরনের শক্ত আঠা লাগিয়ে। যখন এই জিনিসটিরও সরবরাহে অসুবিধে হতে লাগলো সমুদ্রপথে বাধাপ্রাপ্তির জন্যে, জাপানি বিমানশাখাও তখন দারুণভাবে ঘা খেয়ে কমজোরি হয়ে গেল। যদিও জাপানবাসীদের মধ্যে সর্বপ্রকার কষ্ট সহ্য করে সংগ্রাম চালানোর দারুণ প্রাণশক্তি আছে, তবুও জনসাধারণ দেখলো তাদের সহ্যশক্তি প্রায় ভেঙে পড়ার মুখে এসে গেছে। সমস্ত জিনিসপত্রেরই সরবরাহ কমে গেল।

অধিকন্তু, জাপান গভর্নমেণ্ট তখন তার সমস্ত শক্তিকে সংহত করলো, তার মধ্যে ছিল—সমস্ত পুরুষ, ১২ থেকে ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত, এবং অবিবাহিত মহিলা ও বিধবা, ১২ থেকে ৪০ বছর বয়সের। এক চরম পদক্ষেপের ক্ষেত্রে, জেনারেল তোজো, 'আরো সংহত যুদ্ধ প্রচেষ্টা' হিসেবে নিজের হাতে নিলেন—প্রধানমন্ত্রীর, যুদ্ধমন্ত্রীর এবং আর্মি চিফ অফ স্টাফ-এর যৌথ দায়িত্ব—এক্ষেত্রে যা ছিল নজির-বিহীন পদক্ষেপ, এবং যার ফলে তাঁর আরেক উপনাম জুটে গেল 'টোটাল তোজো' 'Total Tojo') বা সর্বেসর্বা তোজো।

একসময়ে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, একটা প্রায়-চরম মুহূর্তে জেনারেল তোজো সুভাষচন্দ্র কর্তৃক বার্মা সীমান্ত পার হয়ে মিত্রবাহিনীকে আঘাত হানার চিন্তা পরিকল্পনা ও অবিরত অনুরোধ-উপরোধের উদ্দেশ্যে হঠাৎ 'সম্মতি' জানিয়ে বসলেন। জাপানি প্রধানমন্ত্রী অবশ্যই জানতেন যে, নিজের যোগাযোগের লাইন যা ইতিমধ্যেই প্রচণ্ড চাপের মধ্যে রয়েছে এবং সরবরাহ ও পরিসেবাগত শোচনীয় ঘাটতি চলছে, তখন জাপানের নিজস্ব কোনোরকম উপায়ই নেই যাতে সে সুদূর ভারতে কোনোরকম সশস্ত্র অভিযান চালাতে পারে। এটা অতএব মনে হলো 'ডুবন্ত মানুষের খড়কুটো ধরে বাঁচার চেষ্টার মতো' ঘটনা (জাপানি ভাষায়—**Obureku-monowa Waramo Tsukumu : a dying man catching at a straw**)।

সেক্ষেত্রে সম্মতি জানাতে গিয়ে, সামরিক ব্যক্তি হিসেবে তিনি অবশ্যই সাধারণত জানতেন তা হবে আত্মঘাতী ঘটনার সামিল, তবুও জেনারেল তোজো সম্ভবত দুটি বিষয়ের বিবেচনার দ্বারা চালিত হয়েছিলেন : ক) ভারতের ওপর আক্রমণ সম্ভবত মিত্রবাহিনীর দ্বারা বার্মাকে দখল প্রচেষ্টা প্রতিরোধের সবচেয়ে ভালো উপায়, এবং খ) জনসাধারণের মনোবলকে সম্ভবত এইভাবে একটা বৈচিত্র্যমুখী যুদ্ধফ্রন্ট খুলে চাঙ্গা করা যাবে, এবং তার ফলে এমন একটা ধারণার সৃষ্টি করা যাবে যে, প্রায় ভেঙে পড়ার পরিবর্তে জাপান এখনো জীবন্ত ও সংগ্রামশীল। সেক্ষেত্রে 'সম্ভবত' একটা ক্ষীণ আশা ছিল যে, যদি উত্তর-পূর্ব ভারত জয় করে নেওয়া যায়, এবং অ্যাংলো-আমেরিকান বাহিনী সেখান থেকে তার শক্তিকে প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়, তাহলে সেখান থেকে চীনে প্রচুর পরিমাণে বড় আকারের বিমান-বাহিত সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া যাবে, এবং তার দ্বারা জাপানি বাহিনীর উপর ঐ এলাকায় চীনের প্রচণ্ড চাপকেও ঠেকিয়ে সহজ করা সম্ভব হবে।

২৫.
ইম্ফল অভিযান

সামরিক দিকের দারুণ ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা চিন্তা না করেই সুভাষচন্দ্র তাঁর ভারত-অভিযান পরিকল্পনায় জেনারেল তোজোর সম্মতি নিলেন ব্যক্তিগত বিজয়াভিযানের ঘটনা হিসেবে। ১৯৪৪ জানুয়ারির গোড়ার দিকে সুভাষচন্দ্র ইতিমধ্যেই স্বাধীন ভারতের প্রভিশনাল গভর্নমেন্টের সদর দফতর রেংগুনে স্থানান্তরিত করে ফেলেছেন। এর কিছুকাল আগেই তিনি 'অফিসিয়ালি' আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। লেঃ কর্নেল এ. ভি. লোগানাথান (Lt. Col. Loganathan) সেখানে চিফ কমিশনার হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন—আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের জন্যে; তিনি দেখলেন আঞ্চলিক হাতবদল '('transfer of territory) ব্যাপারটা নিতান্তই সাধারণ, প্রকৃতপক্ষে ঐ দুটি দ্বীপপুঞ্জের কোনো ব্যাপারেই তাঁর কোনো কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ নেই।

জেনারেল তোজোর কাছ থেকে অপারেশান-U অভিযানের (ভারত-অভিযানের সাংকেতিক নাম) সংকেত পাওয়া মাত্রই সুভাষচন্দ্র দীর্ঘ আলোচনা করলেন যাঁদের সঙ্গে তাঁরা হলেন—লেঃ জেনারেল মাসাকাজু কাওয়াবে (Lt. Gen. Masakazu Kawabe), জাপানিজ-বার্মা এরিয়া আর্মির কমাণ্ডার, এবং লেঃ জেনারেল রেনিয়া মুতাগুচি (Lt. Gen. Ranya Mutaguchi), ভারত-

অভিযানের ভারপ্রাপ্ত অফিসার। সুভাষচন্দ্র প্রস্তাব করলেন, INA বাহিনী আক্রমণ পরিচালনা করুক, এবং জাপানি আর্মি তাকে অনুসরণ করুক। লেঃ জেনারেল কাওয়াবে একেবারে ক্ষেপে গেলেন। সুভাষচন্দ্র এই জাপানি মনোভাব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। তার ফলে সমগ্র পরিকল্পনাটার ওপরেই প্রায় যবনিকাপাতের ঘণ্টা বেজে উঠলো। জাপানি সেনারা ছিল তাদের সম্রাটের উপাসক। তারা কখনোই কোনো অ-জাপানি কমাণ্ডারের নির্দেশ অনুসরণ করবে না, বরং তারা যথাশীঘ্র 'হারাকিরি' করবে (পাকস্থলি চিরে ফেলে আত্মহত্যা করা), তবু জাতীয় গর্ববোধের প্রতি অবমাননাসূচক কোনো কিছুই করবে না। ফিল্ড মার্শাল তেরাউচি (Field Marshal Terauchi) যখন এ বিষয়ে শুনলেন, তিনিও দারুণ ক্ষেপে গেলেন, সম্ভবত লেঃ জেনারেল কাওয়াবের চেয়েও। যাই হোক, সেই প্রসঙ্গ চাপা পড়ে গেল যখন সুভাষচন্দ্র তাঁর মত বদল করলেন।

লেঃ জেনারেল কাওয়াবে এবিষয়ে যতদূর করতে রাজী ছিলেন তা হলো, জাপানি কমাণ্ডারের সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণাধীনে রেখেই INA বাহিনীর একটি রেজিমেণ্টকে একজন ভারতীয় কমাণ্ডারের অধীনে পরিচালনা করতে দেওয়া যেতে পারে। INA বাহিনীর সেনাদের পক্ষে কোনোরকম সংগ্রামী ভূমিকা নির্ভর করবে ঐরকম পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে নিযুক্ত উক্ত রেজিমেণ্টের কার্যকলাপের উপর। বাহিনীর অন্যান্যদের জন্যে এবং অন্য কয়েকটি বিষয়ে কিছু নিয়মকানুন থাকবে যৌথ ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষে সাহায্যকারী ভূমিকা হিসেবে, এবং এটাই মোটামুটিভাবে ঠিক হলো। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোনো কিছুই ভালোভাবে করা হয়ে ওঠেনি।

বিপরীতক্রমে, এক্ষেত্রে নানা সন্দেহ ও পারস্পরিক অভিযোগ–পাল্টা অভিযোগের ঘটনা ছিল। ঘটনাক্রমে পরীক্ষামূলক রেজিমেণ্ট ব্যতীত আর যেসব বিষয়ে লেঃ জেনারেল কাওয়াবে ও লেঃ জেনারেল মুতাগুচি একমত হয়েছিলেন তা হলো-- INA বাহিনীর কয়েকটি ছোট ছোট ইউনিট (১০০ থেকে ২০০ সেনা নিয়ে) জাপানি কমাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করা, এবং অবশ্যই তা হবে গৌণ কর্মের ভিত্তিতে, যেমন–রাস্তা ও সেতু তৈরি করা, রেশনের জিনিসপত্রাদি পরিবহনের কাজ করা, সরবরাহ লাইন পাহারা দেওয়া, জঙ্গলের আগুন নেভানোর কাজ করা, গোরুর গাড়ি ও ঐ ধরনের অন্যান্য গাড়ি চালানো ইত্যাদি কাজ করা। যাই হোক, ঐ 'পরীক্ষামূলক রেজিমেণ্ট'কে উভয় সহযোগী পক্ষের দিক থেকেই কোনোরকম অফিসিয়াল ব্যবস্থা হিসেবেও কদাচিৎ কাজে লাগানো হয়েছিল কিনা সন্দেহ।

সামরিক অভিযান যা গৃহীত হয়েছিল তা ছিল দ্বিমুখী : একদিকে আরাকান হিল্‌স ও অন্যদিকে ইমফল অভিযান। আরাকান যুদ্ধ শুরু হলো ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪ তারিখে এবং কিছুকালের জন্যে তা জাপানিদের পক্ষে ভালোই চলেছিল। কিন্তু মিত্রবাহিনী শীঘ্রই সেই অবস্থা সামলে নিল এবং জাপানিদের পাল্টা আঘাত করলো, বাধ্য করলো বিজয়ী জাপানি বাহিনীকে পিছু হঠতে এবং তাকে কোনঠাসা

করে রাখলো যাতে সে পাল্টা আঘাত হানতে না পারে—ভারত-বার্মা সীমান্তের দক্ষিণ ভাগে।

ইমফল অভিযান শুরু হলো ২১ মার্চ ১৯৪৪ তারিখে, কিন্তু শেষ হতে লাগলো প্রায় তিনমাস—যাকে যুদ্ধের ইতিহাসকাররা দুনিয়ার যে কোনো স্থানে সংঘটিত স্থলযুদ্ধের ইতিহাসে এই ঘটনাটিকে সর্বাপেক্ষা শোচনীয় একক ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

জাপানিরা যুদ্ধে প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার সেনা নিয়োগ করেছিল, কিন্তু তার প্রস্তুতি ছিল ক্রটিপূর্ণ ভাবেই অপ্রচুর এবং এলোমেলো। এক্ষেত্রে কোনোরকম ভারি যন্ত্রপাতি ছিল না, এমনকি ছোটখাটো অস্ত্রশস্ত্রের সরবরাহও ছিল প্রয়োজনের তুলনায় শোচনীয়ভাবেই কম। পরিবহনের কাজের জন্যে সবসুদ্ধ মাত্র ২৬ খানি চার-টনি ট্রাক ছিল, তাদের অধিকাংশেরই অবস্থা ছিল খারাপ, কয়েকখানি এমনকি যাত্রা শুরু করার আগে পর্যন্তও ছিল ভাঙা। রেশনের আংশিক জিনিসপত্রাদি বহন করা হয়েছিল গোরুর গাড়িতে, এবং অবশিষ্ট অংশ বহন করা হয়েছিল পদাতিক সেনাদের দ্বারা মাথায় করে। এক্ষেত্রে চিকিৎসার সুবিধা-সুযোগ ছিল খুব সামান্যই, অথচ এই এলাকা ছিল সবচেয়ে বেশি রকম রোগ-ব্যাধি কবলিত।

সুভাষচন্দ্র সহ সমস্ত বেস কমাণ্ডারই দারুণভাবে অজ্ঞ ছিলেন ভারতীয় পক্ষের পরিস্থিতি বিষয়ে। মিত্রপক্ষের সাউথ-ইস্ট এশিয়া কমাণ্ড (South-East Asia Command : SEAC) স্থাপিত হয়েছিল অ্যাডমিরাল লুই মাউণ্টব্যাটেন-এর (Adm. Louis Mountbatten) সর্বোচ্চ কমাণ্ড-এর অধীনে—এই কমাণ্ড জমায়েত হয়েছিল দৃঢ় সংকল্প নিয়ে—কেবলমাত্র ভারতের মধ্যে কোনো রকম সফল জাপানি অগ্রগতি রোধ করতেই নয়, বরং তার লক্ষ্য ছিল আরাকান ও মাইৎকিনা সীমান্ত থেকে শুরু করে সমগ্র বার্মা পুনরুদ্ধার করা, এবং তারপর চিন্‌দউইন উপত্যকা ও অন্যান্য অঞ্চলে অভিযান করা। জাপানি ইনটেলিজেন্স সার্ভিস ছিল হতাশাজনক ভাবেই দুর্বল। যখন বার্মা এলাকার জাপানি বাহিনী ইমফল অভিযানের আদেশ দেয়, তারা তখন জানতোই না যে ঐ এলাকায় মিত্রপক্ষের SEAC বাহিনী ছিল দাঁতে-চাপা রকমের সশস্ত্র, সংখ্যায় ছিল তারা জাপানি বাহিনীর চেয়ে তিনগুণ শক্তিশালী, তারা অপেক্ষা করছিল জাপানি বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে। জাপানি বাহিনীর প্রকৃতপক্ষে কোনোরকম বিমানছত্রের ব্যবস্থা ছিল না। জাপানি বাহিনীর অধীনস্থ অভিযানমূলক বিমানবাহিনী ছিল মিত্রপক্ষের সংহত শক্তির তুলনায় এক-দশমাংশেরও কম। তরাই অঞ্চল ছিল মাউণ্টব্যাটেনের কমাণ্ডের কাছে পরিচিত, কিন্তু জাপানি ও INA বাহিনীর কাছে তা ছিল বিস্ময়কর ভাবে অপরিচিত।

সিংগাপুরে, জাপানি আর্মির প্রচারমূলক কাজকর্ম আমাদের কাছে শূন্যগর্ভ ফাঁকা বলে মনে হলো। জাপানি ও INA বাহিনীর মিথ্যা বিজয়কাহিনী প্রচার করা হয়েছিল। একখানি ছবি বিলি করা হয়েছিল, সম্ভবত একখানি ফটোগ্রাফ, জাপানি সেনা ও INA বাহিনীর দ্বারা ইমফল জয়ের চিত্র সংবলিত, এবং সেই সঙ্গে দেখা যাচ্ছিল সুভাষচন্দ্রের একটি প্রতিকৃতি ; এবং সেনারা ভারতীয় পতাকা পুঁতছে বিজিত অঞ্চলের মাটির মধ্যে, যা দেখলে সহজেই বোঝা যায় সেই ছবি মালয়ের একটি পরিচিত গ্রাম থেকে নেওয়া।

ইমফল অভিযান বিষয়ে বিভিন্ন গল্পকথা শোনা যায়। কেউ কেউ বলেন, জাপানি ও INA বাহিনী এমন সাংঘাতিক ভাবে যুদ্ধ করেছিল যে, ব্রিটিশ বাহিনী প্রাথমিক ভাবে নিজেরাই ইমফল থেকে তার বাহিনী প্রত্যাহার করে নেয়। ইমফল শহরটি তাই প্রকৃতপক্ষে আক্রমণকারী বাহিনীর দখলেই ছিল কিছু সময়ের জন্যে। অন্যান্য বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, ঠিক যে সময়ে অভিযানটি বিজয় সাফল্যের মুখে, জাপানি ও INA বাহিনীর দিকে তখন সমস্ত সরবরাহ, এমনকি অস্ত্রশস্ত্রেরও টান পড়েছে। তখন তাদের পিছনে হঠিয়ে দিল ব্রিটিশ বাহিনী, বিশেষত গুর্খা রেজিমেণ্ট। কেউই নিশ্চিত ভাবে বলতে পারে না, সঠিক কি ঘটেছিল, একমাত্র তার পরিণতিতে দেখা গেল সমস্ত অভিযানটাই একটা শোচনীয় বিপদ হিসেবে দেখা দিল জাপানি ও INA বাহিনীর পক্ষে।

কিন্তু আমার পরিচিত কয়েকজন জাপানি যাঁরা ছিলেন ঐ অভিযানে ফিল্ড কমাণ্ডার তাঁদের কাছ থেকে আমি শুনেছিলাম যে, জাপানি ও INA বাহিনীর সেনারা অস্ত্রশস্ত্রের দিক থেকে শোচনীয়ভাবেই ত্রুটিপূর্ণ ও দুর্বলভাবে সজ্জিত এবং সংখ্যায় অত্যন্ত কম। তাদের পক্ষে, বিপুল সংখ্যক সুসজ্জিত ও সশস্ত্র ব্রিটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে জয়লাভের কোনোরকম সুযোগই ছিল না। কিন্তু এমন একটা ভাব দেখানো হয়েছিল যে, ব্রিটিশ বাহিনী যেন দারুণ চাপের মধ্যে রয়েছে, এবং ইচ্ছাকৃত ভাবেই সেই অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছিল মিত্র বাহিনীর দ্বারা। এক চতুর কর্মকৌশল হিসেবে, ইমফল ও কোহিমা উভয় যুদ্ধাঞ্চলেই ব্রিটিশ বাহিনী অভিযানকারী জাপানি ও INA বাহিনীগুলিকে সুবিধে দিয়েছিল কিছুক্ষণের জন্যে অবাধে ঢুকে পড়তে এবং তারপরে তাদের পরিবেষ্টিত করে, আটক করে শেষে ধ্বংস করে দিয়েছিল। জাপানি বাহিনীগুলি এবং INA বাহিনীর একটি কর্নেল এম. জেড. কিয়ানি-র (Col. M. Z. Kiani) অধীনে বেশ সাহসিকতার সঙ্গেই যুদ্ধ করেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হতাশভাবেই পরাজিত হয়।

ইমফল অভিযানে জাপানি পক্ষের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হলো শোচনীয়। প্রায় ৬৫ হাজার নিহত, এবং জঙ্গলের পথে পিছু হঠার কালে অসংখ্য মৃত্যু হলো ম্যালেরিয়া, কলেরা, টাইফয়েড ও অন্যান্য রোগে। এটা হলো ঠিক যেন মৃত্যু-মিছিলের মতো, এবং তার ফলে স্থাপিত হলো ভয়ংকর এক রেকর্ড। সেই জঙ্গল

ছিল প্রচণ্ড মৌসুমী বর্ষার জলকাদায় ভর্তি, এবং সেই জলাভূমি ও পাহাড়ি পথঘাট উভয়ই অবরুদ্ধ ছিল স্ফীত ও দুরন্ত রকমের সর্বনাশা নদীনালার দ্বারা। বহুসংখ্যক সেনার মৃত্যু হয় বিষাক্ত সাপের কামড়ে এবং অন্যান্য অজানা বিপদের কবলে পড়ে। তাছাড়া ছিল ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, মৃত্যু ইত্যাদি, বার্মা বেস পর্যন্ত সমস্ত রাস্তা ব্যাপী। এবং আরো কিছু সংখ্যক মৃত্যু হয় এমনকি দলভ্রষ্ট ও পথভ্রষ্ট হয়ে হেড-কোয়ার্টার্সের হাসপাতালে যাবার পরেও, যেহেতু তারা তখন দুরারোগ্যভাবেই রুগ্ন হয়ে পড়েছিল।

একটি স্বল্পজ্ঞাত ঘটনা হলো এই যে, তিনজন ফিল্ড ডিভিশন কমাণ্ডার—লেঃ জেনারেল ইয়ানাগিদা (Lt. Gen. Yanagida), লেঃ জেনারেল ইয়ামাগুচি (Lt. Gen. Yamaguchi) ও লেঃ জেনারেল সাতো (Lt. Gen. Sato) সকলেই তিক্ততার সঙ্গেই প্রতিবাদ জানালেন তাঁদের উর্ধ্বতন অফিসার লেঃ জেনারেল মুতাগুচি (Lt. Gen. Mutaguchi) ও লেঃ জেনারেল কাওয়াবে-র (Lt. Gen. Kawabe) কাছে, এবং শেষ পর্যন্ত ফিল্ড মার্শাল তেরাউচি-র (Field Marshall Terauchi) কাছে—বেস কমাণ্ডারদের দ্বারা এই অভিযানের সামগ্রিক অব্যবস্থার জন্যে। লেঃ জেনারেল মুতাগুচি কঠোর ব্যবস্থা নিলেন এবং ঐ তিন ফিল্ড ডিভিশন কমাণ্ডারদের প্রত্যেককেই সরিয়ে দিলেন, কিন্তু তার দ্বারা অবস্থার উন্নতি হলো না। লেঃ জেনারেল কোতোকু সাতো (Lt. Gen. Kotoku Sato), যিনি তাঁর প্রায় ২৫ হাজার ভালো সেনাকে হারিয়েছিলেন, তিনি লেঃ জেনারেল মুতাগুচিকে মানতে অস্বীকার করলেন, এবং তাঁর জীবিত প্রায় ১০ হাজার সেনা নিয়ে প্রত্যাহার করতে শুরু করলেন ও সেখান থেকে যুদ্ধ করার আদেশ অমান্য করলেন। লেঃ জেনারেল মুতাগুচি কর্তৃক তাঁকে কোর্ট-মার্শাল করার হুমকি দেবার ফলে লেঃ জেনারেল সাতো ফেটে পড়লেন এবং মুখের ওপর জবাব দিলেন এই বলে যে, তিনি ঐ আদেশ মানতে অস্বীকার করছেন কারণ, এই অভিযানের সমগ্র পরিকল্পনাটাই হলো 'বোকামি ও পাগলামি' ('stupid and mad')। সমগ্র জাপানি মিলিটারির ইতিহাসে এটাই হলো একজন ফিল্ড কমাণ্ডার কর্তৃক বা অন্য কারো দ্বারা খোলা-খুলি ভাবে অবাধ্যতার একমাত্র ঘটনা। এবং এটাই হলো ইমফল পতনের ব্যাপকতার একটা মাপকাঠি।

INA বাহিনীর হতাহতের সংখ্যা হলো: প্রায় ৬০০ নিহত, এবং ২০০০ জনের মৃত্যু হয় খাদ্যাভাবে ও রোগভোগের ফলে। এবং যারা বার্মায় ও হাসপাতালে ফিরে যেতে সমর্থ হয়েছিল, তাদের সংখ্যা ছিল মাত্র ২৫০০ জনের মতো। মোটামুটি ভাবে, ২০০০ জনের মতো সেনা এই বাহিনী ছেড়ে ব্রিটিশ পক্ষে যোগ দিয়েছিল যুদ্ধ চলাকালে। এটা ছিল সুভাষচন্দ্রের পক্ষে একটা বড় আঘাত—ফলে সুভাষচন্দ্র জোর গলায় ঘোষণা করলেন, যে মুহূর্তে INA বাহিনীর সেনারা

ভারতের মাটিতে গিয়ে পা দেবে, প্রতিপক্ষ ব্রিটিশ কমাণ্ডের অধীনে যুদ্ধরত ভারতীয় সেনারা সঙ্গে সঙ্গেই INA বাহিনীর সঙ্গে দলে দলে যোগ দেবে, এবং 'দিল্লি মার্চ' (দিল্লি চলো) অভিযানে অংশ গ্রহণ করবে। কিন্তু এই দলত্যাগের ঘটনা হলো বিপরীত ভাবে। দলত্যাগীরা নিঃসন্দেহেই মার্চ করেছিল, অথবা সম্ভবত তাদের ট্রেনে করে বা বিমানে করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল দিল্লির দিকে—কিন্তু INA-তে নয় তখনো পর্যন্ত। INA বাহিনী তারপর দেখলো জাপানের পরাজয়, এবং সেখানেই শেষ হলো সেই যুদ্ধের।

আমাদের মন অবশ্যই এই যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতি স্বরূপ মৃতদের পক্ষে যাবে। প্রায় ৭০ হাজারেরও বেশি যুবকরা তাদের রক্ত দিয়ে যুদ্ধের মূল্য দিয়েছিল এই যুদ্ধের অযৌক্তিক সিদ্ধান্তের ফলে – যার ওপর তাদের কোনো হাত ছিল না।

দারুণ এক আতংকের মধ্যে আমরা সিংগাপুরে বসে এই খবর শুনলাম যে, এতসব ঘটনা সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্র তখনো আশাবাদী ছিলেন, এবং চেষ্টা করছিলেন বাহিনীকে পুনর্গঠিত করতে এবং প্রস্তুত হচ্ছিলেন ভারতে দ্বিতীয় অভিযান চালাতে। যখন আমরা একটা রিপোর্ট পেলাম, সুভাষচন্দ্র লেঃ জেনারেল কাওয়াবেকে বলেছেন তিনি 'ঝাঁসির রাণী' রেজিমেন্টের নারী-বাহিনীকে পাঠাবেন যুদ্ধাঞ্চলের অগ্রবর্তী ঘাঁটিগুলিতে নতুন করে বদলি সেনা হিসেবে, আমাদের আশংকা হলো সুভাষচন্দ্র হয়তো মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন, এবং তাঁকে অবশ্যই তখনি চিকিৎসাধীনে রাখতে হবে। দৈবক্রমে, লেঃ জেনারেল সুভাষচন্দ্রের সেই প্রস্তাব মানলেন না। আমার দিক থেকে আমি 'হিকারি কিকান' সংস্থাকে বললাম বার্মা এরিয়া আর্মিকে একটা পরামর্শ দিতে, যদি আরেকটি অভিযানের চেষ্টা করা হয়, তাহলে ঐ কমাণ্ডে আদৌ জীবিত কেউ থাকবে না, এবং ইতিহাস সুভাষচন্দ্রকে শাপান্ত করবে চিরকালের জন্যে। সমগ্র বার্মা-এরিয়া আর্মি ইতিমধ্যেই প্রায় ভেঙে পড়ার মুখে এসে গিয়েছিল—ভারতের দিক থেকে SEAC বাহিনীর আক্রমণাত্মক চাপের ফলে, কিন্তু তখনো তা কোনো রকমে টিঁকে ছিল, এবং জাপানি বাহিনীর নিষ্ঠা ছিল উল্লেখযোগ্য, কারণ বেশ কয়েক মাসের জন্যে ব্রিটিশ বাহিনী মূল বার্মা ডিফেন্স বাহিনীর মধ্যে ঢুকে পড়তে সমর্থ হয়নি।

এমনকি যখন দুর্ভাগ্যজনক ইমফল অভিযান প্রায় শোচনীয় পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, তখন একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটলো সিংগাপুরে। কে. পি. কেশব মেননকে গ্রেফতার করা হলো এবং তাঁকে জেলবন্দী করা হলো ২৪ এপ্রিল ১৯৪৪ তারিখে।

কেশব মেনন রাসবিহারীর প্রতি অবিচার করেছেন একটা ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, এই মহান ভারতীয় স্বদেশপ্রেমিকের জাপানি নাগরিকত্বের

'টেকনিক্যাল স্ট্যাটাস'ই হলো তাঁর পক্ষে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের (ইনডিয়ান ফ্রিডম মুভমেণ্ট) সক্রিয় নেতৃত্বপদে থাকার পক্ষে বাধা স্বরূপ। তা সত্ত্বেও, IIL-সংস্থার রাসবিহারী সহ, প্রত্যেকেই, কেশব মেননকে সম্মান করতেন তাঁর স্পষ্টবাদিতা ও ব্যক্তিত্বের জন্যে। তিনি ছিলেন একজন গোঁড়া জাতীয়তা-বাদী এবং গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের (ইনডিয়ান ন্যাশ-নাল কংগ্রেস) একজন গোঁড়া সমর্থক। আমি তাঁকে জানতাম, এবং কিছু পরিমাণে তাঁর সঙ্গে কাজকর্মের অভিজ্ঞতা ছিল, এমনকি যখন আমি ছাত্র ছিলাম ত্রিবান্দ্রামে।

যখন সামান্য পরিমাণে নরম হওয়াই কাম্য, তখন কেশব মেনন বরং কড়া হতেই ইচ্ছুক, কিন্তু তা ছিল তাঁর জোরালো ব্যক্তিগত মূল্যবোধ ও বিচারবোধ, যেদিকে তিনি দারুণভাবে আকর্ষণ বোধ করতেন এবং যা ছিল তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্বের অঙ্গ বিশেষ। যাঁরা তাঁকে ভালোভাবে জানতেন, যেমন রাসবিহারী ও আমার মতো অন্যেরা, তাঁর এই ভালোমানুষী তাঁরা বুঝতেন।

যতদূর আমি জানি, যাঁরা কে. পি. কেশব মেনন বা INA বা IIL সম্পর্কে লিখেছেন তাঁরা কেউই এখনো পর্যন্ত লেখেন নি: কেন প্রকৃতপক্ষে তিনি জাপানি আর্মির দ্বারা কারাবন্দী হয়েছিলেন সিংগাপুরে। আপাতদৃষ্টে মনে হয়, ঐ লেখকরা সেকথা জানতেন না। সম্ভবত কেশব মেনন নিজেও পুরোপুরি ভাবে সেই কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন না, যেহেতু এক্ষেত্রে তার কোনো উল্লেখই নেই তাঁর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালীন সেই বিরাটায়তন ও প্রচুর তথ্যপূর্ণ মালয় বাসের জীবনস্মৃতিতে। এই সত্য যা সিংগাপুরে থাকতে আমার কাছে এবং টোকিও থাকতে রাসবিহারীর কাছে পরিজ্ঞাত ছিল, যেহেতু জাপানি আর্মির অন্তরঙ্গ মহলের 'গোপনীয়তা'র মধ্যে আমাদের উভয়েরই প্রবেশাধিকার ছিল, এবং তা হলো: **কেশব মেননকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল সুভাষচন্দ্র বোসের নির্দেশে।**

কেশব মেননের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল নিজস্ব মতামত হাতুড়ির-মতো ঘা দিয়ে সশব্দে প্রকাশ করা, এমনকি তা যুদ্ধকালীন অস্বাভাবিক পরিবেশেও, যার ফলে প্রায়ই আমার চিন্তা হতো। তাছাড়া তিনি রক্ষীবিহীন ভাবেই চলতে ইচ্ছুক ছিলেন, এমনকি সব সময় সে বিষয়ে ভালোভাবে তিনি চিন্তাভাবনার ধারও ধারতেন না—কার সঙ্গে তিনি কথাবার্তা বলছেন খুব গোপন বিষয়েই। সুভাষচন্দ্রের নীতির বিষয়ে তাঁর প্রবল প্রতিবাদ, বিশেষত যেখানে তাঁর সঙ্গে ইনডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সঙ্গে সংঘর্ষ হতো, তা ছিল সুবিদিত। সুভাষচন্দ্রের পরম পৃষ্ঠপোষকতায় জাপানি ও INA বাহিনীর দ্বারা ভারত অভিযানের যেসব ভয়ংকর কাহিনীর খবর এসে পৌঁছতে লাগলো, তা যেন তাঁকে বিপর্যস্ত করে ফেললো। এবং তার ফলেই তাঁর তিক্ততা আরো বেড়ে গেল সুভাষচন্দ্রের

নেতৃত্বের বিরুদ্ধে।

সেই সময়ে, যখন কেশব মেনন একদিন তাঁর বাড়িতে এক দর্শনপ্রার্থীর সঙ্গে কথা বলছিলেন, তিনি অন্যসব কথার সঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন—যে সুভাষচন্দ্র নিজেকেই ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতের জন্যে 'রাষ্ট্রপ্রধান' (Head of State) হিসেবে নিজেই নিযুক্ত করেছেন, গান্ধী-নেহরু-প্যাটেল প্রমুখের ওপরে, এবং ভারত অভিযানের জন্যে আত্মঘাতী পথ নিয়েছেন, সেই 'রাষ্ট্রপ্রধানেরই' প্রয়োজন উপযুক্ত পরীক্ষার ও চিকিৎসার। তিনি আরো বলেছিলেন যে, এই 'রাষ্ট্রপ্রধান' যিনি একদা ভারতে থাকতে নিজেকে 'সমাজবাদী' হিসেবে দাবি করেছিলেন সেই সুভাষচন্দ্র প্রকৃতপক্ষে একজন 'ফ্যাসিস্ট' এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তাঁর কার্যকলাপের মধ্যে তাঁর ডিকটেটার সুলভ আচরণের দ্বারা তা প্রমাণিত হয়েছে।

ঐ দর্শনার্থী সম্ভবত একজন গুপ্তচর, তিনি কেশব মেনন কৃত সুভাষচন্দ্রের প্রতি এই মন্তব্য রিপোর্ট করলেন গিয়ে সুভাষচন্দ্রের কাছে। রাগে ও প্রতিহিংসায় উত্তেজিত হয়ে সুভাষচন্দ্র বললেন বার্মা-এরিয়া আর্মিকে, যাতে সিংগাপুরস্থ জাপানি মিলিটারি পুলিশকে বলে কশব মেননকে গ্রেফতার করে—একজন 'বিপজ্জনক ব্যক্তি' হিসেবে এবং জাপানি যুদ্ধ প্রচেষ্টা সংক্রান্ত তথ্যাদি ফাঁস করে দিয়ে নিরাপত্তার ব্যবস্থা বিপন্ন করে তুলছে, এই অভিযোগে।

কিন্তু অন্য কেউ কেউ মনে করেন যে, কেশব মেনন গ্রেফতার হয়েছিলেন সিংগাপুরস্থ জাপানি কর্তৃপক্ষের নির্দেশে, যারা ভারত সংক্রান্ত বিষয়ে 'হিকারি কিকান' সংস্থার প্রতিনিধিত্ব করছিল। তবে তা সত্য নয়। তাঁকে গ্রেফতারের আদেশ এসেছিল রেংগুন থেকে সুভাষচন্দ্র বোসের অনুরোধে, এক সিগন্যালের মাধ্যমে, এবং তা এসেছিল বার্মা-এরিয়া আর্মি থেকে সরাসরি সিংগাপুরের মিলিটারি পুলিশ কমাণ্ডের কাছে। এই ঘটনার খবর 'হিকারি কিকান' সংস্থায় ও সেইসঙ্গে IIL-সংস্থার সদর দফতরে আসে—কেশব মেননকে যখন গ্রেফতার করে নিয়ে তাঁকে লক-আপে রাখা হয়ে গেছে, তার পরে।

রেংগুন থেকে ঐ খবরটি আসে জরুরি বার্তা হিসেবে, এবং মিলিটারি পুলিশ তদনুসারে কাজ করে দ্রুতগতিতে। তারা কেশব মেননের বাড়িতে যায় সকাল ৪টায়, তাঁর পরিবারের সকলকে একসঙ্গে জড়ো করে রাখে এক ঘরের মধ্যে কড়া পাহারায়, এবং তাঁকে নিয়ে চলে যায় এমনকি স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের কাছেও একটি কথা বলার সুযোগ না দিয়ে, তারা জানতেও পারলো না কোথায় তাঁকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এটা রীতিমতো মুখের ওপর অপমান করা এবং তা কেবল সাধারণ সৌজন্য বিরোধীই নয়, তা IIL-সংস্থা ও 'হিকারি কিকান' সংস্থার প্রতিও বিরুদ্ধাচরণ। কেশব মেনন তাঁর গ্রেফতার হওয়ার সময়েও ছিলেন IIL-সংস্থার একজন সদস্য।

যাঁরাই রাসবিহারী বোসের হাতে ইনডিয়ান ইনডিপেনডেন্স লিগের (IIL) সূচনা ও বিকাশ লক্ষ্য করেছেন, তাঁদের যে কোনো ব্যক্তির কাছেই এটা অভাবনীয় যে,

ভবিষ্যতে এমন কোনো সময় আসবে যখন রাসবিহারীরই উত্তরসূরী (সুভাষচন্দ্র) জাপানি মিলিটারি পুলিশকে বলবে কেশব মেননের মতো স্বদেশপ্রেমিককে বন্দী করে রাখতে। এবং যেটা সবচেয়ে খারাপ তা হলো, কেশব মেননের সঙ্গে তৃতীয়-শ্রেণীর কয়েদির মতো ব্যবহার করা হলো এবং তাঁকে জেলবন্দী করা হলো প্রথমে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে এবং পরে চরম কষ্টযন্ত্রণার মধ্যে থাকার শর্তে কারাদণ্ড দেবার জন্যে। তাঁকে এমন সাংঘাতিক দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্যে থাকতে হয়েছিল যে, তাঁর বেঁচে থাকাটাই ছিল আশ্চর্যের কথা, বিশেষত যাঁরা জানতেন কী সাংঘাতিক দুঃখ-যন্ত্রণা তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল। IIL-সংস্থার পক্ষে যাঁরা দারুণ ক্ষতিকর ছিলেন, যেমন – মোহন সিং এবং কর্নেল গিল, যদিও তাঁরা গ্রেফতার হয়েছিলেন উপযুক্ত ভাবে সংগঠিত কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহার করার জন্যে, তবুও তাঁদের সঙ্গে সম্মান-জনক আচরণ করা হয়েছিল এবং তাঁদের প্রত্যেককেই মনুষ্যোচিত সুখ-সুবিধাসহ পৃথক বাড়িতে রাখা হয়েছিল। এবং এইভাবেই সুভাষচন্দ্র এমন এক পরিবেশে ঠেলে দিলেন কেশব মেননকে – যেখানে তাঁর সঙ্গে ব্যবহার করা হলো ঠিক খুনী অপরাধী ও উন্মাদশ্রেণীর বন্দীদের সঙ্গে যেমন করা হয়।

মিলিটারি পুলিশ-ব্যবস্থা ছিল 'হিকারি কিকান' সংস্থার নিয়ন্ত্রণের বাইরে, এবং তার আদেশের বিরুদ্ধে কোনোরকম পাল্টা ব্যবস্থা নিতে আমরা অক্ষম ছিলাম। এ ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে আমি যা করতে পারি তা হলো, মিলিটারি পুলিশ সংস্থার মধ্যে আমার কয়েকজনের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের সূত্রে তাদের মধ্যে আমার প্রভাব খাটাতে পারি, যাতে মিলিটারি পুলিশের লোকেরা তাদের অভ্যাসবশে ও স্বাভাবিক প্রথাবশে বন্দী কেশব মেননের ওপর কোনোরকম অত্যাচার ও নির্যাতন না করে। তবুও তাঁর পরিবারের কোনো লোককে, কিংবা অন্য কোনো ভারতীয়কে অনুমতি দেওয়া হয়নি তাঁর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে। একবার যখন তাঁর ছেলেকে এরকম অনুমতি দেওয়া হয়, তা দেওয়া হয় কেবলমাত্র সিংগাপুরে তাঁর পরিবারের সঙ্গে বসবাসরত মেয়ের মৃত্যুসংবাদটি পৌঁছে দেওয়ার জন্যে। তাই, কেশব মেননের গ্রেফতারের ঘটনাটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সুভাষ-যুগের ইতিহাসে সবচেয়ে কলঙ্কিত ঘটনা হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

২৬.

সুভাষ-যুগের পরিসমাপ্তি

ইমফল পতনের পরে, রেংগুনে রীতিমতো অসুখী ছিলেন বলে শিবরাম ফিরে গেলেন সিংগাপুরে। তিনি খুশি হলেন, কারণ সুভাষচন্দ্র তাঁকে IIL-সংস্থার মুখপাত্র হিসেবে আবার দায়িত্ব দিয়ে পাঠালেন, এবং তাঁর আগেকার প্রচারকর্মাদি আমার সঙ্গে থেকে চালিয়ে যেতে বললেন।

কিন্তু আবারও শিবরামের ক্ষেত্রে গোলমালের সূচনা দেখা গেল। তাঁকে সর্বপ্রকারে বিরক্তিকর নির্দেশাদি দেওয়া হতে লাগলো রেংগুন থেকে—তাঁর পক্ষে করণীয় কি ইত্যাদি বলে। তাঁকে বলা হলো এমনভাবে অনুষ্ঠানসূচি রচনা করতে, যাতে গান্ধীজীর সঙ্গে জিন্নার প্রস্তাবিত আলোচনাকে হেয় করা হয়, নেহরুকে 'ব্রিটিশের মিত্র' বলে বর্ণনা করা হয়, রাজাজীকে 'ভাইসরয়ের এজেন্ট' (Field Marshall Wavell, ফিল্ড মার্শাল ওয়াভেল) বলা হয়। অন্যান্য নেতৃবৃন্দ, যেমন—সর্দার প্যাটেল, ভুলাভাই দেশাই প্রভৃতিকেও নানাভাবে দোষারোপ করা হতে লাগলো—IIL-সংস্থার সিংগাপুরস্থ বেতার-কেন্দ্রের প্রচার ঘোষণা থেকে।

শিবরাম উত্যক্ত ও বিরক্ত হয়ে উঠলেন। তিনি সুভাষচন্দ্রকে একথা জানিয়ে লিখলেন যে, তিনি IIL-সংস্থার সদস্যপদ থেকে এবং প্রচার দফতরে তাঁর পদাধিকার থেকে অব্যাহতি চান। আমার ক্ষেত্রে, আমি সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করিনি। আমার অবস্থা ছিল এই যে, আমি রেংগুন থেকে পাঠানো এরকম নির্দেশাদি উপেক্ষা করতাম, যদি সেরকম কোনো নির্দেশ আসতো, যদিও সেরকম নির্দেশ পাঠানো IIL-সংস্থা বিরোধী এবং ব্যাংকক কনফারেন্সে গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরোধী। আমি স্রেফ নিষেধ করে দিলাম শিবরামকে, সুভাষচন্দ্র যেরকম অনুষ্ঠানসূচি চান সেরকম কিছু প্রস্তুত না করতে। আশ্চর্য, আমাকে কখনো নির্দিষ্ট কোনো রকম নির্দেশাদি দেওয়া হয়নি রেংগুন থেকে। কিংবা সম্ভবত, তেমন অবাক হবার কিছু নেই, কারণ সুভাষচন্দ্র, আয়ার এবং অন্যান্যরা অবশ্যই বুঝে থাকবেন যে, আমি কোনো রকম অসংগত পরামর্শ বা আদেশ ('unreasonable advice or orders') মেনে চলবো না, তা রেংগুন থেকে বা অন্য যে কোনো জায়গা থেকে আসুক না কেন।

শিবরামের চিঠি সুভাষচন্দ্রের উদ্বেগের কারণ হলো। তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হলো রেংগুনে প্রধান কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা করার জন্যে। শিবরাম সেখানে গেলেন এবং দীর্ঘ আলোচনা হলো। কোনো যুক্তিসংগত সমাধান সম্ভব হলো না

এই জটিল বিষয়ে, এবং শিবরাম জোর দিতে লাগলেন যাতে তাঁর পদত্যাগ গৃহীত হয়।

সেই পর্বে, সুভাষচন্দ্র একটা রাস্তা খুঁজে বের করলেন যাতে শিবরামকে কোনো ভাবে লিগ সংস্থার কাজে ধরে রাখতে পারা যায়। এটা সাব্যস্ত হলো যে শিবরাম প্রচার দফতরের পদত্যাগ করতে পারেন, কারণটা স্রেফ তিনি তাঁর কাজের মধ্যে যে হস্তক্ষেপ হচ্ছে তা বরদাস্ত করতে পারছেন না এই হিসেবে; কিন্তু সুভাষচন্দ্র তাঁর জন্যে টোকিওতে একটা পদসৃষ্টি করতে প্রস্তুত ছিলেন। অর্থাৎ শিবরাম টোকিও যাবেন সেখানকার জাপানি কূটনৈতিক কর্মপদ্ধতি ও কার্যকলাপ ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করতে। সম্ভবত সুভাষচন্দ্র আশা করেছিলেন যে, এইভাবে শিবরামের কার্যকলাপের ফল বেশ কার্যকরী হবে, ভবিষ্যতে যখন তিনি ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান হবেন এবং অন্যান্য দেশ থেকে পাঠানো রাষ্ট্রদূতদের গ্রহণ করবেন ও পরিবর্তে সেদেশেও রাষ্ট্রদূত পাঠাবেন। ইতিমধ্যেই এই গুজব রটে গেল যে, জনৈক মিঃ হাচিয়া (Mr. Hachiya) জাপান গভর্নমেণ্ট কর্তৃক মনোনীত হয়েছেন এবং সুভাষচন্দ্রের অন্তর্বর্তী স্বাধীন ভারত সরকারের (Provisional Government of Free India) জন্যে রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন,—যদিও কখনোই জানা যায়নি কি কাজ তিনি করছেন।

শিবরাম ভাবলেন, এটা একটা ভালো সুযোগ, যাতে এই সুবাদে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ছেড়ে চলে যাওয়া যায়। তিনি রেংগুন থেকে সিংগাপুরে চলে গেলেন, টোকিও যাত্রার জন্যে তল্পিতলপা গোটাতে। সেটা ছিল ১৯৪৪-এর শরৎকাল, আরো সঠিক বলতে গেলে অকটোবরের প্রথম সপ্তাহ।

কাকতালীয় ভাবে একই সময়ে আমিও একটি বার্তা পেলাম জাপান গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে 'হিকারি কিকান' সংস্থার মাধ্যমে; তাতে প্রস্তাব করা হলো আমি যেন টোকিওতে IIL-সংস্থার প্রচারকর্মের দায়িত্ব গ্রহণ করি, সেহেতু সেখানে আগেকার কার্যকলাপ ইত্যাদি সন্তোষজনক বলে প্রমাণিত হয়নি। আমি আরো জানতে পারলাম যে, সিংগাপুরস্থ 'হিকারি কিকান' সংস্থা অনেক আগেই গুটিয়ে ফেলা হয়েছে।

আমাকে যে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল তা ছিল বেশ কঠিন ধরনের। যে IIL-সংস্থার সৃষ্টিতে রাসবিহারী বোসের সঙ্গে আমিও যথেষ্ট পরিশ্রম করেছি, তার কাছ থেকে বিদায় নেওয়া, জোর করে একটা বড় রকমের মোচড় দেওয়ার মতোই ঘটনা। একই সঙ্গে এটা উপেক্ষা করাও অর্থহীন যে, নতুন নেতৃত্বের অধীনে সংস্থাটি প্রকৃতপক্ষে ভেঙে যাচ্ছিল। সুভাষচন্দ্র চাইলেন লিগ-সংস্থার শাখা সমূহের সেই ব্যাপক কার্যকলাপ অন্তর্বর্তী স্বাধীন ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণে এনে INA বাহিনীর কর্মী

হিসেবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে অসামরিক নাগরিকদের নিয়োগ করে ঐ কার্যকলাপের পরিবর্তন ঘটিয়ে অবস্থার আরো উন্নতি করতে। ফল হলো গোলমেলে ও বিপর্যয়কর। INA অফিসারদের এহেন অফিস চালানোর পক্ষে কোনোই অভিজ্ঞতা ছিল না। তাঁদের আচরণ ও কার্যকলাপের ফলে ভারতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল অসন্তোষ দেখা দিল—যাঁরা অন্যের দ্বারা ভুলভাবে দেখাশোনা করার পরিবর্তে নিজেরাই নিজেদের দেখাশোনা করতে পছন্দ করেন।

সুভাষচন্দ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে সফর করেন, এবং আবেগময়ী ভাষণ দেন যাতে প্রত্যেককেই 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' ('do or die') বলে উত্তেজিত করা হয়। তিনি এমনভাবে তাঁর কাজকর্ম করতে লাগলেন যেন ভারতীয় সম্প্রদায়ের দেখাশোনা করার কাজ তাঁর ঐ ভাষণের দ্বারাই সমাধা হয়ে যাবে। অনেকেই এবিষয়ে তাঁদের আগ্রহ হারিয়ে ফেললেন, অন্তত এক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে প্রথম থেকেই যে আকর্ষণ বোধ করছিলেন তা থেকে। অন্যেরা গুলিয়ে ফেললেন যখন তাঁরা এক ও অনন্য বিষয়ের বিভিন্ন নাম শুনতে লাগলেন: তাঁরা জানতেন না নতুন এই 'প্রভিশনাল গভর্নমেণ্ট অফ ফ্রি ইনডিয়া' বা অন্তর্বর্তী স্বাধীন সরকার কী প্রয়োজনে সংগঠিত, যেখানে 'ইনডিয়ান ইনডিপেনডেন্স লিগ'-এর মতো কার্যকরী সংস্থা আগে থেকেই রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, এমন একটা আন্দোলন কার্যত বন্ধই হয়ে গেল। ভারতীয়রা হয় ব্যক্তিগত ভাবে কিংবা দলবদ্ধভাবে তাদের পছন্দমতো শুরু করে দিল জাপানি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে। সুভাষচন্দ্র তাঁর এই ঝটিকা সফরকালে যা তিনি একটানা চালিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি INA বাহিনীর জন্যে আরো বেশি সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবী সংগ্রহের আবেদন জানাতে লাগলেন, যেহেতু তিনি চাইছিলেন ভারতে 'আরেকটি আক্রমণ' অভিযান চালাতে। কিন্তু তাঁর আবেদনের জবাবে সাড়া যেটুকু পাওয়া গেল, তা ক্রমশ অস্পষ্ট এবং ঘটনাক্রমে প্রায় শূন্যতায় পর্যবসিত হলো।

ভারাক্রান্ত চিত্তে আমি একদিন সকালে শিবরামকে বললাম যে, আমিও টোকিওর উদ্দেশে সিংগাপুর ত্যাগ করছি, যেহেতু একমাত্র সেখান থেকেই আমি আরো ভালোভাবে কোনো কাজ করার আশা করতে পারি। আমি প্রস্তাব করলাম যে, তাঁকে যেকোনো কাজেই সেখানে পাঠানো হোক না কেন, তিনি ও আমি একত্রে কিছু একটা করতে পারি যাতে টোকিও থেকে প্রচারের কাজ-কর্মের আরো উন্নতি ঘটানো যায়। শিবরাম সম্মত হলেন এবং কয়েকজন যুবককে নিয়োগের কাজ শুরু করে দিলেন—যারা আমাদের রেডিও-টোকিওর কাজ-কর্মে এবং জাপানে অন্যান্য গণমাধ্যম থেকে কার্যকলাপের ক্ষেত্রে সহায়তা সহায়তা করবে।

আমি সিংগাপুর ত্যাগ করলাম অকটোবরের প্রথম সপ্তাহে এবং টোকিও গিয়ে

পৌঁছলাম কয়েকদিনের মধ্যেই। শিবরাম তাঁর প্রচারকর্মের জন্য দশেক সহ-কারিদের নিয়ে আমার সঙ্গে যোগ দিলেন অকটোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে।

টোকিও পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই, আমি খোঁজখবর করলাম আমার স্ত্রী ও পুত্রের, এবং দেখে নিশ্চিন্ত হলাম তাঁরা কোনো রকমে গ্রামের দিকে যাবার ব্যবস্থা করে-ছিলেন এবং নিরাপদেই আছেন। খোদ টোকিও, যেমন অন্যান্য বৃহৎ জাপানি শহরগুলিও, ইতিমধ্যেই মিত্রবাহিনীর দ্বারা প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের অধিকৃত ঘাঁটিগুলি থেকে আমেরিকান বোমার অভিযানের লক্ষ্যস্থল হয়ে উঠেছে। নিরাপত্তা প্রশ্নের দৃষ্টি থেকে, সেই সময়ে সিংগাপুর থেকে টোকিও যাওয়ার অর্থ, ঠিক যেন 'তপ্ত কড়াই থেকে আগুনে পড়া'র মতো ব্যাপার। ৯ জুলাই ১৯৪৪, ইমফল অভিযান যে তারিখে সরকারি ভাবে পরিসমাপ্তি ঘোষণা করা হয় (যদিও তা সঠিকভাবে শেষ হয়েছিল অনেক আগেই), তা একই দিনে ঘটেছিল যেদিন আমেরিকার হাতে মারিয়ানার অন্তর্গত সাইপান অধিকারের (capture of Saipan in Marianas) ঘোষণা করা হয়। প্রায় ২৫ হাজার জাপানি সেনা যারা একে রক্ষার সংগ্রামে নিযুক্ত ছিল, তাদের সর্বশেষ সেনাটিরও মৃত্যু হয়। তাদের মধ্যে ছিলেন অ্যাড-মিরাল নাগুমো (Adm. Nagumo) যিনি প্রায় দু-বছরেরও আগে একটি 'টাস্‌ক ফোর্স' পরিচালনা করেছিলেন—পার্ল হারবার আক্রমণের ক্ষেত্রে। সাইপান দ্বীপে তাদের অবতরণের সঙ্গে সঙ্গেই জাপানের মূল ভূখণ্ড এসে গেল আমেরিকান 'বি-২৯ সুপার ফোর্টরেস' বোমারু বিমানের আঘাত হানার আওতার মধ্যে। ঐ একই মাসের মধ্যেই জাপান হারালো তার নিউ জর্জিয়া (New Georgia) দ্বীপটি।

এই বিরাট পতনের সঙ্গে সঙ্গেই জেনারেল তোজোর মর্যাদাগত অবস্থা হয়ে উঠলো অসহনীয়। তিনি এবং তাঁর ক্যাবিনেট বাধ্য হলো ১৮ জুলাই ১৯৪৪ তারিখে পদত্যাগ করতে। অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল কুনিকাই কোইসো (Gen. Kunikai Koiso) হলেন নতুন প্রধানমন্ত্রী। তাঁকে নিয়ে আসা হলো কোরিয়া থেকে, যেখানে তিনি ছিলেন গভর্নর-জেনারেল। এর আগে তিনি ছিলেন কোয়ানটুং আর্মির কমাণ্ডার। আমি তাঁকে জানতাম যখন আমি মানচুকুওয় ছিলাম কিছুকাল।

কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর পরিবর্তনে অবস্থার কোনোরকম পরিবর্তন হলো না, এমনকি এই ঘোষণায়ও কোনো কাজ হলো না যে—প্রধানমন্ত্রী জেনারেল কোইসো তাঁর ক্ষমতা ভাগাভাগি করে নেবেন অ্যাডমিরাল ইয়োনাই-এর (Adm. Yonai) সঙ্গে—নৌবাহিনীকে শান্ত করার জন্যে। যুদ্ধে জাপানি পক্ষের বিপর্যয় অব্যাহত চলতে লাগলো। সেপটেম্বর নাগাদ গিলবার্ট দ্বীপপুঞ্জেরও (Gilbert Islands) পতন হলো আমেরিকান-দের হাতে, এবং অকটোবরে ম্যাকার্থারের বাহিনী (Mac Arthur's Army)

তার বিখ্যাত বিজয়কীর্তি ঘোষণা করলো ফিলিপাইনসের লুজন-এ (Philippines at Luzon) লেইট উপসাগরে (Leyet Gulf) কঠোর সংগ্রামের পরে,—যেখানে মিত্রবাহিনী সংঘটিত করে তার বৃহত্তম উভচর অবতরণ (amphibious landings)—এর আগে তারা ফ্রান্সের নরম্যাণ্ডিতে যেমন করেছিল ঐ বছরেরই জুন মাসে, ঠিক তার পরে। লেইট অভিযানে, জাপানি নৌবাহিনী তার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ জাহাজ হারায়। এবং এই দেশ কখনোই সেই আঘাত থেকে সামলে উঠতে পারেনি।

আমি এবং শিবরাম, আমাদের ছোট এক কর্মীদল নিয়ে অনিবার্যভাবেই টোকিওতে বাস করতে হয়েছিল, এবং বিপজ্জনক ঝুঁকির মুখোমুখি হতে হয়েছিল ; কিন্তু আমি এক্ষেত্রে জোর দিয়েছিলাম যাতে আমার স্ত্রী ও পুত্র গ্রামের মধ্যেই থাকেন। প্রকৃতপক্ষে, এটা কেবল আমার স্ত্রীর জন্যেই সম্ভব হয়েছিল যে, আমরা সম্ভাব্য খাদ্যাভাব জনিত উপবাসের হাত থেকে রেহাই পেয়ে গিয়েছিলাম—উপবাস ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছিল টোকিওর বাসিন্দাদের একাংশের মধ্যেই। আমার স্ত্রী যেভাবে হোক নানান বিশেষ ধরনের এবং প্রায় বিপজ্জনক উপায়ের মাধ্যমে আমাকে যথেষ্ট পরিমাণে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যাদি পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিলেন, যার ফলে আমাদের সংস্থার জন্যে যৌথ রান্নাঘর চালু রাখা সম্ভব হয়। শিবরাম এবং আমি, আমাদের অফিসের জন্যে যা কিছু করণীয় তার যথাসাধ্য করেছিলাম। আমরা রেডিও-টোকিও থেকে বেতার-ঘোষণা চালু রেখেছিলাম, এবং তার অন্তর্ভুক্ত ছিল—ঐ সময়কার ঘটনাবলী সততা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে যথাসম্ভব প্রচার করা যায়। আমরা জানতাম শেষের সেদিন এগিয়ে আসছে।

১৯৪৪ নভেম্বর নাগাদ, রাসবিহারী দুরারোগ্য ভাবেই পীড়িত হলেন, এবং শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। তখন মাত্র একজন পরিচারিকা ছিলেন তাঁর বাড়িতে, এবং আমি দেখেছিলাম যে তিনি যদিও বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন, তবুও তিনি খুব বেশি সাহায্য করতে পারছিলেন না। আমি অতএব আমার কাজের সময় ভাগ করে নিলাম প্রচার দফতরের কাজে যেখানে আমি কাজ করতাম দিনের বেলায়, এবং রাসবিহারীর বাড়িতে আমি সময় দিতাম রাত্রিতে। তাঁর সিংগাপুর ত্যাগের পর থেকে যুদ্ধের ঘটনাবলীর অবস্থাগত সংবাদ তাঁকে এত বেশি আঘাত দিয়েছিল যে, কিছুদিন পর আমি চেষ্টা করতে লাগলাম যুদ্ধের ঘটনাবলী থেকে তাঁর মনকে অন্যমনস্ক রাখতে। চিকিৎসাগত সুবিধা-সুযোগ পাওয়া কঠিন হলো, যদিও আমার ডাক্তার বন্ধুদের মধ্যে যাঁদের পাওয়া গিয়েছিল তাঁরা তাঁদের যথাসাধ্য করেছিলেন।

১ নভেম্বর ১৯৪৪ তারিখে, টোকিওর আকাশ সবেমাত্র পরিষ্কার হয়েছে বি-২৯

বোমারু বিমানের সাংঘাতিক বিমান অভিযানের একটানা ঢেউয়ের পরে, একখানি ছোট জাপানি বিমান সুভাষচন্দ্র এবং লেঃ জেনারেল সাবুরো ইসোদা (Lt. Gen. Saburo Isoda), বার্মার 'হিকারি-কিকান' সংস্থার প্রধানকে নিয়ে পৌঁছলো রাজধানীর বিমানবন্দরে। এই দুই বিশিষ্ট ব্যক্তি এসেছিলেন নতুন প্রধানমন্ত্রী এবং ইমপিরিয়াল জেনারেল স্টাফ-এর সঙ্গে 'সামরিক বিষয়ে' আলোচনা করতে।

টোকিওতে তাঁর কয়েক সপ্তাহ থাকাকালে, সুভাষচন্দ্র কয়েকটি প্রকাশ্য ভাষণ দিলেন জাপানের ভবিষ্যৎ বিষয় সম্পর্কে আশা প্রকাশ করে। তিনি আরো ঘোষণা করলেন যে, INA বাহিনী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয়দের মধ্য থেকে নিয়োগ করে বেশ বড় আকারে সম্প্রসারিত হবে, এবং ভারতে 'আরেকটি আক্রমণ-অভিযান' চালানো হবে ভারত থেকে ব্রিটিশদের তাড়িয়ে দেবার জন্যে। দোমেই নিউজ এজেনসিতে (Domei News Agency) আমার বন্ধুদের মধ্যে একজন যিনি সুভাষচন্দ্রের ঐ ভাষণ কভার করেছিলেন, তিনি বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন এবং আমার কাছে ফিসফিস করে বললেন যে, এখানে এমন একজন এসেছেন যিনি অবশ্যই 'আলফ্রেড দি গ্রেট' এর অবতার স্বরূপ ('incarnation of Alfred the Great')। তুলনা করার ব্যাপারে তাঁর ক্ষমতাটা তেমন নিশ্চিত নয়, কিন্তু অবশ্যই বলতে হবে সুভাষচন্দ্র ছিলেন একজন দুর্লভ প্রকৃতির আশাবাদী। এবং তাঁর চিন্তাভাবনার ক্ষমতার বিষয়ে মতামত যাই হোক না কেন, তাঁর প্রাণশক্তির প্রাচুর্য যার ফলে তিনি ভাষণের পর ভাষণ দিতে সমর্থ হয়েছিলেন, তা ছিল সত্যিই উল্লেখ্যযোগ্য। আমি তাঁর কয়েকটি ভাষণে হাজির ছিলাম, কিন্তু শেষে যাওয়া বন্ধ করেছিলাম। কারণ সেই বক্তব্যের মধ্যে এমন কোনো মূলকথা নেই যার ফলে তা বসে বসে শোনা যায়, কিংবা যার মধ্যে তৎকালের কোনো রকম রাজনৈতিক ও বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

ইমপিরিয়াল হাইকমাণ্ডের তখন সুভাষচন্দ্রের মিলিটারি পরিকল্পনা (military schemes) বিষয়ে বা ঐ বিষয়ে অন্য কোনো পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করার মতো কোনো রকম ইচ্ছা-আগ্রহ ছিল না। হাইকমাণ্ড তখন সুভাষচন্দ্রকে জানালেন বিদেশমন্ত্রী শিগেমিৎসুর (Shigemitsu) সঙ্গে দেখা করতে। সেটা ছিল সম্ভবত একটা অসুবিধাজনক ব্যাপার। কিন্তু শিগেমিৎসু সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করার কোনো সময় পাননি। সুভাষচন্দ্র তখন দেখা করতে চাইলেন জেনারেল কোইসো-র (Gen. Koiso) সঙ্গে। তিনি তাঁর নিজের চেষ্টায় জেনারেল কোইসোর সঙ্গে সাক্ষাতের কোনো দিনক্ষণ ঠিক করতে পারলেন না, এবং তিনি তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আমি তাঁকে সাহায্য করতে পারি কিনা।

আমি এবিষয়ে কথা বলতে পারতাম জেনারেল কোইসোর সঙ্গে, মানচুকুওয় থাকাকালীন তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়ের প্রভাব খাটিয়ে; কিন্তু তার চেয়ে আমি স্থির করলাম আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু দোমেই-এর প্রেসিডেন্ট মিঃ কোনোর (Mr. Kono

President of Domei) মাধ্যমে চেষ্টা করবো, ; তিনি ছিলেন সরকারের মধ্যে একজন উচ্চ প্রভাবশালী ব্যক্তি যিনি গভর্নমেন্টের 'মাথাওয়ালাদের' (member of its 'brains trust') মধ্যে একজন সদস্য। আমি তাঁর সঙ্গে সুভাষচেন্দ্রর পরিচয় করে দিলাম, এবং মিঃ কোনোকে অনুরোধ করলাম যে, তিনি যেন সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে জেনারেল কোইসোর একটা সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেন।

এটা মজার ব্যাপার, সুভাষচন্দ্রকে মিঃ কোনোর সঙ্গে পরিচয় করে দেবার পরেই সুভাষচন্দ্র প্রস্তাব করলেন যে, তাঁকে একাকী যেতে দেওয়া হোক মিঃ কোনোর সঙ্গে : অর্থাৎ আমাকে অবশ্যই ঘর ছেড়ে যেতে হবে। আমি প্রায় জোরে হেসে উঠেছিলাম, কিন্তু নিজেকে সংযত করলাম এবং আস্তে আস্তে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম।

মিঃ কোনো সেই সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করলেন যা সুভাষচন্দ্র করতে চাইছিলেন জেনারেল কোইসোর সঙ্গে। আলোচনাদির কথা যা আমি শীঘ্রই খবর পেলাম মিঃ কোনোর কাছ থেকে, তা মূলত ছিল INA-র জন্যে আরো অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের ব্যাপারে। এটা মজার ব্যাপার, একজন বড় নেতা কিভাবে তাঁর আশ্রয়দাতা দেশের তৎকালীন সাংঘাতিক বাস্তব অবস্থা উপেক্ষা করে এমন ছোট মনোভাবের কাজ করতে পারেন। মিঃ কোইসোর প্রতিক্রিয়া হলো ভবিষ্যদ্‌বাণীর মতো : তিনি সাক্ষাৎকারের সময় সংক্ষেপ করে ফেললেন, এবং সুভাষচন্দ্রের দ্বারা আর কোনো সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বা অন্য কোনো ব্যবস্থার ফলে বার্মা সীমান্ত অতিক্রম করার কোনো কথা বলতে মিঃ কোইসো নিষেধ করে দিলেন। অপর পক্ষে, মিঃ কোইসো সুভাষচন্দ্রকে বললেন INA-র পক্ষে প্রাপ্ত সমস্ত সম্বল একত্রিত করে SEAC-র বিরুদ্ধে বার্মা সীমান্তে জাপানিদের আত্মরক্ষার প্রচেষ্টায় সাহায্য করতে। সুভাষচন্দ্রের পক্ষে তখন সেই প্রস্তাবে সম্মত হওয়া ছাড়া আর কোনো বিকল্প ছিল না। এমনকি সেক্ষেত্রে আর কোনো আলোচনারও সুযোগ ছিলনা। পরিস্থিতি ছিল জাপানের পক্ষে চরম বেপরোয়া।

নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে রেংগুন ত্যাগের আগে, সুভাষচন্দ্র আমার সঙ্গে গিয়েছিলেন রাসবিহারীকে দেখতে তাঁর রোগশয্যায়। এই সময়কার আলোচনা কালে, রাসবিহারী সুভাষচন্দ্রকে যা বললেন তা হলো তাঁর 'শেষ উপদেশ'। IIL-সংস্থার রেডিও-প্রচার এবং অন্যান্য প্রচারমূলক কর্মপ্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করে রাসবিহারী সুভাষচন্দ্রকে বললেন যে, টোকিও থেকে রেডিও-প্রচার ইত্যাদি সবই ঠিক আছে, কিন্তু সুভাষচন্দ্রের দিক থেকে দেখা দরকার—'আমাদের শত্রুসংখ্যা বাড়ানো উচিত হবে না'। একথার তাৎপর্য বেশ পরিষ্কার, অন্তত যাঁরা সেই দৃশ্যের কথা জানতেন তাঁদের কাছে। এটা ছিল সুভাষচন্দ্র কর্তৃক বার্মা

থেকে পরিচালিত (আয়ারের সাহায্যেই অবশ্য) প্রচারমূলক কর্মসূচির প্রতি রাসবিহারীর মন্তব্য। সেই রেডিও-প্রচারের মধ্যে ছিল ব্রিটেন ছাড়া আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিও প্রচুর পরিমাণে আক্রমণাত্মক মন্তব্য। রাসবিহারী তাঁর দর্শনার্থী সুভাষচন্দ্রকে মনে করিয়ে দিলেন যে, আমাদের শত্রু হলো একমাত্র ব্রিটেন।

কিন্তু এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, সুভাষচন্দ্র রাসবিহারীর সেই 'শেষ উপদেশ' মেনেছিলেন। সুভাষচন্দ্র আমেরিকার বিরুদ্ধে রেডিও-প্রচার বন্ধ করে দিলেন।

সুভাষচন্দ্র রেংগুনে ফিরে এসে যা দেখলেন তা অবশ্যই উৎসাহজনক ছিল না। মাউণ্টব্যাটেনের SEAC-বাহিনী তখন বার্মা পুনরুদ্ধারের প্রস্তুতি চালাচ্ছে। জাপানি ১৫-তম ডিভিশন তখন সেই ধাক্কা সামলানোর জন্যে বীরত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা করছে। কিন্তু জাপানের পক্ষে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল সাংঘাতিক। সুভাষচন্দ্র তখন INA-র যা কিছু সম্বল ছিল, তাই নিয়ে জাপানি আর্মিকে সাহায্যের কাজে। লেগে গেলেন। সুভাষচন্দ্র মালয় সফর করলেন এবং তাঁর যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন জাপানি বাহিনীর পক্ষে আরো লোক নিয়োগের জন্যে। কিন্তু এক্ষেত্রে সংগতভাবেই কোনোরকম অনুকূল সাড়া পাওয়া গেল না। বিপরীত ক্রমে, কালক্রমে আমি যা শুনেছিলাম তা হলো, বেশ কয়েকটি কেন্দ্রে তাঁর বিরুদ্ধে দারুণ বিরোধিতা করা হয়েছিল। বিশেষ করে তা হয়েছিল কারণ এটা স্পষ্ট যে, ভারতীয়দের নিয়োগ ছিল প্রকৃতপক্ষে জাপানি বাহিনীর পক্ষে ভাড়াটে সেনা হিসেবে কাজ করার জন্যে। কিন্তু এই উদ্দেশ্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্বদেশপ্রেমিক ভারতীয়রা নিশ্চয়ই রাসবিহারীর অধীনে IIL-সংস্থায় যোগ দেয়নি।

দক্ষতা ও যোগ্যতা বাড়ানোর প্রচেষ্টা হিসেবে সুভাষচন্দ্র তাঁর ক্যাবিনেট সম্প্রসারিত করলেন। নতুন ভাবে যাঁকে আনা হলো তিনি হলেন এন. রাঘবন, তাঁকে দেওয়া হলো অর্থ দফতরের দায়িত্ব। একটা উপভোগ্য বিষয় হলো যে নতুন এই নিয়োগ-প্রস্তাব গ্রহণের আগে রাঘবন তারবার্তা পাঠালেন রাসবিহারীর কাছে তাঁর অনুমোদনের জন্যে। তিনি এটা করেছিলেন এইজন্যে যে, আগে তিনি রাসবিহারীর 'অ্যাকশান কাউনসিল' থেকে পদত্যাগ করেছিলেন, যে কাজের জন্যে তিনি পরে আপশোষ করেছিলেন। তাই রাঘবনের পক্ষে এভাবে রাসবিহারীর সঙ্গে পরমর্শ করাটা খুব চমৎকার কাজ হয়েছিল, কারণ রাঘবনের কাছে রাসবিহারী IIL-সংস্থার কেবল প্রাক্তন নেতাই নন, তিনি তখনো পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রের সংস্থার পক্ষে ছিলেন সর্বোচ্চ পরামর্শদাতা (Supreme Adviser)। তখন অসুস্থ থাকায় স্বদেশপ্রেমিক রাসবিহারী রাঘবনকে টেলিগ্রাম পাঠাতে পারেন নি, কিন্তু আমাকে তাঁর পক্ষে তা করতে বললেন,—রাঘবনের প্রস্তাবে রাজী হয়ে সুভাষচন্দ্রের সম্প্রসারিত ক্যাবিনেটে যোগদানে সম্মতি জানালেন। আমি তখন সেই বার্তাটি জানিয়ে দিলাম। রাঘবন একজন মন্ত্রী হলেন। কিন্তু এমন একটা পর্যায় এলো যখন

কোনো কিছুই INA-কে বা জাপানি আর্মিকে সাহায্য করতে পারলো না।

রাসবিহারী বোসের মৃত্যু হলো ২১ জানুয়ারি ১৯৪৫ তারিখে। আমি তাঁর বাড়িতেই রাত কাটাতে লাগলাম, এবং এটা ছিল আমার পক্ষে একটা যন্ত্রণাদায়ক কর্তব্য যে, তাঁর অন্তিম মুহূর্তের পূর্ব পর্যন্ত তাঁকে শেষ জলবিন্দু আমাকেই দিতে হয়েছিল। যখন তিনি জানতে পারলেন মৃত্যু তাঁর দ্বারে আঘাত করছে, তিনি আমাকে বললেন— তিনি আবার জন্ম নেবেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাজ চালিয়ে যাবার জন্যে। তাঁর শেষ দৃষ্টি ছিল একখানি ফ্রেমে বাঁধানো ফলকের উপর—যা তিনি সর্বদাই তাঁর সামনের দেয়ালে টাঙিয়ে রাখতেন, তাতে লেখা ছিল : **বন্দেমাতরম্**।

এক মহান জীবনের অবসান হলো। ভারত হারালো তার এক মহত্তর সন্তানকে এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাজের ক্ষেত্রে একজন অগ্রণী নেতাকে। ব্যক্তিগত ভাবে আমার কাছে তাঁর মৃত্যু হলো গভীর দুঃখের কারণ। সেই দুঃখ এখনো বিদ্যমান।

ক্যাপটেন মোহন সিং অত্যন্ত নিচু ও ইতর পর্যায়ে নেমে এসেছেন। তাঁর বইতে তিনি যেখানে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে অসৌজন্য-মূলক কথাবার্তা বলেছেন রাসবিহারী সম্পর্কে, অথচ তিনি ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে একজন মহান নেতা। তাছাড়া অন্যান্য অভদ্র মন্তব্যের মধ্যে আছে, রাসবিহারীকে মোহন সিং বলেছেন 'পিগমি' ('pigmy') বা বামন। অথচ ভারতীয় স্বদেশ-প্রেমিকদের মধ্যে বিরাট নেতা মহানায়ক রাসবিহারী বোসের বিরুদ্ধে যিনি এমন অভদ্র উক্তি করেছেন, তাঁর চেয়ে 'ছোট পিগমি' আর কেউ হতে পারে না। হায়রে, মোহন সিং তাঁর বইতে বোধ হয় ভুলে গেছেন মাউন্ট এভারেস্ট বা চারিদিকের ঐ জাতীয় অন্য কিছুর সঙ্গে তাঁর নিজের উচ্চতা মাপতে।

রাসবিহারীর মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে, জাপান সম্রাট তাঁকে উচ্চ সম্মানে ভূষিত করেন : দি সেকেণ্ড অর্ডার অফ মেরিট অফ দি রাইজিং সান (Second Order of Merit of the Rising Sun) পদক দিয়ে। ঐ পদকটি তাঁকে সম্রাটের পক্ষ থেকে ইম্পিরিয়াল হেড-কোয়ার্টার্সের লেঃ জেনারেল সেইজো আরিস্যুয়ে (Lt. Gen. Seizo Arisue) কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছিল।

জাপানের জনগণ শান্ত ও মর্যাদাপূর্ণ এক শবযাত্রার ব্যবস্থা করেছিল—যেখানে ফিউনারাল কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে সভাপতিত্ব করেছিলেন প্রাক্তন প্রধান-মন্ত্রী কোকি হিরোতা (Koki Hirota)। বহু সংখ্যক মান্যগণ্য বিশিষ্ট জাপানি, এবং সমগ্র ভারতীয় সম্প্রদায় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অন্তিমকালীন পারলৌকিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন হয়েছিল টোকিওস্থ শিবায় জোজোজি মন্দিরে

(Zozoji Temple, Shiba), এবং জাপানি নেতাদের মধ্যে যাঁরা তাঁর প্রতি তাঁদের শেষ সম্মান প্রদর্শন করতে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন : জেনারেল তোজো এবং অন্যান্য কয়েকজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী, প্রাক্তন ও বর্তমান উভয়েই। ঐ জোজোজী মন্দিরের বিশাল ঘরগুলি শোকগ্রস্তদের ভিড়ে উপচে পড়ছিল, যাঁদের মধ্যে অনেককেই বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল, ঘরের ভিতরে জায়গার অভাবে।

১৯৪৫ মার্চ নাগাদ, বার্মা সীমান্তে মাউন্টব্যাটেনের প্রচণ্ড ধাক্কা জাপানের পশ্চিম প্রান্তের আত্মরক্ষা মূলক ঘাঁটির পক্ষে এক সাংঘাতিক হুমকি হিসেবে দেখা দিল। এপ্রিল মাসে জেনারেল হিতারো কিমুরা (Gen. Heitaro Kimura) লেঃ জেনারেল কাওয়াবে-কে বার্মা-এরিয়া আর্মির প্রধান হিসেবে নিয়োগ করলেন। কিন্তু তার ফলে বিপর্যস্ত জাপানি ফোর্সের অবস্থাগত কোনো সুরাহা হলো না। তাদের তখন চরম অসুবিধাপূর্ণ দুর্দশার অবস্থা চলছিল। বার্মায় তখন বিশৃংখলা ও গোলমেলে অবস্থা চলছে। জেনারেল কিমুরার সেনারা সাহসিকতার সঙ্গেই যুদ্ধ করছিল, কিন্তু তারা SEAC বাহিনীর চাপ সামলাতে পারছিল না। জাপানি সেনাদের পক্ষে হতাহতের সংখ্যা ১ লাখ ছাড়িয়ে গেল। সুভাষচন্দ্র INA বাহিনীর কয়েকটি ইউনিটের ব্যবস্থা করেছিলেন জাপানিদের পক্ষে যুদ্ধ করার জন্যে, এবং এই ইউনিটের অনেক সেনাই নিহত হয়। কিন্তু তাদের বেশ বড একটা অংশ চলে গেল ব্রিটিশ ১৪-তম আর্মির পক্ষে, তার ফলে সুভাষচন্দ্র প্রচণ্ড রেগে গেলেন, এবং তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন এইসব 'বিশ্বাসঘাতকদের' সম্বন্ধে তিনি যথাসময়ে ব্যবস্থা নেবেন।

জাপানি পৃষ্ঠপোষিত মুক্ত বার্মার (Japanese-sponsored Free Burma) প্রধান বা-মা'কে (Ba Maw) পালিয়ে যেতে হয়েছিল মৌলমেনে, এবং তাঁর পরিবারকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় থাইল্যাণ্ডে। জেনারেল আউং সান-এর (Gen. Aung San) গেরিলারা, জেনারেল কিমুরা যেমন আশা করেছিলেন তদনুসারে সাহায্য করার পরিবর্তে তারা জাপানিদের হয়রানি করতে লাগলো। সুভাষচন্দ্রের অন্তর্বর্তী স্বাধীন ভারত সরকারের হেড-কোয়ার্টার্স এবং INA, জাপানিদের এই অন্তর্দ্বন্দ্বের ধাঁধায় পড়ে গেল। INA থেকে দল-বদল চলতেই থাকলো।

জেনারেল কিমুরা বার্মা সীমান্ত থেকে সেনা প্রত্যাহার করে নিয়ে থাইল্যাণ্ডে যেতে সিদ্ধান্ত করলেন। সুভাষচন্দ্র তবুও অধিক সংখ্যক INA সেনাদের সংগঠিত করতে ও যুদ্ধ চালিয়ে যেতে আশাবাদী ছিলেন, এবং আবার চলে গেলেন মালয় বাহিনীর পক্ষে নতুন করে নিয়োগের ব্যবস্থা করতে। কিন্তু এসবে কোনো কাজ হলো না। ঘটনাক্রমে তিনি জেনারেল কিমুরার উপদেশ অনুসারে ব্যাংককে

পিছু হঠতে রাজী হয়ে গেলেন। মাত্র কয়েকশো INA সেনা এবং ঝাঁসি রেজিমেন্টের কিছু সংখ্যক নারীসেনাকে নিয়ে তিনি ব্যাংককে এসে পৌছালেন ৭ মে ১৯৪৫ তারিখে,—জার্মানির দিক থেকে শর্তমূলক আত্মসমর্পণের ঘোষণা ও ইয়োরোপে যুদ্ধ পরিসমাপ্তির মাত্র একদিন আগে।

প্রভিশনাল গভর্নমেণ্ট অফ ফ্রি ইনডিয়া, IIL ও INA—সমস্তই ভেঙে দেওয়া হলো জাপান কর্তৃক বার্মা ছেড়ে আসার প্রায় সমকালে।

আমি সিংগাপুর থেকে আগত আমার কয়েকজন বন্ধুর কাছ থেকে খবর পেয়েছিলাম যে, বার্মা পতনের পরে থাইল্যাণ্ড থেকে জাপানিদের আসন্ন বহিষ্কারের সময়ে, সুভাষচন্দ্র আবার সিংগাপুরে গেলেন INA বাহিনীর পক্ষে জাপানিদের সাহায্যার্থে সেনা সংগ্রহ করতে, যাতে অন্তত মালয়ে টি'কে থাকা যায় তাদের শেষ ভরসাস্থল হিসেবে। তখনো পর্যন্ত মনে হলো তিনি আশা করেন হয়তো কোনো অলৌকিক উপায়ে, জাপান শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করবে।

এবং যা আরো অশান্তির ব্যাপার তা হলো, তিনি অবিরত এই তত্ত্ব-প্রচার চালিয়ে যেতে লাগলেন যে, ভারতকে স্বাধীন করা যাবে তাঁরই নেতৃত্বে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে পরিচালিত একমাত্র সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারা। যেহেতু প্রচারকর্মের পক্ষে আর কোনো ব্যবস্থা ছিল না, সুভাষচন্দ্র নিজে রেডিও-প্রচার শুরু করলেন রেডিও-সিংগাপুর থেকে তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনা অনুসারে—যাতে তাঁর বক্তব্য ছিল : ভারতে আরেকটি সশস্ত্র আক্রমণ ('another armed attack') এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেসকে (Indian National Congress) তার 'পরাজিত মনোভাব'-এর ('defeatist attitude') জন্যে দোষারোপ করা। মালয়ের সর্বত্র তিনি 'ভারতীয় সেনাদের কাছ থেকে রক্ত ও অর্থ' এবং ভারতীয় সম্প্রদায়ের 'অন্যান্যদের কাছ থেকে দ্রব্যসামগ্রী' চাইতে লাগলেন। তিনি অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করতে লাগলেন, কিন্তু কার্যত যা দেখা গেল তা হলো, মূলত সর্বত্র লোকজনদের মধ্যে দারুণ একটা অসন্তোষ ও আতংক ; তাদের আশংকা হলো যে, সম্ভবত তারা স্বাভাবিক সময়ে যেসব বিপদের মুখোমুখি হয়ে থাকে তার চেয়েও আরো বড় বিপদের মুখে পড়তে যাচ্ছে—যখন মিত্রবাহিনী মালয় পুনরধিকারের জন্যে আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ শুরু করে দেবে সেই সময়ে।

এসব খবর এমনই বিপজ্জনক ছিল যে, একটা পর্যায়ে ১৯৪৫ মে মাসে, আমি ভাবলাম আমাকে আবার একবার ব্যাংককে বা সিংগাপুরে যেতে হবে, সেখানকার ভারতীয় সম্প্রদায়ের দুঃখ-দুর্দশার ভাগ নিতে, এবং তাদের জন্যে কোনো রকম সাহায্যকারী কিছু করা তখনো পর্যন্ত সম্ভব কিনা তা দেখতে। আমি আমার এক কর্নেল বন্ধুর সঙ্গে ইমপিরিয়াল হেড-কোয়ার্টার্সে বসে পরামর্শ করলাম যানবাহনের সুবিধা-সুযোগের বিষয়ে ; কিন্তু আমাকে বলা হলো যে, ঐসব ব্যবস্থা করা যেতে পারে যদি আমি তার জন্যে চাপ দিয়ে অনুরোধ করি, যেহেতু জাপান

তখন প্রায় সম্পূর্ণত ভেঙে পড়ার মুখে এসে গেছে। তবু প্রচেষ্টা চালানো হতে লাগলো যাতে যুদ্ধের বিষয়ে একটা সম্মানজনক অভিযোগ করা যায়।

এই যখন পরিস্থিতি, আমি স্থির করলাম টৌকিওয় থেকে যাবো, এবং দেখবো এই পরিস্থিতিতে দেখার আর যা বাকি আছে, এবং তখনো পর্যন্ত এই পরিস্থিতিতে বাস্তবিক পক্ষে যদি কিছু করণীয় থাকে তা করবো, যদিও কার্য-কারণগত অবস্থা দৃশ্যত খোলাখুলি ভাবেই অত্যন্ত হতাশাজনক।

একটা খবর আমার কাছে এসে পৌঁছলো প্রায় এমন সময়ে যখন সময়টা ছিল কিছুটা গুপ্ত ষড়যন্ত্রের কাল। আমি জানতে পারলাম যে, এস. এ. আয়ার যিনি তখন ছিলেন ব্যাংককে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে, তিনি ছিলেন সেখানকার পোর্তুগালের কনসুলেট-জেনারেল-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্রবে। ঐ কনসুলেট-জেনারেল যদিও ছিলেন একজন পোর্তুগিজ নাগরিক, কিন্তু মূলত ছিলেন একজন গোয়ান বংশজাত। এটা সহজেই অনুমান করা যায়, একজন ভারতীয় যিনি অন্তর্বর্তী স্বাধীন ভারত সরকারের একজন অত্যন্ত উচ্চ পদাধিকারী, কেন তিনি ঘনিষ্ঠ পোর্তুগিজ সংস্রবে থাকবেন। এটা সন্দেহজনক মনে হলো, কিন্তু আমি আয়ারকে 'সন্দেহের অবকাশ'-এর (benefit of doubt) সুবিধা দিতে চাইলাম, এবং সিদ্ধান্ত নিলাম যে, এটা সম্ভবত একটা নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপার হতে পারে — গুপ্ত কার্যকলাপ কিছু নেই।

INA বাহিনীর অবশিষ্ট কাহিনী সাধারণত সুবিদিত। অনেকেই অনেক কিছু বলেছেন স্বাধীনতা সংগ্রামে সেই বাহিনীর প্রভাবের বিষয়ে, যার ফলে ঘটনাক্রমে ভারতের স্বাধীনতা এসেছিল ১৯৪৭ আগস্টে। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে INA এবং সুভাষচন্দ্রের একটা সম্মানজনক স্থান আছে, কিন্তু এটা অবশ্যই ঠিক নয় যে তাঁরা এই সংগ্রামে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন। আমার মতে, ভারতের স্বাধীনতা লাভ হয়েছিল মূলত ভারতের অভ্যন্তরীণ নেতৃত্ব এবং দেশের মধ্যেকার মানুষজনদের আত্মোৎসর্গের জন্যে। সেক্ষেত্রে সত্যিই তারা প্রচুর পরিমাণে নৈতিক সমর্থন পেয়েছিল INA এবং দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানের ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাছ থেকে; কিন্তু এই সমস্ত ঘটনাটাকে আমাদের মনে রাখতে হবে তার উপযুক্ত পরিপ্রেক্ষিতে। একথা সত্যি যে, ইমফল পতনের ঘটনা একটা বড় রকমের ট্রাজেডি — যা এড়ানো যেত যদি বাস্তব জ্ঞানের চেয়ে তার ওপর আবেগকে স্থান না দেওয়া হতো, কিংবা বাস্তব জ্ঞানকে উপেক্ষা না করা হতো।

মিত্রবাহিনীর কাছে INA বাহিনীর আত্মসমর্পণের এবং তার অফিসারদের ভারতে ফেরত পাঠানোর পরে, ঐ সংস্থার কয়েকজন অফিসারের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ

সরকার একটি বিচারের ব্যবস্থা করলো বিভিন্ন অপরাধের অভিযোগে, যেমন— ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, খুন জখম করা, খুন জখমকে সমর্থন করা, তাদের হাতে বন্দীদের ওপর সপক্ষে আনবার জন্যে নিষ্ঠুর প্রথায় পাশবিক অত্যাচার করা ইত্যাদি। ব্রিটিশরা সঠিকভাবে না বুঝে, এইসব বিচারসভা অনুষ্ঠানের প্রকাশ্য আয়োজন করে, ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে আরো বেশি করে উদ্দীপিত করে তুললো।

ব্রিটিশ-ভারতের সশস্ত্র বাহিনীতে বিপুল সংখ্যায় ভারতীয়দের নিয়োগ করা হতে লাগলো ব্রিটিশের পক্ষে যুদ্ধ করার জন্যে, ফলে ইতিমধ্যেই বাহিনীতে ভারতীয়দের সংখ্যাশক্তি দারুণভাবে বেড়ে গেল, এবং এই সমস্ত নতুন অফিসার ও লোকজনেরা তাদের সঙ্গে ইয়োরোপীয়দের তুলনায় যে খারাপ ব্যবহার ও অন্যান্য অবিচার করা হচ্ছিল বলে এতদিন যেসব অভিযোগ করে আসছিল, সেসব কথা আর গ্রাহ্য হলো না। ব্রিটেন আর বেশিদিন ভারতীয়দের পরাধীন করে রাখতে পারবে এমন আশা করতে পারে না, অন্তত যতক্ষণ ব্রিটিশ পক্ষ ইংল্যাণ্ড থেকে হাজার হাজার সশস্ত্র অফিসার এবং সেনাদের নিয়ে না আসতে পারছে সেখানে।

INA বাহিনীর নামে বিচারসভার প্রশ্নটি ক্রমে উচ্চস্তরের রাজনৈতিক প্রশ্ন হয়ে উঠলো। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নেহরু, ভুলাভাই দেশাই, তেজবাহাদুর সাপরু এবং অন্যান্য অনেকের প্রেরণায় স্থির করলো যে, অভিযুক্ত INA অফিসার-দের পক্ষে আইনগত সমর্থন জানাবে। দেশের মধ্যে চারিদিকে জাতীয় স্তরে একটা বড রকমের স্বদেশী ভাবের ঢেউ উঠলো। ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও অসন্তোষ চরমে উঠলো। ভারতীয় নৌবাহিনীর বোম্বে ইউনিট বিদ্রোহ ঘোষণা করলো ব্রিটেনের বিরুদ্ধে।

INA বাহিনী বীর হিসেবে চারিদিকে বিখ্যাত হয়ে উঠলো। এইভাবে যাই হোক, এসব ক্ষেত্রে প্রায়ই যা হয়ে থাকে, কয়েকজন অযোগ্য ব্যক্তি স্বীকৃতি লাভ করলেন। প্রাক্তন INA বাহিনীর বহুসংখ্যক লোকজন লোভনীয় সরকারি চাকুরির দাবি জানাতে লাগলো—ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময়ে, এবং জওহরলাল নেহরু তাঁর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব নিয়ে এমনই কিছু লোককে অনুগ্রহ বিতরণ করতে লাগলেন—কোনো সময়েই বিচার করা হলো না যে, এঁদের সঙ্গে ভেকধারী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়! তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন যাঁদের কোনো রকম মর্যাদালাভের যোগ্যতা ছিল না, যোগ্যতা তাঁদের ওপর আরোপ করা হলো। এমন সব ঘটনার মধ্যে একটি হলো, আমার মতে—শাহ নওয়াজ'-এর ঘটনাটি, যিনি স্বাধীন ভারত সরকারে পেলেন মন্ত্রীত্বের পদ, প্রধানমন্ত্রী নেহরুর অধীনে। সিংগাপুরে যাঁরা সেই দুঃসময়ের দিনগুলিতে ছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই মনে করতেন, যে শাহ নওয়াজের আচরণ ছিল অত্যন্ত খারাপ, অর্থাৎ কোনোক্রমেই

সহায়ক ছিল না। তিনি ছিলেন বরাবর একজন সীমান্ত-ঘেঁষা অস্থিরচিত্ত, অর্থাৎ জাপানিদের অধীনে যুদ্ধবন্দী হিসেবে থাকবেন কিংবা IIL-সংস্থায় যোগ দেবেন, এবিষয়ে তিনি ছিলেন সংশয়চিত্ত। (পরে অবশ্য, তিনি প্রচুর পরিমাণে অনুগ্রহ পেয়েছেন সুভাষচন্দ্রের কাছ থেকে।)

এসব কথা আমি অবশ্য, আমার কৃত সেবাকর্মের অস্বীকৃতি জনিত কোনো রকম ক্ষোভের ফলে বলছি না। সেকথা ওঠেই না। প্রকৃতপক্ষে, ঠিক যেমন কিছু সংখ্যক ভারতীয়কে অর্থাৎ যাঁরা IIL এবং INA সংস্থার সঙ্গে ছিলেন তাঁদেরকে ভারত সরকারের বৈদেশিক অফিসের চাকুরিতে (ইনডিয়ান ফরেন সার্ভিস) নেওয়া হয়, আমাকেও ঐরকম চাকুরিগ্রহণের প্রস্তাব দেওয়া হয়। যথাসময়ে একজন রাষ্ট্রদূত পদে উন্নীত করা হবে বলেও আমাকে কথা দেওয়া হয়। কিন্তু আমার দিক থেকে সর্বদাই চিন্তা ছিল ভিন্ন দৃষ্টিতে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা। IIL-সংস্থার মূলনীতির মধ্যে একটি ছিল – 'অনাসক্ত কর্ম' (anasakta karma)। স্বাধীন ভারতের ব্যুরোক্রাসির ক্ষেত্রে একটা সম্ভাব্য অবস্থান আমার পক্ষে মানানসই ছিল না; এবং যখন স্বাধীন ভারতের নতুন কূটনৈতিক পর্যায়ের অফিসারদের মধ্যে আমার কথা বিবেচনা করা হলো, আমি তখন কোনো রকম আগ্রহ দেখাই নি। এটা একটা ভিন্ন ব্যাপার হতে পারতো, যদি আমাকে কূটনৈতিক মিশনের সিনিয়ার হেডের পদে সরাসরি রাজনৈতিক নিয়োগ হিসেবে যোগদানের প্রস্তাব দেওয়া হতো; কিন্তু সেই কূটনৈতিক চক্রের নিছক একটি খাঁজ বা দাঁত হিসেবে চাকুরিজীবন শুরু করার আমন্ত্রণ যা আমার কয়েকজন বন্ধুরা ইতিমধ্যেই গ্রহণ করেছেন, আমার কাছে সেই আবেদন কোনো রকম সাড়া জাগায় নি।

আমার মতে এইসব 'মরশুমি' স্বাধীনতা সংগ্রামী যাঁরা নেহরুর সামনে ঘোরাঘুরি শুরু করেছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে সুতরাং আমার জীবনের কোনো সম্পর্ক ছিল না। জাপানে আমার জন্যে যেসব কূটনৈতিক পদমর্যাদার প্রশ্ন জড়িত ছিল, বলতে পারি, ভারত সরকার সেরকম কোনো পদমর্যাদার সঙ্গে আমাকে তাঁদের প্রতিনিধি হিসেবে টোকিওয় নিয়োগ করতে পারেন নি; কারণ আমি অনেকের দৃষ্টিতেই ছিলাম 'মিত্রবাহিনী' ঘেঁষা, বিশেষত তার ব্রিটিশ পক্ষের দিকে।

যাই হোক আমি মনে করি না যে, জাপানে ব্যক্তিগতভাবে আমার কাজকর্ম, জেনারেল ম্যাকার্থার ও তাঁর সেনাদলের টোকিওর দাই-ইচি ভবনে (Dai-Ichi Building) আবির্ভাবের ফলে ও 'দখলদারি' শুরুর সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেল। শীঘ্রই হোক আর পরে হোক, এক্ষেত্রে একটা-শান্তি চুক্তি' (peace treaty হবে—বিজিত দেশ ও মিত্রশক্তির মধ্যে। আমি যেভাবে হোক অনুভব করলাম, এই সূত্রে পালন করবার মতো আমারও একটা দায়িত্ব আছে। আমি চিন্তিত ছিলাম ভবিষ্যতে যা আসছে সেই বিষয়ের চিন্তায়, এবং পরিবর্তিত অবস্থার মধ্যে ইন্দো-

জাপানিজ সম্পর্কের (Indo-Japanese relations) ক্ষেত্রে একটা ভূমিকা পালনের বিষয়ে।

২৭.

জাপানের আত্মসমর্পণ

১৯৪৪ সনের শেষ দিকে, টোকিও এবং জাপানের অন্যান্য শহরগুলি এসে গেল আমেরিকান বোমাবাজির প্রচণ্ড চাপের মধ্যে, এবং পরিস্থিতি ক্রমশ আরো খারাপ হতে লাগলো দিনের পর দিন। সেটা ছিল শোচনীয় বিপদে জাপানি জনসাধারণের সহ্য ক্ষমতার একটা বড় লক্ষণ—যে বিপদের মধ্যেও অসামরিক জনগণ একটা স্বাভাবিক জীবনের ভাব অব্যাহত রেখেছিল রাজধানী ও অন্যান্য স্থানে। শিবরাম ও আমার পক্ষে এটা ক্রমশই কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠছিল আমাদের কাজ চালিয়ে যাবার পক্ষে, যদিও আমরা সেকাজ একেবারেই ছেড়ে দিইনি।

টোকিওতে আর থাকা অর্থহীন দেখে, শিবরাম রওনা হলেন সিংগাপুরের উদ্দেশে (বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে); তাঁর জন্যে আমার অনুরোধে অনেক অসুবিধে করে যানবাহনের ব্যবস্থা করেছিল সেকেণ্ড ব্যুরো। শিবরাম সিংগাপুর চলে গেলেন ঠিক রাসবিহারীর মৃত্যুর কিছুকাল আগে। আমি থেকে গেলাম, যদিও কোনো সন্দেহ ছিল না যে, যুদ্ধ শেষ হতে চলেছে জাপানের পরাজয়ের মধ্যেই। ম্যাকার্থারের বাহিনী লুজনে (Luzon) অবতরণ করলো—৯ জুলাই ১৯৪৪ তারিখে, সেকথা আগেই বলেছি, এবং তারা মার্চ করতে শুরু করে দিল ম্যানিলার মধ্যে। ১৬ ফেবরুয়ারি ১৯৪৫ তারিখে, আমেরিকান পঞ্চম নৌবহর থেকে, যে নৌবহর তখন পশ্চিম জাপানের ২০০ মাইলের মধ্যে গিয়েছিল, সেই নৌবহর থেকে প্রায় ১৫০০ বিমান এসে টোকিও এবং ইয়োকোহামার উপর বোমাবর্ষণ করলো। সেটা ছিল বোমায় বোমায় কার্পেট বিছানোর মতো বোমবাজি (carpet bombing, কার্পেট বোম্বিং)। যেহেতু তখন জাপানি বিমান প্রতিরোধ কিছু ছিল না। জাপানি বিমান বাহিনীর অবশিষ্ট বলতে যা ছিল তা হলো আসলে একমাত্র তার 'কামি কাজে' শাখা (Kami kaze wing), যা কোনো কাজেই লাগে না আমেরিকার বি-২৯ 'সুপার ফোর্টরেস' বিমানের বিরুদ্ধে।

আমেরিকান চাপ চলতেই লাগলো আইও জিমার (Iwo Jima) ওপর,

এবং সেই চাপ ক্রমশ বেড়েই চললো। ঐ দ্বীপপুঞ্জের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিধ্বস্ত হয়ে গেল মার্চ মাসে। হতাহতের সংখ্যা, জাপানি এবং মিত্রবাহিনী উভয় পক্ষেই হলো প্রচুর। ওকিনাওয়া (Okinawa) দ্বীপের জন্যেও যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল মার্চ মাসে, এবং তা প্রচণ্ড আকার ধারণ করলো যখন জেনারেল কোইসো (Gen. Koiso) পদত্যাগ করতে স্থির করলেন ৪ এপ্রিল তারিখে, পরিবর্তে তাঁর স্থানে সুযোগ করে দিলেন অ্যাডমিরাল কানতারো সুজুকিকে (Adm. Kantaro Suzuki)। অ্যাডমিরাল সুজুকি খ্যাতি অর্জন করেছেন রুশো-জাপানি যুদ্ধের (Russo-Japanese War) কালে, তিনি জেনারেল কোইসোর স্থলাভিষিক্ত হতে অনিচ্ছুক ছিলেন, যেহেতু তিনি চিন্তা করলেন তিনি খুবই বৃদ্ধ (৭৭ বছর বয়সী), কিন্তু সম্রাটের ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করলেন, অর্থাৎ প্রস্তাব মেনে নিলেন। সেটা ছিল আপাতদৃষ্টে জাপানের দিক থেকে ওকিনাওয়া বাঁচানোর শেষ চেষ্টা। কিন্তু তাতে কোনো কাজ হলো না। জাপানি নৌবাহিনী হারালো তার সবচেয়ে মূল্যবান যুদ্ধ-জাহাজ— ৭২ হাজার টনের ইয়ামাতো (Yamato, 72000 tons), তৎকালীন দুনিয়ার নৌবাহিনীর মধ্যে বৃহত্তম সমুদ্রগামী জাহাজ, এবং আরো ১০খানি যুদ্ধজাহাজ। ১২ হাজারেরও বেশি লোক নিহত হলো, সমস্ত যুদ্ধগুলির মধ্যে সবচেয়ে শোচনীয় এই যুদ্ধে। যাঁদের মৃত্যু হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে ছিলেন রাসবিহারীর পুত্র মাসাহিদে (Masahide)। আমেরিকান পক্ষের নিহতের সংখ্যা প্রায় ১৩ হাজার।

ইতিমধ্যে, টোকিওর ওপর যত বিমান অভিযান হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে প্রচণ্ড বিমানহানা শুরু হলো ৯ মার্চ তারিখে। এটা ছিল প্রচণ্ড আক্রোশ বশে চালানো রাত্রিকালীন অগ্নিবোমার আক্রমণ, এবং বেশ হিসেবি আক্রমণ, যাতে সবচেয়ে বেশি রকম ক্ষতি হলো জাপানের অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদনের কারখানাগুলির —যা ছিল টোকিওর উত্তর-পূর্ব শহরতলি এলাকাগুলিতে অবস্থিত। প্রায় ৩৫০ খানি আমেরিকান বি-২৯ বোমারু বিমান উড়ে গেল টোকিওর ৫ হাজার ফিট ওপর দিয়ে এবং প্রায় ২ হাজার টন নাপাম, ম্যাগনেসিয়াম ও ফসফরাস বোমা নিক্ষেপ করলো। জাপানি বিমান বাহিনীর হাতে রাত্রিকালীন যুদ্ধের উপযোগী কোনো রকম যুদ্ধবিমান ছিল না, কিংবা তার হাতে না ছিল শত্রুপক্ষের রাত্রিকালীন বিমান আক্রমণ প্রতিরোধের উপযোগী কোনো রকম রাডার নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা। এক লক্ষেরও বেশি লোক নিহত হলো সেই এক রাত্রেই, এবং ৫ লক্ষেরও বেশি লোক দেখলো তাদের ঘরবাড়ি ভস্মস্তূপে পরিণত হলো।

একের পর এক বিমানহানা চললো কয়েকদিন অন্তর অন্তর, এবং মে মাস নাগাদ টোকিওর অর্ধেকেরও বেশি এলাকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো। জাপান সম্রাট তাঁর প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে এলেন কী ঘটছে তা দেখতে, এবং তিনি যা দেখলেন তাতে নিশ্চয়ই তিনি খুশি হলেন না। অধিকাংশ জাপানিরাই তৎকালীন

দুঃখকষ্টের প্রতি তাদের চরম নির্বিকার ভাব দেখিয়েছিল। তবুও তারা সম্রাটের প্রতি শ্রদ্ধাবনত ছিল, এবং কোনো রকম অভিযোগ করেনি।

ওকিনাওয়া পতনের সঙ্গে সঙ্গে মিত্রশক্তির দিক থেকে জাপান দ্বীপপুঞ্জের ওপর কঠোর দমনমূলক কাযকলাপের সম্ভাবনা আসন্ন হয়ে উঠলো। শীঘ্রই তা একটা দমবন্ধ করা পরিস্থিতি হয়ে উঠতে পারে, যার ফলে বিপর্যস্ত দেশবাসী প্রায় মৃত্যুমুখে পতিত হবে। টোকিও তখন জ্বলছে। একমাত্র সম্রাটের প্রাসাদ এবং অন্যান্য কয়েকটি ভবন ইচ্ছাকৃত ভাবে ছেড়ে দিয়ে মিত্রপক্ষের বিমানবাহিনী খুব নিচু দিয়েই তখন সারা শহরে ভারি বোমা ফেলে চলেছে। একমাত্র টোকিওতেই ৫ মিলিয়ানেরও বেশি জাপানি ছিল নিরাশ্রয়, তাছাড়া হিসেবের বাইরে অসংখ্য লোক নিহত হলো। এটা আশ্চর্যের ব্যাপার, শহরের প্রায় অর্ধেক লোক কিভাবে ঘরবাড়ি ছাড়া হয়েও বেঁচে গেল : সম্ভবত একমাত্র কারণ, সেটা ছিল গরমকাল। যদি সেটা শীতকাল হতো, তাহলে যারা ঘরবাড়ি ছাড়া হয়েছিল তাদের অধিকাংশই প্রচণ্ড ঠাণ্ডাতেই মারা যেত।

এক্ষেত্রে যুদ্ধ পরিচালনার বিষয়ে সুপ্রিম কাউনসিল শান্তিচুক্তির নির্দেশ দেওয়া বা চেষ্টা করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারতো না। শিগেনোরি তোগো (Shigenori Togo) বিদেশমন্ত্রীর পদ থেকে শিগেমিৎসুকে (Shigemitsu) সরিয়ে দিলেন ; তিনি সোভিয়েত মধ্যস্থতার জন্যে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু রাশিয়ানরা কৌশলে সেই সত্য এড়িয়ে গেল। সোভিয়েত ইউনিয়ন গোপনে আমেরিকা ও ব্রিটেনকে, ১৯৪৫ ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত ইয়ালটা কনফারেন্সে (Yalta Conference, 1945 February) কথা দেয় যে, জাপানের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধে দাঁড়াবে, ইয়োরোপিয়ান যুদ্ধ শেষ হবার তিন মাসের মধ্যেই। প্রকৃতপক্ষে, প্রশান্ত মহাসাগরীয় পরিস্থিতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকানদের পক্ষে রাশিয়ান হস্তক্ষেপের আর প্রয়োজন হলো না ; আমেরিকানরা ১৯৪৫ জুলাই নাগাদ নিজেরাই যুদ্ধজয়ে সমর্থ হলো রাশিয়ান সাহায্য ছাড়াই। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন অনিবার্যভাবেই খুশি হলো ফাঁকতালে যুদ্ধজয়ের আনন্দে। ঘটনাক্রমে ১৯৪৫ জুলাই মাসে এলো পট্‌সডাম কনফারেন্স (Potsdam Conference, 1945 July) এবং ২৭ জুলাই-এর আমেরিকান-ব্রিটিশ-চীনা ঘোষণা (American-British-Chinese declaration, 27 July), জাপানকে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের আহ্বান জানালো। প্রধানমন্ত্রী সুজুকি (Suzuki) প্রত্যাখ্যান করলেন সেই হুমকি, কিন্তু ঘটনাবলী অনিবার্যভাবেই চলে গেল জাপানের পক্ষে নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

হিরোশিমার উপর অ্যাটম বোমা ফেলা হয় ৬ আগস্ট ১৯৪৫ তারিখে, এবং নাগাসাকির উপরে ৯ আগস্ট তারিখে। এই শহর দুটি সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। তখন শোনা যাচ্ছিল আরো অ্যাটম বোমা আসছে, যদিও আমেরিকার হাতে প্রকৃতপক্ষে ঐ সময়ে আর কোনো অ্যাটম বোমা ছিল না।

রাশিয়া ঐ ৯ আগস্ট তারিখেই জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে পড়লো, অর্থাৎ যেদিন নাগাসাকির ওপর অ্যাটম বোমা ফেলা হয়, এবং যে সময় জাপান সমস্ত বাস্তব উদ্দেশ্যেই পরাজিত হয়েছিল, এবং তারা তখন সন্ধান করছিল এক নিরপেক্ষ মধ্যস্থের—যার মাধ্যমে যুদ্ধবিরতির আলোচনা চালানো যায়।

সমস্ত বিমানহানা চলাকালেই আমি ছিলাম টোকিওতে, অবাক হয়ে ভাবছিলাম কিভাবে আমি আমার দেহ ও মনকে ঠিক রাখতে পারছি। আমাকে ঘন ঘন বাসা পাল্টাতে হচ্ছিল। আমি আমার পরিবারের দেখাশোনার জন্যে যখনি সম্ভব তখনি গ্রামের মধ্যে যেতাম, কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা উপযুক্ত সময় দিতে হতো টোকিওতে মিলিটারি হাইকমাণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্যে—যাতে আমি যুদ্ধের অগ্রগতির খবরাখবর বিষয়ে অবহিত থাকতে পারি।

যুদ্ধমন্ত্রী জেনারেল আনামি (Gen. Anami) তখনো পর্যন্ত জাপানি আর্মিকে যুদ্ধ বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন, এমনকি ১৯৪৫ আগস্টের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বলছেন যুদ্ধ চালিয়ে যেতে, ইম্পিরিয়াল ফোর্সের সেনা প্রতিদিনই নিহত হচ্ছে প্রচুর সংখ্যায়, এবং সেই একই ঘটনা ঘটছে অসামরিক লোকজনের ক্ষেত্রেও। আমেরিকান বি-২৯ বোমারু বিমানগুলি ঢেউয়ের পরে ঢেউয়ের মতো এসে জ্বালিয়ে দিয়ে যাচ্ছে শহরগুলির বিভিন্ন লক্ষ্যস্থানে নিখুঁত ভাবে। সেক্ষেত্রে তা সত্ত্বেও জাপানি প্রচেষ্টা চলছে তার দিক থেকে সমগ্র সেনাবাহিনীকে সংহত করে মূল ভূখণ্ডকে রক্ষা করার প্রাণপণ সংগ্রাম, কিন্তু সেই প্রচেষ্টাও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পরিণত হলো।

১৫ আগস্ট ১৯৪৫ তারিখ সকালে রেডিওর শ্রোতারা প্রথম শুনলো 'কিমি-গায়ো' (Kimi-gayo, জাপানের জাতীয় সংগীত), এবং জাপান সম্রাটের কণ্ঠস্বর :

> "আমাদের সৎ ও অনুগত প্রজাদের উদ্দেশ্যে··· দুনিয়ার স্বাভাবিক গতি-প্রকৃতির কথা গভীরভাবে চিন্তা করে, এবং আমাদের সাম্রাজ্যের সর্বশেষ প্রকৃত অবস্থার কথা জেনে, আমরা স্থির করেছি বর্তমান পরিস্থিতি বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা নিয়ে একটা কার্যকরী মীমাংসা করতে···আমরা যদি আর যুদ্ধ চালিয়ে যাই, তাহলে তার ফলে কেবল সমগ্র জাপান সাম্রাজ্য ভেঙে পড়বে ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে না, বরং তার পরিণতি হবে সমগ্র মানব সভ্যতার সমূহ অবলুপ্তি··· তাই সময়ের ও পরিণামের দাবি মেনে নিয়ে আমরা স্থির করেছি অনাগত ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যে অসহ্য দুঃখকষ্ট আর নির্যাতনকে অবিচল ভাবে সহ্য করে এক পরম শান্তির পথ প্রশস্ত করে দিতে···আপনারা আপনাদের সমস্ত শক্তিকে সংহত করে সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে আত্মনিয়োগ করুন"···

এই রাজকীয় অনুশাসন ছিল দীর্ঘ, এবং কেবল তার সংক্ষিপ্ত সারই এখানে দেওয়া হলো। সংক্ষেপে বলতে গেলে, সম্রাট 'পটসডাম ঘোষণা' (Potsdam

Declaration) মেনে নিয়েই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করছিলেন—যার দাবি ছিল জাপানের পক্ষে 'নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ'।

মিত্রশক্তির বিজয়-দিবস ছিল ১৪ আগস্ট ১৯৪৫ তারিখে। একটা দুর্ধর্ষ ও মর্মান্তিক যুদ্ধের শেষ হলো অসংখ্য জীবন ও অকথ্য নির্যাতনের মধ্যে। একটা জাতির পতন হলো ক্ষমতার সুউচ্চ চূড়া থেকে সমূহ পরাজয়ের ধরাশয্যায়, এবং তার পরিণাম হলো তার জনগণের পক্ষে অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট আর লাঞ্ছনা ভোগ।

যদিও সম্রাট তাঁর রেডিও-ঘোষণা করলেন ১৫ আগস্ট ১৯৪৫ তারিখ সকালে, কিন্তু তাঁর 'পট্‌সডাম ঘোষণা অনুসারে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল ১০ আগস্ট তারিখে, অর্থাৎ নাগাসকির উপর অ্যাটম বোমা নিক্ষেপের ও সমগ্র শহরটি ধ্বংস হওয়ার ঘটনার পরদিনই। এক্ষেত্রে তাঁর ৪ দিন সময় লেগেছিল সশস্ত্র বাহিনীর বিভিন্ন বিভাগ থেকে মিলিটারির পক্ষে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্যে এবং প্রয়োজন হলে শেষ মানুষটি পর্যন্ত প্রাণ দেবে এই অনুমতি প্রার্থনার সমস্ত আবেদন-নিবেদনকে অগ্রাহ্য করতে, অর্থাৎ আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নিতে। যুদ্ধমন্ত্রী জেনারেল কোরেচিকা আনামি (Gen. Korechika Anami), ভূলুণ্ঠিত হয়ে সম্রাটের কাছে তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের জন্যে প্রার্থনা করেন। যুদ্ধমন্ত্রী চেয়েছিলেন তিক্ত পরিসমাপ্তি পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে। কিন্তু সম্রাট তাঁর সিদ্ধান্তে অবিচলিত ছিলেন। সম্রাটের পক্ষ থেকে জাপানের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্তের কথা মিত্রশক্তির কাছে জানিয়ে দেওয়া হলো ১৪ আগস্ট ১৯৪৫ তারিখে। জেনারেল আনামি বিশ্বাস করতেন জাপানের সশস্ত্র সেনারা অবশ্যই কখনোই আত্মসমর্পণ করবে না; এখন তাঁর সহকর্মীদের কাছে সম্রাটের এই ঘোষণার কথা জানানো এবং তাঁকে বলে-কয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত পাল্টানোর ব্যাপারে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন, একথা বলাটা হলো তাঁর কাছে একটা অসহ্য রকমের কাজ।

একদল তরুণ অফিসার বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। জেনারেল তোজোর জামাই মেজর হিদেমাসা কোগা (Maj. Hidemasa Koga) এবং আরেকজন মেজর কেনজি হাতানাকা (Maj. Kenji Hatanaka), এই দু'জনে চলে গেলেন ইমপিরিয়াল গার্ডস ডিভিশনে (Imperial Guards Division) এবং গেট ভেঙে ঢুকে গেলেন কমাণ্ডারের অফিসে। জেনারেল মোরি (Gen Mori) তখন সেখানে ছিলেন। বিদ্রোহীরা চাইল জেনারেল মোরি তাঁদের সঙ্গে যোগ দিন এবং একটা মিলিটারি ক্যুপ ঘটিয়ে সুজুকির ক্যাবিনেটকে ধ্বংস করতে। জেনারেল মোরি যখন সেই প্রস্তাবে অসম্মত হলেন, মেজর হাতানাকা তাঁকে গুলী করে মেরে ফেললেন। তারপর জেনারেল মোরির সিলমোহর নিয়ে তাঁরা একটা জাল আদেশনামা বের করলেন, যাতে বলা হলো—ইমপিরিয়াল গার্ডস বাহিনী যেন এই বিদ্রোহী

অফিসারগোষ্ঠীর কথামতো কাজ করে। অতঃপর তাঁরা চলে গেলেন সম্রাটের প্রাসাদে ; সম্রাটের আত্মসমর্পণের ঘোষণা-প্রচারের রেকর্ডটি যা তখন তাঁর ঘরে রক্ষিত আছে বলে তাঁরা শুনেছিলেন, সেটি হস্তগত করতে। তাঁরা সেটি খুঁজে পেলেন না। ১৪ আগস্ট তারিখে তাঁরা ঝড়ের বেগে ঢুকে পড়লেন রেডিও ব্রডকাস্টিং স্টেশনে যাতে সেই ঘোষণার টেপ-রেকর্ডটি কেড়ে নেওয়া যায়, কিন্তু আবারও তাঁরা ব্যর্থ হলেন। সম্রাটের ঘোষণামূলক ভাষণের টেপ-রেকর্ডটি পূর্ব-নির্দিষ্ট বিমানযোগে ইতিমধ্যেই যথাস্থানে পৌঁছে গেছে।

১৪ আগস্ট ১৯৪৫ তারিখে জেনারেল আনামি, সামুরাই ঐতিহ্য অনুসারে, সম্রাটের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে একখানি চিঠি লিখলেন, এবং 'হারাকিরি' করে আত্মহত্যা (seppuku) করলেন। জেনারেল আনামী যখন মারা যাচ্ছেন, ইস্টার্ন ডিস্ট্রিকট আর্মি কমাণ্ডার জেনারেল তানাকা (Gen. Tanaka) তখন ইমপিরিয়াল গার্ডস বাহিনীর একটি অনুগত ইউনিটকে পরিচালিত করে কোনোরকমে ঐ বিদ্রোহী তরুণ অফিসারদের দমন করার ব্যবস্থা করলেন। এটা বিশ্বাসযোগ্যভাবে শোনা যায়, জেনারেল তানাকাই ঐ বিদ্রোহী অফিসারগোষ্ঠীকে রেডিও ব্রডকাস্টিং স্টেশনের প্রত্যেককে গুলী করে মারতে নিষেধ করেছিলেন, যেহেতু ঐ দু'জন মেজরই তখনো পর্যন্ত একটা শক্তিশালী বাহিনীকে সমস্ত শক্তি নিয়ে সংহত করার চেষ্টা করছেন।

দেশবাসী যখন সম্রাটের রেডিও-ঘোষণা শুনলো, তারা কেঁদে ফেললো. তবুও তারা সম্রাটের প্রাসাদের প্রতি অনুগত রইলো। পরবর্তী কয়েকদিনের জন্যে, সশস্ত্র বাহিনীর ঐ তণরুগোষ্ঠী ছিল বিক্ষুব্.র ও মারমুখী। কিন্তু শীঘ্রই অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে এলো। মেজর কোগা (Maj. Koga) এবং তাঁর সহকর্মী মেজর হাতানাকা এবং অন্যান্য অনেকেই আত্মহত্যা করলেন নিজেদের বন্দুক দিয়ে। এক বিপুল সংখ্যক অফিসারবৃন্দ আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মহত্যা করলেন মিলিটারি চত্বরের মধ্যে (Yoyogi) 'হারাকিরি' করে। আরো কয়েকজন দলবেঁধে তাঁদের জীবন শেষ করলেন সম্রাটের প্রাসাদের নিকটবর্তী এক পাহাড়ের উপরে গিয়ে হাত-গ্রেনেডের সাহায্যে।

রাজকুমার হিগাশিকুনি (Prince Higashikuni) সুজুকির স্থানে অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী রূপে নিযুক্ত হলেন। রাজপরিবারের অন্যান্যদেরও বলা হলো দেশের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে জাপানি সেনাদের সম্রাটের আত্মসমর্পণের আদেশনামাকে মেনে নিতে, যেহেতু ঐ সেনাদের অধিকাংশই সম্রাটের আদেশনামার ঘোষণা ঠিক বিশ্বাস করতে পারেনি।

অ্যাডমিরাল মাতোমে উগাকি (Adm. Matome Ugaki), নৌবাহিনীর 'কামিকাজে' শাখার (Kami-kaze wing) কমাণ্ডার, তাঁর নিজস্ব বিমানে করে ওকিনাওয়া দ্বীপের দিকে চলে গেলেন এবং আর ফিরে আসেন নি। অবশ্যই তিনি

নিজেকে হত্যা করে ফেলেছেন। তিনি একটি বার্তা রেখে গেলেন, যাতে লেখা ছিল—অসংখ্য যুবক পাইলট যাদের মধ্যে তাঁর কমাণ্ডের অধীনস্থ বহু তরুণ পাইলটও আছেন, তাঁদের মৃত্যুর জন্যে তিনিই দায়ী, এবং সেনাবাহিনীর অ্যাড-মিরাল ইসোরোকু ইয়ামামাতোর (Adm. Isoroku Yamamato) জীবন রক্ষার ব্যাপারেও তিনিই ব্যর্থ ও দায়ী।

ভাইস-অ্যাডমিরাল তাকিগিরো ওনিশি (Adm. Takigiro Onishi) 'কামি কাজে' সংস্থার জনক (falher of the 'Kami-kaje'), তিনি তরবারি দিয়ে নিজেকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিলেন। আর যাঁরা আত্মহত্যা করেছিলেন, তাঁদের সংখ্যাও ছিল বিপুল; তাঁদের মধ্যে ছিলেন অসামরিক প্রশাসনের কয়েকজন উচ্চস্তরের অফিসারবৃন্দ, এবং অবশ্যই সশস্ত্র বাহিনীর জেনারেল ও অন্যান্য সিনিয়ার কমাণ্ডাররাও ছিলেন। পরাজয়ের গ্লানি এবং বীভৎসতা ও যন্ত্রণা যা চলেছিল, তার ফলে তাঁরা সম্পূর্ণ পরাভূত হয়েছিলেন, যার ফলে তাঁরা চেয়েছিলেন অন্তত জাতিগত প্রেরণা হিসেবে তাঁদের প্রাণ দিয়েও 'বুশিডো'র (Bushido) ধারা বাঁচিয়ে রাখতে।

আমেরিকান বাহিনী জাপানে পৌঁছুতে শুরু করে দিল ২৯ আগস্ট ১৯৪৫ তারিখ থেকে। জেনারেল আইচেলবার্জার (Gen. Eichelberjer) ৩০ আগস্ট সকালের বিমানেই সেখানে পৌঁছালেন, এবং জেনারেল ম্যাকার্থার-এর (Gen. Mac-Arther) সি-৫৪ 'বাটান' (Batan) বিমানখানি *সেখানকার মাটিতে নামলো আস*-টুগি বিমানবন্দরে (Astugi airport) ঐদিন বিকেলেই। এক্ষেত্রে আমেরিকানদের মধ্যে দারুণ এক আশংকা ছিল যে তাঁর জীবনের ওপর সংশ্লিষ্ট এলাকার বাহিনীর দ্বারা কিংবা 'কামি কাজে' শাখার পাইলটদের যাঁরা বিমানবন্দরের কাছাকাছি এলাকায় বসবাস করছেন, তাঁদের দ্বারা জেনারেল ম্যাকার্থারের প্রাণনাশের প্রচেষ্টা হতে পারে। কিন্তু সেরকম কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটেনি। বিপরীতক্রমে, ইয়োকোহামা পর্যন্ত সমগ্র ১৫ মাইল ব্যাপী রাস্তা সোজা যেখানে গিয়েছে গ্রাণ্ড হোটেল (Grand Hotel) পর্যন্ত, যেখানে জেনারেল ম্যাকার্থার সাময়িকভাবে ছিলেন টোকিওর আলাসকায় আমেরিকান এমব্যাসি অফিস ভবনে যাওয়ার আগে পর্যন্ত, সমস্ত রাস্তাই সুরক্ষিত ছিল জাপানি সেনাদের দ্বারাই, এবং জাপানি সেনারা তাঁকে একইভাবে সম্মান দেখালো যেভাবে তারা তাদের সম্রাটকে সম্মান করতো। জেনারেল ম্যাকার্থার আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

রাশিয়া তার ৬ সপ্তাহের যুদ্ধ শেষ করলো জাপানের বিরুদ্ধে, ২ সেপটেম্বর ১৯৪৫ তারিখে। রাশিয়া মনে করলো, জাপানের হাতে ১৯০৪ সনে তার পরাজয়ের শোধ সে নিতে পেরেছে। সোভিয়েত রাশিয়া, দক্ষিণ শাখালিন ও কুরিল দ্বীপপুঞ্জকে (Sakhalin & Kurile Islands) দখল করে নিল। যাই হোক, জার্মানিতে যে অসম্ভব ঘটনা ঘটেছিল, জাপানের মূল ভূখণ্ড সেভাবে রাশিয়ান বাহিনীর দ্বারা

অধিকার করা সম্ভব হবে না। সমস্ত বাস্তব উদ্দেশ্য নিয়েই জাপানে আমেরিকার দখলদার বাহিনীর উপস্থিতি কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলির সম্মতিসূচক অংশগ্রহণের ফলেই সম্ভব হয়েছিল।

মামোরু শিগেমিৎসু (Mamoru Shigemitsu) ছিলেন জাপানি প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে, এবং লেঃ জেনারেল ইয়োশিজিরো উমেজু (Lt. Gen. Yoshijiro Umezu) ছিলেন ইমপিরিয়াল হাইকমাণ্ডের সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিনিধি; এঁরা দু'জনে আত্মসমর্পণের দলিলে সই করলেন – ২ সেপটেম্বর ১৯৪৫ তারিখে, জেনারেল ম্যাকার্থারের সামনে – টোকিও উপসাগরে অবস্থিত আমেরিকান যুদ্ধজাহাজ 'মিসৌরি'তে (Missori) বসে। লেঃ জেনারেল উমেজু স্বভাবতই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করেছিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সম্রাটের অভিপ্রায়েব কাছে নতি স্বীকার করলেন।

এই আত্মসমর্পণ উপলক্ষে জেনারেল ম্যাকার্থার এই আশা প্রকাশ করে বলেন যে – আরো সুন্দর এক দুনিয়ার আবির্ভাব সম্ভব হবে 'রক্তপাত ও অতীতের তিক্ততার পরে'...আজ বন্দুকের আওয়াজ নিস্তব্ধ...এক বিরাট ও মর্মান্তিক ঘটনার আজ শেষ...আসুন আমরা প্রার্থনা করি, এখন শান্তি পুনঃস্থাপিত হোক ও বিরাজ করুক সারা দুনিয়ায়, এবং ঈশ্বর তা নিয়ত রক্ষা করুন; এই বিবরণীর শেষ হলো।...

৪০০ খানিরও বেশি বি-২৯ বিমানের এক বাহিনী এবং আরো ১৫০০ খানিরও বেশি নৌবাহিত বিমান গর্জে উঠে মার্চ-পাস্ট করে গেল আত্মসমর্পণের স্বাক্ষরের জন্যে অবস্থিত যুদ্ধজাহাজ 'মিসৌরি'র উপর দিয়ে—সেই অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তিকে স্মরণীয় করে রাখতে – যে ঘটনায় সমগ্র জাপানবাসীর চোখ জলে ভরে গেল।

৮ সেপটেম্বর ১৯৪৫ তারিখে, জেনারেল ম্যাকার্থার প্রথাগতভাবে টোকিও শহরে প্রবেশ করলেন, এবং তাঁর অফিস স্থাপন করলেন দাইচি ভবনে (Daichi Buildings)। তিনদিন পরে, ১১ সেপটেম্বর তারিখে, আমেরিকান মিলিটারি পুলিশ গেল জেনারেল তোজোর বাড়িতে, তাঁকে গ্রেফতার করতে। জেনারেল তোজো চেষ্টা করেছিলেন পিস্তলের গুলীতে আত্মহত্যা করতে। যদিও তিনি সাংঘাতিকভাবে আহত হয়েছিলেন, আমেরিকান ডাক্তাররা তাঁর জীবন বাঁচিয়েছিলেন। ঘটনাক্রমে, জেনারেল ম্যাকার্থারের দ্বারা গঠিত 'যুদ্ধাপরাধ ট্রাইবুনাল (War Crimes' Tribunal) কর্তৃক জেনারেল তোজোকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলো, এবং তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হলো ২৩ ডিসেম্বর ১৯৪৮ তারিখে।

১৯৫১ এপ্রিলে প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুমান কর্তৃক বরখাস্ত হওয়ার পূর্বে (ট্রুম্যানের নীতির প্রতিবাদে ও কোরিয়ান যুদ্ধের আচরণের দায়ে), জেনারেল ম্যাকার্থার বলেছিলেন যে, তিনি জাপানের গণতন্ত্রীকরণ করেছেন। জাপানের সম্রাটকে তাঁর

স্বর্গীয় মর্যাদার আসন থেকে টেনে নামানো হলো। জেনারেল ম্যাকার্থারের ভবিষ্যদ্‌-বাণীর একটি হলো : জাপান আগামী ২৫ বছরের মধ্যে একটি খ্রীস্টানি দেশে পরিণত হবে। যদিও তা হয়নি। জেনারেল ম্যাকার্থারের স্থানে এলেন জেনারেল ম্যাথিউ বি. রিজওয়ে (Gen. Mathew B. Ridgway)। জাপানকে পুনর্গঠন করতে আমেরিকান সাহায্য, অর্থনৈতিক ভাবে ও অন্যান্য নানাভাবে, সত্যিই ছিল বিপুল পরিমাণে। সেই সহায়তা নিয়ে, কিন্তু পূর্ব থেকেই তাদের প্রকৃতিগত দারুণ কষ্ট-দুঃখ সহ্য করার ক্ষমতা এবং তার দক্ষ লোকজনের কাজের ফলে, সমগ্র জাতি হিসেবে জাপান তার শিল্প ও অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে এক অলৌকিক অগ্রগতি ঘটালো। জাপান 'সান ফ্রানসিসকো চুক্তি'র (San Francisco Treaty) পূর্ব পর্যন্ত সবযুদ্ধ ৬ বছর সাড়ে-আট মাস যাবৎ আমেরিকার অধিকারে ছিল, অতঃপর ঐ চুক্তি কার্যকরী হয় ২৮ এপ্রিল ১৯৫২ তারিখে। জাপানের যুদ্ধোত্তর কালীন বিকাশ যা তাকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 'সুপার-পাওয়ার' বা শ্রেষ্ঠ শক্তির মর্যাদার আসনে উন্নীত করে, তার প্রকৃতি এমনই ছিল যে, এরকম উন্নতি এর আগে কেউ কখনো দ্যাখেনি — অন্তত কোনো পরাজিত দেশের ইতিহাসে।

২৮.

সুভাষচন্দ্র বোসের অন্তর্ধান

মিত্রশক্তির বিজয়-দিবসের (১৪ আগস্ট ১৯৪৫) পরে ৩৬ বছরেরও বেশি হয়ে গেছে, মিত্রশক্তি তখন জাপানকে পদানত করে তাকে বাধ্য করে নিঃশর্ত আত্ম-সমর্পণ করতে। সুভাষচন্দ্র বোস তখনো ইনডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির (INA) একজন বীরনায়ক বলে ভারতে শ্রদ্ধা পাচ্ছেন, এবং ইমফল পতন সত্ত্বেও তাড়া-হুড়ো করে ব্রিটিশ শাসন থেকে ভারতকে মুক্ত করার কাজের জন্যে তাঁকে কৃতিত্ব দেওয়া হয়। তিনি শহিদ বলে বিবেচিত হন। এক্ষেত্রে যেভাবেই হোক, তাঁর তথাকথিত মৃত্যুকে ঘিরে বহু বিতর্ক আছে।

এক্ষেত্রে সন্দেহ নেই যে, বৃহত্তর পূর্ব-এশিয়া যুদ্ধ (Greater East-Asia war) ভারতকে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করতে একটু তাড়াহুড়োর পথ নিয়েছিল। এবিষয়েও কোনো বিতর্ক নেই যে, সুভাষচন্দ্র ছিলেন একজন মহান স্বদেশপ্রেমিক ও স্বাধীনতা সংগ্রামী। এসব কথা স্বীকার করে নিয়েও, আমরা মুহূর্তের জন্যে চিন্তা করে দেখতে পারি — ইনডিয়ান ইনডিপেনডেন্স লিগে তাঁর নেতৃত্বের ঘটনার বিষয়ে

ভেবে দেখতে, এবং তার অন্তর্ভুক্ত শাখা সংস্থাগুলি বিশেষত তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা ইনডিয়ান ন্যাশনাল আর্মিতে তাঁর নেতৃত্বের ঘটনার বিষয়ে। আসুন আমরা আমাদের যেকোনো ভাববেগের উচ্ছ্বাসকে আপাতত একপাশে সরিয়ে রাখি, এবং যে পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালে জাপান সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল, সেই পরিস্থিতিকে সঠিকভাবে দেখার ও বোঝার চেষ্টা করি।

জানা যায়, সুভাষচন্দ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাপানি সামরিক কর্তৃপক্ষকে বলেছিলেন, একখানি বিমানে করে তাঁকে এবং তাঁর কয়েকজন সহকর্মীকে নিয়ে জাপানি-নিয়ন্ত্রিত এলাকার ওপারে রাশিয়ান-অধিকৃত এলাকায়, খুব সম্ভব মানচুকুওয় পৌঁছে দিতে ; মানচুকুও ততক্ষণে আংশিকভাবে রাশিয়ানদের দ্বারা অধিকৃত, এবং রাশিয়া তখন জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে ৯ আগস্ট ১৯৪৫ তারিখে, অর্থাৎ যুদ্ধবিরতি ঘোষণার মাত্র কয়েকদিন আগে। এটা তাই স্বভাবতই বিশ্বাস করা যায়, সুভাষচন্দ্র যে প্রস্তাব করেছিলেন তা তাঁর পরামর্শ-দাতাদের কথাতেই করেছিলেন।

একজন নেতার গুণাবলীর প্রকৃত পরীক্ষা হয় জরুরি কালীন সময়ে কিংবা সংকটকালে। তাঁকে স্বভাবতই হয় সেই বিপদসাগর সাঁতরে পার হতে হয়, কিংবা অনুগামীর দলবল সহ ডুবে মরতে হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে সুভাষচন্দ্রের পলায়নের কাহিনী, তা তাঁর সহকর্মীদের পরামর্শেই হোক বা তাঁর নিজস্ব চিন্তার ফলেই হোক, তা যদি সত্যি হয় তবে তার অর্থ হলো, তিনি তাঁর সমস্ত লোকজনদের (পুরুষ ও মহিলা) যাঁদেরই নেতৃত্বে ছিলেন তিনি, তাঁদের এমন বিপদের মধ্যে ফেলে গেলেন, যে সময়ে তাদের সবচেয়ে বেশি দরকার ছিল তাঁরই সাহসী নেতৃত্বের। আমার পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন যে, সুভাষচন্দ্রের মতো একজন নেতা এমন একটা ক্ষতিকর কাজ করবেন। সুতরাং আমি তাঁর পলায়নের এই সমস্ত কাহিনীর বিষয়ে সন্দেহবাদী ছিলাম, সাধারণভাবে যেসব কথা স্বভাবতই বিশ্বাস করা হয়ে থাকে।

এক্ষেত্রে বহু লোক আছেন যাঁরা গোপনে বা প্রকাশ্যে সুভাষচন্দ্রের সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করেন : যেন তাঁকে একবার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে পালিয়ে যেতে দেওয়া হয়, অন্তত তাঁর মতো মূল্যবান জীবনের কথা ভেবে, যাতে তাঁকে বিজয়ী মিত্রশক্তির দিক থেকে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া না হয়, বিশেষত তার ব্রিটিশ পক্ষের হাতে তুলে দেওয়া না হয়,—যাদের বিবেচনায় সুভাষচন্দ্র নিঃসন্দেহে হারানো অঞ্চল পুনরধিকারের চেষ্টা করবেন এবং ব্রিটিশরাও জাপানের সমর্থকদের শত্রুপক্ষ বলে বিবেচনা করবে। একথা যাঁরা বলেন সেই একই লোকেরা আবার বলেন যে, সুভাষচন্দ্র পালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন যাতে তিনি বাইরের কোনো বিকল্প স্থান থেকে ভারতের স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারেন। আমি দেখলাম, এরকম কোনো তত্ত্বকথা সমর্থন করা অসম্ভব, কারণ তা যুক্তিসংগত ছিল না। গোলমালের

জায়গা থেকে পালিয়ে গিয়ে তিনি হয়তো কিছু পেতে চেয়েছিলেন, সেটা অসম্ভব নয়। তবে, তা ভারত ত্যাগ করে অন্য দেশে গিয়ে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার মতো ব্যাপার নয়। এই পরিস্থিতি অন্য এমন কোনো কিছুরই সমান হতে পারে না যা অন্যান্য স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পক্ষে, বিশেষত ভিতর থেকে কিছু করার পরিবর্তে বাইরে থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে কিছু করার মতো অনুসরণযোগ্য দৃষ্টান্ত হতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, এটা নিশ্চয়ই রাসবিহারী বোসের পলায়নের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত নয়, কিংবা যে কারণে অন্যান্যরা যেমন রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের মতো ব্যক্তি দেশ ছেড়ে পালিয়েছিলেন তার সঙ্গেও তুলনীয় হতে পারে না।

এটা একরকম অবিশ্বাস্য যে, সুভাষচন্দ্রকে যাঁরা বিশিষ্ট নেতা মনে করেন সেই সুভাষচন্দ্র যে কোনো পরিস্থিতিতেই হোক তাঁর লোকজনদের ফেলে নিজের নিরাপত্তার জন্যে ছুটবেন। এরকম কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের চেয়ে তিনি অনেক বেশি সাহসী ছিলেন। এবং তাঁর তথাকথিত গন্তব্যস্থান, যথা রাশিয়া কিংবা রাশিয়ান নিয়ন্ত্রিত এলাকাও কিন্তু কোনো বিবেচক লোকের পক্ষে ভারতীয় স্বাধীনতার স্বার্থে নতুন করে কাজ চালিয়ে যাওয়ার মতো উপযুক্ত স্থান নয়। রাশিয়া ছিল সুভাষচন্দ্রের শত্রু ব্রিটেনের মিত্রদেশ, এবং যে ব্রিটিশশক্তি সুভাষচন্দ্রের মিত্র জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত। এই পরিস্থিতিতে রচিত যে কোনো পরিকল্পনায়, মসকোর উদ্যোগে নতুন করে একটা ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের কেন্দ্র স্থাপন, স্বভাবতই কোনোক্রমেই যুক্তিসংগত নয়।

তাই একথা বলা হয় যে, তিনি 'জাপানি'দের সাহায্যে ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁকে বিমানে করে রাশিয়ায় কিংবা রাশিয়া নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। জাপানি মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে যাদের প্রাথমিক জ্ঞান আছে তারা কেউই বিশ্বাস করবে না যে, কোনো জাপানি পাইলট তার বিমান নিয়ে রাশিয়ার মাটিতে নামবে, কিংবা এমনকি রাশিয়া নিয়ন্ত্রিত বিমানপথ দিয়ে যাবে। তার চেয়ে বরং তার আগেই সে অন্য কোনো উপায়ে আত্মহত্যা করবে, খুব সম্ভবত ঐতিহ্যগত জাপানি প্রথা 'হারাকিরি' করে, কিংবা বিকল্প হিসেবে তার বিমানকে শত্রুপক্ষের গোলার আওতার মধ্যে নিয়ে গিয়ে নিজেকে বিধ্বস্ত করে ফেলবে 'কামি কাজে' বিমানের কায়দায়। এবং সেক্ষেত্রে একজন জাপানি কমাণ্ডার এমনভাবে তাঁর বিমানকে চালনার কাজে নিযুক্ত করবেন যাতে মনে হবে তখন তিনি তাঁর বিমানকে আর মাটিতে নামাতে চান না, কিংবা তার আরোহী হিসেবে নিজেকে আর বাঁচাতে চান না।

আমাদের বলা হলো যে, সুভাষচন্দ্রের নিজের জন্যে ঐ বিমানে একটি আসন রাখা হয়েছে, এবং আরেকটি আসন রাখা হয়েছে তাঁর সাহায্যকারী ক্যাপটেন

হাবিবুর রহমানের জন্যে : ঐ একই বিমানে কয়েকজন জাপানি অফিসারও যাচ্ছিলেন। একথা বলা হয়ে থাকে যে, ঐ বিমানটিতে বহু সংখ্যক বাক্সো নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল যাতে ছিল প্রচুর পরিমাণে সোনা এবং অন্যান্য মূল্যবান জিনিস-পত্রাদি যা ছিল সুভাষচন্দ্রের সঙ্গের মালপত্রের অংশবিশেষ, এবং সেই বিমানটি তাইপের পথে বিধ্বস্ত হয়ে গেল, এবং তার পরিণতিতে বিমানে আগুন লেগে পুড়ে গিয়ে সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু হলো। জানা যায় হাবিবুর রহমান কিছুটা আঘাত পেয়েছিলেন, এবং তা পেয়েছিলেন যখন সুভাষচন্দ্রের গায়ের জামাকাপড়ের আগুন নেভানোর চেষ্টা করছিলেন। অপরপক্ষে, এক্ষেত্রে কিছু লোক অন্তত এখনো পর্যন্ত আছেন যাঁরা মনে করেন যে সুভাষচন্দ্র এখনো বেঁচে আছেন, হয়তো কোথাও লুকিয়ে আছেন। এক্ষেত্রে বহু উদ্ভট রকমের অনুমানের কথা প্রচলিত আছে, যাদের মধ্যে কয়েকটিতে অভূতপূর্ব সাড়া জাগানো চলচ্চিত্র তৈরির উপাদানও পাওয়া যেতে পারে।

আমার মতে, সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান বিষয়ে প্রত্যেকটি কাহিনীই বিশ্বাসযোগ্য বলে গ্রহণের পক্ষে অযোগ্য। আমি আগেই উল্লেখ করেছি, কোনো জাপানি বিমানের পক্ষে সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে রাশিয়ান এলাকায় যাওয়ার চেষ্টা করার তত্ত্বকথা একেবারেই হাস্যকর। সে প্রশ্ন একেবারেই সরাসরি নাকচ করে দেওয়াই উচিত। কিন্তু তথাকথিত ঐ ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রশ্নাদির আলোচনা করলে আমরা জানতে পারি, প্রচুর পরিমাণে ধনসম্পদ ঐ বিমানে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। বলা হয়ে থাকে যে, এই ধনসম্পদ ছিল মূল্যবান অলংকারের আকারে যা দান করেছিলেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার লোকজন, বিশেষত মালয়ের গরিব তামিল মজুরশ্রেণীর লোকেরা। যেকথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি, মহিলারা এমনকি তাঁদের 'মঙ্গলসূত্র' তুল্য পবিত্র অলংকারও সুভাষচন্দ্রের যুদ্ধ-তহবিলে দান করেছিলেন। এই ধনসম্পদের পরিণাম কি হলো ?

খুব সম্ভব অনুমান যে, একটি বিমান বিধ্বস্ত হয়েছিল ফরমোজায়, যে বিমানে সুভাষচন্দ্র পুড়ে গিয়েছিলেন, তার ফলেই সাংঘাতিক সন্দেহের সূত্রপাত হয়। একথাও বলা হয় যে, সুভাষচন্দ্র ছাড়াও আরো কয়েকজনের মৃত্যু হয় ঐ বিমান দুর্ঘটনায়। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত জ্ঞান-বিশ্বাস মতে, জাপানি যাত্রীদের যাঁরা প্রত্যেকেই মারা গিয়েছিলেন বলে তালিকাভুক্ত, তারা দুর্ঘটনার পরেও বহুক্ষণ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং তারপরই 'সম্ভবত তাঁদের মৃত্যু' হয়। এটা বিশ্বাসযোগ্য নয় যে, একখানি বিমান যা বিধ্বস্ত হলো ডজনখানেক বা ঐরকম সংখ্যার যাত্রী ও চালকসহ, তার মধ্যে মাত্র একজন অর্থাৎ সুভাষচন্দ্রেরই মৃত্যু হলো। আমি এহেন গল্পকথাকে বানানো বলেই মনে করি, তা সে বিষয়ে অন্যের মতামত যাই হোক না কেন।

কয়েকজন 'মৃত' ব্যক্তি সম্ভবত এখনো জীবিত। ঐ যাত্রীদের অন্যান্য কয়েকজন দুর্ভাগ্যক্রমে আর বেঁচে নেই। ঐ রকম জীবিতদের মধ্যে কয়েকজনকে আমি

ব্যক্তিগত ভাবে চিনতাম, তাঁরা আমাকে বলেছিলেন যে, 'মৃতদের তালিকা' যা অভিন্নভাবেই প্রকাশিত হয়েছিল বেশ কয়েকখানি বইতে, তা ছিল একটা হিসেব করা জালিয়াতি।

অলংকারপূর্ণ ধনসম্পদের কয়েকটি বাকসোর বিষয়ে প্রচুর পরিমাণে রহস্য আছে বলে মনে হয়। এবিষয়ে প্রকাশিত কোনো রেকর্ডপত্রে যা আমি এ পর্যন্ত দেখতে পেয়েছি, তাতে কিছুই প্রমাণিত হয়নি। খুব সামান্য কিছু সোনার অলংকার এবং অন্যান্য জিনিসপত্র, যার মূল্য নিতান্তই নগণ্য, সম্ভবত ঐ বিধ্বস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত বিমানের একমাত্র অবশিষ্ট বলে, যুদ্ধের পরে, জাপান সরকার টেকিওর ভারতীয় দূতাবাসের মাধ্যমে ভারত সরকারের কাছে হস্তান্তর করে। এইসব সামান্য জিনিস-পত্রাদি সত্যিই ভারতীয় সম্প্রাদায়ের কাছ থেকে সংগৃহীত সুভাষচন্দ্রের সেই যুদ্ধ-তহবিলের অংশ কিনা, এই কথাটাই একটা প্রকাশ্য প্রশ্ন। আমি ব্যক্তিগত ভাবে এরকম কোনো অনুমানে সন্দেহ করি। সেই জিনিসপত্রাদি যে কোনো জায়গা থেকেই সরিয়ে নেওয়া যেতে পারতো। যেভাবেই হোক, ঐ যুদ্ধ-তহবিলের অবশিষ্ট অলংকার সম্পদের একটা মোটামুটি হিসেব অনুসারে যার ওজন হবে প্রায় কয়েক শত কিলোগ্রাম, তার কি হলো? এর জবাব খুব ক্ষীণ ভাবেও বা সন্তোষজনক ভাবে আজ পর্যন্ত কোথাও প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

এক্ষেত্রে কয়েকটি বড় রকমের সন্দেহজনক দিক আছে তথাকথিত এই সমগ্র বিমানধ্বংসের কাহিনীর মধ্যে, সুভাষচন্দ্রের মৃত্যুতে এবং সেই ধনসম্পদের অন্তর্ধান বিষয়ে, যা তিনি সেই বিমানে করে নিয়ে যাচ্ছিলেন বলে শোনা যায়।

এটা মনে হয় যে, প্রাথমিক ভাবে একটা ব্যবস্থা হয়েছিল এস. এ. আয়ার ও হাবিবুর রহমান উভয়েই সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে যাবেন ঐ বিমানে ; কিন্তু স্থানাভাবে পরে স্থির হয় কেবলমাত্র হাবিবুর রহমানই সঙ্গে যাবেন। কিন্তু আয়ার কোনোভাবে ব্যবস্থা করে টৌকিওয় পৌচেছিলেন তথাকথিত ঐ বিমান দুর্ঘটনার ২-৩ দিনের মধ্যেই। তিনি কয়েকদিনের জন্যে টৌকিওর শিমবাশিতে দাইচি হোটেলে (Daichi Hotel,)।

IIL-সংস্থার প্রচার দফতরের কয়েকজন কর্মী তখন ঐ একই দাইচি হোটেলে অবস্থান করছিলেন এবং আয়ারের সঙ্গে দেখা করতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তিনি কৌশলে তাঁদের এড়িয়ে যান। একজন জাপানি, লে: কর্নেল কাদামাৎসু (Lt. Col. Kadamatsu), যেভাবেই হোক আয়ারের সঙ্গে তাঁর ঐ হোটেল ঘরেই ছিলেন বেশ কয়েক ঘণ্টা, প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত। তাঁদের মধ্যে যে আলোচনাদি হয়েছিল তা নির্ভরযোগ্য কোনোভাবে জানা যায়নি। কিন্তু এক্ষেত্রে একটা জোর গুজব যে, তাঁদের মধ্যে অনেক 'পরিকল্পনা' হয়েছিল — কিভাবে সুভাষচন্দ্রের 'অন্তর্ধান' বিষয়ে

এবং তাঁর সঙ্গের মোটা পরিমাণ ভারতীয় ধন-সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে একটা গল্প ফাঁদা যায় সেই বিষয়ে।

১৯৪৫ আগস্টের শেষ সপ্তাহে, আমি আয়ারের সঙ্গে দেখা করি এ. এম. সহায়ের (A. M. Sahay) বাসায়, যেখানে আমি দেখেছিলাম বহু সংখ্যক ধাতুর বাকসো যা সেখানে এনেছিলেন আয়ার। আমি ঐসব বাকসোর আকার দেখে কৌতুহলী হয়েছিলাম, এবং তার ওজন সম্পর্কে একটা ধারণা পেতে চেয়েছিলাম ঐরকম একটি বাকসো তোলার চেষ্টা করে। কিন্তু ঐ বাকসো এত ভারি ছিল যে, আমি অনেক চেষ্টা করেও (এবং আমি দুর্বলদেহী লোক ছিলাম না) তাকে নাড়াতে পারিনি। আমি তখন বুঝলাম যে, ঐ ধাতুর বাকসোগুলিতে কাপড়চোপড় নয় কিন্তু অন্য কিছু আছে, এবং খুব সম্ভবত – তা ভারি ধাতু। আমি জিজ্ঞাসা করলাম আয়ারকে – এতে কি আছে? তিনি স্রেফ চুপচাপ ও সতর্ক হয়ে গেলেন, এবং কেবলমাত্র বললেন: 'গুরুত্বপূর্ণ কিছু' আছে। কিন্তু সেটা ঠাট্টা-তামাশার সময় ছিল না।

আয়ারের সেই এড়িয়ে-যাওয়া জবারের একমাত্র অর্থ হতে পারে যে, ঐ বাকসোর বিষয়ে গোপন কিছু ছিল, যা তিনি আমাকে জানতে দিতে চাননি। আমার প্রতি তাঁর এই ব্যবহার, বিশেষত ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন বিশিষ্ট সদস্য এবং একজন প্রাক্তন সহকর্মী হিসেবে আমার প্রতি, ছিল অত্যন্ত খারাপ।

মিঃ সহায়ের বাড়ি থেকে আয়ার গিয়েছিলেন ব্রিটিশ দূতাবাসের চিফ ইনটেলিজেন্স অফিসার কর্নেল ফিগ্‌স-এর (Col. Figges) কাছে, এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। ঐ ঘটনার ২-৩ দিনের মধ্যেই হাবিবুর রহমানও কর্নেল ফিগ্‌স-এর কাছে গেলেন এবং তিনিও আত্মসমর্পণ করলেন। আয়ার এবং রহমান উভয়কেই পরে ভারতে ফেরত পাঠিয়ে দেয় ব্রিটিশ পক্ষ। আমাকে বলা হয়েছিল যে, আয়ার তাঁর সমস্ত 'বকেয়া বেতন' পেয়েছিলেন রয়টারের কাছ থেকে, এবং তাই হাবিবুর রহমানকেও ঐ একইভাবে তাঁর সমস্ত প্রাপ্য মিটিয়ে দেওয়া হয়েছিল ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে, তারপর রহমান স্বেচ্ছায় পাকিস্তানের চাকুরিতে যোগ দিলেন। সুভাষচন্দ্রের সবচেয়ে বিশ্বস্ত লেফটেনাণ্ট ভারতে থাকাই অনভিপ্রেত মনে করলেন!

আয়ার তাঁর নিজের লেখা 'স্টোরি অফ দি ইনডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি' (Story of the Indian National Army) বইতে লিখেছেন যে, – তিনি যখন টোকিওতে ছিলেন, তখন জাপানের 'ফরেন অফিস' অর্থাৎ বিদেশ দফতর তাঁকে অনুরোধ করেছিল সেই বিমানধ্বংস ও সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু বিষয়ে একটা বেতার-সংবাদের খসড়া করার ব্যাপারে সাহায্য করতে। আমি মনে করি, এই ঘটনাটি কোনো ষড়যন্ত্রের ইংগিতপূর্ণ। প্রথমত – জাপানের বিদেশ দফতর NHK-সংস্থা চালাচ্ছিল না। দ্বিতীয়ত – কেন আয়ারের সাহায্য চাওয়া হয়েছিল? যদি কাউকে অনুরোধ করতেই হয় সাহায্যের জন্যে, তবে হাবিবুর রহমানের সাহায্য চাওয়াই হবে নিশ্চয়ই

যুক্তিসংগত নির্বাচন। আয়ার কেমন করে জানবেন কী ঘটেছিল সেই বিমান দুর্ঘটনা উপলক্ষে, যখন তিনি নিজে সেই ঘটনার মধ্যে ছিলেন না?

সেক্ষেত্রে দুটি কমিশন নিযুক্ত হয়েছিল ভারত সরকার কর্তৃক সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান বিষয়ে তদন্ত করতে: শাহ নওয়াজ কমিশন, এবং জাস্টিস খোসলা কমিশন। আমি ব্যক্তিগত ভাবে জানতাম, কিভাবে এই কমিশনগুলি জাপানে কাজ করেছিলেন। তাঁরা এমনভাবে তাঁদের কাজ চালিয়েছিলেন, যেন তাঁদের কর্তব্য সুভাষচন্দ্র সেই তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন, এটাই প্রতিষ্ঠা করা। এবং তাই তাঁদের রিপোর্টে তাঁরা বলেছিলেন, সুভাষচন্দ্র সেই বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। তাঁরা কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছ থেকে তথ্য যাচাই করে দেখেন নি, যাঁরা এবিষয়ে বিশ্বস্তভাবে সাক্ষ্য দিতে পারতেন, এবং যাঁদের সহজেই পাওয়া যেতো। আমি বিশ্বাস করি, যাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল তাঁদের অধিকাংশই জ্ঞানবুদ্ধির চেয়ে মজাদার রসিকতারই আশ্রয় নিয়েছিলেন। ঘটনা হলো এই যে, জ্ঞানবুদ্ধি মতে তাঁদের কিছুই জানা ছিল না, এবং তাই কমিশনও সেভাবে কিছু সংগ্রহ করতে পারেন নি। আমার মতে, সেটা ছিল একটা মেকি ও বাজে কাজ।

জাস্টিস খোসলা তাঁর রিপোর্টে বলেছেন যে, তিনি সেই সম্ভাব্য বিমান ধ্বংসের স্থান তাইপেতে (Taipeh) যান নি, কারণ ভারত সরকারের সঙ্গে কোনোরকম 'কূটনৈতিক সম্পর্ক ('diplomatic relations') ছিল না ফরমোজা গভর্নমেণ্টের। বিচারপতি খোসলার প্রতি সমস্ত শ্রদ্ধা নিয়েই আমি বলছি যে, এই যুক্তি হাস্যকর। আমার কোনো সন্দেহই নেই যে, তাইওয়ান প্রশাসনকে (Taiwan Administration) যদি অনুরোধ করা হতো, তাহলে তারা এ বিষয়ে অবশ্যই তাদের সর্বপ্রকার সম্ভাব্য সহযোগিতা প্রদান করতো। এক্ষেত্রে কোনো রকম কূটনৈতিক প্রশ্ন জড়িত ছিল না: যা জানার ছিল তা হলো সত্যকে খুঁজে বের করার চেষ্টা, এবং তা ভারতের জনস্বার্থে একটা জরুরি ব্যাপার। সেক্ষেত্রে ঐ রিপোর্টে এমন কোনো আভাস ছিল না যে, খোসলা কমিশন কখনো ফরমোসা কর্তৃপক্ষের কাছে কোনো অনুরোধ করেছেন। মোটকথা, বহু ভারতীয় এমনকি এখনো ফরমোসায় যাচ্ছেন, যদিও এখনো সেখানে কোনো রকম 'কূটনৈতিক সম্পর্ক' নেই ফরমোজার সঙ্গে ভারত সরকারের। আমি দুঃখের সঙ্গেই বলবো, খোসলা কমিশনের কার্যকলাপ সম্পর্কে আমার ধারণা খুব খারাপ।

১৯৫০-৫. সনে, আমি প্রস্তাব করেছিলাম যে, এবিষয়ে সত্য আবিষ্কারের একমাত্র আশা আছে একটা 'যৌথ' ইন্দো-জাপানিজ এনকোয়ারি কমিশন ('Joint' Indo-Japanase Commission of Enquiy) নিযুক্ত হলে। জাপানি ও ভারতীয় উভয় সংবাদপত্রগুলিই বেশ উৎসাহ দেখিয়েছিল এই প্রস্তাবের সপক্ষে, এবং তাদের মধ্যে কয়েকটি সংবাদপত্র সম্পাদকীয় প্রকাশ করেছিল এই মর্মে যে, এটাই হলো একমাত্র উপায় যার দ্বারা উপযুক্ত কোনো রকম ফলপ্রাপ্তির আশা

করা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, সেই ঘটনার পরে দীর্ঘ সময় পার করে সত্য আবিষ্কারে এমনকি যৌথ কমিশনের পক্ষেও গ্যারান্টি দেওয়া সম্ভব হতে পারে না; কিন্তু যদি আদৌ কোনো কিছু পাওয়া সম্ভব হতো, তা পাওয়া যেতে পারতো একমাত্র ঐ রকম কমিশনের মাধ্যমেই। মিঃ এইচ. ভি. কামাথ, এম. পি., ইনডিয়ান সিভিল সার্ভিসের একজন প্রাক্তন সদস্য, তিনি আই-সি-এস. থেকে পদত্যাগ করলেন, রাজনীতিতে যোগ দেবার জন্যে, তিনি এবং সুভাষচন্দ্রের একজন ভক্ত ছিলেন, তিনি অন্তত তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রথমে ঐ প্রস্তাব সমর্থন করে ছিলেন, ভারতীয় পার্লামেন্টে প্রদত্ত তাঁর এক ভাষণের মধ্যে। তিনিও বলেছিলেন যে, আমার ঐ প্রস্তাব কার্যকরী করা উচিত।

ভারত সরকার তখন সহযোগিতা চাইলেন জাপান গভর্নমেন্টের কাছে। জাপান সরকার ভারতীয় তদন্ত কমিশনকে সর্বপ্রকার সুবিধা-সুযোগ দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েও 'যৌথ কমিশন' গঠনের সেই প্রস্তাব কৌশলে এড়িয়ে গেলেন। কারণটা অনুমান করা কঠিন নয়। তাঁরা এ ব্যাপারে তাঁদের গায়ে আঘাত লাগুক বা তাঁরা কোনোরকমে জড়িয়ে পড়েন, তাঁরা তা চাননি, অন্তত যাতে অক্ষত থাকা যায় তাই তাঁরা চেয়েছিলেন। আমি মনে করি, ভারত সরকারের দিক থেকে ঐ প্রশ্নে চাপ না দেওয়াটা ভুল হয়েছিল। তার নিট ফল হলো যে, বহু অর্থ নষ্ট হলো ঐ দুই কমিশন নিয়োগের ফলে, যে কমিশনের রিপোর্টের ওপর, আমার মতে আদৌ আস্থা রাখা যায় না।

যখন শাহ নওয়াজ খান কমিশন টোকিওয় ছিলেন, কমিশন সদস্যদের একজন মিঃ মিত্র কর্তৃক আমার সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে একবার যোগাযোগ করা হয়েছিল, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ব্যক্তিগত কথাবার্তা বলার জন্যে। শাহ নওয়াজ নিজে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করার কথা ভাবেন নি, এবং আমি সহজেই তার কারণটা অনুমান করতে পারি: INA-র প্রথম দিককার দিনগুলিতে, তিনি ছিলেন একজন সীমানা-ঘেঁষা লোক, এবং এমনকি ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষেও তাই তিনি তাঁর সম্পূর্ণ মনোযোগ নয়—তার অতি সামান্য অংশই দিয়েছিলেন। আমি মিঃ মিত্রকে বলেছিলাম যে, যেভাবে সমগ্র কমিশনের কর্মসূচি স্থির হয়েছে, তা হলো ত্রুটিপূর্ণ। কোনো তদন্ত কমিশনেরই আগে থেকেই কোনো কিছু ঠিক করে নিয়ে সেটাকেই প্রমাণ করার কাজে নামা উচিত নয়: কোনো বিষয়ে তদন্ত করে যা পাওয়া যায়, তা থেকেই সিদ্ধান্তে আসা উচিত। অর্থাৎ যদি তাদের খোলা মন থাকতো তবে তাদের কাজ শুরু করা উচিত হতো কয়েকটি আনুমানিক বিষয় নিয়ে: দৃষ্টান্ত স্বরূপ এক্ষেত্রে বলা যায়—ক) সুভাষচন্দ্র কি জীবিত? খ) মারা গেছেন? গ) বন্দী হয়েছেন? ঘ) নিখোঁজ? ঙ) আত্মহত্যা করেছেন? চ) খুন হয়েছেন? এসবের কোনোটাই অসম্ভব ছিল না; সুতরাং এইসব প্রশ্নের প্রত্যেকটিরই অবশ্যই বিশদ-ভাবে অনুসন্ধান করা উচিত ছিল। কিন্তু তা করা হয়নি।

আমি যা বলেছি, অনেকের কাছেই মনে হবে এর চেয়ে বেশি আর কিছু বলার দরকার নেই। কিন্তু যদি আমার মন্তব্যের ফলে অত্যন্ত দায়িত্বশীল মহলে কিছু নিরপেক্ষ চিন্তা-ভাবনার উদ্রেক হয়, তাহলেই আমি সন্তুষ্ট হবো। ব্যক্তিগত ভাবে, আমি ঠিক নিশ্চিন্ত নই যে সুভাষচন্দ্র সত্যিই জাপানের আত্মসমর্পণের সেই দিনগুলিতে তাঁর চার-পাশের সংস্থার বিপর্যস্ত অবস্থার হাত থেকে রেহাই পেতে চেষ্টা করেছিলেন কিনা, কিংবা যদি তা করে থাকেন তবে তা পেতে সফল হয়েছিলেন কিনা। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার পক্ষে এখন আর আমার সন্দেহের কথা নথিবদ্ধ করার কোনো উপায় নেই; কিন্তু আমি মনে করি যে, একমাত্র যুক্তিহীন চিত্তের মানুষই আমি যেসব সম্ভাব্য প্রশ্নের অবতারণা করেছি তা অগ্রাহ্য করতে পারে।

এই সূত্রে, আমি পরিষ্কার স্মরণ করতে পারি যে, ১৯৫১ সনে একদিন পরলোকগত ভি. কে. কৃষ্ণমেনন কিছুক্ষণের জন্যে টোকিওয় ছিলেন, বিভিন্ন স্থানে যাতায়াতের পথে,—তার মধ্যে ছিল পিকিং, সেখানে তিনি তখন ছিলেন জওহরলাল নেহরুর 'বিশেষ প্রতিনিধি'। তিনি তখন ইমপিরিয়াল হোটেলে (Imperial Hotel) অবস্থান করছিলেন সেখানে তখন কর্নেল জে. কে. ভোঁসলে, আই-এন-এ'র প্রাক্তন চিফ, ছিলেন সাময়িকভাবে। আমি তখন সেই হোটেলে ছিলাম আমার কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার জন্যে। তখন ভোঁসলে আমাকে দেখে, কাছে এসে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন ভি. কে. কৃষ্ণমেননের সঙ্গে, এবং সেই সঙ্গে তাঁকে আমার জীবন ও কার্যকলাপের পটভূমি বিষয়ে বিশদ সংবাদও জানালেন। তিনি মেননকে বললেম: যখন তিনি (ভোঁসলে) এবং INA বাহিনী ব্রিটিশ ফোর্সের কাছে আত্মসমর্পণ করেন ১৯৪৫ সনে, তখন তারা সুভাষচন্দ্রের বিষয়ে কোনো কিছুই জিজ্ঞাসা করেনি, এবং কেবলমাত্র অনুসন্ধান করেছিল: এ. এম. নায়ার কোথায়?' আমার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া, যা আমি মনের মধ্যে চেপে রেখেছিলাম, তা ছিল দারুণ বিস্ময়কর: সুভাষচন্দ্রের 'অন্তর্ধান' বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে কিংবা অন্য কারো সহযোগে, ব্রিটিশ পক্ষের কোনো হাত আছে কিনা।

মেননের কাছ থেকে নির্দিষ্ট এক প্রশ্নের জবাব দিয়ে, ভোঁসলে নিশ্চিত হলেন যে, সংশ্লিষ্ট ব্রিটিশ পক্ষ একেবারেই কোনো কথাই বলেনি তথাকথিত সেই বিমান দুর্ঘটনা কিংবা সংশ্লিষ্ট যে পরিস্থিতিতে সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু হয়েছিল বলা হয় সেই সম্পর্কে,—অথচ যে সম্ভাব্য মৃত্যুর কথা সারা দুনিয়ায় বেতারযোগে প্রচার করা হয়েছিল। মেনন এবং আমি উভয়েই ভাবলাম, যদি ব্রিটিশ পক্ষ সুভাষচন্দ্রের বিমান ধ্বংসের খবর বিশ্বাস করতো এবং সে বিষয়ে একটি কথাও না বলতো, তাহলে তা হতো সম্পূর্ণ অ-ব্রিটিশ সুলভ। (এবং অবশ্যই কৃষ্ণমেনন, যিনি তাঁর জীবনের বেশ কিছুকাল ইংল্যাণ্ডে কাটিয়েছেন, তিনি ব্রিটিশকে ভালোই জানতেন।) একথা সত্যি যে, ব্রিটেনের এজেন্টরাই ভারতকে উপনিবেশে পরিণত করে তাকে

শোষণ করেছে দীর্ঘ থেকে সুদীর্ঘকাল যাবৎ ; কিন্তু তবুও এটা আশ্চর্যের বিষয় যে, INA বাহিনীর আত্মসমর্পণের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ব্রিটিশ অফিসারদের কেউই সংশ্লিষ্ট সুভাষচন্দ্রের বিষয়ে এমনকি একটি কথাও বললেন না, অবশ্য তাঁদের কাছে গোপনতা বজায় রাখার মতো 'টপ সিক্রেট' যদি কিছু না থাকে। যদি তা 'টপ সিক্রেট' হতো, তবে তার বিষয়বস্তু কি ? মোট কথা, যা বহু পাঠক স্মরণ করতে পারেন, জাপানিরা রুজভেলেটর মৃত্যুতেও শোকপ্রকাশ করেছে, এমনকি যখন যুদ্ধ চলছে এবং দু'পক্ষই যখন উভয়ের ঘোর শত্রু তখনো।

যদি সেটা সম্পূর্ণত IIL এবং INA সংস্থাকে উপেক্ষা করার ঘটনা হতো, তাহলে বিজয়ী পক্ষের অফিসাররা কেন এ. এম. নায়ারের বিষয়ে কোনো কিছু জানতে চাইবেন ? সেক্ষেত্রে বহু অনুমান করা যেতে পারে, এবং সমানভাবে জবাবও হতে পারে প্রচুর পরিমাণে। কিন্তু আমি মনে করি না যে, তার দ্বারা কখনো সত্য প্রতিষ্ঠা হয়। আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে, বিমানধ্বংসের সমস্ত কাহিনীটাই বানানো।

মোহন সিং তাঁর বইতে (Soldiers' Contribution to Indian Independence, p. 347) এই প্রসঙ্গে বলেছেন তাঁর 'দৃঢ় বিশ্বাস' যে, বিমান দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় ১৮ আগস্ট ১৯৪৫ তারিখে (যখন, তাঁর নিজস্ব বিবৃতি অনুসারে, তিনি নিজে ছিলেন সুমাত্রায়), এবং সুভাষচন্দ্র যে বিমানে মারা যান, কারণ হাবিবুর রহমান তাঁকে সেই রকমই বলেছেন, এবং হাবিব ছিলেন 'ধর্মভীরু শান্ত প্রকৃতির ভদ্রলোক' ইত্যাদি। আমার আশংকা, আমি আদৌ সেকথা মেনে নিতে পারি না, অর্থাৎ হাবিবুর রহমানকে মোহন সিং যেভাবে বর্ণনা করেছেন সেকথা। এমনকি মোহন সিং-এর সংশ্লিষ্ট 'সত্য বিবৃতিতেও' আমার কোনো বিশ্বাস নেই। সংখ্যার দিক থেকে যদি কেউ তাঁর বইয়ের মিথ্যাচার, অপব্যখ্যা, বিকৃতি ও বানানো কাহিনীর হিসেব করেন, তাহলে আমি মনে করি সেই তালিকা হবে দীর্ঘ।

সাধারণত গোয়েন্দাগিরি বহুপ্রকার হতে পারে, এবং যুদ্ধকালে ছদ্মবেশী বা চোরাগোপ্তা খুনের ঘটনাও হতে পারে, তা জাপানিদের দ্বারা এবং অন্য যে কোনো পক্ষের দ্বারাই হোক না কেন। অস্বাভাবিক সময়ে, কে মৃত বা কে ধৃত বা নিহত, আর কেই বা নিখোঁজ ইত্যাদি বিষয়ে কেউই নিশ্চিত হতে পারে না—তা সেই বিমানখানিই হোক আর X—Y—Z সত্যি সত্যিই কে সেই কাজ করেছে না করেছে, সেই বিষয়েই হোক। কেউই এ বিষয়ে সুনিশ্চিত হতে পারে না, এমনকি একখানি বিমান, তার নাম যাই হোক না কেন : ৯৭-২, স্যালি (sally), কিংবা অন্য যা কিছু হোক, এবং সত্যিই তার অস্তিত্ব আছে কিনা, এমনকি তা মাটি থেকে আদৌ উড়েছিল কিনা ইত্যাদি, সে বিষয়েও সুনিশ্চিত কিছু বলা যায় না।

কিছু লোক তাদের আনুগত্যে এমনই নিশ্চিত যে, তাদের কমরেড সঙ্গীদের

বিরুদ্ধে যাওয়ার চেয়ে বা তাদের ধ্বংস করার চেয়ে তারা বরং আত্মহত্যা করবে। অন্যদের হয়তো এরকম কোনো বিবেকের দুর্বলতা নাও থাকতে পারে। এ ধরনের ব্যাপারে কোনো বিশেষ দেশের পক্ষে কিছু বিচিত্র বা অসম্ভব নয়: তা হতে পারে যে কোনো স্থানে—ভারতে এবং জাপানেও হতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, কিছু লোক যারা ইনটেলিজেন্সি অফিসার অর্থাৎ পাল্টা গোয়েন্দাগিরির কাজ করতো যুদ্ধকালে ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে; জানা যায় তারা দখলদার কর্তৃপক্ষকে প্রচুর পরিমাণে সাহায্য করেছিল জাপানের আত্মসমর্পণের পরে বিভিন্ন ধরনের গোপন খবর দিয়ে।

এই ধরনের কিছু ঘটনা দেখতে হলে টোকিওতে কাউকে বেশিদূরে নজর দিতে হবে না, এবং এটা সহজেই বোঝা যায় যে, এই শ্রেণীর মানুষ অন্য যেকোনো স্থানেও আছে। ১৯৪০-এর শেষদিকে এবং ১৯৫০-এর গোড়ার দিকে এক্ষেত্রে মারুনৌচিতে নাইগাই ভবনের (Naigai Building, Marunouchi) চার-তলায় একটা অফিস ছিল—যারা ছিল জাপানের বিরুদ্ধে উপকরণ সংগ্রহে এবং তা কাজে লাগানোর ব্যাপারে আমেরিকান প্রসিকিউটারদের (American Prosecutors) দ্বারা নিযুক্ত (Joseph Keenan—জোসেফ কিনান পরিচালিত)—তাদের কাজ ছিল ইণ্টারন্যাশনাল ওয়ার ক্রাইমস ট্রাইবুনাল ফর দি ইস্ট-এর স্বার্থে (International Tribuual for the Far East)। ইনডিয়ান লিয়াজোঁ মিশনও (Indian War Crimes Liaison Mission) অবস্থিত ছিল ঐ একই ভবনের পাঁচতলায়, কিন্তু চারতলা ছিল স্বভাবত সেখানকার 'সিক্রেট' অফিসে যারা কাজ করতো তারা ছাড়া অন্য সবার পক্ষে অবাধ প্রবেশাধিকার যুক্ত, সাধারণত তাকে বলা হতো—যুদ্ধসংক্রান্ত অফিস (War History Office। কিন্তু সেই অফিসে কর্মরত একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন মেজর ফুজিওয়ারা আইওয়াইচি (Maj. Fujiwara Iwaiichi), তিনি ছিলেন ক্যাপটেন মোহন সিং-এর পৃষ্ঠপোষক এবং যিনি INA-এর ফাণ্ড সংগ্রহের জন্যে কৃতিত্বের দাবি করেন। আমি বিশ্বাস করি, তা ছিল সেই একই অফিস যা আমেরিকানদের পক্ষে জাপানিদের কাছ থেকে মোটামুটি অর্ধ মিলিয়ন অত্যন্ত মূল্যবান ঐতিহাসিক এবং অন্যান্য বহু বইপত্র ও উপকরণ জাপানি সূত্র থেকে সংগ্রহ করতে সাহায্য করেছিল, তার মধ্যে ছিল সরকারি, মহাফেজখানা এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, এবং সেগুলোকে জাহাজ বোঝাই করে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে পাঠিয়ে দেয়।

তাই এটা কিছু লোকের কাছে সব কিছুই সংগত মনে হতে পারে, কেবলমাত্র প্রেমে ও যুদ্ধেই নয়, বরং তা শান্তির সময়েও সমান সংগত। তারা সম্ভবত এমনকি শোচনীয় বিমানধ্বংস জনিত হতাহতের ঘটনারও, কিংবা অন্যান্য দুর্ঘটনারও তালিকা প্রস্তুত করতে পারে, যা হয়তো আদৌ সংঘটিত হয়নি। তাদের মধ্যে কিছু লোক হয়তো যাদুকরের মতো ভোজবাজি দেখাতে পারে: তারা সম্ভবত দিনকে

রাত এবং রাতকে দিন করতে পারে। কে বলতে পারে যে, এহেন উল্লেখ-যোগ্য মানুষদের মধ্যে কিছু লোক সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান কাহিনী বানানোর কাজ করেনি।

এতৎসত্ত্বেও যদিও আমি ব্যক্তিগত ভাবে সুভাষচন্দ্রের পালানোর কাহিনী অসত্য বলে মনে করি (কারণ আমি কখনো তাঁকে কাপুরুষ বলে জানতাম না), তবু আমি তাঁদের সঙ্গে খুব বেশি বিবাদ করবো না যাঁরা সেই ঘটনাকে সত্য বলে মনে করেন। মনুষ্য প্রকৃতি অনিশ্চিত হতে পারে। বিভিন্ন মানুষ ভিন্ন স্বরে চিন্তা করতে ও কাজ করতে পারেন — যা তাঁদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হতে পারে, যদিও অন্যদের কাছে তা মনে হতে পারে অন্যরকম। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইনডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর বিসম্বাদের পরে, সুভাষচন্দ্র বলতে গেলে একরকম পালিয়ে গেলেন ('run away') ভারত থেকে (কথাটা এইভাবেই প্রকাশ করেছিলেন এক বন্ধু, বেশ আপত্তিজনক ভাবেই)। প্রত্যেকেই অবশ্য এরকম কাজ করেন না তাঁদের রাজনৈতিক জীবনে। সাধারণত এক্ষেত্রে লোকে রুখে দাঁড়ায় এবং সংগ্রাম করে তার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে, হার বা জিত যাই হোক, দেশের মধ্যেই। আমার ঐ সদাশয় বন্ধু যাঁর কথা আমি আগেই বলেছি, তিনি মন্তব্য তিনি করলেন যে, সুভাষচন্দ্র যখন বার্লিনে নিজেকে দেখলেন ভুল লক্ষ্যপথে পরিচালিত, সেখান থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তাঁর সেই আকস্মিক যাত্রা যাই হোক, সেই পরিস্থিতিতে রাসবিহারী ও আমার পক্ষে এবং সেই সঙ্গে আমার ও IIL-সংস্থার প্রত্যেকের দিক থেকে যতই তাঁকে স্বাগত জানানো হোক না কেন, তা ছিল এক ধরনের 'পলায়ন'।

এহেন পরিস্থিতিতে এটা অসম্ভব নয়, যেমন কিছু লোক বলেন যে, সুভাষচন্দ্র হয়তো পালাতে চেষ্টা করেছিলেন - দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিশেষত চারিদিকের এই গোলমেলে অবস্থার সুযোগে। তাঁর এই ধরনের কার্যকলাপ হয়তো কোনো বদ্ধমূল ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্য যুক্ত করা যেতে পারে বা হতেও পারে। তবে এই ধরনের কাজকর্ম ভালো কি মন্দ, এখান তা আলোচ্য বিষয় নয়। সেকথা মূল্যায়নের বিষয় হতে পারে, এবং তার মধ্যে আমি যেতে চাই না।

যাঁরা এই 'পয়ায়ন' তত্ত্ব (? 'পলায়নী মনেভাব' ? escapism') সমর্থন করেন, (তাঁদের মধ্যে কিছু লোক, আশ্চর্য, এমনকি মনে করেন তা বেশ বিবেচকের মতো কাজই হয়েছে, যতি তা সত্যিই ঘটে থাকে!), সম্ভবত তাঁদের বক্তব্যের সপক্ষে আছে আরেকটি ঘটনা সুভাষচন্দ্র তাঁর পরিবারকেও ফেলে গেছেন জার্মানিতে, কিন্তু সে বিষয়ে কাউকেই কিছু বলতে চাননি। একথা তাঁর 'অন্তর্ধানের' অনেক পরে জানা যায় যে, তিনি বিয়ে করেছেন তাঁর জার্মান সেক্রেটারি এমিলি শেংকলকে (Emilie Schenkl), ১৯৪২ ফেবরুয়ারিতে এবং তাঁদের একটি মেয়েও আছে,

তার ভারতীয় নাম 'অনিতা'। আমার বন্ধুবান্ধবদের যাঁরা অনিতাকে দেখেছেন এবং সুভাষচন্দ্রকেও ভালোভাবে জানতেন তাঁরা বলেছিলেন যে, অনিতার মুখখানি সত্যিই একেবারে সুভাষচন্দ্রের ছাঁচ। জওহরলাল নেহরু এই অনিতাকে তাঁর অতিথি হিসেবে সাদর আপ্যায়ন করেন স্বাধীন ভারতে, যখন অনিতা ছিলেন তরুণী যুবতী মাত্র। কিন্তু সুভাষচন্দ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রত্যেককেই এমন একটা ধারণা দিয়েছেন যে, তিনি ছিলেন একজন 'ব্যাচেলার' বা চিরকুমার।

একথা কেউই বুঝতে পারে না যে, কেন একজন বিবাহিত লোক বলবে না সে বিবাহিত। এতে কোনো ভুল বা দোষের কিছু নেই যে কোনো লোক বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করছে অর্থাৎ বিবাহ করছে : এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। এবং কোনো লোক তার পরিবারের প্রতি আসক্ত বা সংযুক্ত থাকতে গর্ববোধই করবে, সেক্ষেত্রে তার জীবনে যেকোনো রাজনৈতিক চাপ বা যত অসুবিধেই থাক না কেন। একথা বলাই বোধ হয় সবচেয়ে ভালো হবে যে, বিবাহটা কারো ব্যক্তিগত ব্যাপার, কিন্তু সেরকম যুক্তি কেবলমাত্র সাধারণ লোকের পক্ষেই চলতে পারে। (সত্যি বলতে গেলে, আমি নিশ্চিত নই যে তাদের পক্ষেও একথা চলতে পারে কিনা।) মহান নেতারা সর্বদাই পাদপ্রদীপের সামনেই অর্থাৎ সামনের সারিতেই থাকেন, এবং তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনও— জনসাধারণের কাছে তাঁদের সম্পর্কিত ধারণার চিত্র থেকে সম্পূর্ণভাবে মুছে ফেলা যায় না।

এক্ষেত্রে আমি যা ভাবি তা হলো এটা প্রকৃতিগত 'পলায়নীবৃত্তির' আরেকটি দৃষ্টান্ত, যা অবশ্যই সাহসিকতা ও স্বদেশপ্রেমের পক্ষে ক্ষতিকর। আমি মনে করি একথার মধ্যে অনেকখানি সত্য আছে যে, মানবতার (এবং তার বৈচিত্র্যসহ) আলোচনা-সমালোচনার ক্ষেত্রে সর্বোত্তম উপায় হলো মানুষের আলোচনা-সমালোচনা করা। একথা আরো বলা হয়ে থাকে যে, প্রতিভাধর ও তার বিপরীত অর্থাৎ সাধারণ মানুষের মধ্যে ভেদরেখা কোনো কোনো ক্ষেত্রে খুব সামান্যই।

আমি সুভাষচন্দ্রকে শ্রদ্ধা করি এবং তাঁকে একজন মহান ভারতীয় হিসেবেও মান্য করি, কিন্তু আমি তাঁকে শহিদ বলে মনে করি না, যেমন অন্য অনেকে করে থাকেন বলে মনে হয়। দুনিয়ায় বহু বড় বড় নেতা আছেন, এবং তাঁদের মধ্যে সুভাষচন্দ্রও একজন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে সকলেই অবশ্যই শহিদ নন। কিছু কিছু বড় নেতা কিছু কিছু মারাত্মক ভুল করেছেন : আমি বলি সুভাষচন্দ্রও তাঁদের মধ্যে একজন। তাঁর প্রথম ভুল হলো—তিনি বিদেশে গিয়ে একটি বিপ্লবী সেনাদল গঠন করতে পারবেন এবং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সশস্ত্র শক্তির দ্বারাই ভারতকে স্বাধীন করতে পারবেন, এই আশায় ভারত ত্যাগ করা। তাঁর সবচেয়ে বড় ভুল হলো—তিনি ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করতে পারবেন জাপানিদের ও আই-এন-এর সাহায্যে ভারতে সশস্ত্র অভিযান চালিয়ে, একথা চিন্তা করা। এবং এক্ষেত্রে ব্যর্থতা যা হলো তা এমনকি চিন্তাভাবনার থেকেও অনেক বড়ধরনের এবং সুস্পষ্ট।

কিন্তু তাতে সুভাষচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম ছোট হয়ে যায় না। তবে এর দ্বারা যা বোঝায় তা হলো কেবল এই যে, তাঁর প্রচণ্ড গতিসম্পন্ন প্রবল ক্ষমতা ও শক্তিশালী ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তুলতে তিনি তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাশক্তি ও বিচারবোধকে যে পথে কাজে লাগিয়েছিলেন, তা ছিল ভুলপথে পরিচালিত। আমি আবার বলি যে, এটা আমার ব্যক্তিগত অভিমত এবং তার পূর্ণ দায়িত্ব আমারই। আমার মতামত অন্য কারো উপরেই জোর করে চাপিয়ে দেবার কোনো ইচ্ছাই আমার নেই।

একথা সুবিদিত যে, জনসাধারণের স্মৃতি স্বভাবতই ক্ষীণ। প্রথমদিকের একটি অধ্যায়ে আমি স্পষ্টতই বলেছি যে, INA একটি সুসংগঠিত এবং সুসংগতিপূর্ণ সংস্থা, এবং তা গড়ে উঠেছিল রাসবিহারী বোসের মহান নেতৃত্বে স্থাপিত ইনডিয়ান ইনডিপেনডেন্স লিগের দ্বারা। অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গেই আমি বলবো, এক্ষেত্রে এবং সুদূর প্রাচ্যে ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের সমগ্র কার্য-কলাপের ক্ষেত্রেই আমি ছিলাম রাসবিহারীর ঘনিষ্ঠতম এবং সবচেয়ে উৎসর্গীকৃত প্রাণ সহযোগী। সুভাষচন্দ্র উত্তরসূরী হিসেবে আমাদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন একটা 'রেডিমেড' বা একেবারে তৈরি-করা এবং একটি সুদক্ষ সংস্থা।

রাসবিহারী এড়িয়ে চলতেন সর্বপ্রকার আত্মপ্রচারের চাকচিক্য ও লোকদেখানো ভাবভঙ্গি, এবং তিনি সমস্ত ক্ষমতা নিয়ে শান্ত অথচ দৃঢ়ভাবে আত্মনিয়োগ করতেন গতিশীল, দক্ষ ও গঠনমূলক কাজে। সুভাষচন্দ্র পছন্দ করতেন কেবল নেতৃত্ব করতেই নয়, 'নেতৃত্বের ভাব' দেখাতেও—এমনকি নেতৃত্বের সর্বপ্রকার কায়দাকানুন ও বড় রকমের প্রচার কৌশলের সাহায্য নিয়ে সামনের সারিতেই থাকতে চাইতেন। সম্ভবত সেজন্যেই আজ, ভারতের জনসাধারণের মনে, আই-এন-এ এবং সমগ্রভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন – সুভাষচন্দ্রের সঙ্গেই প্রায় সর্বাংশেই সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সুদূর প্রাচ্যে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মঞ্চে সুভাষচন্দ্রের আবির্ভাব সম্পূর্ণতই সম্ভব হয়েছিল একমাত্র রাসবিহারী বোসের জন্যেই। রাসবিহারী না থাকলে সুভাষচন্দ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কিংবা সুদূর প্রাচ্যে থাকতে পারতেন না। এবিষয়ে আমরা যেন কোনো ভুল না করি। সুভাষচন্দ্র একথা তাঁর অন্তরের অন্তস্তল থেকেই জানতেন, এবং রাসবিহারীকে শ্রদ্ধা করতেন, যদিও দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি প্রায় সর্বদাই তাঁর বাস্তব জ্ঞানবুদ্ধির চেয়ে আবেগকেই বেশি প্রাধান্য দিতেন। তাঁর নেতৃত্ব ছিল একাধারে বীরত্বপূর্ণ ও মর্মান্তিক ('heroic and tragic')।

আমি আশা করতে পারি যে. আর বেশি দেরি হবার আগেই, ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে রাসবিহারী বোস যে মহান ভূমিকা পালন করেছিলেন, তার স্মরণে উপযুক্ত পর্যালোচনা ও সংরক্ষণ করা হবে—ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থেই।

আমাদের মধ্যে বিস্মৃতির ভাব দেখা যাচ্ছে, এমনকি গান্ধীজী, নেহরুজী, রাজাজী, এবং অসংখ্য অন্যান্য বিশিষ্ট নেতাদেরও ভুলে যাবার—যাঁরা আমাদেরকে সুদীর্ঘ কঠিন ও দুর্গম পথে চলার রাস্তা দেখিয়েছিলেন—যার ফলেই আমরা স্বাধীনতার পথে পা বাড়াতে পেরেছিলাম। আমরা যেন আমাদের সমস্ত নিদ্রাচ্ছন্ন ভাব পরিত্যাগ করে সেইসব মহাপুরুষদের শ্রদ্ধায় স্মরণ করতে তৎপর হতে পারি—যাঁদের জন্যেই আমাদের আজকের স্বাধীনতা আমরা ভোগ করছি। এবং আমরা যেন ভুলে না যাই দ্বিতীয় সারির কোনো নেতাকেই—যাঁরাই শক্ত করে ধরে রেখেছিলেন প্রথম সারিকে। জনসাধারণের স্মৃতি অত্যন্ত দুর্বল, আমরা যেন এই ধারণাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পারি।

সুভাষ-যুগ ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আমি অনেক কথাই বলেছি, এবং এ বিষয়ে আমি আমার পাঠকদের সহানুভূতি চাইছি। এখন আমি অবশ্যই আমার পর্যালোচনার উপসংহার করতে চাই এই বলে যে, আমরা আর সময় কাটাবো না ঐসব ঘটনার কথা বলে -তা ইম্ফল কাহিনী কিংবা অন্যান্য মর্মান্তিক বিষয় যথা সুভাষচন্দ্রের 'অন্তর্ধান' কাহিনী, যাই হোক। এসব বিষয় ভুলে যাওয়াই হবে সবচেয়ে ভালো কাজ যা আমরা করতে পারি তাঁর বিষয়ে এবং আমাদের দেশের বিষয়ে।

পরলোকগত মিৎসুরু টয়ামা একবার আমাকে বলেছিলেন যে, বৃহত্তর বিষয় সংরক্ষণের স্বার্থে, ক্ষুদ্রতর ব্যাপারাদি ভুলে যাওয়া কেবলমাত্র সম্ভবই নয় তা প্রয়োজনও বটে। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের সামগ্রিক বিচারের ক্ষেত্রে, আমি মনে করি, আমরা যা করতে পারি তা হলো যা হয়ে গেছে তাকে বিগত ঘটনা বলে ভুলে যেতে পারি—অন্তত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সুভাষচন্দ্র বোসকে ঘিরে যেসব অপ্রীতিকর গল্পকাহিনী গড়ে উঠেছে, সে বিষয়ে। আজ যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হলো সে বিষয়ে আমাদের এমন কিছুই করা উচিত হবে না যাতে আমাদের জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ক্ষেত্রে খুঁচিয়ে ঘা করা হয়, এবং সেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো: ভারত ও জাপানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের উন্নতি সাধন করা।

২৯.

ভারত এবং যুদ্ধোত্তর জাপান

জাস্টিস আর. বি. পাল কর্তৃক 'যুদ্ধাপরাধ' বিষয়ে ভিন্নমতের রায়।

জাপান যখন নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণ করলো মিত্রশক্তির কাছে, ভারত তখনো ব্রিটিশ শাসনাধীন। ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অকুপেশান ফোর্সের (BCOF) অংশ হিসেবে, ব্রিটিশ আর্মির একটা ছোট সেনাদল ছিল—তাকে জাপানে জেনারেল ম্যাকার্থারের (Gen. MacArthur) অধীনে দখলদার বাহিনীর কাজের গোড়ার দিকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। ভারতীয় সম্প্রদায়ের স্বার্থ বিষয়ে দেখাশোনার জন্যে ভারতের ব্রিটিশ সরকার, টোকিওর ব্রিটিশ সরকার, টোকিওর ব্রিটিশ লিয়াজোঁ অফিসের সঙ্গে আলোচনা করে মিঃ এল. পি. জৈনকে নিযুক্ত করলেন ইনডিয়ান লিয়াজোঁ মিশনের প্রধান হিসেবে। যুদ্ধের আগে আবাসিক ভারতীয়রা ছিল একটি সমৃদ্ধশালী সম্প্রদায়, তাদেরও অন্যান্য সকলের মতোই অত্যন্ত দুঃখ-কষ্ট এবং দারুণ আর্থিক ক্ষতি সহ্য করতে হয়েছিল—টোকিও এবং অন্যান্য শহরের উপর আমেরিকান বিমান বাহিনীর বোমাবর্ষণের সময়ে। তাদের সংখ্যা হবে প্রায় ৭৫০, এবং তাদের অধিকাংশই ব্যবসা-বাণিজ্যে নিযুক্ত ছিল। তাদের প্রধান বসবাস কেন্দ্র ছিল ইয়োকোহামা, কোবে এবং ওসাকা শহরে। টোকিওর আবাসিকদের সংখ্যা ছিল অপেক্ষাকৃত কম। সেক্ষেত্রে মাত্র অল্প কয়েকজন ছাত্র ছিল যারা তখনো লেখাপড়া করছিল জাপানি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে, কিন্তু তারাও যুদ্ধের কষ্ট-দুঃখের কবলে পড়ে গেল, এবং তারা ভারতে ফিরতে অসমর্থ হলো।

ভারতীয় সম্প্রদায়ের পুনর্বাসনের তাৎক্ষণিক জরুরি প্রশ্ন ছাড়াও, ইনডিয়ান মিশনের প্রধানের দায়িত্ব ছিল ভারত ও জাপানের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবনের কাজে সহায়তা করা—যা ছিল উক্ত আবাসিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিকাংশের কাছে বেঁচে থাকার পক্ষে প্রধান অবলম্বন। জাপানের পরাজয়ের পরে বেশ কিছুকাল যাবৎ সেদেশের সঙ্গে কোনোরকম আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ছিল না, কারণ জাপানের সমুদ্রপথগুলি মিত্রশক্তির নৌবাহিনীর দ্বারা মাইন পেতে নষ্ট করে রাখা হয়েছিল, এবং কোনো যাত্রীবাহী বা বাণিজ্য-জাহাজ জাপানের দিকে বা জাপান থেকে যাতায়াত করতে পারতো না। মাইন সাফাইকারীদের সাহায্যে সমুদ্র পথগুলিকে বাণিজ্য-জাহাজগুলির পক্ষে নিরাপদ করে তুলতে বেশ কিছু সময় লেগেছিল।

ইতিমধ্যে যাই হোক, মিত্রশক্তির সর্বোচ্চ কমাণ্ডারের (SCAP/Supreme

Commander for the Allied Powers) একটি অফিস ছিল, তার কাজ হলো জাপান এবং অন্যান্য দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নীতিগত বিষয়ে দেখাশোনা করা। মিঃ জৈন এ বিষয়ে কিছু পরিমাণে প্রস্তুতিমূলক কাজকর্ম করেছিলেন এই সংস্থার সঙ্গে, ভারতের বাণিজ্যিক স্বার্থ নিরাপদ করতে; যদিও এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল তিনি অধিকৃত টোকিওর ঐ মিশনের অন্যান্য কর্মকর্তাদের মতো তেমন উৎসাহী ছিলেন কিনা। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পরে উক্ত ইনডিয়ান লিয়াজোঁ মিশনের প্রথম কর্মকর্তা ছিলেন মিঃ রামা রাও, আই সি.এস.।

তাঁর সময়কালে কে. পি. এস. মেনন পিকিঙে ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রদূত রাষ্ট্রপুঞ্জের পক্ষ থেকে কোরিয়ায় একটা সরেজমিন সফর করেছিলেন, এবং কোরিয়ায় যাওয়ার পথে কিছুক্ষণের জন্যে ছিলেন টোকিওতে, এবং জেনারেল ম্যাকার্থারের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। টোকিও এবং সিওলে (যেখানে Syngman Rhee সিংম্যান রী ছিলেন প্রেসিডেণ্ট) অবস্থা পরিদর্শন করে, মেনন এই মর্মে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেন যে, তিনি জাপানে 'ম্যাকার্থার পূজা' (MacArthur worship) দেখেছেন, যার তুলনায় কোরিয়ায় দেখা 'রী উত্তেজনা' ('Rhee baiting') অনেক বেশি উৎসাহজনক। তার ফলে ম্যাকার্থার বিব্রত বোধ করলেন, এবং রামা রাওকে বলে পাঠালেন কে. পি এস. মেননের কাছ থেকে তাঁর কাজের জন্যে কৈফিয়ত চাইতে এবং এজন্যে ক্ষমা চাইতে।

আমাকে বলা হয়েছিল, রামা রাও জেনারেল ম্যাকার্থারকে খবর দিলেন যে, ভারত আর ব্রিটিশ অধিকৃত দেশ নয় বরং একটি স্বাধীন দেশ। প্রকৃতপক্ষে, ম্যাকার্থারের মনে বেশ কয়েকটি কারণে ভারতের বিরুদ্ধে একটা বিদ্বেষ ছিল, যেহেতু ভারত জাপানের সঙ্গে বন্ধুত্বের নীতি গ্রহণ করেছিল—সমতা ও অভিন্নতার ভিত্তিতে। ম্যাকার্থারের মনে হলো যে, ভারত তার নিজস্ব নীতি গ্রহণ করেছে জাপানের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে, এবং SCAP-র নীতি নির্দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভিন্ন সুর বাজাচ্ছে না! সত্যিই, ম্যাকার্থার তাঁর বিচারে ঠিকই ছিলেন!

মিঃ রামা রাও এর পরে সেক্ষেত্রে ইনডিয়ান মিশনের আর দু'একজন কর্মকর্তা ছিলেন—তার মধ্যে ছিলেন মিঃ বি. এন. চক্রবর্তী—যাঁকে বদলি করা হয়েছিল পিকিং থেকে টোকিওতে। সেটা ছিল ১৯৪৮ সনে, যখন তথাকথিত জাপানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্যে দূরপ্রাচ্যে আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধীদের ট্রাইবুনাল (International War Crimes Tribunal) স্থাপিত হয়, জেনারেল ম্যাকার্থারের দ্বারা, তখন তার কাজ এগিয়ে চলেছে। আমার মনে পড়ে, মিঃ চক্রবর্তী ছিলেন কলিকাতা হাইকোর্টের জাস্টিস রাধাবিনোদ পালের কাজের পক্ষে রীতিমতো সহায়ক, এবং জাস্টিস পাল ছিলেন ঐ ট্রাইবুনালের ভারতীয় বিচারপতি।

টোকিওতে জাস্টিস আর. বি. পালের উপস্থিতি ছিল প্রকৃতপক্ষে, ভারত গভর্নমেণ্টের অফিসিয়াল সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমার যোগাযোগের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় সূচনা। পটভূমি সংক্রান্ত উপকরণ বিষয়ে গভীর পর্যালোচনা কালে, জাস্টিস পাল চাইছিলেন যথাসাধ্য সম্ভব যুদ্ধ চলাকালীন সময়ের, তার আগের ও পরের অবস্থা সম্পর্কে এবং সে বিষয়ে যতটা সম্ভব জাপানি প্রথা ও রীতিনীতি, জাতীয় মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানার্জন করতে। তিনি আরো চিন্তিত ছিলেন মানচুকুও সম্পর্কে প্রাথমিক সংবাদ ইত্যাদি জানার জন্যে। তিনি আমার বিষয়ে, জাপান এবং মানচুকুওয় আমার অবস্থান ও কাজকর্ম সম্পর্কেও শুনেছিলেন, এবং শুনেছিলেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে রাসবিহারী বোস ও সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে আমার ভূমিকা সম্পর্কেও। জাস্টিস পালের কাজে আমার ভূমিকা ছিল, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাঁর পর্যালোচনার জন্যে তিনি নিজে সারা দুনিয়া থেকে যে বিপুল পরিমাণে তথ্যাদি সংগ্রহ করেছিলেন, তার আলোচনা করা।

ডক্টর পাল ও আমি উভয়ে পারস্পরিক সুসম্পর্ক গড়ে তুলেছিলাম। আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ হতো ঘনঘন, এবং কখনো কখনো তা একটানা কয়েকঘণ্টা যাবৎ স্থায়ী হতো। তিনি প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করতেন এবং তার জবাব শুনতে কখনো ক্লান্তিবোধ করতেন না। পরিহাসের বিষয় এখানে একজন ভারতীয় আইনজীবী নিযুক্ত ছিলেন অভিযোগকারীর পক্ষে, যাঁর কর্তব্য ছিল কেবল জাপানিদের বিরুদ্ধে যুক্তিতর্ক দিয়ে অভিযোগ প্রমাণ করা। তিনি হলেন মিঃ পি. গোবিন্দ মেনন, কেরালার লোক; তিনি ছিলেন মাদ্রাজ সরকারের পাবলিক প্রসিকিউটার (Public Prosecutor)। তাঁর একজন সহকারিও ছিলেন, তাঁকে ব্রিফ তৈরি এবং অন্যান্য দলিলপত্রাদি রচনা সম্পর্কিত কাজে সাহায্য করার জন্যে। কিছুকাল পরে, যাই হোক, মিঃ গোবিন্দ মেনন এসব কাজ করতে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়লেন, যেহেতু তিনি মনে করলেন এসব কাজ যুক্তিহীন। ব্রিটেন ও আমেরিকান পক্ষ নিয়ে যুক্তিতর্ক-প্রমাণ দিয়ে জাপানকে দোষী করার কাজে তাঁর মনে কোনো রকম সায় ছিল না, এবং তাই তিনি ভারতে ফিরে যাওয়াই স্থির করলেন।

এই সূত্রে একটা ঘটনার কথা যা আজ পর্যন্ত কোথাও প্রকাশিত হয়নি—ভারতীয় সূত্রে বা অন্য কোনো সূত্রেই নয়; এবং তা হলো যখন গোবিন্দ মেনন ভারতে ফিরে যেতে স্থির করেন, তাঁর একটি ব্যক্তিগত ও গোপনীয় কথা ছিল জাস্টিস পালের সঙ্গে; তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন, জাপানে থাকতে তাঁর অসুবিধে কোথায়, কারাবন্দী জাপানি নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে যুক্তিতর্ক-প্রমাণ খাড়া করা, এবং এমনকি জাস্টিস পালের কাছ থেকেও অনুসন্ধান করে জেনে নেওয়া—তিনি এই প্রশ্নে কী ভাবেন এবং ট্রাইবুনাল চালিয়ে যাবার ব্যাপারে তাঁর মনোভাব কী, বিশেষত তিনি এখানে থেকে যেতে চান কিনা ইত্যাদি। জাস্টিস পাল চাইলেন এ বিষয়ে শান্তভাবে চিন্তা করতে এবং তাড়াহুড়ো করে তখনি কোনো সিদ্ধান্ত না নিতে।

সুতরাং জাস্টিস পাল মিঃ গোবিন্দ মেননকে বললেন যে, তিনি তাঁর নিজের ভবিষ্যৎ অবস্থা সম্পর্কে শীঘ্রই সিদ্ধান্ত নেবেন।

বেশ ধীরেসুস্থে চিন্তাভাবনা করার পরে, জাস্টিস পাল মিঃ চক্রবর্তীর সঙ্গে আলোচনা করে স্থির করলেন যে, এই ট্রাইবুনালের বিচারের সময় ভারতের দিক থেকে প্রতিনিধিত্বহীন অবস্থায় থাকাটা সংগত হবে না, এমনকি যদিও গোবিন্দ মেনন ভারতে ফিরে যেতে দৃঢ়সংকল্প, কিন্তু তিনি নিজে একজন বিচারক হিসেবে এই ট্রাইবুনালের বিচারের কাজে থেকে যাবেন খোলা মন নিয়ে—যেমন প্রত্যেক বিচারপতিই করবেন বলে আশা করা যায়।

জাস্টিস পাল একজন অত্যন্ত পণ্ডিত ব্যক্তি, অন্তত এ পর্যন্ত আমি যেসব মানুষের দেখা পেয়েছি তাঁদের মধ্যে। আমি তাঁর কাছে বয়সে ও অভিজ্ঞতায় খুবই ছোট ছিলাম, এবং অবশ্যই আন্তর্জাতিক আইন (International Law) বিষয়ে কোনোরকম অভিজ্ঞ ছিলাম না। কিন্তু আমি গভীরভাবে অভিভূত হলাম তাঁর ঐ ট্রাইবুনালের বিচারের কাজ চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্তে, এবং বিচারের ফলাফলের পূর্বেই সে বিষয়ে কোনোরকম পূর্বসিদ্ধান্ত গ্রহণ না করার মনোভাবে। তিনি একবার আমাকে বলেছিলেন যে, বিচারকের কর্তব্য একজন অ্যাডভোকেটের কর্তব্য থেকে ভিন্ন প্রকৃতির: বিচারকের পক্ষে মামলা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তা ছেড়ে যাওয়া উচিত নয়। সেই হিসেবে জাস্টিস পাল অন্যান্য আরো ১০ জন বিচারকের সঙ্গে বসে গেলেন সমগ্র বিচারপর্ব শেষ না হওয়া পর্যন্ত। আন্তর্জাতিক বিচারশাস্ত্রে তাঁর বিশেষ জ্ঞান, বিশেষত যুদ্ধ ও যুদ্ধাপরাধ বিষয়ে, ছিল অসাধারণ রকমের গভীর। তিনি প্রচুর সময় দিয়ে পর্যালোচনা করে দেখেছেন—আমেরিকা, ব্রিটেন, প্রভৃতির বিরুদ্ধে জাপানের যুদ্ধ ঘোষণার পটভূমি ইত্যাদি বিষয়গুলি। ইমপিরিয়াল হোটেলে তাঁর ঘরগুলি ছিল প্রকৃতপক্ষে আইনগত দলিলপত্র এবং অন্যান্য বহুরকম বইপত্রে পরিপূর্ণভাবে ঠাসা। তাঁর প্রকৃত কর্তব্য কাজ ছাড়া আর কোনো বিষয়ে আগ্রহ/উৎসাহ ছিল না।

ইন্টারন্যাশানাল ট্রাইবুনাল তার রায় জানিয়ে দিল ১০ নভেম্বর ১৯৪৮ তারিখে। মোট ১১ জন বিচারকের মধ্যে জাস্টিস পাল ছিলেন একমাত্র বিচারক যিনি এই ট্রাইবুনালের যথার্থতার বিষয়ে অর্থাৎ তার মূলগত প্রশ্নে ভিন্ন মতাবলম্বী। তাছাড়া আরো কয়েকটি ছোটখাটো খুঁটিনাটি বিষয়ে আপত্তি ছিল, অন্যান্য দু'তিন জন বিচারকের দিক থেকে। কিন্তু জাস্টিস পালের দিক থেকে সামগ্রিক মতবিরোধের ব্যাপারটি চারিদিকে দারুণ এক সাড়া জাগালো। এটা আরো হয়েছিল তার কারণ, ঐ ট্রাইবুনালের ১১ জন বিচারকের মধ্যে, তিনিই ছিলেন আন্তর্জাতিক আইনশাস্ত্রে একমাত্র অভিজ্ঞ—যা আইনগত সাধারণ শিক্ষাগত যোগ্যতা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

তিনি ঐ বিষয়ে গভীর মনোযোগ সহকারে পর্যালোচনা করে দেখেছেন এবং শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, দুনিয়ার ইতিহাসে কখনো এমনটা ঘটেনি যে কেবলমাত্র একটি দেশ অন্য দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে বলেই সেটা যুদ্ধ ঘোষণাকারী ঐ দেশের বিরুদ্ধে অপরাধ বলে গণ্য হবে। যে কারণেই হোক, এই কাজের জন্যে কারো বিরুদ্ধেই কোনোরকম বিচার হয়নি।

জাস্টিস পালের আরেকটি মূল আপত্তির বিষয় হলো যে, শুনানি চলাকালে অভিযোগ ইত্যাদি মূল প্রশ্নে বিষয় ছেড়ে অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে। জেনারেল ম্যাকার্থার ঐ ট্রাইবুনাল নিযুক্ত করেছিলেন একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে ; তা হলো জাপানি নেতৃবৃন্দ যাঁরা সুগামো জেলে (Sugamo Jail) বন্দী আছেন, তাঁরা পার্ল হারবারে বোমাবর্ষণের সময় থেকে যুদ্ধশেষ হওয়া পর্যন্ত, যুদ্ধাপরাধে অপরাধী কিনা তা স্থির করতে। এই ঘটনার শুনানি চলাকালে জানাজানি হয় যে, অভিযোগ ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারটাই চলেছিল একটা পূর্বনির্দিষ্ট সংস্কার নিয়ে এবং একমাত্র চেষ্টা চলছিল যেনতেন-প্রকারেন সেই নির্দিষ্ট প্রশ্নের ভিত্তিতেই তথ্যপ্রমাণ ইত্যাদি খাড়া করা, অর্থাৎ জাপানকে দোষী সাব্যস্ত করা। এটা শুরু হয়েছিল মুকদেন ঘটনায় (Mukden incident) জাপানকে অভিযুক্ত করার ঘটনা থেকে, যার পরিণতি হয়েছিল জাপান কর্তৃক মানচুরিয়া দখল, এবং সেইসঙ্গে মানচুকুও রাজ্যের সৃষ্টি ও পত্তন।

জাস্টিস পাল তাঁর রায়ে বলেছেন যে, এই ট্রাইবুনালের কোনো এখতিয়ার নেই মানচুরিয়া প্রশ্নে বা সংশ্লিষ্ট কোনো ঘটনার প্রশ্ন বিচারে। তিনি জেনারেল তোজোর এবং অন্যান্য অভিযুক্তদের কাজের যথার্থতার বিষয়ে আইনগত কোনো সন্দেহের কিছুই দেখতে পাননি, বিশেষত যখন তাঁরা আমেরিকা ও ব্রিটেনের ভেদনীতি ও বৈষম্যমূলক আচরণের প্রমাণ দিয়েছেন, এবং জাপানের জাতীয় স্বার্থে ও আত্মরক্ষার্থেই যুদ্ধঘোষণার পক্ষে যুক্তিসংগত কারণ দেখিয়েছেন। ডক্টর পাল আরো বলেছেন, সম্ভবত পরাজিত নেতাদেরও যে যথেষ্ট দায়িত্ব ছিল সেকথা আমরা আদৌ অস্বীকার করতে পারি না।

জাস্টিস পাল আরো বলেছেন : কালক্রমে যখন আবেগ ও সংস্কার আরো কমে আসবে, যুক্তির কশাঘাতে যখন অপব্যাখ্যা ও ভুল ব্যাখ্যারও মুখোশ খুলে যাবে, তখন বিচারের মানদণ্ডে সবকিছু সমানভাবে পরিষ্কার হয়ে যাবে, ঘটনার পট-পরিবর্তন হবে, এবং তার জন্যে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও সময়ের প্রয়োজন। শুনানির মধ্যে তিনি আরো বলেন : এই ট্রাইবুনাল কর্তৃক প্রতিবাদী পক্ষের কয়েকজনের বিরুদ্ধে আনীত সুনির্দিষ্ট কয়েকটি অভিযোগের জবাব দিতে বলা হয়েছে, যথা তাঁদের যে যুদ্ধের আদেশ দিতে, মিত্রশক্তির সেনাদের বিরুদ্ধে বা অসামরিক নাগরিকদের বিরুদ্ধে অত্যাচারমূলক দমন-পীড়নের কাজ চালাতে বলা হয়েছে, আদেশ দেওয়া হয়েছে বা সেই মর্মে কিছু করতে তাঁদের অধিকার দেওয়া হয়েছে, তার প্রমাণ

ইত্যাদি দাখিল করতে : কিন্তু তিনি উপস্থাপিত সাক্ষ্য প্রমাণাদির মধ্যে এমন কিছুই দেখতে পাননি—যাতে যুদ্ধবন্দীদের কেউই সরকারিভাবে যা ব্যক্তিগত ভাবে অন্যায় কিছু করেছেন, কিংবা তাঁদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিচারে তাঁদের দোষী বা অপরাধী বলা যায় তেমন কিছু করেছেন বলে তিনি দেখতে পাচ্ছেন না বা বলতে পারেন না।

যে বিষয়টি ট্রাইবুনালের সামনে ছিল তার বিচার ও সে বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্যে, সুতরাং তা উপযুক্ত ভাবে আদালত কর্তৃক প্রমাণিত হয়নি। তাঁর পর্যালোচনার সার সংক্ষেপ করে জাস্টিস পাল বলেন: "আমার অভিমত যে, অভিযুক্তদের প্রত্যেকেই ও সকলেই নিরপরাধ ও নির্দোষ, এবং তাঁদের প্রত্যেককেই ও সকলকেই তাঁদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ থেকে মুক্ত বলে গণ্য করা উচিত।"

আরেকটি ঐতিহাসিক উক্তি জাস্টিস পাল কর্তৃক উচ্চারিত হয়েছিল এবং তা হলো—বিচারের নামে কোনো রকম প্রতিশোধের মনোভাবকে উত্তেজিত করা উচিত হবে না, এ বিষয়ে তিনি হুশিয়ারি দিয়েছিলেন। দুনিয়ার এখন প্রয়োজন হলো—উদারতা বোঝাপড়া ও সহানুভূতির মনোভাবের প্রদর্শন ও প্রসার। সত্যকার উদারচিত্তের একমাত্র আন্তরিক জিজ্ঞাসাই হলো—সমগ্র মানবতা আবার কত দ্রুত গড়ে উঠবে এবং দুনিয়ার সভ্যতাকে সমূহ বিপদ থেকে বাঁচাতে পারবে। এবং "বিচারমূলক ট্রাইবুনাল হিসেবে আমরা এমনভাবে আচরণ করতে পারি না যাতে জনসাধারণের মনে এমন কোনো ধারণা গড়ে উঠতে পারে যে, এই বিচারসভা মূলত কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যেই গঠিত হয়েছে, যদিও বিচারসভার গায়ে আইনসংগত একটা পোশাকের আবরণ জুড়ে দেওয়া হয়েছে।"

যুদ্ধ বাধানোর জাপানি ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগের কথা উল্লেখ করে জাস্টিস পাল বলেন : "বহু শক্তিশালী রাষ্ট্রই এরকম জীবনযাপন করছে (অর্থাৎ এরকম কাজ করছে), এবং এরকম কার্যকলাপ যদি অপরাধমূলক হয় তবে সমগ্র আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ই অপরাধীর জীবনযাপন করছে।" তাই এবিষয়ে তিনি বলেন : "কোনো রাষ্ট্রই এরকম কাজকর্মকে আজ পর্যন্ত অপরাধমূলক বলে গণ্য করেনি। কেননা, সমস্ত শক্তিশালী রাষ্ট্রই ঐ রকম অপরাধকারী রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছে।"

এবিষয়ে তিনি সুস্পষ্ট নির্দেশ করে জাস্টিস পাল বলেন যে : ঘৃণা থেকেই যুদ্ধের সূচনা এবং যুদ্ধের ফলে আরো ঘৃণা ছড়ায়। স্বদেশপ্রেমের তাগিদ যা মানুষের মনে তাদের দেশের জরুরি সংকট কালে যোগ্য সাড়া দিতে প্রেরণা জোগায়, তা কেবল তাদের মনেই জন্ম নেয়—যারা দেশের শত্রুকে চরম ঘৃণা করে এবং সেই শত্রুরাও তাদের আচরণে ঘৃণার উদ্রেককারী জঘন্য কার্যকলাপ চালায় ও স্বদেশপ্রেমিক মানুষের চোখে ঘৃণ্য হয়ে ওঠে। অতএব এহেন ঘৃণা ও ঘৃণ্য ব্যাপারাদি যা যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত, এবং যে যুদ্ধের ফলে সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে ঘৃণা ছড়ানোর

কাজে যুক্ত, তা বুঝতেও অসুবিধে হয় না ; আবার তার ফলে দমন-পীড়নমূলক গল্পকথাও যে অনিবার্য হয়ে ওঠে তাও বুঝতে কোনো অসুবিধে হয় না। এবং এইসব ঘটনা ও এই জাতীয় ব্যাপারাদির পক্ষে প্রচারমূলক কাজকর্মের বীজ নিহিত আছে, এই ট্রাইবুনালের সামনে আনীত বিচার্য বিষয়ের মধ্যেই।...

এছাড়া অতিরিক্ত আরো একটি দুর্ভাগ্যজনক বিষয় ছিল যা উপেক্ষা করা যায় না বলে ডক্টর পাল উল্লেখ করেছেন। জাপানিদের হাতে যুদ্ধবন্দীদের সংখ্যা ছিল ভয়াবহ রকমের বেশি, যার দ্বারা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, শাদা-চামড়ার মানুষদের প্রত্যেকেই জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাটাও অবশ্য প্রয়োজন বলে বুঝেছিল ; কারণ জাপানও 'শ্বেত প্রভুত্বের' ('white supremacy') বা শাদা চামড়ার প্রাধান্যের বিরুদ্ধে ফেটে পড়তে চাইছিল। অন্যান্য যেসব প্রশ্নের ভিত্তিতে ডক্টর পাল তাঁর ভিন্নধর্মী রায় দিয়েছিলেন তা হলো, তথাকথিত যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে ভিন্নরীতিতে বিচার করতে হবে, কিন্তু সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্যে জেনারেল ম্যাকার্থারের গঠিত ট্রাই-বুনালের স্বাভাবিক রীতিতে নয়। অর্থাৎ তথাকথিত অভিযুক্তদের মধ্যে কেউই বিজয়ী দেশের বিরুদ্ধে কোনো রকম ভুল বা অন্যায়ের বিরুদ্ধেই কোনো অভিযোগ করতে সমর্থ হবে না। কিন্তু ঐসব অভিযুক্তদের কারো বিরুদ্ধেই কোনো রকম অপরাধের বা দোষের অভিযোগ করা যায় না।

জাস্টিস পাল যা বলতে চান তা হলো, এই ট্রাইবুনালের কাজ হলো কেবল এই প্রশ্নই বিচার করা যে — যাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ করা হয়েছে, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে কোনো রকম অপরাধের বা দোষের, বা অমানুষিক ধরনের কোনো কাজ করেছেন কিনা যা যুদ্ধাপরাধের সংজ্ঞার আওতায় পড়ে। তিনি সুস্পষ্ট এই মত পোষণ করেন, যেসব জাপানি নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ আনীত হয়েছে, তাঁদের কেউই ব্যক্তিগতভাবে বা সরকারিভাবে ঐ ধরনের কোনো অভিযোগে অপরাধী বা দোষী নয়। যেসব অফিসার কিংবা জাপানি আর্মির যেসব কর্মীরা যুদ্ধকালে অগ্রবর্তী লাইনের শত্রু সেনাদের ওপর অত্যাচারমূলক কাজকর্ম করেছেন বলে অভিযোগ আনা হয়েছে, তাঁদের ইতিমধ্যেই বিজয়ী মিত্রবাহিনীর সংশ্লিষ্ট কোর্ট বা অন্যান্য আদেশবলে তাঁদের বন্দী করা ও বিচার করা হয়েছে। টোকিওতে ঐ ট্রাইবুনালের সামনে বিবেচনাধীন একটা প্রশ্ন ছিল — জাপানিদের হাতে এরকম যুদ্ধবন্দী অফিসার ও তাঁদের ওপর অত্যাচারের তদন্ত করা হবে কিনা, যাঁরা বন্দী রয়েছেন সুগামো জেলে।

ডক্টর পাল তাঁদের বিরুদ্ধে আনীত এরকম অভিযোগের কোনো প্রমাণ দেখতে পাননি। তাঁর মূল আপত্তির বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করে তিনি বলেন : "কোনো শ্রেণীর যুদ্ধই অপরাধমূলক বা বেআইনি বলে আন্তর্জাতিক জীবনে উল্লিখিত হয়নি। কোনো ব্যক্তি সরকারের অন্তর্গত বা তার প্রতিনিধি হিসেবেই কাজ করুন না কেন, আন্তর্জাতিক আইনের চোখে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে কোনো অপরাধের বা দোষের

কাজ করেন না, যার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা যায় বা তার বিচার করা যায়। তাই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এখনো পর্যন্ত এমন কোনো পর্যায়ে আসেনি, যেখান থেকে যুদ্ধরত কোনো পক্ষকে অর্থাৎ রাষ্ট্রগত বা ব্যক্তিগত ভাবে আইন ও বিচারের দৃষ্টিতে দোষী সাব্যস্ত করে তাকে শাস্তি দেওয়া যায়।"

জাস্টিস পাল তাঁর ভিন্নধর্মী রায়ের মধ্যে আরো বলেছেন যে, অভিযুক্ত জাপানি পক্ষের নেতৃবৃন্দের কেউই নিষ্ঠুরভাবে যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছেন বলে, তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো রকম প্রমাণ পাওয়া যায় না। এমনকি তাঁরা নিষ্ঠুর কোনোরকম নীতি অনুসরণ করেছেন বলেও কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। যদি সেরকম কিছু হয়েও থাকে, তবে তা হয়েছে মিত্রশক্তির সিদ্ধান্ত তথা অ্যাটম বোমা ব্যবহারের ফলেই।

এবং সেই মহান ভারতীয় জুরির তাৎক্ষণিক সাড়া জাগানো সেই রায়ের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অংশ হলো এই রকম : "ভবিষ্যৎ প্রজন্মই বিচার করবে এই মারাত্মক সিদ্ধান্তের। ইতিহাসই বলবে, এহেন নতুন অস্ত্রের অযৌক্তিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের আবেগ অনিবার্যভাবেই ফেটে পড়েছিল কিনা, এবং তা কেবলমাত্র আবেগসর্বস্বই ছিল কিনা, এবং যেখানে সমগ্র জাতটা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে কৃতসংকল্প, তার সেই ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেবলমাত্র যুদ্ধে জয়লাভের জন্যেই নির্বিচারে সেই মারাত্মক অস্ত্রের প্রয়োগ আইন সংগত হয়েছিল কিনা।"…

ট্রাইবুনালের সংবিধানের কয়েকটি বিশেষ ধারা বলে কোনোরকম ভিন্নধর্মী রায় কোর্টের মধ্যে পড়তে অনুমতি দেওয়া হয়নি।* জাস্টিস পাল চেয়েছিলেন, অন্তত তাঁর রায়ের সারাংশটি কোর্টের মধ্যেই প্রকাশ্যে সবার গোচরে আনা হোক, যাতে প্রত্যেকেই তাঁর বক্তব্যগত অবস্থানের কথা জানতে পারেন। কিন্তু ট্রাইবুনালের অসট্রেলিয়ান চেয়ারম্যান তা অনুমতি দেননি। সেই ঐতিহাসিক রায় ছিল ১৩০০ পৃষ্ঠারও বেশি, এবং তাও সরকারিভাবে সম্পূর্ণত প্রকাশিত হয়নি (যতদূর আমি

* অধিকাংশ বিচারকদের রায় অনুসারে, নিম্নলিখিত ৭ জনকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়—২৩ ডিসেম্বর ১৯৪৮ তারিখে। তাঁরা হলেন—১. জেনারেল হিদেকি তোজো (বয়স ৬৪), প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী; ২. জেনারেল কেনজি দোইহারা (৬৫), মানচুরিয়ায় ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের প্রাক্তন প্রধান; ৩. জেনারেল সেশিরো ইতাগাকি (৬৩), কোয়ানটুং আর্মির প্রাক্তন চিফ অফ স্টাফ; ৪. জেনারেল হিতারো কিমুরা (৬০), তোজো ক্যাবিনেটে সমর দফতরের উপমন্ত্রী; ৫. জেনারেল আকিরা মুতো (৫৬), মিলিটারি অ্যাফেয়ার্স-এর চিফ ১৯৩৯-৪২, এবং লেঃ জেনারেল ইয়ামাশিতার ফিলিপাইন্‌স-এর চিফ অফ স্টাফ; ৬. জেনারেল আইওয়ানে মাৎসুই (৭০), নানকিঙে জাপানি আর্মির প্রাক্তন কমাণ্ডার; ৭. কোকি হিরোতা (৭০) প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী।

জানি)। কিন্তু অভিযুক্তরা অবশ্যই জানতেন যে জাস্টিস পালের সঙ্গে তাঁর সহকর্মী অন্যান্য বিচারকদের মতভেদ হয়েছে এবং তিনি ভিন্নমত পোষণ করেছেন, এবং সংবাদপত্রের ত্বনিয়া এই বিষয়টি বেশ ভালোরকম ব্যাপকভাবেই পরিবেশন ও প্রচার করে। সমগ্র জাপান জাতি জাস্টিস পালের দৃঢ়চিত্ত সাহসিকতাকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গেই গ্রহণ করেছিল।

জেনারেল সেশিরো ইতাগাকি ছিলেন আমার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং তাঁর বিষয়ে আমি আগেই লিখেছি; তিনিও ছিলেন অভিযুক্তদের মধ্যে একজন, এবং অধিকাংশ বিচারকদের রায় অনুসারে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। যখন তিনি জাস্টিস পালের বক্তব্য জানতে পারলেন, তিনি সুখী হয়েছিলেন এই ভেবে যে অন্তত একজন জুরি তাঁকে এবং তাঁর সহবন্দীদের বিচার করেছেন নির্দোষ হিসেবে। জানা যায় তিনি মন্তব্য করেছিলেন: ডক্টর পাল গাঢ় মেঘাচ্ছন্ন এই ত্বনিয়ায় ঠিক যেন আলোক সংকেতের মতো।

এটা কৌতুহলজনক বিষয় হিসেবে উল্লেখযোগ্য যে জাস্টিস পাল তাঁর রায়ে যে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন, পরবর্তীকালে তার প্রতি সমর্থন জানান একজন প্রখ্যাত ব্রিটিশ জুরি—লর্ড হ্যাংকে (Lord Hankey)।

যাই হোক, ট্রাইবুনালের শুনানি শেষ হবার পরে সঙ্গে সঙ্গেই জাস্টিস পাল ভারতে ফিরে গেলেন। কিন্তু এটা আমার সৌভাগ্য যে, আমি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পেরেছিলাম, এমনকি তার পরেও।

জাস্টিস পাল পরবর্তীকালে জাপান সফর করেছিলেন তিনবার, বিভিন্ন উপলক্ষে। প্রথমবার ১৯৫২ সনে — ওয়ার্লড ফেডারেশানের এশিয়া কনফারেন্সে (Asia Conference on World Federation) যোগ দিতে। ডক্টর পাল কয়েকটি কেন্দ্রে সমাগত বুদ্ধিজীবী শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন, এবং যেসব বিখ্যাত স্থানে ভাষণ দেন, তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো: টোকিও, ওয়াসেদা, হিরোশিমা ও ফুকুওকা বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তাঁর আলোচ্য বিষয়ের পরিধি ছিল বেশ ব্যাপক: আন্তার্জাতিক আইনশাস্ত্র থেকে কোরিয়ান যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট বিবিধ বিষয় পর্যন্ত। এটা ছিল তাঁর কাছে খুবই ত্বঃখের বিষয় যে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র জাপানকেই ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করেছে কোরিয়ার উপর বোমাবাজি করার কাজে। তিনি আরো যেসব বিষয়ে আলোচনা করেন তার মধ্যে আছে—ভারতীয় দর্শন, ভারত-জাপান সম্পর্ক ইত্যাদি, এবং এ বিষয়ে তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেন যার ভিত্তিতে এশিয়ার ত্বটি গুরুত্বপূর্ণ দেশের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে—উভয়েরই পারস্পরিক স্বার্থে। ডক্টর পাল আরো যেসব বিষয়ে আলোচনা করেন তা হলো—বেদান্ত, সংস্কৃত সাহিত্য, ভারত ও জাপানের মধ্যেকার সুপ্রাচীন সম্পর্ক ইত্যাদি, এবং এরকম আরো অনেক বিষয়।

জাষ্টিস পালের আইনশাস্ত্রে ডক্টরেট উপাধির থিসিস ছিল : বেদান্তে আইনশাস্ত্র (Jurisprudence in Vedanta) —এমন একটি বিষয় যা আমার বিশ্বাস, আর কেউই তেমন কার্যকরীভাবে আলোচনা করতে সমর্থ হননি যেমন তিনি ত' করতে পেরেছেন।

জাষ্টিস পালের অন্যান্য দুটি সফর হলো যথাক্রমে ১৯৫৩ সনে, ও ১৯৬৬ সনে। এই সফর দুটিও ছিল জাপানের গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাগুলির দ্বারা সংগঠিত—যে সংস্থাগুলি আন্তরিকভাবেই আগ্রহী ও নিয়োজিত ছিল উপযুক্তভাবে ভারত-জাপান বোঝাপড়া ও সদিচ্ছার উন্নয়নের কাজে। মহান ইয়াসাবুরো শিমোনাকা (Yasaburo Shimonaka) ছিলেন তাঁর এই সফরগুলির উদ্যোক্তা/সংগঠক, ১৯৫৩ সনে। ১৯৬৬ সনে জাপান সম্রাট তাঁকে 'পবিত্রচিত্ত' হিসেবে 'ফার্স্ট অর্ডার অফ মেরিট' (First Order of Merit of the Sacred Heart) উপাধিতে ভূষিত করেন। এর আগে (১৯৫৯ সনে), ভারতের প্রেসিডেন্ট তাঁকে ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম সম্মান 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন।

এটা আমার পক্ষে খুবই সৌভাগ্যের কথা যে, জাপানে তাঁর সমস্ত সফরকালেই আমি তাঁর সঙ্গে ঘুরেছি এবং তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই থেকেছি। এবং এটা আরো সৌভাগ্যের কথা যে, আমি ছিলাম তাঁর অফিসিয়াল দোভাষী ও অনুবাদক। আমাকে সর্বদাই মঞ্চের উপরে তাঁর পাশাপাশি বসার জায়গা দেওয়া হতো—যাতে তাঁর ভাষণের বক্তব্য বিষয় জাপানি শ্রোতাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় নির্ভুল ও নিরপেক্ষভাবে। আমি অবশ্যই স্বীকার করবো ডক্টর পালের বক্তব্য এমনই উচ্চস্তরের ছিল যে, আমার জাপানি ভাষাজ্ঞানের পরিধির প্রতি পর্যায়েই আমাকে সজাগ থাকতে হতো তাঁর ভাষণকে সঠিকভাবে জাপানি শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে পৌঁছে দেবার কাজে। আমি অসংকোচেই বলবো যে, যুদ্ধোত্তর কালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমতুল্য ব্যক্তিত্বপূর্ণ ভারতীয় দার্শনিক ছিলেন মাত্র দু'জন। তাঁরা হলেন—ডক্টর এস. রাধাকৃষ্ণান এবং ডক্টর রাধাবিনোদ পাল।

আমি ডক্টর পালের সমস্ত ভাষণেরই ব্যাখ্যা করেছিলাম জাপানি শ্রোতাদের কাছে, একমাত্র উচ্চস্তরের দার্শনিক বিষয়গুলি ছাড়া ; দার্শনিক বিষয়গুলির ব্যাখ্যা করেছিলেন টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নাকামুরা (Prof. Nakamura, তিনি ছিলেন দর্শনের একজন পণ্ডিত, এবং অবশ্যই ছিলেন আমার চেয়ে অনেক বেশি গুণী ও যোগ্য মানুষ—গভীর, বিমূর্ত ও দুর্বোধ্য ভারতীয় দর্শনের ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে।

এটা আমার পক্ষে একটা আনন্দদায়ক স্মৃতি যে, ১৯৫৭ সনে যখন আমার বড় ছেলে বাসুদেবন নায়ার প্রাচ্য সফরকালে ভারতে যায় তখন সে ছিল জাষ্টিস পালের সঙ্গে তাঁর কলকাতার বাড়িতে প্রায় একমাস ; এই সময়ে বাসুদেবন ভারত এবং তার সংস্কৃতি সম্পর্কে অনেক কিছু শিখতে পেরেছিল, যা তার পক্ষে খুবই কার্যকরী

হয়েছিল, এবং তা সে সম্ভবত অন্যত্র সারা বছর যাবৎ চর্চা করলেও এতখানি শিখতে পারতো না। তারপর ঐ সময়ে জাস্টিস পাল তার প্রতি যে সহৃদয়তা ও সুবিবেচনা প্রদর্শন করেছিলেন, সেকথা বাসুদেবন তার পরেও সানন্দে স্মরণ করেছে। তাকে 'বাসু' বলে ডাকা হতো, যেন সে জাস্টিস পালের পরিবারভুক্ত একজন। ডক্টর পাল তাঁর 'বাসু'কে প্রায়ই অনুরোধ করতেন তাঁর সঙ্গে খেতে বসতে, এবং যতবেশি সম্ভব সময় দিয়ে তাঁর কাছ থেকে ভারত ও পৃথিবী বিষয়ে নানান ধরনের কথাবার্তা শুনতে বলতেন। আমার ছেলে তখনো আমার সঙ্গে এসব কথা বলতো যখনি সে আমার সঙ্গে দেখা করতে টোকিওয় যেতো ম্যানিলা থেকে—যেখানে সে ছিল এশিয়ান ডেভালাপমেণ্ট ব্যাংকের (Asian Development Bank) একজন সিনিয়ার অফিসার।

৩০.

ভারত-জাপান শান্তি চুক্তি

যখন মিঃ বি. এন. চক্রবর্তী তাঁর কার্যকাল শেষ করলেন এবং বাইরে নিযুক্ত হলেন ১৯৪৪ সনের শেষদিকে, মিঃ কে. কে. চেট্টুর তখন টোকিওতে ইনডিয়ান লিয়াজোঁ মিশনের নতুন প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হলেন। মিঃ চেট্টুর এর আগে স্বল্পকালীন জাপান সফর করেছেন যখন তিনি ভারতের বাণিজ্য দফতরে একজন সিনিয়ার অফিসার ছিলেন, এবং দুই দেশের মধ্যে একটি বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদন করতে গিয়েছিলেন। রাজনৈতিক বিষয়ে তাঁর ব্যাপক দূরদৃষ্টি ছাড়াও বাণিজ্যিক ব্যাপারে তিনি যে বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন; তা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং নেহরু তাঁকে টোকিওর ইনডিয়ান মিশনে মিঃ চক্রবর্তীর স্থানে নিযুক্ত করেন, এমনকি চেট্টুর তখনো পেশাদার কূটনৈতিক হিসেবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্থায়ী সদস্যও নন। মিঃ চেট্টুর ছিলেন কেরালার এক বিশিষ্ট নায়ার পরিবারের সন্তান এবং বিখ্যাত স্যার সি. শংকরন নায়ার-এর ভাইপো —যাঁর কথা আমি এই বইয়ের প্রথম অধ্যায়েই বলেছি।

মিঃ চেট্টুরের প্রথম জাপান সফরের সময় তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি, এবং তাই বরং অবাক হয়ে গেলাম যখন তিনি প্রথম কাজের দায়িত্ব নিয়েই একটা নতুন কাজ করলেন: আমাকে বলে পাঠালেন একটা আলোচনার জন্যে তাঁর সঙ্গে

দেখা করতে। আমি আরো অবাক হয়ে গেলাম একথা জেনে যে, তিনি চান তাঁর সঙ্গে আমি তাঁর রাজনৈতিক বিষয়ক এবং ভারত-জাপান সম্পর্কের মতো অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও তাঁর পরামর্শদাতা হিসেবে কাজে যোগ দিই। বহু নতুন নতুন সম্পর্কও মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার সম্ভাবনাও ছিল অনিবার্য : তাঁর এমন একজনের সাহায্য চাই যিনি যুদ্ধকালীন আগাগোড়া খবর রাখেন এবং যাঁর সঙ্গে স্থানীয় সংযোগ আছে বেশ ভালো রকম। তাঁর মতে আমিই ছিলাম একাজের পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি, অন্তত ভারতীয় সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়গুলি বিচারের দৃষ্টিতে।

আমি সম্মানিত বোধ করলাম এবং তাঁর সঙ্গে কাজ করতে সম্মত হলাম। কিন্তু মিঃ চেট্টুর একথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেলেন না ; কেননা তিনি চিন্তিত ছিলেন তা ঘোষণার ফলে হয়তো সহকর্মীদের মধ্যে ঈর্ষার ভাব জাগাতে পারে একাজে আমাকেই বেছে নেবার জন্যে, এবং তিনি তা এড়াতে চেয়েছিলেন – যদিও তিনি জানতেন একাজের পক্ষে আর কারো আমার চেয়ে ভালো কোনোরকম যোগ্যতা ছিল না। মানুষের স্বভাব প্রকৃতি যাই হোক না কেন, অনাবশ্যক অনুমান/সন্দেহ অযথা উত্তেজনা বাড়িয়ে কোনো লাভ নেই এবং তিনি আমাকে উপযক্ত ভাবে বুঝিয়ে দিলেন এবং অন্যান্য প্রত্যেককেও জানিয়ে দিলেন যে, তাঁর কাছে আমার যাতায়াতটা কাজের পক্ষে গোপনীয় এবং ঘরোয়া, যেক্ষেত্রে অন্যান্যদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ও যাতায়াতটা হবে প্রকৃতপক্ষে অফিসিয়াল অর্থাৎ প্রথামাফিক।

SCAP শাসনকালে, মিশনগুলির অধিকাংশ প্রধানরাই তাঁদের কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ নির্দিষ্ট কেন্দ্রের মধ্যে ও বিজিত দেশের সহকর্মীদের মধ্যে চালিয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন। এবং সাধারণত তাঁরা তাঁদের সমস্তরের মানুষজন ও কার্যকলাপের সন্ধানে ফিরতেন জেনারেল ম্যাকার্থারের হেড-কোয়ার্টার্সের আশেপাশে সমুদ্র অঞ্চলে। এজন্যে তাঁদের স্থানীয়ভাবে সরকারি পর্যায়ে বিশেষ কোনো সাহায্য-সহযোগিতার প্রয়োজন হতো কদাচিৎ কখনো এবং তা খুবই সামান্য, একমাত্র দখলদার কর্তৃপক্ষ মিত্রশক্তির প্রতিনিধিদের অফিসগত ও বাসস্থানগত কারণে যা কিছু প্রয়োজন তা মেটাতে বিনামূল্যে যেসব জিনিসপত্র সরবরাহ করতেন তা ছাড়া। কিন্তু মিঃ চেট্টুর এইসব কৃত্রিম এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাসাভাসা নকল পরিবেশের ঊর্ধ্বে যেতে চেয়েছিলেন। তিনি আন্তরিকতার সঙ্গে হিসেব করে গভীরভাবে জানতে আগ্রহী ছিলেন যে, জাপানি সেনাবাহিনীর বিভিন্ন পর্যায়ের অফিসারদের মধ্যে অন্তরঙ্গ মহলে প্রকৃত কি ঘটছে ; কিন্তু এসব জানার পথে অনিবার্য বাধা ছিল বিজেতা ও বিজিতদের মধ্যে যেসব স্বাভাবিক বাধার প্রাচীর থাকে সেই সবকিছু।

সেই সময়টা ছিল অস্বাভাবিক। জাপানি নেতৃত্ব সরব উচ্চকণ্ঠ হওয়ার পরিবর্তে নিস্তেজ হয়ে পড়লো। সংগত কারণেই তাই যেহেতু তখন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটা ঝাড়াই-বাছাই পর্ব চলছিল জেনারেল ম্যাকার্থারের

নির্দেশে, কেউই তাঁর বিরাগভাজন হতে চায়নি এমনকি যদি কেউ এক্ষেত্রে কোনো-রকম সাহায্য করতে পারে তবুও না। প্রত্যেকেই ছিল অতি সাবধানী এবং মুখবন্ধ। কিন্তু তার দ্বারা এটা বোঝায় না যে, তারা অসতর্ক বা অমনোযোগী কিংবা নিষ্ক্রিয়। এ ব্যাপারে কয়েকজন বিশিষ্ট জাপানি ছিলেন যাঁরা তাঁদের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উচ্চস্তরের যোগ্যতাসম্পন্ন ; তাঁরা নীরবে চুপচাপ তাঁদের দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যুক্তিসংগত ভিত্তিতে পরিকল্পনা করে চলছিলেন যাতে আগে হোক বা পরে হোক জাপান আবার একদিন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। কিন্তু তাঁরা মুখে এ বিষয়ে কিছু বলতেন না, একমাত্র যাঁদের ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে তাঁদের সঙ্গে ছাড়া।

মিঃ চেট্টুরের লক্ষ্য ছিল ভারত-জাপান সম্পর্কের ভিত্তিসূত্র স্থির করা, যাতে তা ঠিকমতো সম্পন্ন হয়, কেবলমাত্র দখলদারি সময়কালেই নয়, বরং শান্তি-চুক্তির উত্তরকালেও তা অবশ্যই ঠিকমতো চলে। চলতি সমস্যার সমাধান ছিল অবশ্যই দৈনিক কর্মসূচির অংশবিশেষ, এবং তা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তাঁর দৃষ্টি ছিল কোনো কিছুর পরিণতি সুদূর ভবিষ্যতে কি রূপ নেবে কেবল সেদিকেই। ভিত্তিসূত্র অবশ্যই প্রস্তুত করা উচিত স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে, এবং তাই প্রতিটি চলতি কার্যকলাপই যেন সেই ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী ভিত্তির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায়। উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রস্তুত করা যেতে পারে কেবলমাত্র বিভিন্ন অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠ মহলে কি হচ্ছে না হচ্ছে সেইসব বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ সংবাদ সংগ্রহ করতে পারলেই ; এবং এইসব ঘনিষ্ঠ মহল হলো : রাজনীতিক, শিল্পপতি, শিক্ষাবিদ এবং অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের মহল, সংবাদের ও তথ্যাদির মাধ্যম, এবং এইরকম আরো অনেক মহল। এবং এইসব ক্ষেত্রেই মিঃ চেট্টুর বিশেষ করে আমার সাহায্য চাইলেন।

আমার কর্তব্যকর্মাদি ছিল মূলত দ্বিমুখী। প্রথমত—মোটামুটি রুটিনমাফিক, যদিও শ্রমসাধ্য, তা হলো দৈনন্দিন ভিত্তিতে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ ও ভাষ্য ইত্যাদি যা জাপানি দৈনিক সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র এবং অন্যান্য মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, এবং টোকিও-রেডিও থেকে যেসব বেতার-প্রচার ইত্যাদি ঘোষিত হয়, সেই সব কিছুর সার সংক্ষেপ প্রস্তুত করা। ভারত সংক্রান্ত প্রসঙ্গগুলির ক্ষেত্রে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। এই ভারতীয় প্রসঙ্গগুলির সঙ্গে আমার বক্তব্য/মন্তব্য ইত্যাদিও যোগ করতে হবে, যাতে মিঃ চেট্টুর সে-সব তাঁর নিজস্ব চূড়ান্ত মূল্যায়নের কাজে লাগাতে পারেন।

দ্বিতীয়ত—সেটা আরো গুরুত্বপূর্ণ, আমার ওপর দায়িত্ব ছিল মিঃ চেট্টুরের সঙ্গে জাপানের জনজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের নেতৃবৃন্দের দেখা-সাক্ষাতের ও প্রয়োজনীয় কথাবার্তার ব্যবস্থা করা ; কোনো কোনো সময়ে ব্যক্তিগত ভাবে, এবং অন্যান্য

সময়ে ছোট ছোট গোষ্ঠীবদ্ধভাবে। দখলদারি পরিবেশের ফলে ঐসব জাপানি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বা আলাপ-আলোচনা করা সুবিধাজনক বা অবাধ ও সহজ ছিল না, সেকথার আভাস আমি আগেই দিয়েছি। কিন্তু মিঃ চেট্টুর বিশেষ-ভাবে আগ্রহী ছিলেন জাপানি সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর মধ্যে কত রকম ভাগ-উপবিভাগ ইত্যাদি আছে সেকথা যথাসাধ্য বিশদভাবে জানতে: রক্ষণশীল, উদার, সমাজবাদী এবং এমনকি কম্যুনিস্টদের মতো র‍্যাডিক্যালদের সম্পর্কেও জানতে চাইতেন। আমাকে হতে হয়েছিল এঁদের সঙ্গে সংযোগকারী ব্যক্তি। একাজ, বলা বাহুল্য খুবই জটিল। কিন্তু তা ছিল আরো উত্তেজনাপূর্ণ, কারণ আমি ছিলাম সম্ভবত স্বল্প কয়েকজন বিদেশিদের মধ্যে একজন এবং অবশ্যই ভারতীয়দের মধ্যে একমাত্র ব্যক্তি— আমি ঐসব জাপানিদের প্রায় প্রত্যেককেই জানতাম, এবং মিঃ চেট্টুর যাঁদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে ও কথাবার্তা বলতে চান তাঁদেরও। আমি আমার কর্তব্য-কাজে লেগে গেলাম পরম উৎসাহভরে, যেহেতু আমাকে বোঝানো হয়েছিল —এই কাজটা হলো ভারত ও জাপান উভয়েরই স্বার্থে জরুরি।

এই সমস্ত দেখা-সাক্ষাতের সময়ে আমি ছিলাম দোভাষী ও ব্যাখ্যাকারী। মিঃ চেট্টুরের ছিল ক্ষুরধারযুক্ত বুদ্ধিবৃত্তির মন, যার ফলে তিনি প্রায়ই গভীর তাৎপর্যপূর্ণ প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করতেন। এটা ছিল তাঁর দিক থেকে জাপানের প্রতি স্বাভাবিক মর্যাদাবোধ, কেতাদুরস্ত আচরণ, প্রকৃত আতিথেয়তা ও বন্ধুত্বের পরিচয় যে, উল্লিখিত জাপানিদের যাঁদের সঙ্গে আমি তাঁর যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলাম তাঁরা সকলেই তখন মিঃ চেট্টুরের সঙ্গে সহজ ও অন্তরঙ্গতা বোধ করলেন এবং তাঁর সঙ্গে তাঁদের মতামত বিনিময় করলেন বিশ্বস্ত ও আন্তরিকভাবে। এবং তাঁদের এই খোলাখুলি ও অন্তরঙ্গ মতামতই মিঃ চেট্টুর পেতে চেয়েছিলেন।

এই সমস্ত দেখা-সাক্ষাৎ হতো প্রায়ই সন্ধ্যার দিকে। তাঁর অফিস বা বাড়ি বাদ দিয়ে যখন যেমন পরিস্থিতি হতো—প্রায়ই এমন উপলক্ষ হয়েছে যখন আমি প্রায় সারা রাতই কাজ করেছি আমার বাড়িতে, এবং যাবতীয় কথাবার্তা ও আলাপ-আলোচনাদির নোট তৈরি করেছি আমার মন্তব্যসহ, পরদিন সকালেই যাতে মিঃ চেট্টুরের কাজে লাগে।

আলাপ-আলোচনাদি কেবলমাত্র বেসরকারি ব্যক্তি পর্যায়েই সীমাবদ্ধ থাকতো না। কয়েকজন সরকারি ব্যক্তিও ঐ সময়ে সহজেই এইসঙ্গে মেলামেশা করতেন, তাঁদের সঙ্গে বিদেশি কূটনীতিকও থাকতেন; কিন্তু আমার ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে আমি মিঃ চেট্টুরের জন্যে উচ্চস্তরের ব্যুরোক্রাটদের সঙ্গেও দেখা-সাক্ষাতের ব্যবস্থা করতাম। গল্‌ফ-খেলার মাঠেই ইনডিয়ান মিশনের প্রধানের সঙ্গে দেখা পাওয়া যেত, সেটা ছিল কাজকর্ম এবং কথাবার্তার পক্ষেও বেশ একটা সুন্দর জায়গা। মিঃ ও মিসেস চেট্টুর যে বাড়িতে থাকতেন সে দিকে তাঁরা বেশ যত্ন নিতেন এবং অতিথি অভ্যাগতদেরও বেশ আপ্যায়ন করতেন, সেটাও দেখা-সাক্ষাতের পক্ষে

আরেকটি ভালো জায়গা। জাপানি অফিসিয়ালদের মধ্যে যাঁরা বন্ধুত্বপূর্ণ ও খোলা-খুলি, কোনো কোনো সময়ে তাঁরা বেশ জটিলও হয়ে উঠতেন, যেমন—মিঃ বামবোকো ওনো (Mr. Bamboko Ono) স্বভাবতই একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও পার্লামেণ্টের স্পিকার, এবং মিঃ শিগেরু ইয়োশিদা (Mr. Shigeru Yosshida) প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং।

মিঃ শিনতারো রিয়ু (Mr. Shintaro Ryo) তখন ছিলেন আশাহি শিমবুন (Ashai Shimbun) পত্রিকার প্রধান সম্পাদকীয় লেখক; তিনি পরে ঐ পত্রিকার ম্যানেজিং ডিরেকটার হন। আমি তাঁকে একজন চমৎকার ভদ্রলোক হিসেবে ঘনিষ্ঠভাবেই জানতাম বেশ কয়েক বছর যাবৎ। তিনি ঘটনাক্রমে হয়ে গেলেন মিঃ চেট্টুরের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু, এবং তাঁরা ছ'জন প্রায়ই মিলিত হতেন নানা বিষয়ে বিশদ ও ব্যাপক আলোচনার জন্যে। এক্ষেত্রে ডোমেই নিউজ এজেন্সিতেও (Domei News agency) কয়েকজন বন্ধু ছিলেন, যাঁদের মাধ্যমে আমরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খবরাখবর পেতাম অন্যান্য অনেকের থেকে বহু তাড়াতাড়িতে। তানশান ইশিবাশি (Tanshan Ishibashi) একজন বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ, তিনি ছিলেন বিখ্যাত নেতাদের মধ্যেও একজন (শান্তি চুক্তির পরবর্তী জাপানের প্রধানমন্ত্রী হন), তাঁকে জেনারেল ম্যাকার্থার অভিযুক্ত করে বিতাড়িত করেন; এই তানশানও ছিলেন আমার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু, এবং মিঃ চেট্টুর তাঁর সঙ্গে বেশ কয়েকবার দেখা-সাক্ষাৎ করেন। এটা খুবই উপভোগ্য ভাবেই লক্ষ্য করার মতো ব্যাপার যে, ছ'জন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী তাৎক্ষণিক বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের মধ্যে মতবিনিময় করছেন।

অন্যান্য যেসব দর্শনার্থী প্রায়ই আসা-যাওয়া করতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন—মিঃ ফুসানোসুকা কুহারা (Mr. Fusanosuka Kuhara), হিতাচিও নিস্সান শিল্প-গোষ্ঠীর (Hatachi and Nissan groups) প্রতিষ্ঠাতা; মিঃ মাসাবুরো সুজুকি (Mr. Masaburo Suzuki) এবং আসানুমা (Asanuma) সমাজবাদী; আকিরা কাসামি (Akira Kasami), ইনি ছিলেন প্রাক্-যুদ্ধকালীন প্রিন্স কোনোয়ে-র ক্যাবিনেটের চিফ সেক্রেটারি; মিঃ আইচিরো ফুজিওয়ারা (Mr. Aiichiro Fujiwara) একজন সুপরিচিত শিল্পপতি, যিনি রাজনীতিতে এসেছিলেন এবং বিদেশমন্ত্রী ছিলেন বেশ কয়েক বছর যাবৎ, এবং পরলোকগত মিঃ ইনুকাই (Mr. Inukai), যিনি পরে বিচারমন্ত্রী হন। তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন SCAP সংস্থার 'অভিযুক্তদের তালিকাভুক্ত', এবং তাই আমাদের সাবধান হতে হয়েছিল।

তথাকথিত 'সান ফ্রানসিসকো শান্তি চুক্তি'র (San Francisco Peace Treaty) প্রস্তুতিপর্ব লক্ষ্য করা গেল যখন জন ফস্টার ডালেস (John Foster Dulles) টোকিও সফর শুরু করলেন ১৯৫০ সনে। বন্ধুবান্ধবদের এক ঘনিষ্ঠ মহলের মাধ্যমে আমি ডালেস ও জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইয়োশিদার মধ্যেকার আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ গতিপ্রকৃতি বিষয়ে অবহিত ছিলাম। ইয়োশিদার বিশেষ বক্তব্য ছিল এবং তাই তিনি চুপচাপ ছিলেন আমেরিকান কয়েকটি প্রস্তাবের বিষয়ে, কিন্তু ডালেস বেশ সাফল্যের সঙ্গেই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানগত বক্তব্য ইয়োশিদাকে দিয়ে গেলাতে সমর্থ হয়েছিলেন।

ইয়োশিদা তাঁর প্রথম জীবনে ছিলেন একজন উচ্চাকাংক্ষী কূটনীতিক, এবং তাঁকে প্রায়ই বলা হতো একজন, ইয়েলো ইংলিশম্যান, (Yellow Englishman) বা 'পীত ইংরেজ'; তিনি ব্রিটিশদের প্রশংসা করতেন এবং এমনকি চেষ্টা করতেন তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে। তিনি ছিলেন চার্চিলের মতোই একজন 'সিগার স্মোকার' এবং তাঁর স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল পশ্চিমি কায়দার প্রাচ্যকরণে। ফলে, ডালেস জাপানের ওপর যে চাপ সৃষ্টি করেছিলেন সেই শান্তি চুক্তির সন্ধি-প্রস্তাবের কয়েকটি ধারার খসড়া প্রস্তাবে নিছক নামেমাত্র একটি ইতিবাচক 'হ্যাঁ' শব্দের প্রয়োজন ছিল – যা বিশেষভাবে জাপানের পক্ষে তেমন উৎসাহজনক নয়: দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, শান্তি-চুক্তির পরেও জাপানে মিত্রবাহিনী রাখার শর্তের কথা। কিন্তু অবশ্যই একথা স্বীকার করতে হবে যে, ইয়োশিদাও তেমন কোনো সহজ বা সুবিধাজনক অবস্থায় ছিলেন না। তাঁর অনিশ্চিত অবস্থা সহৃদয়তার সঙ্গেই দেখতে হবে। তবে, দখলদারি অবস্থার যথাশীঘ্র অবসানকল্পে তাঁর আন্তরিক আকাংক্ষা ও প্রচেষ্টাকে দোষ দেওয়া যায় না।

যুক্তরাষ্ট্র-ব্রিটেন পরিচালিত খসড়া চুক্তির বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট SCAP সংস্থা ও জাপান সরকারের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনাকালে, আমি মিঃ চেট্টুরকে হালফিল রিপোর্ট দিতাম ঐ আলোচনার অগ্রগতি ইত্যাদির বিষয়ে। আমাকে বলা হয়েছিল যে, ভারত সরকার ঐসব বিষয়ে আমেরিকা থেকে প্রাপ্ত খবরের চেয়েও অনেক বেশি খবর পেয়েছিলেন টোকিও থেকে।

যুক্তরাষ্ট্র সরকার যখন সান ফ্রানসিস্কো চুক্তির খসড়ায় ভারত সরকারের সম্মতি চাইলেন, তখন সুতরাং পণ্ডিত নেহরু এবং তাঁর ক্যাবিনেটের কাছে সমস্ত তথ্যাদি সহ কাগজপত্র পাঠানো হয়েছিল তাঁদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে। ২৩ আগস্ট ১৯৫১ তারিখের একটি নোটে, যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের কাছে ভারত সরকার দুঃখ প্রকাশ করে এই যৌথ খসড়া-চুক্তি গ্রহণে তাদের অক্ষমতা জ্ঞাপন করলো।

যেসব কারণে ভারত সরকার তার অক্ষমতা জ্ঞাপন করলো, তা ছিল মিঃ চেট্টুরের

সুপারিশের ভিত্তিতে। এইসব কারণগুলি প্রধানত দুটি মূল ভিত্তিতে গঠিত, এবং তা হলো :

১. এই চুক্তি একটি শর্ত কণ্টকিত এবং বলা হয়েছে যে, যুক্তরাষ্ট্র বাহিনী জাপানে থাকবে, যতক্ষণ না জাপান তার আত্মরক্ষার্থে পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণে সমর্থ হয়, এবং এক্ষেত্রে কোনো তৃতীয় শক্তির কাছ থেকে কোনো রকম সাহায্যই নেওয়া যাবে না, যুক্তরাষ্ট্রের অনুমতি ছাড়া। কিন্তু চুক্তির খসড়ায় এরকম ধারার অন্তর্ভুক্তি কোনো দেশের পূর্ণ সার্বভৌমত্বের মতবাদের বিরোধী।

(এই শর্তের সপক্ষে আমেরিকার যুক্তি হলো, এই ধারা জাপানের নিজস্ব অনুরোধ অনুসারেই রাখা হয়েছে, যেহেতু এই দেশ প্রতিরক্ষাবিহীন অবস্থায় থাকতে চায় না। কিন্তু টোকিওতে আমাদের কাছে এই খবর ছিল যে, আমেরিকার ঐ চুক্তি হলো একটা চোখে-ধুলো দেওয়া ব্যাপার মাত্র। প্রকৃত ঘটনা হলো যে, আমেরিকাই চেয়েছিল জাপানে সামরিক ঘাঁটি করতে—সোভিয়েত ইউনিয়নের দিক থেকে সম্ভাব্য হুমকির মোকাবিলার জন্যে। খসড়া-চুক্তির ধারাগুলির মধ্যে এই চুক্তিটিতে ইয়োশিদাকে 'হাঁ' বলতে হয়েছিল ডালেসের চাপে পড়ে।)

২. যেহেতু কেবলমাত্র ফরমোজাকে আর অনির্দিষ্ট কালের জন্যে ফেলে না রেখে অবিলম্বে ফেরৎ দিতে হবে চীনের হাতে, রিয়ুকিয়ু ও বোনিন দ্বীপগুলিকেও (Ryukyu and Bonin Islands) অবিলম্বে পুনরুদ্ধার করে জাপানের হাতে ফেরৎ দিতে হবে—আর তাদের রাষ্ট্রসংঘের ট্রাস্টিশিপের অধীনে রাখা হবে না। এই দ্বীপগুলি ঐতিহাসিক ভাবেই জাপানের, এবং কোনোকালেই কখনোই আগ্রাসী আক্রমণের দ্বারা অধিকার করা হয়নি।

(এই ধারার সপক্ষে আমেরিকান যুক্তি হলো যে, পট্‌সডাম ডিকলেয়ারেশন বা পট্‌সডাম ঘোষণা অনুসারে জাপানবাসীদের মূল ভূখণ্ডের চারটি দ্বীপের মধ্যেই বসতি সীমাবদ্ধ রাখার কথা, এবং রিয়ুকিয়ু ও বোনিন দ্বীপগুলির মতো ছোটখাটো দ্বীপের ব্যাপারে 'সারেণ্ডার প্রোক্লামেশন'/বা বিজয়ী দেশের ইচ্ছানুসারেই স্থিরীকৃত হবে। ভারতের বক্তব্য হলো যে, মূল পট্‌সডাম ঘোষণাই এক্ষেত্রে ন্যায্য ও সংগত ছিল না।)

এই যুক্তিগুলি পণ্ডিত নেহরু ভারতীয় পার্লামেন্টে ঘোষণা করলেন ২৭ আগস্ট ১৯৫১ তারিখে। তিনি ঐ একই সময়ে ঘোষণা করলেন যে, ভারত জাপানের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ চায় না। এই প্রসঙ্গে ভারত সরকার কর্তৃক ৩০ আগস্ট ১৯৫১ তারিখে একটি 'হোয়াইট পেপার'/বা শ্বেতপত্র প্রকাশিত হলো, তাতে জোর দিয়ে বলা হলো—"যে চুক্তিতে ভারত সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট নয়, তাতে তার স্বাক্ষর না করার স্বাভাবিক ও প্রশ্নাতীত অধিকারের" কথা।

এক্ষেত্রে আরো একটি খবর তাঁর কাছে যা ছিল তা পণ্ডিত নেহরু ঘোষণা করতে

পারেন নি—কূটনৈতিক প্রশ্নের বিচারে। তিনি প্রকৃতপক্ষে যুক্তরাষ্ট্র-জাপান দ্বিপাক্ষিক নিরাপত্তা চুক্তির (US-Japan Bilateral Security Pact) মূল বয়ানটিই দেখেছেন—যে চুক্তিতে ঐ একই দিনে অর্থাৎ সান ফ্রানসিস্‌কো চুক্তির সঙ্গে একই সঙ্গে (২৩ আগস্ট ১৯৫১) আমেরিকা জাপানকে দিয়ে স্বাক্ষর করিয়ে নেবার ব্যবস্থা করেছিল। যেহেতু ঐ নিরাপত্তা চুক্তির বয়ান তখনো পর্যন্ত প্রচারিত হয়নি, এবং সুতরাং তা ছিল গোপনীয়, তাই নেহরু তা স্বভাবতই প্রকাশ করতে পারেন নি।

এক্ষেত্রে কোনো সন্দেহই ছিল না যে, অনেক দেশই জানতো আসন্ন যুক্তরাষ্ট্র-জাপান দ্বিপাক্ষিক নিরাপত্তা চুক্তির কথা, এবং অন্তত কিছু দেশ জানতো এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে ৮ সেপটেম্বর ১৯৫১ তারিখে। কিন্তু আমার বিশ্বাস ভারত ছাড়া খুব অল্প দেশই (যদি হয়), ঐ চুক্তির মূল বয়ান আগাম হাতে পেয়েছিল। আমিও হঠাৎ যেন দৈবক্রমে একটি কপি পেয়েছিলাম অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই, মিঃ চেট্টুরের জন্যে।

টোকিওতে ক্যাবিনেট প্রেস ক্লাবকে (Cabinet Press Club) সরকারের তরফ থেকে গোপনে বলা হয়েছিল ঐ 'সিকিউরিটি প্যাক্ট' বা নিরাপত্তা চুক্তির কথা, এবং ঐ চুক্তির কপি দেওয়া হয়েছিল চুক্তি স্বাক্ষরের জন্যে ধার্য দিনের সামান্য কিছু আগে; কিন্তু তখনি নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছিল, এই চুক্তির কথা সান ফ্রানসিস্‌কো চুক্তির কথা প্রকাশের পরই যেন প্রচার করা হয়—তার আগে কখনোই নয়। আমার এক ঘনিষ্ঠ সাংবাদিক বন্ধুর এ ব্যাপারে একটা নিজস্ব মনোভাব ছিল এবং তিনি স্থির করেছিলেন যে, এই চুক্তির ক্ষেত্রে গোপনীয় কিছুই নেই—অন্তত তিনি ও আমি এ ব্যাপারে যতদূর জানতাম বা সংশ্লিষ্ট ছিলাম। সুতরাং ঐ সাংবাদিক বন্ধু ঐ চুক্তির একটি কপি আমাকে দিয়েছিলেন, এবং আমিও তা হস্তান্তর করলাম মিঃ চেট্টুরের কাছে। এবং নেহরু তা বেশ ভালোভালেই পড়ার সময় পেয়েছিলেন এবং তিনি দেখলেন যে, সান ফ্রানসিস্‌কো চুক্তির ছত্রতলে আমেরিকা জাপানকে যুক্তরাষ্ট্রের অধীন শক্তিগোষ্ঠীতে (US Power bloc) থাকার জন্যে 'চাপ' দিচ্ছে। এহেন পরিস্থিতি ভারতের কাছে নীতিগত ভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ এই চুক্তিতে জাপানকে অন্যান্য দেশের সঙ্গে 'পূর্ণ মর্যাদা, সমতা ও সৌজন্য প্রদর্শন' করা হয়নি। এটা একটা স্বতন্ত্র ব্যাপার হতো যদি জাপান সম্পূর্ণ সার্বভৌম রাষ্ট্র হবার 'পরে' সে তার নিজস্ব স্বাধীন বিচারে এবং সতর্ক চিন্তাভাবনার পরে বিদেশি শক্তিকে তার মাটিতে স্বল্প সময়ের জন্যে বা দীর্ঘকালের জন্যে থাকতে দিতে সিদ্ধান্ত করতো তাহলে; কিন্তু এটা ঠিক নয় যে, স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার করতে হবে শর্ত কণ্টকিত করে, বিশেষত নির্দিষ্ট কোনো দেশের সুবিধার্থে—এক্ষেত্রে আমেরিকার স্বার্থে। আমার বিশ্বাস, এই শর্তই ঐ নিরাপত্তা চুক্তির প্রধান বিবেচ্য বিষয়—যেজন্যে ভারতকে কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছিল ঐ সান ফ্রানসিস্‌কো

চুক্তির পক্ষে যোগ না দিতে।

যৌথ শান্তি-চুক্তি (Joint Peace Treaty) যা জাপানের সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছিল সমবেত ৫২টি দেশের মধ্যে ৪৯টি দেশের (জাপান সমেত), যারা ঐ সান ফ্রান-সিস্কো কনফারেন্সে যোগদান করেছিল, এবং তা কার্যকরী হয়েছিল ২৮ এপ্রিল ১৯৫২ তারিখ থেকেই। স্বতন্ত্র ভারত-জাপান দ্বিপাক্ষিক চিরস্থায়ী শান্তি ও মিত্রতার চুক্তি (India-Japan Bilateral Treaty of Perpetual Peace and Amity) সম্পন্ন হয় ৯ জুন ১৯৫২ তারিখে। এই চুক্তিতে ভারতের পক্ষে স্বাক্ষর করেন মিঃ কে. কে. চেট্টুর, এবং জাপানের পক্ষে মিঃ কাৎসুও ওকাজাকি Mr. Katsuo Okazaki), বিদেশমন্ত্রী,—তিনি ঐ একই দিনে এক প্রেস বিবৃতি দিয়ে বলেন :

"জাপানের প্রতি ভারতের মিত্রতা ও শুভেচ্ছার ভাব যথেষ্ট ভাবেই দেখানো হয়েছে এই চুক্তির মধ্যে। এই ভাব বিশেষভাবেই লক্ষ্য করা যায় ভারতের পক্ষ থেকে জা ানের কাছ থেকে সর্বপ্রকার ক্ষতিপূরণের দাবি ছেড়ে দেওয়া এবং ভারতে অবস্থিত সমস্ত জাপানি সম্পত্তি ফেরৎ দেবার ইচ্ছামূলক ধারাগুলির মনোভাবের মধ্যে।"

এই চুক্তির মূল বয়ান এই বইয়ের পরিশিষ্টে (পরিশিষ্ট-৪) সংকলিত হয়েছে। এই সংক্ষিপ্ত ও অকপট সরল সোজা দলিল থেকে প্রাথমিক ভাবেই একটা সরল ও সহজ কাজের ধারণা পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু এটা বলাই বাহুল্য যে, প্রচুর পরিমাণ চিন্তা ও বহুদিনের পরিশ্রম স্বীকার করতে হয়েছে এই চুক্তিটি সমাধা করতে। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস কেটেছে একটা দুশ্চিন্তা নিয়ে।

কিন্তু এটা আশ্চর্যের বিষয়, কিভাবে প্রায় প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের সঙ্গেই একটা হালকা দিক থাকে। বর্তমান ঘটনায় এমন একটা কাকতালীয় ব্যাপার ছিল যার দ্বারা সেই পুরনো প্রবচনটি প্রমাণিত হয় যে ; কাহিনীর চেয়েও ঘটনা আশ্চর্যজনক হতে পারে (fact is stranger than fiction)। ব্যুরোক্রাটিক কেতা-কায়দায় আমি বিশেষজ্ঞ হতে পারিনি, কিন্তু ইনডিয়ান মিশনের প্রধানের পরামর্শদাতা হিসেবে অভিজ্ঞতার কালে, আমি এমন কিছু জানতে পারি যাকে নয়াদিল্লির দুর্বলভাবে গঠিত 'গভর্নমেন্ট'-এর ভাষায় 'সিদ্ধান্ত গ্রহণের কৌশল' ('decision making process') বলা যেতে পারে। (আমি ভেবেছিলাম যে অদল-বদল যাই হোক, তার প্রয়োগ-গত রীতিকায়দা গণতান্ত্রিক সরকারগুলির সর্বত্র অবশ্যই একই হবে।) সিদ্ধান্ত-সমূহ গৃহীত হয়ে থাকে সাধারণত 'যৌথভাবে'

যাকে সাধারণত অস্পষ্ট/ঘোলাটে ভাবের কথা বলে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। সান ফ্রানসিস্‌কো চুক্তি এবং ভারত-জাপান চুক্তির আলাপ-আলোচনার ধরনধারণ বিষয়ে আমাকে বলা হয়েছিল যে, প্রতিটি বা সব কটি 'সমস্যার' আগেই তা পাঠানো হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী নেহরু এবং তাঁর ক্যাবিনেটের আদেশের জন্যে। এবং ঐ বিষয়ে তাঁর ক্যাবিনেটের সাতজন সিনিয়ার অফিসারের বিচার-বিবেচনা ও মন্তব্য যদি কিছু থাকে তা জানার জন্যে।

উক্ত ৭ জন সিনিয়ার অফিসার হলেন—১, ২. মিঃ কে কে. চেট্টুর (টোকিওতে ইনডিয়ান মিশনের প্রধান, এবং অধিকাংশ চিঠিপত্রেরই সূচনাকারী) এবং তাঁর পরামর্শদাতা এ. এম. নায়ার (বর্তমান লেখক); এন. আর. পিল্লাই, নয়াদিল্লিস্থ বিদেশ মন্ত্রকের সেক্রেটারি জেনারেল (বিদেশ দফতরে নেহরুর পরবর্তী স্থানাধিকারী); ৪. কে. পি. এস. মেনন অধিকাংশ সময়ের জন্যে ছিলেন ফরেন সেক্রেটারি (পরে তাঁকে মসকোয় ভারতের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করা হয় এবং বেশ কয়েক বছরের কৃতিত্বপূর্ণ কাজের পরে তিনি অবসর গ্রহণ করেন); ৫. ভি. কে. কৃষ্ণমেনন, স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের পক্ষে লণ্ডনস্থ প্রথম হাই-কমিশনার, এবং কিছু কালের জন্যে ছিলেন সেখানে নেহরুর পক্ষে বিশেষ প্রতিনিধি এবং নেহরুর ক্যাবিনেটে যোগদানের আগে ছিলেন তাঁর 'রোভিং অ্যামবাসাডার' (Roving Ambassador) বা 'ভ্রাম্যমাণ দূত'; ৬. এন. রাঘবন, প্যারিসে ভারতের রাষ্ট্রদূত; ৭. সর্দার কে. এম. পানিক্কার, চীনে ভারতের রাষ্ট্রদূত।

এই সাতজনই ছিলেন ঘটনাক্রমে কেরালার মানুষ। এবং আরেকটি কাকতালীয় ব্যাপার হলো, টোকিওতে ইনডিয়ান মিশনের তিনজন অফিসার যাঁরা এই বিষয় নিয়ে গোড়া থেকেই দেখাশোনা করছিলেন; তাঁরা হলেন—১. কে. আর. নারায়ণন, সেকেণ্ড সেক্রেটারি (বর্তমানে তিনি আমেরিকায় ভারতের রাষ্ট্রদূত); ২. এম. এস. নায়ার, থার্ড সেক্রেটারি (তিনি ঘটনাক্রমে রাষ্ট্রদূত পর্যায়ে উন্নীত হন এবং ইদানিং অবসর গ্রহণ করেছেন); ৩. পি. এস. পরশুরাম, মিঃ কে. কে. চেট্টুরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি (পরে তিনি ইনডিয়ান ফরেন সার্ভিস ছেড়ে ভারত সরকারের সেচ ও বিদ্যুৎ দফতরে যোগদান করেন এবং এখানকার ডিরেক্টার হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন),—এঁরা তিনজনও কেরালার মানুষ।

এইভাবে টোকিওর কোনো কোনো মহলে কথাবার্তার মধ্যে আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠলো যে, ভারত-জাপান শান্তি চুক্তি (Indo-Japan Peace Treaty) হলো 'কেরালার ১০ জন ভদ্রলোকের তৈরি' জিনিস। সঠিক কিভাবে এমন একটা ঘটনা রূপায়িত হলো তা পরিষ্কার নয়। কিন্তু ভি. সি. ত্রিবেদী. টোকিওতে ইনডিয়ান মিশনের তৎকালীন ফার্স্ট সেক্রেটারি (তিনি অবসর গ্রহণের আগে নয়াদিল্লির বিদেশ দফতরে উপমন্ত্রী নিযুক্ত হন, এবং দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর মৃত্যু হয় মাত্র কিছুকাল আগে), এবিষয়ে তাঁর একটি 'থিওরি' বা সূত্র ছিল। তাঁর মুখের

আগায় যে কথাটা লেগে ছিল, তা একদিন তিনি তাঁর এক বন্ধুকে বলেছিলেন : এটা হলো জওহরলাল নেহরুর একটা স্থচিন্তিত পরিকল্পনার পরিণতি। ত্রিবেদী শুনেছিলেন যে, জন ফস্টার ডালেস ২০ জন বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করেছিলেন ভারতকে বোঝানোর চেষ্টা করতে, যাতে ভারত সান ফ্রান্সিস্কো চুক্তিতে যোগদান করে। নেহরু চেয়েছিলেন বিষয়টি সতর্কতার সঙ্গে ভেবে দেখতে। মিতব্যয়িতার জন্যে তিনি ভারতের পক্ষে মাত্র অর্ধেক অর্থাৎ ১০ জন বিশেষজ্ঞ মনোনীত করলেন, কিন্তু সমানুপাতিক সংখ্যা নিশ্চিত রাখার জন্যে তিনি স্থির করলেন ঐ ১০ জন বিশেষজ্ঞ রাখবেন ভারতের তৎকালীন ১০টি ছোট রাজ্য থেকে যাতে একটি যুক্তিসংগত অনুপাত বজায় রাখা যায় উভয় পক্ষেই।

আরেকটি কূটনৈতিক গুজব তৎকালে উঠেছিল যে, নেহরুর বোন শ্রীমতী বিজয়-লক্ষ্মী পণ্ডিত যিনি সান ফ্রানসিস্কো চুক্তির কথাবার্তা চলাকালে ওয়াশিংটনে ভারতের রাষ্ট্রদূত ছিলেন, তিনিই চেয়েছিলেন ভারতের পক্ষে 'ঐ চুক্তিতে' স্বাক্ষর করতে যাতে তাঁর 'বিজয়মুকুটে আরেকটি পালক' ('feather to her hat') যুক্ত হয়, এমনকি যদিও কেউই তাঁকে 'হ্যাট' বা 'ক্যাপ' মাথায় দিতে দেখেন নি) : যাই হোক, নেহরু সেই প্রস্তাবে আপত্তি জানান এবং মিঃ চেট্টুরকেই সেই পদে স্থপারিশের সিদ্ধান্ত করেন। আমি একবার ঠাট্টাচ্ছলে জিজ্ঞাসা করেছিলাম মিঃ চেট্টুরকে—এই কাহিনী সত্যি কিনা। তিনি বলেছিলেন এটা যাচাই করে দেখা অসম্ভব।

ঐ শান্তি-চুক্তির সিদ্ধান্তের কয়েক মাস পরে, মিঃ চেট্টুর জাপান ত্যাগ করেন এবং বদলি হয়ে যান বার্মায় ভারতের রাষ্ট্রদূত হিসেবে। আমি তাঁর কাজের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে সংযোগ রেখেছিলাম। বার্মায় যাবার প্রাক্‌কালে, তিনি হঠাৎ অবাক করে দিয়ে এলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে।

যখন তিনি প্রথম আমাকে তাঁর পরামর্শদাতা হতে বলেছিলেন, কিংবা যতদিন তাঁর সঙ্গে আমি কাজ করেছি, এই সময়ের মধ্যে কখনোই আমার মনে কোনো রকম পারিশ্রমিক গ্রহণের চিন্তা আসেনি। আমি কোনো রকম পে-বিলের কথা চিন্তা না করেই কেবল তাঁর সঙ্গে আমার করণীয় কাজ করেই খুশি ছিলাম। আমি ধনী ছিলাম না, কিন্তু অসুবিধে না করে চলার পক্ষে যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকু পরিমাণই আমার প্রয়োজন ছিল, এবং ইনডিয়ান মিশনে আমার কাজকর্মকেও কোনো রকম অতিরিক্ত উপার্জনের সূত্র বলে মনে করিনি। কিন্তু পরে একদিন, আমার এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হয়। মিঃ চেট্টুর আমাকে বলেছিলেন যে, কিছু পরিমাণ অর্থ ভারত সরকার কর্তৃক মঞ্জুর হয়েছে তাঁর সঙ্গে পরামর্শদাতা হিসেবে আমার কাজকর্মের স্বীকৃতি হিসেবে, এবং তাঁর মাধ্যমে নয়াদিল্লির ভারত সরকারের

কাজকর্মের জন্যে ; তাই তিনি (মিঃ চেট্টুর) তাঁর অফিসকে নির্দেশ দিয়েছেন আমাকে টাকাটা দিয়ে দেবার জন্যে। তখনকার মূল্যায়নের হিসেবে সেটা ছিল একটা বড় অঙ্কের টাকা। আমি বিব্রত বোধ করলাম এবং মিঃ চেট্টুরকে বললাম আমি কোনো রকম টাকা-পয়সা নিতে অনিচ্ছুক, কেননা আমি সর্বদাই আমার কাজ-কর্মকে স্বদেশের প্রতি আমার কর্তব্যের অঙ্গ হিসেবেই মনে করেছি, এবং অধিকন্তু তা করেছি ভারত ও জাপানের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে, যে জাপানে আমি বসবাস ও কাজকর্ম করেছি আমার জীবনের অধিকাংশ সময়কাল যাবৎ। আমি বড হয়ে উঠেছি ব্রিটিশ-বিরোধী কার্যকলাপের মধ্যে এবং ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের কার্যকলাপের স্বার্থে, গীতায় কথিত সেই 'অনাসক্ত কর্মের' স্বার্থে। আমি সেই ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলাম রাসবিহারী বোসের সঙ্গে আমার পরিচয় ও তাঁর কার্যকলাপের ফলে, এমনকি যখন আমি নেহাত ছাত্র ছিলাম তখন থেকেই। দূর প্রাচ্যে ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইনডিয়ান ইনডিপেনডেন্স লিগের পক্ষে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের কাজে তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ যোগাযোগের ফলে সেই সম্পর্ক আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল। আমি ভারত সরকারের এবং মিঃ চেট্টুরের বিচার-বিবেচনার জন্যে কৃতজ্ঞ, কিন্তু আমাকে অবশ্যই কোনো রকম টাকা-পয়সা নেওয়া থেকে রেহাই দিতে হবে। সেদিন যখন আমরা পরস্পর বিদায় নিলাম, উভয়েই আমরা কিছুটা যেন অন্যরকম হয়ে গিয়েছিলাম ; কিছুটা যেন বিভ্রান্ত, একথাও কেউ বলতে পারেন। আমি শুনলাম মিঃ চেট্টুর বলেছেন মৃদুভাবে : 'আমি যাচ্ছি কিছু হিসেবের গোলমাল সংক্রান্ত সমস্যার মুখোমুখি হতে!'

এর চেয়ে বেশি কিছু তখন আর কোনো আলোচনা হয়নি ঐ প্রসঙ্গে, বেশ কিছুকালের জন্যে। কিন্তু মিঃ চেট্টুর সেকথা ভোলেন নি। তিনি ছিলেন বেশ ধূর্ত প্রকৃতির মানুষ, এবং এমন ধরনের মানুষ নন যে তিনি যা কিছু করতে চান সহজে তা হঠাৎ করে ছেড়ে দেবেন। তিনি একটা পরিকল্পনা করলেন যার মধ্যে ভারত সরকারের অবস্থা ও আমার মধ্যে একটা বোঝাপড়ার ব্যবস্থা ছিল।

মিঃ চেট্টুর আমাকে একদিন ডেকে পাঠালেন এবং বললেন যে, ভারত সরকার আমাকে কিছু 'উপহার' দিতে চান—আমার ছেলেমেয়েরা যারা বড় হয়ে উঠছে তাদের লেখাপড়ার ব্যয় নির্বাহের সহায়তা হিসেবে। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর অ্যাটাশে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন আমার নামে একখানি চেক এবং একটি প্রাপ্তিস্বীকার পত্র সইয়ের জন্যে হাতে করে। যেহেতু মিঃ চেট্টুর তখনো লেখাপড়ার গুরুত্বের কথা এবং তা কিরকম ব্যয়সাধ্য হয়ে উঠেছে সেকথা চিন্তা করছিলেন, ঐ অ্যাটাশে ভদ্রলোক প্রকৃতপক্ষে আমার কাছে যেন 'প্রার্থনা' জানালেন ঐ চেকটি নিয়ে নিতে এবং প্রাপ্তিস্বীকার পত্রে একটি সই করে দিতে, যাতে তাঁর অফিসের হিসাবপত্রের খাতাটির লেখাপড়ার কাজটা তিনি চুকিয়ে দিতে পারেন। সেই প্রথম আমি কোনোরকম অর্থাদি গ্রহণ করলাম ভারত সরকারের কাছ থেকে—'আমার স্বদেশ

সেবার স্বীকৃতি হিসেবে'।

মিঃ চেট্টুরের প্রস্থানের পরে আমি ভাবলাম যে, প্রকৃতপক্ষে আমি ভারতের রাজনৈতিক স্বার্থে জাপানে যা করতে চেয়েছিলাম তা শেষ হয়েছে। আমি আমার জীবনের ধারা পাল্টে ফেললাম এবং হয়ে গেলাম একজন শিল্প-ব্যবসায়ের উদ্যোক্তা। বন্ধুরা ঠাট্টার সুরে আমার নতুন বৃত্তির কথা প্রসঙ্গে বলাবলি করতো, তা যেন ঠিক একজন 'সামুরাই' বা 'রোনিন'-এর পর্যায় থেকে নিছক একজন ব্যবসায়ীর পর্যায়ে আমার অবনতির কথা। কিন্তু আমি মনে করতাম, আমার রাজনৈতিক কাজের অবকাশ ও সুবিধা-সুযোগ সংকীর্ণ হয়ে এসেছে একটা তাৎপর্যহীন পরিস্থিতিতে—এবং তা হয়েছে পূর্বোক্ত শান্তি-চুক্তি সমাধা হওয়ার পরে। আমি জাপানবাসী ভারতীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমার যোগাযোগ বজায় রেখে চলতাম, এবং তাঁদের প্রয়োজনমতো আমার সাহায্য-সহযোগিতার ইচ্ছার কথাও জানিয়ে রেখেছিলাম। সমাজসেবামূলক কাজকর্মের আর কোনো প্রয়োজন রইলো না। জাপানি বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে আমার ব্যাপক পরিচিতির পরিধি আরো বাড়ানোর ও ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ আরো বেড়ে গেল। কিন্তু আমার সময় ও ক্ষমতা অধিকাংশই চলে যেত ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে।

সম্পূর্ণ বোঝাপড়া, বন্ধুত্ব ও সৌজন্য এবং পারস্পরিক মর্যাদাবোধের সুস্পষ্ট একটা ছাপ ছিল আমার স্বদেশের রাষ্ট্রদূত ও আমার মধ্যেকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে; একমাত্র সামান্য ব্যতিক্রম ছিল যখন সেক্ষেত্রে একটা দুর্যোগের মেঘ এসে দেখা দিল সাময়িকভাবে—যখন দারুণ কর্মব্যস্ততা দেখা গেল ভারতে এবং প্রত্যেক দেশের ইনডিয়ান মিশনে—ভারতে চীনের অভিযানের সময়ে, ১৯৬২ অকটোবরে।

সেই সময়টা ছিল চীনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা বিভ্রান্তিকর অবস্থার কাল। চীন যেখানে এযাবৎ ভারতের সঙ্গে ভাইয়ের মতো বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা বলে আসছে, প্রকৃতপক্ষে তারা এখন আমাদের পেছন থেকে ছুরি মারলো। সম্ভাব্য যে 'উত্তেজনার' কারণ ঘটিয়েছিল ভারত দালাই লামাকে এবং প্রচুর সংখ্যক তিব্বতীদের যারা তাঁর সঙ্গে সীমান্ত পার হয়ে এসেছিল তাদের আশ্রয় দিয়ে, সেই ঘটনা কখনোই চীনা আক্রমণের সপক্ষে যুক্তিসংগত কারণ হিসেবে দেখানো যায় না। অপরপক্ষে, ভারত ঐ সীমান্ত সংশ্লিষ্ট এলাকায় তার দায়িত্বের ক্ষেত্রে দারুণ অবহেলার কথা এবং তাঁর ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের চরম ব্যর্থতার কথাও কিছুতেই অস্বীকার করতে বা চেপে যেতে পারে না। অত্যন্ত হতাশা-জনক ভুল সংবাদ যা তাঁকে দেওয়া হয়েছিল তার ভিত্তিতে, প্রধানমন্ত্রী নেহরু ভারতীয় সেনাবাহিনীকে আদেশ দিলেন 'চীনাদের ছুঁড়ে ফেলে দিতে' ('throw the Chinese out')। তাঁর কোনো ধারণাই ছিল না প্রচুর পরিমাণে শক্তিশালী চীনাদের উপস্থিতির বিষয়ে, এবং তার বিপরীতে অত্যন্ত অপ্রস্তুত ভারতীয় বাহিনীর কথা। আমাদের শোচনীয় পরাজয় স্বীকার করতে হলো।

কয়েকজন ভারতীয় বন্ধুদের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনাকালে, আমি আমার মতামত খোলাখুলি প্রকাশ করে বললাম, এই 'বর্ডার ওয়ার' বা সীমান্তযুদ্ধ হলো মারাত্মক ভুল। মনে হলো কেউ একজন আমার এই 'সমালোচনামূলক মন্তব্যাদির কথা' ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের কানে তুলে দিয়েছিলেন, যিনি সম্ভবত অনুমান করলেন, 'এ. এম. নায়ার ভারত-বিরোধী মনোভাব জাগিয়ে' তুলছেন। সম্ভবত তাঁর কথা-মতোই অ্যালান নাজারেথ (Alan Nazareth, সেকেণ্ড সেক্রেটারি, বর্তমানে ইনি ঘানায় ভারতের হাই-কমিশনার) পরদিনই আমার কাছে চলে এলেন, এবং আমার সঙ্গে দীর্ঘ ও বন্ধুত্বপূর্ণ কথাবার্তা বললেন ভারতীয় পরিস্থিতি প্রসঙ্গে, বিশেষত ভারতে চীনা অভিযান বিষয়ে। আমি তাঁকে সেই একই কথা বললাম যা আমি আগেই আমার অন্যান্য বন্ধুদের কাছে বলেছিলাম : প্রধানমন্ত্রী নেহরুর প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা রেখেই বললাম, আমি মনে করি নেহরু অত্যন্ত ভুলভাবে পরিচালিত হয়েছিলেন এবং পতন ডেকে এনেছিলেন। যুদ্ধ করার ব্যাপারে এটা একটা কৌশলগত ভুল, যখন পরাজয় একান্তই নিশ্চিত। চীনের দিকে তাদের শক্তি ছিল আমাদের দিককার তুলনায় সম্ভবত ২০ গুণ বেশি, সীমান্ত সংক্রান্ত প্রদত্ত যে কোনো হিসাবের ভিত্তিতেই।

নাজারেথ আমার বক্তব্য বুঝলেন। তিনি অবশ্যই আমাদের আলোচনার সার-সংক্ষেপ রাষ্ট্রদূতকে জানিয়েছিলেন। পরদিনই আমাকে এমব্যাসি অফিসে আমন্ত্রণ জানানো হলো রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে এক আলোচনার জন্যে, অর্থাৎ যাতে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেন তাঁকে আমার বক্তব্য হিসেবে যা বলা হয়েছে তা সঠিকভাবেই বলা হয়েছে। বিষয়টি একই ছিল, এবং আমার মতামতও একই ছিল—আমি নাজা-রেথকে যেকথা যেমন বলেছিলাম। আমি রাষ্ট্রদূতের কাছে সুপারিশ করেছিলাম, নয়াদিল্লিকে এমন পরামর্শ দেওয়া উচিত যাতে তারা যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত না করে, বরং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তার নিষ্পত্তি করে। আমাদের বরং বেশি করে মনোযোগ দেওয়া উচিত অর্থনৈতিক ভাবে আমাদের দেশকে গড়ে তোলার ব্যাপারে, অন্তত অসার যুদ্ধের ব্যাপারে আমাদের প্রস্তুতি যখন অত্যন্ত দুর্বল। এমব্যাসি অফিসের কয়েকজন তরুণ অফিসারকে মনে হলো যেন ছায়ার সঙ্গে বক্সিং করেছেন, এবং বেশ জোরের সঙ্গেই তাঁদের মতামত প্রকাশ করলেন যে, ভারতের উচিত 'একটা বড় রকমের যুদ্ধ' করা। আমি তাঁদের কয়েকজনের কাছে একটু অপ্রিয় হয়ে গেলাম যখন আমি তাঁদের পরামর্শ দিলাম যে, যুদ্ধ ও শান্তির বিষয়ে তাঁদের এখনো অনেক কিছুই শিখতে হবে।

তার কয়েকদিন পরে, আমার পুরনো বন্ধু হঠাৎ টোকিওয় এসে হাজির হলেন এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি ভারত ও চীনের মধ্যে 'মধ্যস্থতা' ('media-tion') করার মতো কোনো কাজ নিতে পারি কিনা। তিনি বললেন যে আমি যদি রাজি থাকি, তিনি নেহরুকে সংবাদ দেবেন এবং তিনিই তখন সম্ভবত আমাকে

বলবেন পিকিঙে যেতে, চীনা নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে। এটা তখন আদৌ আমার কাছে স্পষ্ট ছিল না (কিংবা, চমনলালের কাছেও আমি কিছু বলিনি সেই ব্যাপারে), কী ধরনের 'মধ্যস্থতা' আমার কাছ থেকে তাঁরা আশা করেন। আমি হয়তো একসময় 'মানচুকুও নায়ার' (Manchukuo Nair) হিসেবে পরিচিত ছিলাম, কিন্তু 'চীনা নায়ার' (China Nair) হিসেবে আমার কোনো খ্যাতি নেই। আমি চমনলালকে বললাম যে, সম্ভবত ভারতীয় এমব্যাসিকে তার নানান সুত্র-সুবিধে সহ পিকিঙে একটি ডেলিগেট পাঠিয়ে তাদের সঙ্গে 'আলাপ-আলোচনা' চালানোর পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে, এবং তিনি যেন আমাকে রেহাই দেন যাতে আমি শান্তিতে থাকতে পারি। আমার এই প্রস্তাবের ফলে এমব্যাসি অফিসের কাছে আমাকে যেন কিছুটা অপ্রিয় করে তুললো কিছুকালের জন্যে। সৌভাগ্যক্রমে যাই হোক, আমাদের মধ্যে যে ক্ষণিক মতভেদের সংঘর্ষ ঝলসে উঠেছিল তা শীঘ্রই দূর হয়ে গেল, এবং আমার দেশের রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আবার ঠিকমতো স্থাপিত হলো।

আজ এটাই ঘটনা যে, আমিই জাপানে সবচেয়ে পুরনো ভারতীয় বাসিন্দা, এবং বিগত কয়েক বছর যাবৎ আমিই টোকিওর ইনডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট পদে বহাল আছি। কেবলমাত্র মিঃ চেট্টুরের কাছ থেকেই নয়, তাঁর সকল উত্তরসূরীর কাছ থেকেই সহানুভূতিপূর্ণ বিচার-বিবেচনা ও স্নেহ-ভালোবাসা পাওয়া, আমার কাছে বেশ একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার। এক্ষেত্রে আমি আনন্দিত যে, নানান সুবিধা-সুযোগ আমার কাছে এসেছে সাধারণ ভারতীয় সম্প্রদায়কে সাহায্য করার জন্যে, এবং ভারত থেকে আগত জাপান সফররত বিশিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি অফিসাররা মাঝে মাঝেই আমার কাছে এসেছেন। আমার ব্যক্তিগত সামর্থ্য অনুসারে আমি ভারত ও জাপানের মধ্যে সুসম্পর্ক উন্নতির স্বার্থে আমার আগ্রহ বজায় রেখে চলি—বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্নভাবে। এই আগ্রহের সক্রিয় দৃষ্টান্ত হলো হাক্কোন-এর আশিনোকু হ্রদের উপকূলবর্তী স্থানে পাল-শিমোনাকা স্মারক ভবন (Pal-Shimonaka Memorial Building, Hakkone) স্থাপন।

আমি ছিলাম সেই বিশিষ্ট দু'জনের নামে স্থাপিত এই স্মারক ভবনের সংগঠকদের মধ্যে একজন। আমি ইতিপূর্বেই তাঁদের একজনের অর্থাৎ ডক্টর রাধাবিনোদ পালের বিষয়ে অনেক কিছু বলেছি, এবং তার চেয়ে আর বেশি কিছু বলার প্রয়োজন নেই। আমার পাঠক-পাঠিকারা সহজেই বুঝতে পারবেন, তিনি কত বড় একজন বন্ধু ছিলেন জাপানের। মিঃ ইয়াসাবুরো শিমোনাকা, জাপানের প্রকাশন শিল্পের ক্ষেত্রে ছিলেন একজন উঁচুদরের মানুষ, এবং একজন বড় বন্ধু ছিলেন

ভারতের এবং বিশেষত ডক্টর পালের। মিঃ শিমোনকো এবং ডক্টর পাল উভয়েই পরস্পরকে ভাইয়ের মতো মনে করতেন। [ড আর. বি. পাল ও মিঃ ইয়াসাবুরো শিমোনাকার সংক্ষিপ্ত জীবনকথার জন্যে, দ্র. পরিশিষ্ট-৩।]

ডক্টর পালের একবারের জাপান সফরকালে, মিঃ শিমোনাকা তাঁর সমগ্র সফরকালেই তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। যখন তাঁরা হিরোশিমায় গিয়েছিলেন যুদ্ধে মৃতদের নামে স্থাপিত স্মারকস্তম্ভ দেখার জন্যে, ডক্টর পাল দেখলেন স্তম্ভের গায়ে লেখা আছে : 'আমরা সেই ভুল আর করবো না' (Futatabi ayamachi wo okashimasen')। হঠাৎ তিনি বিচলিত হয়ে উঠলেন এবং NHK সংস্থার (জাপান ব্রডকাস্টিং স্টেশন) প্রতিনিধিদের যাঁরা তাঁর সঙ্গেই ছিলেন তাঁদের সামনেই জিজ্ঞাসা করলেন : কে এই ভুলের পুনরাবৃত্তি করবে না? জাপান কিংবা আমেরিকা? কারণ, 'তারা' হলো আমেরিকা, যারাই অ্যাটম বোমা ফেলেছিল জাপানের এই শহরের উপর এবং ধ্বংস করেছিল তার সবকিছুই।

ডক্টর পাল দৃশ্যতই বিচলিত হয়েছিলেন, এবং তাঁর চারপাশের প্রত্যেকেই তাঁর এই আবেগময় উত্তেজনার শরিক হয়েছিলেন সেই উপলক্ষে। এই খবর NHK সংস্থা কর্তৃক তার সমস্ত শাখা কেন্দ্রের মাধ্যমেই প্রচারিত হয়েছিল সেইদিনই।

যখন আমি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করছি, কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও আমি বলতে পারি যে NHK সংস্থায় বেশ কয়েক বছর যাবৎ একটা ব্যবস্থা ছিল—একটা বিশেষ প্রোগ্রামের মাধ্যমে হিরোশিমাকে শোচনীয় ভাবে ধ্বংস করার জন্যে ইতিহাসে প্রথম অ্যাটম বোমা ব্যবহার করার ঘটনাটিকে চিহ্নিত করে রাখতে। ডক্টর আর. বি. পালের মন্তব্য যা আগেই উদ্ধৃত করেছি তা-ই ছিল উক্ত বেতার-প্রচারের অংশবিশেষ। আমি লক্ষ্য করছি, ইদানিং টোকিও রেডিও এই ধরনের কোনো বিশেষ কর্মসূচি প্রচার করছে না—প্রতি বছরের ৬ আগস্ট তারিখে। আমি আশা করি, ঐ কর্মসূচির বর্জন সাময়িক মাত্র, এবং সেই গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ যা প্রত্যেকের কাছেই ভালো লাগবে, তা আবার ঐ টোকিও রেডিওর মাধ্যমে প্রচার করা হবে জনসাধারণের সেবার উদ্দেশ্যে। আমি যেন আরো আশা করতে পারি যে, সেই স্মৃতি জাপানের সঙ্গে ভারতের চিরস্থায়ী শান্তি ও মিত্রতার চুক্তিকে আরো উজ্জ্বল ও জোরদার করে তুলবে—সেটাই হলো দু'দেশের মধ্যেকার সেই দ্বিপাক্ষিক চুক্তির সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ দিক—যা সেই পরিস্থিতিতে এই দুটি দেশ সম্পন্ন করতে সমর্থ হয়েছিল।

৩১.

উপসংহার

একথা বলা একটা ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, জাপান একটা দেশ নয়, বরং একটা অস্বাভাবিক আকৃতি বিশেষ—একটা অর্থনৈতিক বিস্ময়কর বস্তুমাত্র। একজন প্রবাসী ভারতীয় হিসেবে, ৭৬ বছরের জীবনের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ বয়স এই দেশে ও সংশ্লিষ্ট এলাকায় কাটিয়ে দেখেছি—জাপান সম্পর্কে আপাতদৃষ্টিতে কথিত ঐ অতিশয়োক্তিতে তেমন দোষের কিছু দেখতে পাইনে। এটা অনেকাংশেই সত্য। এমনকি শেষ বিশ্বযুদ্ধের আগে এক দশক পর্যন্ত, 'জাপান' নামটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে অনেকেরই মনে 'কৃত্রিম জিনিসের' কথাটিই ভেসে উঠতো, যথা—ফুজিয়ামা, চেরি ব্লসম্‌স ও গেইশা ইত্যাদি। ঐ দেশ সম্পর্কে বাইরে থেকে সাধারণ একটা ধারণা এমনই ছিল যে, যদি কেউ দেখেন কোনো একটা জিনিসের গায়ে 'মেড ইন জাপান' ('জাপানে প্রস্তুত') মার্কা মারা, তাহলে তিনি বুঝতেন এটা সম্ভবত সবচেয়ে শস্তা দামের জিনিস, অন্তত ঐ দামে বাজারে যা পাওয়া যায় তার মধ্যে। মনস্তত্ত্বগত অনুষঙ্গ হিসেবে, এটাও অল্পবিস্তর পরিমাণে সত্যি ছিল যে ঐ 'মেড ইন জাপান' মার্কা কথাটির সমার্থক হলো 'নিচুস্তরের' জিনিস, অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট জিনিসটির গুণগত মান খুব নিচুস্তরের। কিন্তু আজকের জাপানের ক্ষেত্রে বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবের অর্থবাহী।

সেটা ছিল ১৯২৮ সন, যখন আমি সর্বপ্রথম এই দেশে এসে পৌঁছাই—ইমপিরিয়াল কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ে সিভিল এনজিনিয়ারিং বিষয়ে পড়াশোনা করতে। ঐ একই বছরটি চিহ্নিত হয়ে আছে বর্তমান সম্রাট হিরোহিতোর (Emperor Hirohito) অভিষেকের বছর হিসেবে। তিনি এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সিংহাসনে আরোহণ করেন কিয়োটোতে, ১০ নভেম্বর ১৯২৮ তারিখে; তখন তিনি ঘোষণা করেন যে—

"এটা আমাদের সিদ্ধান্ত, আমরা ভিতর থেকে আমাদের দেশবাসীর শিক্ষা-দীক্ষা, তাদের নৈতিক ও বস্তুগত প্রয়োজন পূরণ ও উন্নতির যথাসাধ্য চেষ্টা করবো—যাতে তাদের মধ্যে একতা ও সন্তোষ বিধান হয়, এবং সমগ্র জাতি শক্তি ও সমৃদ্ধি লাভ করে; এবং বাইরে থেকে অন্যান্য সমস্ত দেশের সঙ্গেও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনেরও চেষ্টা করা হবে।"...

সম্রাট হিরোহিতোর বয়স তখন মাত্র ২৭ বছর, এবং বাড়িতেই তিনি শিক্ষা লাভ করেছিলেন তাঁর ছোটবেলায়—জেনারেল মারেসুকে নোগির (Gen.

Maresuke Nogi) কাছে, এবং পরে তিনি বিদেশ ভ্রমণ করেন—ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইংল্যাণ্ড এবং অন্যান্য কয়েকটি পশ্চিমি দেশে। তাঁর পবিত্র দৈবী-ভাব যাই হোক সম্পূর্ণ অটুট ছিল, এবং সিংহাসনারোহণ অনুষ্ঠানের মধ্যে ঐতিহ্যগত প্রতীকের ব্যবহারও হয়েছিল, যার অর্থ কেবল এই রাজবংশই সমগ্র দেশটাকে শাসন করেছে ও করছে, এবং ঐ প্রতীকের মধ্যে ছিল: 'আমাতেরাসু ওমি-কামি'র (শিন্টো পুরাণ কাহিনী অনুসারে 'সূর্যদেবী'—Amaterasu Omi-Kami) দর্পণ, মূল্যবান মুক্তা ও বর্শা—যা মূলত ড্রাগনের লেজের দ্বারা ধৃত আছে বলে কল্পনা করা হয়।

এটা অবশ্যই বলতে হবে যে, দেশের সমকালীন নেতৃবৃন্দ এখনো যেভাবে হোক ঐক্যবদ্ধ আছেন সেই কিংবদন্তির কাল থেকে; এবং আমরা দেখি, বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ তার মধ্যে মন্ত্রীরাও আছেন, এক সময়ে স্বয়ং সম্রাটও ছিলেন, তাঁরা পবিত্র শিন্টো মন্দিরগুলির প্রতিও তাঁদের শ্রদ্ধা জানিয়ে আসছেন—এমনকি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ঘটনাগুলির সময়কালেও। কিন্তু একজন বৃদ্ধ হিসেবে, আমি লক্ষ্য করছি এইসব ঘটনার প্রতি এবং পুরনো মূল্যবোধের প্রতি মানুষের আগ্রহ আস্তে আস্তে যেন কমে যাচ্ছে। তার পরিণাম হিসেবে দেখা যাচ্ছে, যে সূত্রে সমস্ত জাতি ও কৃষ্টি বাঁধা ছিল অতীতে এক ইস্পাত কঠিন বন্ধনে, তাও যেন ক্রমশ দুর্বল হয়ে আসছে।

যদিও জাপানের পৌরাণিক ইতিহাস আমাতেরাসু ওমি-কামির পৌত্র জিম্মু-তেননোর (Amaterasu Omi-Kami's grandson Jimmu Tenno) কালের মতো সুপ্রাচীন এবং বলা হয় ঐ জিম্মু-তেননোই জাপান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেন খ্রীস্টজন্মের মোটামুটি ৬০০ বছর আগে: তবুও সামন্ততন্ত্রবাদ থেকে আধুনিক রাষ্ট্র হিসেবে জাপানের আবির্ভাবের ঐ কাহিনী প্রচলিত হয় ১৮৬৮ সনে মেইজি পুনরুদ্ধারের (Meiji Restoration, 1868) পর থেকেই। কিন্তু এই দেশটি যা করেছে (এবং কিছুকালের জন্যে যা না করেছে) মাত্র ১০০ বছর সময়কালের মধ্যে, দুনিয়ার ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় খুব সামান্যই। খ্রী. ১৮৬৮ ও ১৯৪১ সনের মধ্যে জাপান মানচুরিয়া ও কোরিয়ায়, আপাতদৃষ্টে এক অবিরাম যুদ্ধের ঝামেলায় খুব বেশি রকম জড়িত হয়ে পড়ে অনিবার্য ভাবেই; সবাইকে টেক্কা দিতেই যেন আহ্বান জানালো যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন এবং অন্যান্য কয়েকটি দেশের শক্তি-সামর্থ্যকে। এটা তার কাছে যেন সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সার্বিক নেতৃত্ব গ্রহণের নেশার মতো পেয়ে বসলো—একটা পরিকল্পনার মাধ্যমে—যাকে জাপান নাম দিল 'বৃহত্তর পূর্ব-এশিয়া সহ-সমৃদ্ধির প্রকল্প' (Greater East Asia Co-prosperity Scheme)।

এই পরিকল্পনা শোচনীয় ভাবেই ব্যর্থ হলো, এবং জাপান এই প্রথম তার ২৫০০ বছরের ইতিহাসে—নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের মতো হীনতা স্বীকার করলো মিত্রশক্তির

কাছে এবং মিত্রবাহিনীর দখলে চলে গেল দেশটি। জাপানের যাবতীয় মূল্যবান সম্পত্তি ইত্যাদি প্রকৃতপক্ষে সবকিছুই ধ্বংস হয়ে গেল শত্রুপক্ষের বিমানবাহিনীর ঠাসবুনোনি বোমাবাজির ('carpet bombing') ফলে, এবং জাপানের দুটি শহর একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল ১৯৪৫ আগস্টে—তখন পর্যন্ত জ্ঞাত মানবতার ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ ঘাতক—অ্যাটম বোমার হাতে। লক্ষ-লক্ষ লোক মারা গেল সেই যুদ্ধে, এবং যারা প্রাণে বেঁচে গেল তারা নিছক টিঁকে রইলো অবর্ণনীয় কষ্ট ও যন্ত্রণার মধ্যে। সমগ্র দেশেই দেখা দিল দারুণ অভাব, এমনকি অতি সাধারণ জিনিস লবণ পর্যন্ত অমিল হলো দীর্ঘকাল যাবৎ, অন্তত যতদিন না সমুদ্রপথগুলি বিপজ্জনক মাইন থেকে মুক্ত করা হয় এবং বাণিজ্য-জাহাজগুলি ঐ সমুদ্রপথে যাতায়াতের উপযুক্ত হয়ে ওঠে। দেশবাসী শীতের হাডকাঁপানো কনকনে ঠাণ্ডায় হিহি করতে লাগলো, এবং তারা ঢাকনা দেওয়া ট্রেনেই যাতায়াত করতো ঠিক যেন মুখবন্ধ টিনের কৌটোয় সার্ডিন মাছের মতো।

কিন্তু তাদের সহ্যশক্তি অসাধারণ। তারা নিজেদের ওপর যে বিপদ ডেকে এনেছিল সেজন্যে তারা দারুণ লজ্জিত বোধ করলো, কিন্তু তারা উছলে-পড়া নষ্ট দুধের জন্যে, কিংবা তাদের অদৃষ্টের জন্যে তারা কোনোরকম দুঃখ বা বা শোকতাপ প্রকাশ করলো না। দেশবাসী 'অসহ্যকে সহ্য' করলো এবং দখলদারির গ্লানি ও বহু দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিনযাপন করলো। দখলদারি পরিবেশের অনিবার্য বাস্তব অবস্থার প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গির ফলে, তারা এমনকি তাদের ঐতিহ্যগত সামাজিক মূল্যবোধেরও পতন ঘটালো; দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখযোগ্য—আমেরিকান সেনা ও জাপানিদের সৌভ্রাতৃত্বের কথা। যাই হোক, এই প্রসঙ্গে আরো বলা যেতে পারে যে, এটা কেবলমাত্র একটা সাময়িক পর্যায়; এবং সম্ভবত এটা একটা পরিকল্পিত হিসেবি পদক্ষেপ—যাতে এই সাময়িক অর্থাৎ দখলদারি পর্ব যথাশীঘ্র শেষ হয়; কেননা এই অবস্থার 'বাস্তব মতবাদ' হলো: যদি তুমি তাদের সঙ্গে পেরে না ওঠে, তাদের সঙ্গে 'যোগ দাও'। অতঃপর সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধারের প্রায় ছ' বছরের কম সময়ের মধ্যে, সমগ্র রাষ্ট্রটি, বলতে গেলে ভস্মস্তূপ থেকেই উঠে দাঁড়ালো ঠিক যেন ফিনিক্স পাখির মতোই ('the nation rose, phoenix-like, from its ashes') এবং উন্নতি করলো। এবং আজ সেই রাষ্ট্রটি দুনিয়ায় এক দানবীয় বিরাট অর্থনৈতিক শক্তির স্তরে উন্নীত হয়েছে এবং সেই মর্যাদা অর্জন করেছে।

জাপানে এবং অন্যত্র আমার সুদীর্ঘ অবস্থান কালের মধ্যে, আমি এক বিরাট ও বিশ্বনাটক দেখেছি যার মধ্যে এক দিকে রয়েছে - মিত্রশক্তির দখলদারি দেশগুলিতে সামাজিক অধঃপতন কত নিচে নেমে যেতে পারে তার বহর। অন্যদিকে আমি আরো দেখেছি—সাহসিকতা, দুঃখকষ্ট সহ্য এবং শৃংখলাপূর্ণ কঠোর শ্রমশীলতা কত উঁচুতে উঠতে বা উন্নত হতে পারে উভয়ত অর্থাৎ বৃহত্তম এশিয়ান ভূমিকা পালন এবং বেশি সংখ্যক এশিয়ান 'নাটকীয় কুশীলব' ('dramatis personae')

সরবরাহ—এই উভয় ক্ষেত্রেই অগ্রণীয় ভূমিকা নিয়েছে জাপান।

প্রায় ৩৬ বছর আগে যখন বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয় জাপানের সমূহ পরাজয় ও নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের মধ্যে, একজন জাপানির গড়পড়তা আয় ছিল একজন ভারতীয়ের গড়পড়তা আয়ের চেয়ে মাত্র সামান্য কিছু ভালো। ভারতের প্রায় মহারাষ্ট্র রাজ্যের (৩৭২,০০০ বর্গ কিলোমিটার) মতো আয়তন যুক্ত এই জাপান দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীর সংখ্যা মহারাষ্ট্রের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ (১১৫ মিলিয়ান)। কিন্তু ঐ দেশ যে তার প্রায় সমস্ত সম্পদ হারিয়েছে ১৯৪৫ সনে, এবং যে দেশের নিজস্ব কাঁচামালের উপকরণ / উৎস বলতে গেলে প্রায় কিছুই নেই। একমাত্র ব্যতিক্রম প্রচুর পরিমাণ বিদ্যুৎ এবং সীমাবদ্ধ পরিমাণ কয়লা)— সেই দেশ আজ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দুনিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম ধনী দেশ, অর্থাৎ সর্বোচ্চ ধনী দেশ হিসেবে গণ্য প্রথম আমেরিকার পরেই তার স্থান। এবং জাপানের চলতি অগ্রগতি ও বিকাশ দেখে মনে হয়, শীঘ্রই সে আরো উপরে উঠে যাবে. অর্থাৎ প্রথম স্থান অধিকার করবে—বর্তমান শতক শেষ হবার আগেই।

প্রকৃতপক্ষে. জাপানের 'মোট জাতীয় উৎপাদন' (gross national product) প্রতি ৮ বছর অন্তর প্রায় দ্বিগুণ হচ্ছে, দুনিয়ার অর্থনৈতিক অগ্রগতির ইতিহাসে যা তুলনাহীন। বিশেষজ্ঞরা অনুমান করেন যে, চলতি অগ্রগতির এই হারে—মাথা-পিছু একজন জাপানির গড়পড়তা আয় ১৯৮০-র দশকে একজন গড়পড়তা আমেরি-কানের মাথাপিছু আয়কে ছাড়িয়ে যাবে। এবং যদি এই গতিপ্রকৃতি চলতে থাকে, তবে ১৯৯০-এর দশকে তা দ্বিগুণেরও বেশি হবে। শিল্পশক্তিতে জাপানের নাম ১৯৭৯-৮০ সনে ছিল বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম দেশ হিসেবে তালিকাভুক্ত। এটা বিশ্বাস করা হয় যে, বর্তমানে (১৯৮২ খ্রী.) জাপান পশ্চিম জার্মান ও সোভিয়েত রাশিয়া-কেও ছাড়িয়ে গেছে, এবং তার অবস্থান একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের ঠিক পরেই। একথা বেশ কয়েকটি সূত্র থেকেই শোনা যাচ্ছে যে, জাপানের অর্থনীতি মূলত ভঙ্গুর বা নড়বড়ে, এবং তার এই বিরাট দানবীয় স্তরে উন্নতি সম্ভবপর হয়েছে একমাত্র তার প্রতিরক্ষার খাতে স্বল্প পরিমাণ ব্যয়ের জন্যেই। একথা আরো বলা হয় যে, জাপান সাংঘাতিক রকমের উৎসাহ উদ্দীপনা লাভ করে ১৯৫০ সনের কোরিয়ান যুদ্ধ (Korean war, 1950) এবং পরবর্তী ভিয়েতনাম সংঘর্ষ থেকে।

অনেকেই দাবি করেন, যদি দুটি বৃহৎ সামরিক শক্তি তাদের হাতের সমস্ত তাস একসঙ্গে মেলে ধরে অর্থাৎ তাদের সমস্ত গুপ্ত পরিকল্পনাদি ফাঁস করে দেয়, কিংবা যদি পশ্চিম এশীয় দেশগুলি তাদের তৈল-সংকোচনের নীতি প্রয়োগ করে তৈলবিহীন রাষ্ট্রগুলির ওপর অর্থাৎ চাপ দিয়ে কিছু আদায় করতে চায়, জাপান তাহলে অচল হয়ে যাবে এবং উপোস করে থাকবে। এসব গল্পকথা খুব বেশি রকম অতিরঞ্জিত হতে পারে। জাপান তার প্রয়োজনীয় কাঁচামালের জন্যে দারুণভাবে নির্ভরশীল অন্য দেশের ওপর ; তবে অন্য অনেক দেশও তাই করে অল্পবিস্তর, তার মধ্যে

পশ্চিম জার্মানিও আছে। এটা প্রধানত কমবেশি পরিমাণগত ব্যাপার, এবং জাপানের মতো দেশের পক্ষে—যে দেশের উন্নতি করার দক্ষতা প্রচণ্ড রকমের, সে দেশের পক্ষে অনেকেই যে বিপদের আশংকা করে থাকেন, তা প্রায় না হবারই কথা, অর্থাৎ বিপদ যে হবেই তার কোনো কথা নেই। অবশ্য, দুটি বৃহৎ শক্তির মধ্যে নিউক্লিয়ার যুদ্ধগত সংঘর্ষের ক্ষেত্রে, সম্ভবত কোথাও কোনো কিছুই আর অবশিষ্ট থাকবে না, এবং তাহলে সেক্ষেত্রে কোনো প্রশ্নই উঠবে না—কে এক নম্বর, আর কেই বা একশো নম্বর। তখন তার একমাত্র ভবিষ্যৎ—সবকিছুই শূন্যে পরিণত হবে।

কিন্তু তাহলে কিসের জোরে 'জাপানের এই স্পন্দন'—এই প্রশ্নটি এখন প্রায় একটি মামুলি বুলি হয়ে দাঁড়িয়েছে। জবাবটি দীর্ঘ হতে পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রে তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকাও দেওয়া যায়। দেখা যাবে, এই জবাবের তালিকায় আছে—জাপানের সাংগঠনিক দক্ষতা, যার অন্তর্ভুক্ত হলো তার যৌথ শিল্পগত ও অর্থনৈতিক শক্তি। একথা বোঝা কিছুটা মুশকিল, বিশেষত যারা জাপানের ঐতিহ্য-গত মনস্তত্ত্ব ('traditional psychology') কখনো বোঝার চেষ্টা করেনি তাদের পক্ষে। আমি সবিনয়ে এবিষয়ে যা বলতে চাই, অর্থাৎ সাবধান করে দিতে চাই তা হলো, যেসব কারণ ক্ষেত্র বিশেষে গুণ হয়ে উঠতে পারে, তা-ই আবার পরিবর্তিত অবস্থায় দোষ হয়ে দেখা দিতে পারে; এবং যা ঘটেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের যোগদানের ঠিক পূর্বমুহূর্তে—সেটাই হলো এই বিষয়ের ক্ষেত্রে একটা উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

এই অবস্থার পটভূমিকায় একথা বলা যেতে পারে, যে কারণে জাপানের প্রাণ-স্পন্দন জেগেছিল তা হলো মূলত তার দেশবাসী জনসাধারণ। এক্ষেত্রে আমরা এমন একটি দেশের দেখা পাই—যে দেশটি মূলত এক মহান একতার গুণবিশিষ্ট। মূলত জাপানবাসীরা সর্বক্ষেত্রেই কাজ করে এক সংহত শক্তি রূপে—অন্তত যেসব ক্ষেত্রে দেশের যৌথ স্বার্থের প্রশ্ন জড়িত। দেশের ভালোর জন্যে অর্থাৎ দেশের স্বার্থে, গড়পড়তা জাপানিরা তার ব্যক্তিগত আরাম ও সুখ-সুবিধা বর্জন করতে পারে। এই গুণাবলী তার মধ্যে মজ্জাগত রয়েছে কয়েক শতাব্দীরও বেশিকাল যাবৎ। বিশেষ করে বিগত ১০ বা ১২ দশক সময় জুড়ে, এবং এটা জাতীয় স্তরে বিশেষ-ভাবেই তাৎপর্যপূর্ণ, বিশেষত জাপানের 'বুশিডো' (Bushido, the way of the warrior) ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ—যে ধারণার সূচনা হয় সুপ্রাচীন 'সামুরাই' বা রোনিন ('Samurai' or 'Ronin') মতবাদের সময় কালেই।

জাপানিরা কোনো বিষয়ের খুঁটিনাটি দিকের প্রতি বিশেষ মনোযোগী, তাদের মধ্যে রয়েছে গবেষণা ও আবিষ্কারের দিকে প্রকৃতিগত একটা স্বাভাবিক ঝোঁক। এবং তাদের লক্ষ্য হলো, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রাপ্ত জিনিসপত্রের গুণগত মান আরো উন্নত করার দিকে। কয়েকজন পর্যবেক্ষক এ বিষয়ে বলেছেন যে, জাপানিরা সর্বদাই ছোট-খাটো ব্যাপারেও বিশেষ আগ্রহী ও পারদর্শী। কিন্তু তাদের মধ্যেও এক ধরনের

'একচোখা দৃষ্টি' (blinker approach) দেখা যায়, যদিও তাদের অজ্ঞাতসারেই তা হয়েছে, তবুও তার ফলে সমালোচকরা তাদের সম্পর্কে বলার সুযোগ পেয়েছে যে, তারা 'বড় জিনিসের মধ্যেও ছোট হবার' ক্ষমতা রাখে। তাদের এই দুর্বলতা মনে হয় যুদ্ধের পরেই তারা অতিক্রম করতে পেরেছে। তারা আর যুদ্ধ চায় না, যদি তারা একটি যুদ্ধ কোনো রকমে এড়াতে পারে।

দৈনন্দিন জীবনে জাপানিরা তাদের নিজস্ব ঐতিহ্যের বিষয়ে একটা শিল্পচেতনার পরিচয় দেয়, এবং সামাজিক নিয়ম-শৃংখলার বিষয়েও তারা ভালো রুচির পরিচয় দেয়। তারা সর্বপ্রকার প্রথা ও লোকাচারের বিষয়ে কদর্যতা এড়িয়ে চলে। ফলে, তাদের মধ্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি একটা স্বাভাবিক আগ্রহ ও আবেগ গড়ে উঠেছে, তাদের মধ্যে রয়েছে সংগীত, চিত্রশিল্প এবং অন্যান্য চারুশিল্পের প্রতিও স্বাভাবিক আগ্রহ।

ইদানিং কিছুকাল যাবৎ, আমি প্রত্যেক বছর কয়েক মাস ভারতে এবং বাকি অধিকাংশ সময় টোকিও শহরে বাস করেই কাটাচ্ছি। ফলে আমার মনে হয়, আমি এমন একটা সুবিধাজনক অবস্থায় আছি যেখান থেকে ভারতের অবস্থা দেখার সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে জাপানে কী হচ্ছে তার সঙ্গে মনে মনে তুলনা করে দেখা সম্ভব হচ্ছে। এই উপমহাদেশের তুলনায় ভারত এক বিশাল দেশ, তার রয়েছে প্রচুর জনশক্তি এবং উচ্চস্তরের ব্যক্তিগত দক্ষতা ও ক্ষমতার আধিক্য। বুদ্ধি-বিবেচনা ও সামর্থ্য-ক্ষমতার দিক থেকে গড়পড়তা ভারতীয়— দুনিয়ার যে কোনো দেশের মানুষের থেকে কোনো অংশেই কম নয়, বরং তার স্থান বেশ উঁচুতেই। কিন্তু হায়, যেখানে যৌথ উদ্যোগের প্রয়োজন, বিশেষত জাতীয় অগ্রগতির ক্ষেত্রে, সেখানে আমরা তাদের তেমনভাবে সাড়া দিতে দেখি না, যেমন জাপানিদের দেখা পাই। মনে হয়, আমাদের মধ্যে শৃংখলাবোধের অভাব রয়েছে – যে একতা শৃংখলা যৌথ উদ্যোগ ইত্যাদি জাতীয় উন্নতি অগ্রগতির ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রয়োজন, এবং তার ফলেই আধুনিকতার বিচারেও কোনো দেশের প্রকৃত উন্নতি ও দ্রুত উন্নতি করা সম্ভব – যাতে সেই দেশ মহান এক দেশে পরিণত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, আমাদের দেশের শিল্পক্ষেত্রের অবস্থা বা পরিস্থিতির কথা উল্লেখযোগ্য।

আমরা প্রচুর পরিমাণে জনশক্তির অপচয় করে থাকি – ধর্মঘট, ধীরে-চলো এবং ঐ জাতীয় অন্যান্য কাজের ফলে, – যার পরিণাম হলো উৎপাদন হ্রাস, ধীরগতি কাজের ধারা, এবং অভীষ্ট উন্নতির লক্ষ্যমাত্রার মন্দ সূচনা অর্থাৎ উন্নতি/ অগ্রগতির পথরোধ। আমি অবশ্য একথা বলি না যে ধর্মঘট করায় কোনো স্বাধীনতা থাকবে না, কিংবা জাপানে কোনো ধর্মঘট বা অন্যান্য শ্রমিক সমস্যা ইত্যাদি কিছু নেই। আমি সর্বপ্রথমেই যা বলতে চাই তা হলো, জাপানে এ ধরনের সমস্যাদি খুব সামান্যই, কারণ সেখানকার প্রশাসকরা – বেসরকারি বা সরকারি যে স্তরেই হোক –

আমরা যেভাবে পরিকল্পনা করে থাকি তার চেয়ে ভালোভাবেই পরিকল্পনাদি করে থাকেন, এবং তেমন সব অবস্থা ও পরিস্থিতি এড়িয়ে চলেন—যেসব অবস্থা ও পরিস্থিতি যুক্তিসংগত ভাবেই আগে থেকেই অনুমান করা যায় ও এড়িয়ে চলা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, ভারতে আমাদের কেন একটা জাতীয় বেতন-নীতি থাকবে না,—যা থাকলে অন্তত বেতন-বৈষম্য জনিত এবং আনুষঙ্গিক ছোটখাটো নানা কারণ জনিত আকস্মিক ও সচরাচর সংঘটিত ধর্মঘটগুলি এড়ানো সম্ভব হতো। দ্বিতীয়ত—যদি কর্মবিরতির মতো ঘটনা প্রকৃতপক্ষে ঘটেই, সেক্ষেত্রে জাপানে দেখা যায় কর্মকর্তা ও কর্মীদের মধ্যে স্বভাবতই একটা আপোষ-মীমাংসায় পৌঁছানো সম্ভব হয়—যার ফলে উৎপাদনের ক্ষেত্রে অযথা দেরি বা সময় নষ্ট হয় না।

অন্যান্য অনেক কিছুর মধ্যে যেসব বিষয়ে এক্ষেত্রে জাপানে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হলো—ক) কর্মবিরতি কালে কেউই সাধারণত সম্পত্তি নষ্ট বা ধ্বংস করে না, কারণ উৎপাদন বজায় রাখা এবং তার অঙ্গীভূত অন্যান্য সুবিধা-সুযোগ ইত্যাদি সংরক্ষণের অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয় হিসেবেই সকলে চিন্তা করে, যাতে বিবাদ-বিতর্ক মিটে গেলে স্বাভাবিক উৎপাদন আবার চালু করা সুবিধে হয় ; খ) বিবাদ সংঘর্ষ যে মুহূর্তে সন্তোষজনক ভাবে মিটে যায়, তখনই সব কিছুর লক্ষ্য হয় বিবাদের পূর্বে যে অবস্থা ছিল ঠিক সেই অবস্থায় ফিরে যাওয়া, এবং অনিবার্যভাবেই যে সময় নষ্ট হয়েছে তা পুষিয়ে দেওয়া হয় অতিরিক্ত কাজ করে ; গ) কাজের ক্ষেত্রে 'ধীরে চলো' বলে জাপানে বোধ হয় কিছুই নেই ; ঘ) 'সময়ের নিয়মানুবর্তিতা' বিশেষত কাজের সময়ে তা কঠোরভাবে মেনে চলা হয়, এবং কোনো অফিসেই কাজের সময়ে 'বাজে গল্প' করে সময় নষ্ট করা হয় না ; ঙ জাপানের সর্বস্তরেই শ্রমের মর্যাদাবোধ বিশ্বজনীন বোধের সঙ্গে যুক্ত ; চ) কোনো কাগজপত্রই পিওনের অভাবে এক টেবিল থেকে আরেক টেবিলে যাওয়া-আসা আটকে থাকে না, কেননা সেখানে পিওনের-রাজত্ব বলে কিছুই নেই।

শিল্পগত শৃংখলা যেমন তাদের জাতীয় শৃংখলারই অঙ্গস্বরূপ, ঠিক তেমন নাগরিক-বোধও জাপানের যৌথ সমাজ-জীবনের অনিবার্য ও অবিচ্ছেদ্য অংশ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, স্বাস্থ্যরক্ষার কথা। টোকিওর জনসংখ্যা ১৩ মিলিয়ানেরও বেশি। এখানকার বাতাস দূষণের প্রশ্নটি অবশ্যই সাংঘাতিক বিষয়, শিল্পগত অগ্রগতির পথেও তা অনিবার্য একটি প্রধান ব্যাপার ; কিন্তু তাই বলে এখানে দুর্গন্ধযুক্ত কোনো নদী বা হ্রদ, কিংবা বস্তি-ঝুপড়ি ইত্যাদি কিছুই নেই। কিন্তু আমাদের ভারতে কেন এসব থাকবে ? এর একমাত্র যুক্তি যা হতে পারে, তা হলো প্রশাসনিক ঢিলেমি দুর্বলতা এবং অকেজো পরিকল্পনা ইত্যাদি ; অথচ এদেশের মানুষের মধ্যে ক্ষমতা ও দক্ষতার কোনো অভাব নেই। আসলে যদি ইচ্ছে থাকে, কাজটা তাহলে নিশ্চয়ই কঠিন হয়ে দেখা দেয় না। প্রত্যেক ঘরের বাসিন্দাকে বা ভাড়াটিয়াকে তার নিজের ঘরের ও তার চারপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব দাও ; প্রত্যেক

পৌরসভাগুলিকে ঢাকা-গাড়িতে করে সংশ্লিষ্ট এলাকায় ময়লা পরিষ্কারের দায়িত্ব দাও, এবং যেখানে-সেখানে ময়লা ফেলা ও বস্তি-ঝুপড়ি ইত্যাদি তৈরি বন্ধ করার দায়িত্ব দাও তাহলেই দেখবে ঠিক এই অবস্থার প্রতিকার হবে। গ্রামগুলির উন্নতি করো, যাতে প্রত্যেকেই শহরে গিয়ে ভিড় না বাড়ায়। শিল্প-কারখানা ও অফিসগুলি চারদিকে ছড়িয়ে দাও যাতে শহরগুলির অবনতি ও অপমৃত্যু—এড়ানো যায়। এমন পৌরসভা স্থাপন করো যারা কাজ করে।

একথা বলা অনর্থক যে, সমস্যাগুলো বিরাট এবং সমাধানের পক্ষে দারুণ অসুবিধাজনক। অবস্থা মোটেই তা নয়—অন্তত যদি নেতারা বা উপরওয়ালারা তাঁদের নেতৃত্বের ভূমিকা দায়িত্বের সঙ্গে ঠিকমতো পালন করেন। আমাদের রাজনীতিকরা কি সততার সঙ্গে বলতে পারেন—তাঁরা উপযুক্তভাবেই নিঃস্বার্থ? এখানেও আবার, আমাকে যেন ভুল বোঝা বা আমার কথার ভুল ব্যাখ্যা না করা হয়। আমি বলছি না যে জাপানে কিংবা অতি উন্নত অন্যান্য দেশগুলিতে প্রত্যেকেই দেবদূত বা সততায় সাধুপুরুষ। এরকম আদর্শ পরিস্থিতি বিশ্বের কোথাও দেখা যায় না, এবং হয়তো একমাত্র স্বর্গেই দেখা যেতে পারে। খোদ প্রকৃতিই ত্রুটিহীন নয়, অর্থাৎ তার মধ্যেই রয়েছে খুঁত বা দুর্বলতা। কিন্তু তা খুবই সামান্য এবং তা দেখা যায় কদাচিৎ। জাপানের ক্ষেত্রেও তাই। এখানেও ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা যায় খুব সামান্যই: ফাইল আটকে রাখা, আইন অনুসারে কাজকর্ম বা কর্তব্যপালন না করাকে ছোট করে দেখা, দুষ্কর্মে সমর্থন বা সহযোগিতা করা ইত্যাদি কখনো তুচ্ছ বা অবহেলা করা হয় না, এবং শাস্তি ও উপযুক্ত পরিণামের হাত থেকে তাকে রেহাই দেওয়া হয় না।

এসব ঘটনা অনেকের কাছেই 'স্বাভাবিক' বা খুব বেশি হলে 'সামান্য' বা তুচ্ছ বলে মনে হতে পারে। কিন্তু মানুষ হিসেবে জাপানিরা তা মনে করে না। তারা এসব ঘটনাকে বিপজ্জনক বলে মনে করে; এবং যথাসময়ে উপযুক্তভাবে দমন করতে না পারলে, দুষ্টক্ষতের মতো ছড়িয়ে পড়ে অস্থিমজ্জা পর্যন্ত, যখন বড় রকমের অস্ত্রচিকিৎসা প্রয়োজন যার অর্থ সংশ্লিষ্ট অংশ কেটে বাদ দেওয়া, এবং ঘটনাক্রমে সেটাই হয়তো এসব ক্ষেত্রে একমাত্র প্রতিকার বলে মনে হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, এসবের অধিকাংশ ক্ষেত্রে, শাস্তিমূলক প্রতিষেধকই মানুষের নৈতিক চেতনায় বদ্ধমূল সংস্কারের মতো কাম্য বলেই মনে হয়। তার ফলে তাদের 'মুখে কালি' পড়ে—যেটা শাস্তির ক্ষেত্রে সবচেয়ে খারাপ বলেই মনে হয়। বিশেষত কোনো লোক যদি জাতীয় স্তরে ভালো কাজও করে থাকে, তার পক্ষেও একথা খাটে।

জাপানেও অনেক লোকের বিরুদ্ধেই অনেক রকম অভিযোগ এসেছে। এবং সব ক্ষেত্রেই দক্ষতা ও যোগ্যতার সঙ্গেই সে-সব অভিযোগের তদন্ত হয়েছে, এবং অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু ভারতে আমরা কি গুরুত্ব সহকারে বড় বড় অপরাধী যাদের বিরুদ্ধে যুক্তিসংগত সন্দেহ আছে বা দেখা দেয়, তাদের বিরুদ্ধে

আনীত অভিযোগের তদন্ত করে থাকি বা প্রমাণের চেষ্টা হয়ে থাকে, না তাদের বিরুদ্ধে যত সব কলঙ্কজনক ঘটনার খবর ইত্যাদি আমরা কার্পেট চাপা দিয়ে থাকি? সমস্ত 'নেতারাই' আন্তরিকভাবেই এসব কথা ও এই ধরনের অন্যান্য কথা নিজেদের কাছে জিজ্ঞাসা করে দেখুন। এবং তাঁরা মনে করে দেখুন তাঁরা কী করে থাকেন; তাঁদের শিষ্য-সাকরেদরাও স্বভাবতই তাঁদের অনুকরণ করবেন। এক্ষেত্রে একটি মালয়ালাম প্রবাদ উল্লেখযোগ্য: যদি শস্যক্ষেত্রের বেড়াটাই শস্য খেতে শুরু করে, তাহলে তুমি গবাদি পশুকে দোষ দিতে পারো না; অর্থাৎ যেই রক্ষক সেই ভক্ষক হলে কি আর করবে।

এই ধরনের জাতীয় চেতনাবোধ, যার কথা আমি বললাম তা রাতারাতি অর্জন করা যায় না। ভারতে, সংশ্লিষ্ট চেতনাবোধ ইত্যাদি অধিকতর জটিল, এবং ক্রমশ আরো জটিল হয়ে উঠছে। কারণটা হলো আমাদের দেশের দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসন এবং পরবর্তীকালে সেই ধারারই বিষাক্ত কুফল। এই অবস্থার প্রতিকার করতে অর্থাৎ এই কুফলের হাত থেকে রেহাই পেতে এবং আমাদের সকলকে সঠিক পথে চালিত করতে, বহু বছর সময় লেগে যাবে। কিন্তু আমরা কি সেই পথে প্রচেষ্টা শুরু করেছি, যদিও আমরা তিন দশকেরও বেশি কাল আগেই শৃংখলমুক্ত হয়েছি? যদি সেই প্রচেষ্টা শুরু না করে থাকি, তাহলে অন্তত এখনই শুরু করে দেওয়া যাক, যাতে আমরা সেই সময়ের ব্যবধানগত ত্রুটি দূর করতে পারি।

উপসংহারে আমি এখানে ভারত-জাপান রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক সহযোগিতার (Indo-Japan Political and Economic Cooperation) অবস্থার কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করতে চাই। এক্ষেত্রে আমি কিছু ধরনধারণ প্রত্যক্ষ করেছি যুদ্ধের আগে ও যুদ্ধের সময়ে, এবং বিশেষত আমি যখন ভারত সরকারের সঙ্গে কাজ করছিলাম ভারত ও জাপানের মধ্যেকার চুক্তিসূত্রে (Indo-Japan Treaty)। কিন্তু আমি আজ যা দেখছি তা আর যাই হোক, সেদিনের সঙ্গে এক নয় বা তার সঙ্গে কিছু মিলছে না। আমি মনে করি, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ভারত জাপানের কাছে ঋণী। ঘটনাক্রমে যাই হোক না কেন, বৃহত্তর পূর্ব-এশিয়া সংগ্রাম (Greater East Asia War)—জাপান যা শুরু করেছিল, তার ফলেই ভারতের এবং অন্যান্য এশিয়ান দেশের (আফরিকান ও অন্যান্য দেশের) স্বাধীনতা লাভ ত্বরান্বিত হয়েছিল—বিশেষত যেসব দেশ তখনো পর্যন্ত ঔপনিবেশিক শাসনাধীন ছিল। কিন্তু ভারত সেকথা ভোলেনি—অন্তত সেকথা পরিষ্কার হবে, আমি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যেসব কথা এই বইয়ে বলেছি তা থেকে। ভারত-জাপান দ্বিপাক্ষিক শান্তি ও মিত্রতার চুক্তিকালে (Indo-Japan Bilateral Treaty of Peace and Amity), ভারত জাপানের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মধ্যে তাকে বেশ সদাশয়তা ও সৌজন্য

সহকারেই গ্রহণ করেছে। তৎকালীন জাপানি নেতৃবৃন্দ যাঁরা বলতে গেলে আমারই সমসাময়িক ছিলেন, তাঁরা এসব কথা ভালোভাবেই জানতেন, এবং তাঁরা ভারতের এই সহৃদয় দৃষ্টিভঙ্গির জন্যে কৃতজ্ঞ ছিলেন।

যাই হোক, যেসব কারণের জন্যে সম্ভবত জাপান ও ভারত উভয়পক্ষই কৃতিত্বের দাবি রাখে, সে বিষয়ে আমি না ভেবে পারি না যে, এই ভারত-জাপান দ্বিপাক্ষিক শান্তি ও মৈত্রী চুক্তিকালে প্রাথমিক ভাবে যে সহযোগিতার আশা ও উৎসাহের সঞ্চার করেছিল, কার্যত সেই আশা পূরণ হয়নি। জাপান, বিশেষত তার বিস্ময়কর অর্থনৈতিক বিকাশের পরে, মনে হয় না সে উভয় দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ সংক্রান্ত কল্যাণকর সহযোগিতার ক্ষেত্রে বিশেষত ব্যবসা-বাণিজ্য, টেকনিক্যাল ও অন্যান্য ক্ষেত্রে—উন্নতি/অগ্রগতির জন্যে তেমন যথেষ্ট গুরুত্বসহ মনোযোগ দিচ্ছে। আমার মনে হয়, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা-ছত্র (US Umbrella) যার নিচে থাকাটাই জাপান নিজে থেকেই বেছে নিয়েছে বা ভালো বলে মনে করেছে, সম্ভবত তার ফলেই ভারত-জাপান সম্পর্কের প্রয়োজনীয় উন্নতির ক্ষেত্রে কিছুটা অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। জাপান ASEAN ব্যাপারেই বেশি পরিমাণে আগ্রহ দেখিয়ে থাকে, কিন্তু ভারতের দিকে ভ্রূকুটিপূর্ণ দৃষ্টিতেই তাকায় বলে মনে হয়। আমি কোনো রকম দোষত্রুটি দেখার চেষ্টা করছি না; তবে একথাও বলা যেতে পারে যে, ভারতও এ ব্যাপারে কিছু পরিমাণে দায়ী, অর্থাৎ ভারত-জাপান দ্বিপাক্ষিক শান্তি ও মৈত্রী চুক্তিকালে মিঃ কে. কে. চেট্টুর যে ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, ভারত তার ওপরে আর কিছু গড়ে তুলতে তেমন উপযুক্তভাবে কোনো চেষ্টাই করেনি।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, উভয় দেশের বিদেশ-নীতির মধ্যেই মতভেদের কিছু কিছু বীজ বা ক্ষেত্র রয়েছে। জাপান স্পষ্টতই আমেরিকা পরিচালিত পশ্চিম শক্তিজোটের শরিক, যেক্ষেত্রে ভারত হলো জোট বহির্ভূত একটি নিরপেক্ষ দেশ: তার সঙ্গে আছে আরো প্রায় একশোটি অন্যান্য দেশ। ভারতের অবশ্যই জাপানের নীতি-নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোনো অধিকারই নেই, ঠিক যেমন জাপানেরও উচিত নয় ভারতের নীতি-নির্ধারণ করার চেষ্টা করা। কিন্তু আমি কয়েকটি ঘটনার কথা মনে করতে পারি, যেসব ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যেমন জাপান তেমন পাল্টাভাবে ভারতও অবস্থার সুযোগ নিতে পারতো, অন্তত তারা যা করেছে তার থেকে অন্য রকম কিছু করতে পারতো।

আমার যতদূর মনে পড়ছে, ভারত যখন ১৯৬২ সনে চীন কর্তৃক আক্রান্ত হয়, আমার মনে হয় না ভারতের অন্যান্য বন্ধু দেশ যেমন করেছে, জাপান তেমনভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তার উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। তার প্রতি ভারতের বন্ধুত্বের স্বীকৃতি জাপানের দিক থেকে এভাবেই অস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঠিক একইভাবে, যখন প্রেসিডেন্ট নিকসন যুক্তরাষ্ট্রের ৭ম নৌবহরের পরমাণু পরিচালিত আমেরিকান বিমানবাহী

যুদ্ধজাহাজ 'এণ্টারপ্রাইজ'কে (জনশ্রুতি, 'এণ্টারপ্রাইজ' জাপানি সমুদ্রপথে ইয়োকোসুকা ঘাঁটি থেকেই নিযুক্ত হয়, এবং তাতে এমনকি আণবিক বোমাও ছিল) বঙ্গোপসাগরে পরিচালনার আদেশ দিয়েছিলেন ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধকালে ভারতকে হুমকি দিতে, তখনো ভারতবাসী বিস্মিত হয়েছিল এই দেখে যে—কোনো রকমই প্রতিবাদই ওঠেনি জাপানের দিক থেকে।

অতি সম্প্রতি, জাপানের বিদেশমন্ত্রী আইতো (Ito) ১৯৮০ সনে ভারতে এক সফরকালে, মনে হয় নয়াদিল্লির ভারত সরকারকে এমন কিছু বলেন যার অর্থ : ভারতের কামপুচিয়া-নীতি জাপানের পছন্দ নয়। জাপানের অবশ্যই ভারতের যে-কোনো নীতির সঙ্গে একমত না হবার অধিকার আছে, কিন্তু আমি মনে করি না —ভারতের বিদেশ-নীতির প্রশ্নে সেকথা জাপানের বিদেশমন্ত্রীর পক্ষে নয়াদিল্লি এসে বলার অন্তত তিনি যা করেছেন তা করার কোনো দরকার ছিল। সম্ভবত এক্ষেত্রে অন্যান্য মহল থেকে কোনো রকম চাপ ছিল ; আবার সম্ভবত এমনও হতে পারে যে এটা এশিয়ায় ও বিশ্বের ক্ষেত্রে জাপানের দিক থেকে ক্রমবর্ধমান অর্থ নৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশের দিক থেকে একটা লোক-দেখানো ব্যাপার মাত্র। অর্থাৎ একটা নিরপেক্ষ অবস্থার ভাবও বজায় রইলো, আবার সমালোচনারও মুখ বন্ধ করা হলো। এসব কথা লেখার সময়ে, পাকিস্তানকে আমেরিকার দিক থেকে আবার অস্ত্রসজ্জিত করার প্রচেষ্টার বিষয়েও বহু কথাবার্তা হয়েছে। এক্ষেত্রে কেউ আশা করতে পারেন যে, এ বিষয়ে অর্থাৎ ভারতের পক্ষে কোনো রকম ক্ষতিকর প্রশ্নে জাপান কোনো পক্ষ অবলম্বন করবে না।

জাপানের প্রতি ভারত সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভারতের প্রতি জাপানের মনোভাব, বিশেষত ভারতের সঙ্গে যৌথ শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে সহযোগিতার প্রশ্ন খুবই কাম্য, অথচ তার কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। এ ক্ষেত্রেও দুটি বৃহৎ এশিয়ান শক্তির কথা উল্লেখযোগ্য। তার একটা হলো জাপান, টেকনোলজিতে যে দেশ অত্যন্ত উন্নত অথচ যার কাঁচামালের একান্তই অভাব ; আরেকটি দেশ ভারত, যার কাঁচামালের প্রাকৃতিক উৎস রয়েছে বিশাল, যে দেশ জাপান থেকে কিছু পরিমাণ টেকনোলজি আমদানি করলে এবং নিজের শক্তি-সামর্থ্য অনুসারে সামঞ্জস্যসাধন করতে পারলে তার ফল হতো কার্যকরীভাবেই বিরাট। কিন্তু বিষয়টি যেভাবেই হোক, ঠিকমতো সংঘটিত হচ্ছে না। ভারতে আমার বন্ধুরা আমাকে বলেছেন যে, কোনো রকম পারস্পরিক সৌহৃদ্যমূলক উদ্যোগের অভাবই জাপানের দিক থেকে তার টেকনোলজি সংক্রান্ত জ্ঞানবিদ্যার ভাগ ভারতকে দিতে অনিচ্ছুক করে তুলেছে। ভারতে জাপান তারই নিজস্ব উদ্যোগেই কোনো সংস্থা গড়ে তুলতে চায়,—এক্ষেত্রে যেমন তারা করতে সমর্থ ও সফল হয়েছে ব্রাজিল, মেকসিকো, এবং এমনকি খোদ আমেরিকায় এবং অন্যান্য কয়েকটি দেশে।

আমার মনে হয় জাপানের মনে রাখা উচিত, ভারত একটি উন্নতিশীল দেশ—

যে তার দেশের ভিতরে শিল্পগত উৎপাদনের ক্ষেত্রে অন্য কোনো বিদেশি শক্তির নিয়ন্ত্রণ/কর্তৃত্ব কিংবা স্বাধীন শিল্পোৎপাদন সংস্থার দাবি মেনে নিতে পারে না।

আমাকে বলা হয়েছে যে, জাপানের দিক থেকে একমাত্র ভারতের কাছেই তার টেকনোলজি সংক্রান্ত জ্ঞানবিদ্যা বিক্রয়ের প্রশ্ন ওঠে, তখন তার যে মূল্য ধরা হয় সেটা খুবই চড়াহারে। আমি আশা করি এটা ঠিক নয়; যদি তা হয়, তাহলে জাপান নিশ্চয়ই এক্ষেত্রে প্রত্যাশিত সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে তা করেনি।

আমি আশ্চর্য হয়েছি কয়েকটি উপলক্ষে এই দেখে যে, ভারতও এক্ষেত্রে হয়তো ব র্থ হয়েছে, অর্থাৎ সেও কঠোর নিষ্ঠা ও মিলিত চিন্তা-ভাবনা ও পরিকল্পনা করতে পারেনি—ভারত-জাপান সহযোগিতা চালু রাখার প্রশ্নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং পারস্পরিক স্বার্থ সংক্রান্ত কাজগুলির রূপায়ণ করতে। 'এড ইনডিয়া কনসোর্টিয়াম' (Aid India Consortium) সংস্থার মাধ্যমে বা অন্য কোনো ভাবে জাপানের কাছ থেকে কিছু পরিমাণ অর্থনৈতিক সাহায্য বা ঋণ পাওয়াটাই যথেষ্ট নয়। তার দ্বারা ভারত-জাপান সুসম্পর্ক বা সহযোগিতা বজায় রাখার পরিকল্পনা ঠিকমতো কার্যকরী হয় না—যাকে অন্তত স্থায়ী বলে গণ্য করা যেতে পারে। আমাদের অবশ্যই এর চেয়ে, অর্থাৎ 'অ্যাড হক' ভিত্তিতে কিছু পরিমাণ সাহায্য এবং ছোটখাটো পরিকল্পনা ভিত্তিক কিছু খুচরো সাহায্য প্রাপ্তিতেই সন্তুষ্ট থাকার পরিবর্তে, আরো বেশি কিছু করতেই হবে।

কিন্তু জাপান ও ভারতের উচিত নিজেদের মধ্যে আপোষ মীমাংসার পথে কাজ করা আরো কোনো কার্যকরী ভালো রকম ব্যবস্থার পথ সন্ধান করা—যা তাদের উভয়ের পারস্পরিক স্বার্থযুক্ত সম্পর্কের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে— যে পথের প্রতি মিঃ কে. কে. চেট্টুর, ড. রাধাবিনোদ পাল, মিঃ শিনতারো রিয়ু, মিঃ ইয়াসাবুরো শিমোনাকা এবং অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ তাঁদের অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই উভয় পক্ষেই বহু জ্ঞানীগুণী ও শুভাকাংক্ষী মানুষ আছেন—যাঁরা আমাদের আশ্বস্ত করতে পারেন, অন্তত যেসব নেতৃবৃন্দের কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি, তাঁরা সমাধিস্থ হয়েও কখনোই উভয় দেশের মধ্যে সংঘটিত ঘটনাবলীর দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারবেন না। আমি আশা করতে পারি যে, ভারত-জাপান আদান-প্রদানের সম্পর্ক সর্বক্ষেত্রেই এমনভাবে গড়ে উঠবে যাতে উল্লিখিত উভয়পক্ষেরই ঐ সমস্ত এবং অন্যান্য অসংখ্য বিশিষ্ট মানুষদের আত্মা সর্বদাই শান্তিলাভ করবে।

পরিশিষ্ট—১

ক. কয়েকটি ব্যাখ্যামূলক শব্দার্থ :

১. বুশিডো (Bushido) ॥ সাধারণ ভাবে 'বুশিডো' কথাটির অর্থ : যোদ্ধার ভাব বা ধরনধারণ। এটা হলো একটা 'আচরণবিধি', যার মূলকথা হলো—ক) ব্যক্তিগত মর্যাদা ও বীরত্বের উচ্চ ধারণা ; খ) স্বদেশের জন্যে গভীর ভালোবাসা, যে দেশের স্বার্থে ব্যক্তি যে-কোনো রকম স্বার্থত্যাগে এমনকি প্রয়োজন হলে তার জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকবে ; গ) কোনোরকম পাপকর্মের জন্যে অনুতাপ, এবং সেই ভুল আর না করার জন্যে দৃঢ় সংকল্প ; এবং তার জন্যে আত্ম-প্রায়শ্চিত্তকরণ। এমনকি প্রয়োজন হলে আনুষ্ঠানিক 'হারাকিরি' (নিজের পেট চিরে মৃত্যুবরণ) করে আত্মহত্যা পর্যন্ত করবে, যদি সেই পাপকর্ম সাংঘাতিক রকমের হয় ; ঘ) যার সেবারত, সেই প্রভুর প্রতি এবং অবশ্যই সম্রাটের প্রতিও প্রশ্নাতীত আনুগত্য থাকবে।

এই 'বুশিডো'র ধারণা বা শিক্ষা জাপানি সমাজে চলে আসছে কয়েক শতাব্দী যাবৎ, এবং এই শিক্ষা সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে ছোটবেলা থেকেই দেওয়া হয়। এর ফলে সমাজভুক্ত ব্যক্তি তথা সমাজের মধ্যে কিছু পরিমাণে সৈনিকসুলভ নিয়ম-শৃংখলার ট্রেনিং-এর কাজ হয়ে যায়। এটা ভালো কিংবা মন্দ একথা বলা মুশকিল : এই শিক্ষার ভালো-মন্দ দুই দিকই আছে। এই শিক্ষার চরম শৃংখলার ফলে সমাজে আধুনিক পথে দ্রুত অগ্রগতি আনা সম্ভব হয়েছিল, বিশেষত উনিশ শতকের শেষের দিকে 'মেইজি পুনরুজ্জীবন'-এর (Meiji Restoration) শুরুর কাল থেকে। অপরপক্ষে, এই শিক্ষাকে দোষ দেওয়া হয়—জাপানে সমরবাদের অভ্যুত্থানের জন্যে যেসব কারণ দায়ী তার মধ্যে অন্যতম একটি বলে, এবং যে সমরবাদের ফলে জাপান যুদ্ধের পথে পরিচালিত হয় ; কারণ এই 'বুশিডো' শিক্ষার ফলেই ব্যক্তির মধ্যে 'যুদ্ধকামী ও সম্প্রসারণবাদী' চিন্তাভাবনার (belligerency and expansionist ideas) যৌথ মনোভাব গড়ে ওঠে—ব্যক্তিগত চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতাও লোপ পায়, এবং ঘটনাক্রমে তার ফলেই দেশের শোচনীয় পরাজয় ঘটে ১৯৪৫ সনে। —[দ্রষ্টব্য, অধ্যায় ১]

২. রোনিন (Ronin) ॥ একজন 'রোনিন'কে সাধারণত বর্ণনা করা হয় একজন 'সামুরাই' (যোদ্ধা) হিসেবে—সাময়িকভাবে যার সেবা করার মতো নির্দিষ্ট কোনো প্রভু নেই। ঐতিহাসিক ভাবে এই ধারণার সূচনা/সংযোগ দেখা যায় 'এডো'

যুগে (Edo Period, 1600–1867) সংঘটিত একটি ঘটনার মধ্যে, বিশেষত এই যুগের এমন এক সময়ে তা ঘটে যখন তোকুগাওয়া শোগুনাতের (Tokugawa Shogunate) হাতেই ছিল সর্বময় শাসনের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা, এবং প্রকৃতপক্ষে তিনিই বিভিন্ন প্রাদেশিক সামন্ত প্রভুদের ওপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করেছিলেন —যাঁরা তখনো পর্যন্ত তাদের সংশ্লিষ্ট এলাকায় অল্প-বিস্তর পরিমাণে স্বায়ত্তশাসন চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ('শোগুন' কথার অর্থ হলো একজন 'জেনারেলিসিমো' কিংবা 'কমাণ্ডার-ইন চিফ'।) তখন জাপানে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ছিল, প্রকৃতপক্ষে তা ছিল সমগ্র 'তোকুগাওয়া' রাজত্বকালেই, এবং যা স্থায়ী হয়েছিল দুশো বছরেরও বেশিকাল যাবৎ; কিন্তু একটা সাড়া জাগানো ঘটনা ঘটেছিল ১৭০১-৩ সময়কালে, সাধারণত যা '৪৭ রোনিন'-এর (47 Ronin) কাহিনী হিসেবে পরিচিত।

কয়েকজন চিফ এসেছিলেন— কিয়োটো থেকে শোগুন-এর সঙ্গে দেখা করতে 'এডো'তে (টোকিওর প্রাচীন নাম)। তিনজন 'দাইমিয়ো'র (Daimyos, আঞ্চলিক সামন্তপ্রভু) ওপরে পূর্বোক্ত চিফদের দেখাশোনা করার ভার ছিল। এই দাইমিয়োদের একজন, তাঁর নাম আসানো নেগানোরি (Asano Neganori), এসেছিলেন আকো (Ako) থেকে, তিনি অপমানিত হয়েছিলেন শোগুনাতের একজন সিনিয়ার অফিসারের হাতে। উত্তেজনার মুহূর্তে, আসানো ঐ অফিসারকে (তাঁর নাম ইয়োশিনাকা কিরা/Yoshinaka Kira) তাঁর তরবারি দিয়ে আক্রমণ করেন এবং তাঁকে আহত করেন, যদিও তিনি তাঁকে হত্যা করতে পারেন নি, কিন্তু সম্ভবত তাঁর সে রকম মতলব ছিল।

কারোর উসকানিতে হোক বা না হোক, এটা ছিল আসানোর দিক থেকে সাংঘাতিক রকমের একটা অপরাধ, বিশেষত এডো দুর্গের (Edo Castle) চত্বরের মধ্যে তাঁর তরবারি খোলাটা মারাত্মক অন্যায়। তাই শোগুন তখন আসানোর জায়গিরদারি বাজেয়াপ্ত করে নিলেন, এবং তাঁকে আদেশ দিলেন আত্মহত্যা করতে।

সুতরাং ঐ আদেশ অনুসারে আসানো আত্মহত্যা করলেন 'সেপ্পুকু'র (অর্থাৎ, হারাকিরি, কিংবা নিজের পেট চিরে আত্মহত্যা) সাহায্যে ; কিন্তু এই খবর যখন আকো-তে পৌঁছলো, আসানোর সামুরাই রক্ষীরা দারুণ ক্ষেপে গেল এবং তারা চাইলো তাদের তৎকালীন প্রভুর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে। তারা প্রথমেই তাদের প্রভু আসানোর জায়গিরদারি এবং তাঁর ঘরবাড়ি বাজেয়াপ্ত করার আদেশনামা প্রত্যাহার করে নেবার ব্যবস্থা করলো, কিন্তু আসানোকে আত্মহত্যার জন্যে শোগুনের আদেশনামা কার্যকরী করতে সুযোগ দিল, যেহেতু ঐ রক্ষীদের নেতা ওইশি ইয়োশিও (Oishi Yoshio) তাদের সে রকম পরামর্শই দিয়েছিলেন। যাই হোক, ইয়োশিও একটি পরিকল্পনার ছক করেছিলেন আসানোর ঐভাবে মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্যে এবং আসানোর ঐভাবে মৃত্যুর ফলে তাঁর এবং রক্ষীদলের যে অপমান

হয়েছিল এবং তাদের উচ্চ 'সামুরাই' স্তর থেকে 'রোনিন' স্তরে নামিয়ে দেওয়ার ফলে যে অমর্যাদা হয়েছিল, তার পাল্টা প্রতিশোধ নিতে।

কিরা-র ওপর প্রতিশোধ নিতে গোপনে এক শপথ নিয়ে, উক্ত ৪৭ জন প্রাক্তন সামুরাইরা চলে গেল এডো-তে (টোকিওতে)। তাদের ওপর কিরা অথবা শোগুনের অন্য কোনো এজেন্টদের দিক থেকে কোনো রকম সন্দেহ-সংশয় এড়ানোর জন্যে, ওইশি প্রতিশোধ নেবার সময় বেঁধে দিলেন প্রায় দু'বছর – ইচ্ছাকৃত ভাবেই প্রতিপক্ষকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে দিলেন যাতে বাইরে থেকে তাঁর বা তাঁর প্রাক্তন সহকর্মী রক্ষীদের ওপর প্রতিশোধমূলক কাজের ব্যাপারে কোনো রকম সন্দেহ না জাগে। অর্থাৎ তিনি কেবল খেলার ভান করছিলেন যাতে শোগুনাতের গোয়েন্দা এবং অন্যান্য রক্ষীদের চোখে ধুলো দেওয়া যায়। ১৭০৩ জানুয়ারিতে, এই সমস্ত ৪৭ জন রোনিন, এক আকস্মিক আক্রমণ করতে কিরার বাড়িতে গিয়ে চড়াও হয়, এবং তাঁকে ও তাঁর বহু সামুরাই রক্ষীকে হত্যা করে।

এই ৪৭ জন রোনিন এডো কর্তৃপক্ষের (Edo authority) বিরুদ্ধাচরণ করেছিল, কিন্তু একই সঙ্গে তাদের মৃত প্রভুর (আসানো) প্রতি তাদের আনুগত্য এবং তাদের স্বার্থত্যাগের মনোভাব, জাপানে ও জাপানবাসীদের মধ্যে দারুণ এক প্রভাবের সৃষ্টি করেছিল – ফলে জাপানবাসীরা ঐ ৪৭ জন রোনিনকে 'বীর' বলে মনে করতো। শোগুন, যদিও প্রাথমিক ভাবে অস্বস্তি বোধ করেছিলেন, তবু ঘটনাক্রমে তিনি তাদের প্রতি সহানুভূতিমূলক মনোভাব দেখিয়েছিলেন। এমতাবস্থায় তাদের সম্বন্ধে তাঁর সিদ্ধান্ত হলো, এই ৪৭ জন রোনিনকে তাদের অপরাধের জন্যে সম্মানজনক 'হারাকিরি' করে প্রায়শ্চিত্ত করতে সুযোগ দেওয়া উচিত। এবং তদনুসারে ঐ ৪৭ জন রোনিন হারাকিরি করে আত্মহত্যা করলো।

বিখ্যাত এই ৪৭ জন রোনিনের নাটকীয় কাহিনী হয়েছে – জাপানের অসংখ্য গীতিকাব্যের এবং অন্যান্য সাহিত্যের উপজীব্য বিষয় – লিখেছেন কয়েকজন খ্যাতনামা জাপানি লেখক। এই ধরনের কাব্য-সাহিত্যের মধ্যে সবচেয়ে নামকরা বই হলো – 'চুশিনগুরা', লেখক ইজামি তাকেদা (Chushingura, by Izami Takeda), রচনাকাল উনিশ শতকের গোড়ার দিকে। এই ৪৭ জন রোনিনের সমাধি রয়েছে টোকিওর এক মন্দিরঘরে। এখনো তাঁরা 'জাতীয় বীর' (national heroes) হিসেবেই পূজিত হয়ে থাকেন। – [দ্র. অধ্যায় ১৪]

খ. কয়েকটি শব্দ পরিচিতি –

১. অনাসক্ত কর্ম (Anasakta karma, action without the taint of attachment or desire for any reward) ॥ নিষ্কাম কর্ম অর্থাৎ আসক্তিহীন বা কোনো রকম ফলাকাংক্ষাবিহীন কর্ম : পৌরাণিক মহাকাব্য মহাভারত-এর

একটি তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায় 'গীতা' অর্থাৎ শ্রীমদ্‌ভগবদগীতার মূলকথা। এখানে বলা হয়েছে : তোমার কর্তব্য হচ্ছে কেবল কর্ম করা, কিন্তু কখনোই কোনো রকম ফলাকাংক্ষা করা নয়; কর্মফলাকাংক্ষা যেন তোমার কর্মের উদ্দেশ্য বা প্রেরণা না হয়; নিজেকে অকর্ম বা কর্মহীনতার পথে নিয়ে যেও না। —সংক্ষেপে এই ছিল রাসবিহারীর দৃঢ় বিশ্বাস। এবং আমি যদি এ পর্যন্ত আর কোনো ভারতীয়কে জেনে থাকি, অথবা ঐ বিষয়ে অন্য কোনো লোকের কথা শুনে থাকি, অন্তত গান্ধীজী ব্যতীত আর কেউ-যাঁর কর্ম তাঁর প্রচারিত বাণীর সঙ্গে একই স্তরে উন্নীত—তাহলে তিনিই রাসবিহারী বোস। —[দ্র· অধ্যায় ৮]

এই 'অনাসক্ত কর্ম' প্রসঙ্গে রাসবিহারীর বক্তব্য তথা দৃষ্টিভঙ্গি আরো স্পষ্ট হয় যখন তাঁর জাপানি 'নাগরিকত্ব' গ্রহণ এবং সর্বান্তঃকরণে ভারতীয়তার বৈধতা নিয়ে কয়েকজন প্রশ্ন তোলেন। এ বিষয়ে রাসবিহারীর বক্তব্য : "আমার জাপানি নাগরিকত্ব গ্রহণ আমার অস্তিত্ব রক্ষা অর্থাৎ বেঁচে থাকার জন্যে; কিন্তু আমার সমস্ত চিন্তা ও কর্মে আমি একজন ভারতীয়।" ('My Japanese citizenship is for my survival. In all my thoughts and actions, I am an Indian') —বর্তমান লেখকের [এ. এম. নায়ার] পক্ষে এটা ছিল একটা মহৎ শিক্ষা। এটাও ছিল গীতার বাণী অর্থাৎ 'অনাসক্ত কর্ম'কে জীবনে অনুশীলন করার আরেকটি দৃষ্টান্ত। রাসবিহারী ছিলেন এমনই একজন মানুষ যিনি 'টেক-নিক্যাল' অর্থে জাপানি নাগরিক (বেঁচে থাকার জন্যে), কিন্তু সর্বান্তঃকরণে একজন ভারতীয় স্বদেশপ্রেমিক : নিজেকে তিনি 'ইন্দোজিন বোস' ('Indojin Bose' অর্থাৎ 'ভারতীয় বোস' বলতে কখনোই ভীত ছিলেন না। — এই ঘটনাটি দীর্ঘদিন যাবৎ আমার [বর্তমান লেখক এ· এম· নায়ার] স্মৃতিতে রয়েছে বিশদভাবে। ঘটনাটি আমার মনে চূড়ান্ত প্রাধান্য পেয়েছিল যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের যোগদানের পরে খুব শীঘ্রই, আমি জাপানি হাই-কমাণ্ডের অনুমোদন পাই — ইনডিয়ান ইনডিপেনডেন্স লিগ-এর প্রেসিডেন্ট রূপে নির্বাচনের বিষয়ে এবং সান্নো হোটেলে লিগের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে,—যে অধিবেশনে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকেই ভারতীয় সদস্যরা যোগদান করেছিলেন। —[দ্র অধ্যায় ১২]

২. থারাবাদ (Tharavads)। নায়ারদের সমাজ গঠিত হয়েছে যৌথ পরিবারের ভিত্তিতে, যাকে বলা হয় 'থারাবাদ'। ফলে মাতৃতান্ত্রিক গোষ্ঠীপ্রথার উদ্ভব হয়। মূলত এর অর্থ হলো—বংশ পরম্পরা স্থিরীকৃত হতো মায়ের দিক থেকে,— পিতৃ-পরিচয়ে নয়। প্রতিটি 'থারাবাদ' বা পরিবারগোষ্ঠী বয়োজ্যেষ্ঠ অর্থাৎ প্রবীণতম একজন পুরুষের নিয়ন্ত্রণে থাকে— বলা হয় তাঁকে 'করনাভন' (Karanavan)। কিন্তু এই প্রথায়ও মহিলারা বিশেষ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত।

প্রত্যেক থারাবাদ বা পরিবারগোষ্ঠীর বিষয়-সম্পত্তি যৌথভাবে পরিবারের সদস্যরা মালিকানা ভোগ করতো, এবং স্বত্ব স্বামিত্ব স্থিরীকৃত হতো পরিবারের কোনো সর্বজনীন মাতা বা তাঁর অন্য কোনো পূর্বসূরী মহিলার দিক থেকে। ফলে কোনো পিতার বিষয়-সম্পত্তি তাঁর ছেলে বা মেয়ের নামে নয়, তা তাঁর পিতার বোনের ছেলেমেয়েদের নামে। তবে যদি কোনো পিতার বোন না থাকে, সেক্ষেত্রে তিনি স্বভাবতই এক বা দু'জনকে দত্তক নেবেন বোন হিসেবে—যাতে ভাগ্নে-ভাগ্নী লাভ হয় এবং সেই পিতার পার্থিব বিষয়-সম্পত্তি তাঁর মৃত্যুর পর তাদের নামেই বর্তায়। ত্রিবাংকুর ও কোচিন রাজ্যে তাই দেখা যায়, সেখানকার রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী শাসকদের বংশধর নয়— তাঁদের বোনের বয়োজ্যেষ্ঠ ছেলেরা। —[দ্র. অধ্যায় ১]

৩. সত্যাগ্রহ (Satyagraha, reliance on Truth) ॥ একটি সংস্কৃত শব্দ, অর্থাৎ 'সত্যের' (truth) ওপর নির্ভরশীলতা। এই ধারণা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলনের নীতির সঙ্গে প্রবর্তিত হয়। শব্দটি এখন বিক্ষোভ প্রকাশের ক্ষেত্রে যে কোনো অহিংস আন্দোলনের বিষয় বর্ণনার জন্যে ব্যবহৃত হয়। —[দ্র. ৪র্থ অধ্যায়]

গ. কয়েকটি সংক্ষিপ্ত শব্দের (abbreviations) পরিচয়, যথা—

১. ABCD (American, British, Chinese, and Dutch)— আমেরিকান ব্রিটিশ চীনা ও ডাচ ॥ জাপানের বিরুদ্ধে সংগঠিত অর্থ নৈতিক অবরোধকল্পে সংগঠিত ; কখনো কখনো 'ABCD Encirclement' বা 'এবিসিডি বেষ্টনীচক্র' হিসবে উল্লিখিত হয়।— [দ্র. অধ্যায় ১৯]

২. ABC Declaration (American, British, Chinese Declation of 27 July 1945) ॥ পট্সডাম কনফারেন্স (Potsdam Conferaece, 1945 July) অনুসারে আমেরিকান-ব্রিটিশ-চীন যাতে ২৭ জুলাই-এর ঘোষণা— জাপান যাতে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে। —[দ্র. অধ্যায় ২৭]

৩. ASEAC (Allied South-East Asia Command)— যৌথ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া কমাণ্ড/বাহিনী ॥ অ্যাডমিরাল লুই মাউন্টব্যাটেন-এর (Adm. Louis Mountbatten) সর্বময় কর্তৃত্বে সংগঠিত। উদ্দেশ্য— সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পনা অনুসারে ভারতের সীমানার মধ্যে জাপানি আক্রমণাত্মক অভিযান প্রতিরোধ করা। — [দ্র. অধ্যায় ২৪, ২৫ ; এবং দ্র. SEAC, অধ্যায় ২৪-২৬]

৪. ASEAN (Allied South-East Asian Nations)—যৌথ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ান রাষ্ট্রসংঘ ; এই সূত্রে ASEAN affairs— ASEAN ব্যাপারাদি ॥

যৌথ ভারত-জাপান উন্নত সম্পর্ক/সখ্যতা স্থাপনে সংগঠিত, কিন্তু এই সংস্থার কাজ তেমন আশানুরূপ ভাবে অগ্রসর হয়নি।—[দ্র. অধ্যায় ৩১]

৫. BCOF (British Commonwealth Occupation Forces)—(ব্রিটিশ কমনওয়েলথ দখলদার বাহিনী) ॥ জাপান যখন নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে মিত্রশক্তির কাছে, ভারত তখনো ব্রিটিশ শাসনাধীন। তখন উক্ত বাহিনীর অঙ্গ হিসেবে, একটা ছোট বহরের ব্রিটিশ-ইনডিয়ান আর্মিকেও জাপানে নিযুক্ত জেনারেল ম্যাকার্থার-এর (Gen. MacArthur) অধীনে দখলদার বাহিনী নিয়োগের গোড়ার দিকে। এবং জাপানে বসবাসকারী ভারতীয় সম্প্রদায়ের স্বার্থাদি দেখাশোনার জন্যে, তৎকালীন ব্রিটিশ-ভারত সরকার টোকিওস্থ ব্রিটিশ লিয়াজোঁ অফিসের সঙ্গে পরামর্শ করে মিঃ এল. পি. জৈনকে নিযুক্ত করে ইউনিয়ান লিয়াজোঁ মিশনের প্রধান হিসেবে।—[দ্র. অধ্যায় ২৯]

৬. Greater East Asia Co-Prosperity Sphere (বৃহত্তর পূর্ব-এশিয়া সহ-সমৃদ্ধির অঞ্চল) ॥ হিটলারের প্রাথমিক সাফল্য জাপানকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। ফ্রান্স ও হল্যাণ্ড যখন জার্মান বাহিনীর হাতে পরাস্ত হয়, ১৯৪০-এর গোড়ার দিকে, জাপানের দিক থেকে তখন প্রথমোক্ত ঐ দেশ দুটির দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াস্থ কলোনি (বা উপনিবেশ (এলাকায় ঢুকে পড়ার প্রচেষ্টা প্রত্যক্ষ করা যায়। এর পরিণতি লক্ষ্য করা যায়— জাপান কর্তৃক থাইল্যাণ্ড-এর সঙ্গে এক মিত্রতার চুক্তি (১২ জুন ১৯৪০) সম্পাদনের মধ্যে, এবং এই চুক্তির সূত্রে জাপান আরো সুবিধা-জনক অবস্থা সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। ঘটনাক্রমে সেই চুক্তিসূত্রেই গঠিত হয় ও তাকে বলা হয়— বৃহত্তর পূর্ব-এশিয়া সহ-সমৃদ্ধির অঞ্চল।— [দ্র. অধ্যায় ১৮, ২৯, ২৪]

৭ IIL (Indian Independence League—ইনডিয়ান ইনডিপেনডেন্স লিগ) ॥ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন দীর্ঘদিন যাবৎ বেশ জোরদার ভাবে হয়ে আসছিল—ভারতের বাইরের এবং ভিতরের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের পরিচালনাধীনে। এই নেতৃবৃন্দের মধ্যে কেউ কেউ কাজ করেছেন ব্যক্তিগতভাবে, এবং অন্যেরা কাজ করেছেন বিভিন্ন নামের সংস্থার প্রধান হিসেবে। ক্রমে পরিস্থিতি এমন দাঁড়ালো যখন এইসব বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টা ও সংস্থাগুলিকে একটা সংগঠিত ও সংহত প্রশাসনিক কাঠামোর অধীনে এবং একটা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পরিচালনাধীনে আনার প্রয়োজন হয়ে পড়লো। রাসবিহারী বোস আমার সঙ্গে আলোচনা করে প্রস্তাব করলেন যে, এই সংগঠনটি 'ইনডিয়ান ইনডিপেনডেন্স লিগ' নামে অভিহিত হওয়া উচিত, এবং জেনারেল সুগিয়ামা (Gen. Sugiyama) ঐ প্রস্তাবে সম্মত হলেন। ১৯৪২ ফেবরুয়ারির প্রথম সপ্তাহে, টোকিও থেকে রেডিওযোগে এবং জাপানের সংবাদ-পত্রের মাধ্যমে ঘোষণা করা হলো যে, পূর্ব প্রস্তাবিত 'ইনডিয়ান ইনডিপেনডেন্স লিগ' স্থাপিত হয়েছে এবং তার হেড-কোয়ার্টার্স বা সদর দফতর হলো সান্নো

হোটেল-এর (Sanno Hotel) ৩০২ নং ঘরে। অতঃপর আমরা লেগে গেলাম এক কার্যকরী ও গ্রহণযোগ্য কর্মসূচি প্রস্তুতের কাজে। জাপান রেডিও ব্রডকাস্টিং সংস্থা (NHK) থেকেও এই ঘোষণা করা হয়। এই হলো সংক্ষেপে 'ইনডিয়ান ইনডিপেনডেন্স লিগ' প্রতিষ্ঠার গোড়ার কথা। —[দ্র. অধ্যায় ১৯, ২০]

৮. Indian Independence Movement (ইনডিয়ান ইনডিপেনডেন্স মুভমেন্ট)॥ ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন — ব্রিটিশের হাত থেকে মুক্তি অর্জনের জন্যে সুদীর্ঘ সংগ্রাম। ভারতের বাইরে বিশেষত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এই আন্দোলন প্রাথমিক ভাবে সংগঠিত হয় রাসবিহারী বোস কর্তৃক এবং পরে সুভাষচন্দ্র বোসের দ্বারা। — [দ্র. অধ্যায় ১৯, ২০]

৯. IMTFE (International Military Tribunal for the Far East) দূর প্রাচ্যের জন্যে সংগঠিত আন্তর্জাতিক সামরিক ট্রাইবুনাল॥ জাপানের তথা-কথিত যুদ্ধবন্দীদের ('so-called war criminals') বিচারের জন্যে জেনারেল ম্যাকার্থার (Gen. MacArthur) কর্তৃক স্থাপিত। — [দ্র. অধ্যায় ১২]

১০. INA (Indian National Army — ইনডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি)॥ ভারতের বাইরে থেকে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় সহযোগিতা করার জন্যে সংগঠিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের হাতে ব্রিটিশ ভারতীয় যুদ্ধবন্দী সেনাদের মধ্য থেকে মেজর ফুজিওয়ারা (Major Fujiwara) সহযোগিতায় যুদ্ধবন্দী ক্যাপটেন মোহন সিং কর্তৃক এই বাহিনী গঠনের প্রাথমিক প্রচেষ্টা হয়। অতঃপর রাসবিহারী বোসের নেতৃত্বে এবং সুভাষচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে ঐ সংগঠনটিকে আইন সংগত ভাবে পুনর্গঠিত করা হয়। — [দ্র. অধ্যায় ২০-২৪]

১১. NHK (Nippon Hoso Kyokai, i.e. Japanese Broadcasting Corporation) জাপানি বেতার-প্রচার প্রতিষ্ঠান॥ জাপান থেকে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উদ্দেশে সংবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে এই NHK সংস্থার যথেষ্ট দান আছে। [দ্র. অধ্যায় ১০, ১৯]

১২. POW (Prisoner of War) — যুদ্ধবন্দী॥ এখানে প্রধানতঃ ব্রিটিশের সঙ্গে যুদ্ধে জাপানের হাতে ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাদের কথাই বলা হয়েছে। ব্রিটিশ পক্ষের লেঃ কর্নেল হান্ট (Lt. Col. Hunt) কর্তৃক ঐ যুদ্ধবন্দীদের জাপানি পক্ষের মেজর ফুজিওয়ারার (Fujiwara) হাতে আনুষ্ঠানিক ভাবে সমর্পণ করা হয় ফারার পার্কে, ১৭ ফেবরুয়ারি ১৯৪২ তারিখে। মেজর ফুজিওয়ারা এই যুদ্ধবন্দীদের এক নাটকীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গ্রহণ করেন এবং ঐ অনুষ্ঠানে তিনি যুদ্ধবন্দীদের গ্রহণকালে 'প্রিয় ভারতীয় সেনাবৃন্দ' ('beloved Indian soldiers') বলে সম্বোধন করেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে, যুদ্ধবন্দী ও জাপানি বাহিনীর মধ্যে তিনি সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্যে তিনি কাজ করে যাবেন। এক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধবন্দীদের জনৈক ক্যাপটেন মোহন সিং-এর একটা গোপন

বোঝাপড়া হয়। — [দ্র. অধ্যায় ১৯-২৩]

১৩. SCAP (Supreme Commander for the Allied Power) — মিত্রশক্তির সর্বোচ্চ কমাণ্ডার/বাহিনী॥ যুদ্ধোত্তর জাপানে তার পরাজয়ের ফলে বেশ কিছুকাল যাবৎ এদেশের সঙ্গে কোনো রকম আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ছিল না। কেননা, জাপানের সমুদ্রপথগুলিতে মিত্রশক্তির নৌবাহিনী কর্তৃক মাইন পেতে রাখা হয়েছিল, তার ফলে কোনো যাত্রীবাহী বা বাণিজ্য জাহাজের পক্ষে জাপানের দিকে বা জাপান থেকে যাতায়াত করা সম্ভবপর ছিল না। মাইন সাফাইকারীদের দ্বারা জাহাজ চলাচলের পক্ষে সমুদ্রপথগুলি নিরাপদ না হওয়া পর্যন্ত, সমুদ্রপথে আবার জাহাজ চলাচল শুরু হতে বেশ কিছুকাল সময় লেগেছিল। ইতিমধ্যে SCAP জাপানে একটি অফিস খোলে — জাপানের সঙ্গে অন্যান্য দেশের ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে নীতি-নির্দেশ ইত্যাদি স্থির করার জন্যে। টোকিওস্থ ভারতীয় লিয়াজোঁ মিশনের প্রধান মিঃ এল. পি জৈন এই প্রসঙ্গে কিছু পরিমাণে প্রস্তুতিমূলক কাজকর্ম করে রেখেছিলেন — ভারতের বাণিজ্যিক স্বার্থাদি নিরাপদ করে রাখার জন্যে। — [দ্র. অধ্যায় ২৯, ৩০]

১৭. SEAC (South-East Asian Command) — দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ান কমাণ্ড/বাহিনী ; এবং ASEAC (যৌথ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ান কমাণ্ড / বাহিনী) ॥ — [দ্র অধ্যায় ১০, ১৮-২২, ২৫, ২৬ ; এবং দ্র. ASEAC, অধ্যায় ২৬-২০]

১৫. SMR (South Manchurian Railway) — দক্ষিণ মানচুরিয়ান রেলওয়ে॥ সরকারের পরেই মানচুকুওতে এই SMR সংস্থাই সবচেয়ে শক্তিশালী। এই সংস্থার অধীনে ছিল বহু সংগঠন, তার কাজ কেবলমাত্র রেলওয়ে লাইন পরিচালনা করাই নয়, অধিকন্তু তার প্রভাবাধীন ক্ষেত্রসীমা ছিল কার্যত প্রায় সর্বক্ষেত্রেই, যথা — স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অর্থনীতি, গবেষণা ইত্যাদি। জাপান সরকার ছিল এই SMR সংস্থার একক বৃহত্তম 'শেয়ার-হোল্ডার' বা অংশীদার। তাই SMR সংস্থার প্রেসিডেন্ট নিয়োগের ক্ষেত্রে জাপান সরকারের টোকিও ক্যাবিনেটের দিক থেকে প্রাক অনুমোদন ছিল বিশেষ প্রয়োজনীয়। যাই হোক, এই SMR সংস্থা লেখকের [এ. এম. নায়ার] মানচুকুও মানচুরিয়ায় কার্যোপলক্ষে থাকাকালে তাঁকে নানাভাবে সাহায্য/সহযোগিতা করে। — [দ্র. অধ্যায় ১১]

১৬. THU (Tokyo Hitotsubashi University) — টোকিও হিতোৎসুবাশি বিশ্ববিদ্যালয়॥ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইকোনমিকস্ ফ্যাকাল্টি' বা অর্থনৈতিক বিভাগের বেশ খ্যাতি আছে। জাপানের যুদ্ধোত্তরকালীন প্রধানমন্ত্রীদের মধ্যে একজন মিঃ ওহিরা (Mr. Ohira) এবং 'আশাহি নিউজপেপার'-এর একজন খ্যাতনামা সাংবাদিক মিঃ রিয়ু শিনতারো (Ryu Shintaro), এবং অন্যান্য কয়েকজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই স্নাতক হয়েছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই আরেকজন স্নাতক মিঃ কিন (Mr. Kin) লেখকের [এ. এম.

নায়ার] সমবয়সী এবং বিশেষ বন্ধু ; মিঃ কিন ছিলেন তাঁর শ্বশুর লি কাই-তেন-এর (Lee Kai-ten) মতোই একজন জাতীয়তাবাদী। লি কাই-তেন ছিলেন দক্ষিণ কোরিয়ার অধিবাসী এবং একজন জন্ম জাতীয়তাবাদী। এই শ্বশুর-জামাই দু'জন মিলে স্বাধীনতা সংগ্রামীর এক চমৎকার 'টিম' দল) গড়ে তুলেছিলেন। জাপান যখন কোরিয়া দখল করে নেয় ১৯১০ সনে, লি কাই-তেন তখন বিশেষ ক্রুদ্ধ হয়ে পড়েন॥ মিঃ লি এবং লেখক যখন একসঙ্গে মানচুকুওয় ছিলেন ১৯৩৮ সনে তখন লি-র বয়স প্রায় ৬২, অর্থাৎ লেখকের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ বয়সী, কিন্তু উৎসাহ/উদ্যমে লেখকের চেয়ে কোনো অংশেই কম নয় : বরং তাঁর চেয়ে বেশি। তাঁর ছিল ক্ষুরধার বুদ্ধি এবং ইস্পাত-কঠিন স্বাস্থ্য। যাই হোক, বয়সের দিক থেকে অসমাঞ্জস্য থাকা সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে লেখকের আন্তরিক বন্ধুত্বে কোনো অসুবিধে বা ক্ষতি হয়নি : কেননা উভয়েরই অভিন্ন লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দুই দেশের মুক্তি অর্জন, এবং এটাই ছিল তাঁদের উভয়ের মধ্যেকার বন্ধুত্বের ভিত্তিমূল। — [দ্র. অধ্যায় ১৬] অ.

পরিশিষ্ট – ২

রাসবিহারী বোস কর্তৃক ব্যাংকক কনফারেন্স-এর উদ্বোধন উপলক্ষে (১৫ জুন ১৯৪২) প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ।

আপনারা আমাকে আজকের এই অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করতে দিয়ে এবং এই ঐতিহাসিক অধিবেশনকে পরিচালিত করতে দিয়ে যে বিরাট সম্মান প্রদর্শন করেছেন সেজন্যে অনুমতি করুন আপনাদের আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমার প্রতি আপনাদের এই ভালোবাসা ও স্নেহের প্রকাশকে মর্যাদা দিয়েই বলছি : আমি ভুলছি না যে, এই সম্মান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনারা আমার কাঁধে বিরাট দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন – এই অধিবেশনের সভাপতি হিসেবে আমাকে নির্বাচিত করে। যাই হোক আমি যদি আপনাদের আদেশ-নির্দেশ মান্য করে থাকি এবং সভাপতির এই আসন গ্রহণ করে থাকি এই আসনের জটিলতা ও সমস্যাদি যা হতে পারে এই অধিবেশনের সমিতি, জেনেশুনেও তবে তা সমাধা করতে আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি আপনাদের সহযোগিতার মনোভাব ও আন্তরিক বাসনার প্রতি আমার এই গভীর বিশ্বাসে যে, আপনারা আপনাদের মূল্যবান সময় অযথা আলোচনা ও তর্কবিতর্কে নষ্ট না করে সকলে একত্রে মিলিতভাবে এবং প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিয়ে এই কাজে আমাকে সাহায্য করবেন। আমি নিশ্চিত যে, আপনাদের নিঃসংশয় সাহায্য ও সহযোগিতার উপর বিশ্বাস করে আমি এই অধিবেশনের কার্যাবলী সাফল্যের সঙ্গেই সমাধা করতে পারি।

আমি এখন এখানে দাঁড়িয়ে থাকলেও আমার চিন্তা হচ্ছে গত মার্চ মাসের সেই দুর্ভাগ্যজনক বিমান দুর্ঘটনার বিষয়ে যাতে আমাদের চারজন বিশিষ্ট সহকর্মী প্রাণ হারিয়েছেন – যখন তাঁরা বিমানযোগে টোকিও যাচ্ছিলেন ইনডিয়ান ইনডিপেনডেন্স কনফারেন্সে যোগ দিতে। তাঁরা হলেন, স্বামী সত্যানন্দ পুরী ও গিয়ানী প্রীতম সিং, ব্যাংকক ; এবং ক্যাপটেন আক্রাম ও মিঃ নীলকান্ত আয়ার, মালয়।

আমরা বেশ ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পারি, যে বিরাট ক্ষতি আমাদের হয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামের একটা গুরুত্বপূর্ণ সময়ে, এবং আমরা সকলেই সেকথা গভীরভাবেই বুঝতে পারি। যাই হোক, ভাইসব, আসুন আমরা একে অনিবার্য অলংঘনীয় ঘটনা হিসেবেই গ্রহণ করি, এবং প্রার্থনা করি তাদের আত্মার শান্তির জন্যে। আমাদের দুঃখের মধ্যেও, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চরম সংগ্রামের জন্যে, আমাদের আরো বেশি স্বার্থত্যাগ করতে হবে। ("In our grim, final struggle against British Imperialism, we shall have to offer

তৎকালীন ঐ পরিস্থিতিতে, সংশ্লিষ্ট কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে হচ্ছিল গুপ্ত অবস্থায় লোকালয়ের বাইরে থেকে, এবং একটা সীমাবদ্ধ সুযোগের মধ্যে থেকে; এবং যখন সুযোগ হবে তখন একটা বিদ্রোহ প্রচেষ্টার পরিকল্পনা নিয়ে। সামান্য প্রস্তুতি-পর্বের পরে এক্ষেত্রে বিরাট আকারে আমাদের প্রথম প্রচেষ্টা সংঘটিত হয় যখন ১৯১৪-১৮ সনে যুদ্ধের সূচনা হয়। আমাদের কর্মীরা সক্রিয় ছিলেন সর্বত্রই। ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রস্তুত ছিল এই বিদ্রোহের সঙ্গে যোগ দিতে। সেনাবাহিনীর একাংশ প্রকৃতপক্ষে বিদ্রোহ করেছিল বহু নির্দিষ্ট সময়ের আগেই। আমরা ভেবেছিলাম, আমরা সাফল্যলাভ করতে যাচ্ছি। দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা সাফল্যলাভ করতে পারিনি সেই উপলক্ষে। হাজার হাজার কর্মী ও সৈনিকদের পাঠানো হয়েছিল আন্দামান ও মান্দালয়ে, এবং তাদের মধ্যে শত শত জন এখনো পচে মরছে জেলখানায় আর বন্দীনিবাসগুলিতে।

১৯১৪-১৮ যুদ্ধের সময়কালে ব্রিটিশ পক্ষ ভারতের সহযোগিতা লাভ করতে আংশিকভাবে সফল হয় ভারতের কাছে মিথ্যে কথা বলে আর তাকে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে। আমাদের দেশবাসীরা ভুলপথে চালিত হয়েছিল ধুরন্ধর ব্রিটিশ কূটনীতিকদের মোহিনী কথার চালে। তারা আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যুদ্ধের পরে আমাদের স্বাধীনতা দেবে, যে প্রতিশ্রুতি তারা এখনো দিচ্ছে, এমনকি বর্তমান যুদ্ধের সময়েও। কিন্তু সেই যুদ্ধের সিদ্ধান্তের পরে খুব শীঘ্রই এটা বোঝা গেল যে, তারা কেবল স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি পালন না করার কথাই ভাবেনি, বরং নিশ্চিত-ভাবেই তারা স্বাধীনতার এমনকি নাগরিক স্বাধীনতার ছায়াটুকু মাত্রও সরিয়ে নিতে চেয়েছিল—যে স্বাধীনতা প্রাক্-যুদ্ধ পর্বেও ভারতীয়রা ভোগ করতো। ভারতীয়রা যখন এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলো, ব্রিটিশ পক্ষ থেকে তার সাড়া মিললো বোমা, বুলেট এবং মেশিনগানের মাধ্যমে। বলা বাহুল্য, ১৯১৯ এপ্রিলে অমৃতসরের 'জালিয়ানওয়ালাবাগ ট্র্যাজেডি' এখনো তরতাজা রয়েছে আমাদের প্রত্যেকের স্মৃতিতে, এবং সেই ক্ষত এখনো শুকোয় নি। সেই ক্ষত সত্যিই কখনো আরাম হবে না, যতক্ষণ না আমরা সেই ব্রিটিশ শক্তিকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করতে পারছি—যে শক্তি আমাদের দেশবাসীর সেই হীনতাপূর্ণ নিদারুণ অপমানজনক অবস্থার জন্যে দায়ী।

প্রত্যেক ট্র্যাজেডিরই যাই হোক, একটা শিক্ষার দিক থাকে, এবং তাই জালিয়ানওয়ালাবাগ ট্র্যাজেডিরও একটা শিক্ষা আছে। জালিয়ানওয়ালাবাগের সেই সহস্রাধিক পবিত্র শহিদের রক্ত, যার মধ্যে আছে আমাদের নারী ও শিশুদেরও রক্ত, ত কখনো তাৎপর্যহীন নিষ্ফল হতে পারে না। সেই মহান জাগরণ যার দাপট দেখা গেল ভারতের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত, এবং সেই মহান অসহযোগ আন্দোলন ও আইন অমান্য আন্দোলন যা ইনডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস কর্তৃক পরিচালিত হয়েছিল ১৯১৯ থেকে এবং যা আশ্চর্যভাবে ভারতের জনতাকে সংগঠিত করেছিল দেশের রাজনৈতিক সংগ্রামের স্বার্থে, তা ছিল নিঃসন্দেহেই সেই জালিয়ানওয়ালাবাগের

গণহত্যার প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি।

আমরা অবশ্যই প্রত্যেকেই আমাদের মাথা শ্রদ্ধায় নত করবো এবং কৃতজ্ঞ থাকবো সেইসব ভ্রাতা ও ভগিনীদের উদ্দেশে যাঁরা জালিয়ানওয়ালাবাগে তাঁদের জীবন বিসর্জন দিয়ে ভারতের জন্যে এক নবজাগরণের সূচনা করেছেন। আজ আমরা জানি, ভারতে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রস্তুত আপন মাতৃভূমির স্বার্থে সবপ্রকার দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করতে এবং তাঁদের সবকিছু স্বার্থত্যাগ করতে দৃঢ়সংকল্প। যখন ১৯৩৯ সনে যুদ্ধ শুরু হলো ইয়োরোপে, ব্রিটেন আবারও শুরু করলো, নানারকম চালবাজি—যাতে ভারতের সহযোগিতা ও সাহায্য লাভ করা যায়। কিন্তু আমাদের সবার পক্ষে আনন্দের কথা যে আজ এখন ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ আর ভুলপথে চালিত হতে অস্বীকার করেছেন, এবং ভারতকে যুদ্ধের মধ্যে জড়িত করার যাবতীয় ব্রিটিশ প্রচেষ্টার তারা প্রতিরোধ করে যাচ্ছেন আমাদের শ্রদ্ধা প্রাপ্য মহাত্মা গান্ধীর, যিনি অত্যন্ত প্রশংসনীয় ভাবেই সমগ্র জাতিকে চালিত করেছেন, এবং এই যুদ্ধে ভারতের জড়িত হয়ে পড়ার সমস্ত বিপদ পরিষ্কার করে দিয়েছেন।

ভারতে এই পটভূমিতে, বৃহত্তর পূর্ব-এশিয়া যুদ্ধ Greater East Asia war ঘোষিত হলো ৮ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখে। নারী-পুরুষ দুনিয়ার যে অংশে যেই থাকুক, জাপানের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব যাই হোক তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না যে, কোথাও এমন কোনো একজন ভারতীয় স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন যিনি অ্যাংলো-স্যাক্সন জাতির বিরুদ্ধে জাপান কর্তৃক যুদ্ধ-ঘোষণার বিরাট সংবাদ যখন তাঁর কর্ণগোচর হয় তখন তিনি তাঁর অন্তরের অন্তস্থলে চরম আনন্দলাভ করেন নি ও কৃতজ্ঞবোধ করেন নি। আমি বিশ্বাস করি না যে, কোথাও এমন কোনো ভারতীয় স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন যিনি—নারী-পুরুষ যেই হোন, তাঁর জীবিকা ও বিশ্বাস যাই হোক তিনি তখন থেকে আজ পর্যন্ত প্রতিদিন ক্রমশই শক্তিশালী জাপান ইম্পিরিয়াল ফোর্স স্থলে-জলে ও আকাশপথে, এশিয়ায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে প্রচণ্ড আঘাত হেনে যাচ্ছে সেই সংবাদে, এবং এই অঞ্চলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ঘাটিগুলি যেরকম তাসের ঘরের মতো শোচনীয় ভাবে ভেঙে পড়ছে হচ্ছে, সেই সংবাদে তিনি আনন্দিত হননি। কেননা, এমন কোনো মানুষ কোথাও কি আছে যার দু-চোখ আনন্দাশ্রু সংবরণ করতে পারে—যখন সে তার চোখের সামনেই দেখতে পায় মানবজাতির ও শান্তির সবচেয়ে বড় শত্রু, শতাব্দীর সবচেয়ে বড় আগ্রাসী শক্তি ব্রিটিশের ক্ষমতা ক্রমশ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে? আমাদের মধ্যে যাদের জাপানের বসবাস করতে ও কাজকর্ম চালাতে হয় তাদের পক্ষে এই চরম আকাংক্ষিত ঘটনায় অত্যন্ত বেশি আনন্দিত হবার মতো বিশেষ কারণ ছিল।

আমরা জাপানে কাজ করছি কয়েক দশক যাবৎ, এবং আমরা জাপানকে দেখতে পারি নিপীড়িত এশিয়াবাসীর পাশে দাঁড়াতে ও এশিয়াকে মুক্ত করতেও দেখতে পারি। আমরা উদ্বিগ্ন ভাবেই অপেক্ষা করে আছি সেই দিনের জন্যে, যখন জাপান

সম্যকভাবে উপলব্ধি করবে এক মুক্ত ও যুক্ত এশিয়া সৃষ্টি করার কথা, এবং অনুভব করবে ও বুঝতে পারবে যে, জাপানের আপন স্বার্থেই, সেই সঙ্গে এশিয়ার অংশীদার হয়ে, এমনকি যদি সম্পূর্ণ অর্থে সমগ্র দুনিয়ার স্বার্থে নাও হয় যে, প্রাচ্যের অ্যাংলো-স্যাক্সন সাম্রাজ্যবাদের অক্টোপাশের থাবাকে অবশ্যই শিকড় ও ডালপালা সমেত একেবারে ধ্বংস করতে হবে। আমরা সকলেই পুরোপুরিভাবেই বুঝতে পারলাম যে, জাপান একাই এই সম্মান গ্রহণ করার মতো অবস্থায় রয়েছে।

এইভাবে যখন সেই পরম শুভদিনের সকালে, যেদিন প্রভু বুদ্ধ বোধিলাভ করেছিলেন আমরা শুনলাম সেই পরম শুভ সংবাদ, অর্থাৎ আমাদের সাধারণ শত্রু ব্রিটিশের বিরুদ্ধে জাপানের যুদ্ধ-ঘোষণার সংবাদ, আমরা বেশ বুঝলাম যে জাপানে আমাদের মিশন সম্পূর্ণ হয়েছে। আমরা বুঝতে পারলাম যে, ভারতের স্বাধীনতা বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। কয়েক দশক যাবৎ জাপানে থেকে, আমি বেশ ভালো ভাবেই জানতাম যে, জাপান তার শক্তি সামর্থ্য ও সাফল্যলাভের বিষয়ে যতক্ষণ না পুরোপুরি নিশ্চিত হচ্ছে ততক্ষণ যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করবে না, এবং তেমন ভাবে সে অগ্রসরই নয়। আমি তাই তাঁদের চিন্তার শরিক নই যাঁরা ভাবেন চীনে দশ বছরব্যাপী সামরিক কার্যকলাপের ফলে, জাপান শক্তিশালী অ্যাংলো-স্যাক্সন কিংবা তথাকথিত মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানানোর মতো দম হারিয়ে ফেলেছে। আমি তাদের একজন যার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না যে, চীনের যুদ্ধটা হলো ঐ শক্তির বিরুদ্ধেই—যা চীন ও জাপানের মধ্যেকার অনিবার্য ভ্রাতৃঘাতী দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের জন্য প্রকৃতপক্ষে দায়ী। তার বিরুদ্ধে প্রকৃত যুদ্ধের প্রস্তুতি... সঠিক... ১০ বছরেরও বেশি সময় যাবৎ যেসব ঘটনাবলী সংঘটিত হচ্ছিল তার মধ্যে এমন সব আভাস-ইংগিত ছিল যে এরকম একটা বিস্ফোরণ সম্ভব ছিল অনিবার্য। এটাও আপাত-দৃষ্টে স্পষ্ট ছিল যে, ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নটাও সাফল্যজনক ভাবে সমাধান করা যেতে পারে, কেবলমাত্র জাপান যখন সশস্ত্রভাবে রুখে দাঁড়াবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে।

এখন যেহেতু জাপান ও থাইল্যান্ড অস্ত্র হাতে নিয়েছে আমাদের সাধারণ শত্রু ব্রিটিশের বিরুদ্ধে, আমাদের যোগ্য মিত্রপক্ষের যৌথ প্রচেষ্টা ডেকে আনবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নাশ এবং আমাদের সম্পূর্ণ বিজয় নিশ্চিত।

বিভিন্ন ফ্রন্টে আমাদের সাধারণ শত্রু ব্রিটিশকে নাশ করতে এইসব কার্যকরী প্রচেষ্টাই সর্বাধিকের স্মরণ করিয়ে দেয় এই সাধারণ বিষয়ে আমাদের প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে আমাদেরই নিজস্ব কর্তব্য ও দায়িত্বের কথা। আমরা অবশ্যই জিজ্ঞাসা করবো আমাদেরকে যে এ বিষয়ে আমরা কী করেছি এবং আমরা কী করতে যাচ্ছি—সংশ্লিষ্ট এই মহান বিষয়ে আমাদের অবদান রাখার ক্ষেত্রে। কেবলমাত্র জাপান, জার্মানি ও ইটালিকে প্রশংসা করলেই আমরা যেজন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছি সেই

বিষয়ে অধিকারী হয়ে উঠতে পারবো না। আমাদের অবশ্যই যথাসাধ্য দান করতে হবে, এবং সবচেয়ে বেশি পরিমাণে স্বার্থত্যাগ করতে হবে। কেবল তখনি আমরা আমাদের জাপানী মিত্রপক্ষের শ্রদ্ধা ও সুবিবেচনা দাবি করতে পারি, এবং কেবল তখনি আমাদের মতো একটা মহান দেশের যোগ্য আসন দাবি করতে পারবো—ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক সংগঠনের মধ্যে।

এহেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা, এবং আমাদের মাতৃভূমির প্রতি এহেন গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আমাদের কর্তব্যের কথা উপলব্ধি করে, টোকিওতে আমরা সঙ্গে সঙ্গেই মিলিত হলাম রেনবো গ্রিলে (Rainbow Grill) ৮ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখে, এবং একটি কর্মসূচির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি সানন্দে তাঁদের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে সম্মত হলাম। আমরা সবাই পূর্ব-এশিয়ায় ভারতীয় জনমত সংহত করার কাজে হাতে নিলাম—বাইরে থেকে এক সুনির্দিষ্ট সংগ্রামের স্বার্থে। এই মর্মে জাপানের বিভিন্ন কেন্দ্রে সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত হলো, এবং সিদ্ধান্ত-সমূহ অনুমোদিত হলো যাতে জোর দেওয়া হলো আমাদের সহকর্মী স্বদেশপ্রেমিক-দের সংগঠিত করার কাজের ওপর, এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করে ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণার প্রয়োজনের কথার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দান, এবং আমাদের কাজের ওপর আস্থা জাপানের ওপর।

২৬ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখে, জাপানপ্রবাসী ভারতীয়দের ইতিহাসে এই সর্ব-প্রথম, একটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলো সকলের সমস্যাদি বিবেচনার জন্যে টোকিওর রেলওয়ে হোটেলে (Railway Hotel) - কোবে, ওসাকা, ইয়োকোহামা, টোকিও—এই চারটি শহর যেখানে ভারতীয়রা বসবাস করে—সেখান থেকে প্রায় ৫০ জন প্রতিনিধি নিয়ে। অধিবেশনে একটি সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হলো যাতে ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে বলা হলো, পরিস্থিতির গুরুত্ব এবং ভারতের সামনে যে বিপদ আসছে সেকথা উপলব্ধি করতে হবে। সিদ্ধান্তটির বক্তব্য এইরকম :

: ইয়োরোপে ও আমেরিকায় ব্রিটিশ এবং তাদের মিত্রশক্তির ক্রমাগত পরাজয়ে ইয়োরোপে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পরিণাম হয়েছে রুদ্ধগতি ;

: জাপান কর্তৃক প্রাচ্য থেকে ব্রিটিশপক্ষের নৌ ও স্থল বাহিনীর সবচেয়ে মারাত্মক ক্ষতি সাধনের ফলে এশিয়ায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শক্তি ও মর্যাদার পক্ষে তা হয়েছে মারাত্মক আঘাত স্বরূপ ;

: যুদ্ধ দ্রুতগতিতে ক্রমশ এগিয়ে আসছে ব্রিটিশের শক্তঘাঁটি ভারতের উপকূলবর্তী ও সীমান্তবর্তী এলাকার দিকে, এবং অক্ষশক্তি ভারত অভিযান করতে পারে ব্রিটিশের প্রধান সংগ্রাম শক্তিকে ধ্বংস করে দেবার জন্যে ;

: যেহেতু এরকম একটা অভিযানের ফলে শহর নগর ও গ্রামাঞ্চলে বসবাসরত লক্ষ লক্ষ নিরীহ ও অসহায় ভারতীয়দের অকল্পনীয় এবং চরম দুঃখকষ্ট ও দুর্দশা ডেকে আনবে : এবং

: এই চরম অশান্তিকর পরিস্থিতি এড়ানোর একমাত্র উপায় হলো ব্রিটিশ শাসনের হাত থেকে ভারতের পক্ষে পূর্ণ স্বাধীনতার ঘোষণা করা, এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সকল সম্ভাব্য যোগসূত্র সর্বপ্রকার উপায়ে অবিলম্বে ছিন্ন করা, তাই—

: জাপানে বসবাসকারী যেসব ভারতীয় এখানে এই অধিবেশনে সমবেত হয়েছেন, তাঁরা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ও আন্তরিক ভাবে ইনডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের কাছে ও ভারতবাসীদের কাছে আবেদন করছেন—ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণার জন্যে, এবং ভারতে ব্রিটিশের কাছ থেকে সমস্ত ক্ষমতা দখল করে নিতে, এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর যুদ্ধে ভারতের দিক থেকে প্রতিটি এবং সমস্তরকম সাহায্য-সহযোগিতা অবিলম্বে বন্ধ করবার জন্যে সক্রিয় কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে, এবং ভারতবাসীর পক্ষে এই যুদ্ধে কোনোক্রমেই জড়িত হয়ে পড়ার কোনোরকম অভিপ্রায় নেই একথা ঘোষণা করতে, এবং ব্রিটিশকে সাহায্য করতে ভারত কখনোই ইচ্ছুক নয়, একথা ঘোষণা করতে।

আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো হয়েছিল শাংহাইতে, এবং এ বছরের ২৬ জানুয়ারি তারিখে শাংহাইবাসী ভারতীয়দের এক বিশাল সমাবেশ হয় ইয়ং মেন্স অ্যাসোসিয়েশান হলে (Young Men's Association Hall)—যখন অনুরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, যেমন টোকিওতে গৃহীত হয়েছিল, এবং তা অনুমোদিত হয়েছিল অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গেই, এবং আমাদের আন্দোলনকে সর্বসম্মত সমর্থন জানানো হয়।

ইতিমধ্যে আমরা যোগাযোগ করলাম জাপানের সামরিক ও অসামরিক ক্ষেত্রের হাইকমাণ্ডদের সঙ্গে, এবং তাদের বোঝাতে শুরু করে দিলাম, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাকে সাহায্যদানের প্রয়োজনীয়তার কথা, বিশেষত যে বৃহত্তর স্বার্থ অর্জনের জন্যে জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করেছে ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে, সেকথা বিবেচনা করে। আমরা এটা তাদের কাছে পরিষ্কার করে বললাম যে, যতদিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতে বজায় থাকছে, জাপান ততদিন এই যুদ্ধে চরম বিজয় আশা করতে পারে না। অবশেষে আমরা তাদের বোঝাতেসমর্থ হলাম; এবং জেনারেল তোজো (Gen. Tojo.), জাপানের প্রধানমন্ত্রী, খোলাখলি ভাবেই জাপানের পার্লামেণ্টে (Imperial Diet) ঘোষণা করলেন যে, তাঁর সরকার ভারতীয়দের স্বাধীনতা সংগ্রামে, ব্রিটিশের হাতে দীর্ঘদিনের পরাধীনতার কবল থেকে দেশকে মুক্ত স্বাধীন করার প্রচেষ্টায় সাহায্য করতে প্রস্তুত আছে।

সিংগাপুর পতনের পরে পার্লামেণ্টে তাঁর ঘোষণায় জেনারেল তোজো বলেন: "ভারতের পক্ষে এটা একটা সুবর্ণ সুযোগ, যেমন তার কয়েক হাজার বছরের ইতিহাস ও ঐশ্বর্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে, তার পক্ষে ব্রিটেনের নির্মম

ও বেপরোয়া শোষণ থেকে উদ্ধার পাবার পথে সে বৃহত্তর পূর্ব-এশিয়া সহ-সমৃদ্ধির অঞ্চল প্রকল্পে (Greater East Asia Co-prosperity Sphere) অংশগ্রহণ করতে পারে। জাপান আশা করে যে, ভারত তার দেশবাসীদের জন্যে উপযুক্ত মর্যাদা পুনরুদ্ধার করবে, এবং ভারতবাসীদের স্বদেশপ্রেমমূলক যে কোনো প্রচেষ্টার প্রতি সহায়তা প্রদান ও প্রসারের ক্ষেত্রে কোনো রকম কার্পণ্য করবে না। ভারত যদি সংকল্পের ডাকে সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়, তার ইতিহাস ও ঐতিহ্য ভুলে যায়, এবং আগের মতোই ব্রিটিশের মিষ্টি কথার ছলনায়, প্রতারণার শোষণে ভুলে থাকে, এবং তারই আজ্ঞাধীন হয়ে কাজকর্ম করতে থাকে, তাহলে আমি আশংকা না করে পারি না যে, ভারতবাসীদের পক্ষে নবজীবন লাভের সুযোগ চিরাকালের জন্যেই নষ্ট হয়ে যাবে।" ("Should India fail to awaken to her mission forgetting her history and tradition, and continue as before to be beguiled by the British cajolery and manipulation and act at their beck and call, I cannot but fear that opportunity for the renaissance of the Indian people would be forever lost.")

এই ঘোষণা আমাদের যথেষ্ট উৎসাহ জোগায়, এবং আমরা বেশ বুঝতে পারি যে, ভারত বেশ নিশ্চিন্তেই আশা করতে পারে যে পূর্ব-এশিয়া যুদ্ধ (East Asia war) শেষ হবার আগেই সে স্বাধীন হবে। জেনারেল তোজোর এই প্রতিশ্রুতির ওপর ভরসা করে, আমরা আমাদের হেড-কোয়ার্টার্স স্থাপন করলাম সান্নো হোটেলে (Sanno Hotel), এবং আমাদের সঠিক কার্যকলাপ ও প্রস্তুতিপর্ব শুরু করে দিলাম। আমরা স্থির করলাম যে, পূর্ব-এশিয়ার বিভিন্ন অংশের ভারতীয় সংগঠনগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি অধিবেশন হওয়া উচিত— আমাদের ভবিষ্যৎ পদক্ষেপের বিষয়ে মত-বিনিময়ের জন্যে। সামরিক কর্তৃপক্ষের সাহায্যে সুবিধাজনক ভাবেই সবকিছুর ব্যবস্থা হলো, এবং মালয়, হংকং ও শাংহাই এবং সেই সঙ্গে টোকিওয় বসবাসরত আমাদের সহকর্মী স্বদেশপ্রেমিকরা মিলিত হয়ে আমরা ৩ দিনের এক অধিবেশনে বসলাম, এবং প্রয়োজনীয় কার্যকলাপ ও অগ্রগতির স্বার্থে একটি আন্দোলনের পক্ষে প্রাথমিক সংবিধানের খসড়া প্রস্তুত করলাম। আমাদের যেসব বন্ধুরা বাইরে থেকে এসেছিলেন এবং অংশগ্রহণ করেছিলেন টোকিও কনফারেন্সে, তাঁদের সুযোগ হয়েছিল টোকিওর জাপানি আর্মির দায়িত্বপূর্ণ সদস্যদের সংস্পর্শে আসার এবং আমাদের আন্দোলন ও সংশ্লিষ্ট বক্তব্যের বিষয়ে আরো বেশি করে জানবার।

টোকিও কনফারেন্সে আলোচনাদি ছিল বিভিন্ন বিষয়ের, এবং সে বিষয়ে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম একটা দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করতে, যার ওপর আমরা

আমাদের ভবিষ্যৎ কার্যকলাপের পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে পারি। আমরা সকলেই জানি যে, এই কনফারেন্স টোকিওতে অনুষ্ঠিত হয় এমন সময়ে যখন সবকিছু আজকের মতো এত স্থির নিশ্চিত ছিল না। আমাদের ইস্ট-ইনডিজের বন্ধুরা উপস্থিত ছিলেন না। আমাদের থাইল্যাণ্ডের বন্ধুদের কাছ থেকে তাঁদের মূল্যবান সাহায্য ও পরামর্শ থেকে বঞ্চিত হলাম — দুর্ভাগ্যজনক সেই বিমান দুর্ঘটনার জন্যে। বার্মা ও আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ এখনো রয়েছে আমাদের শত্রুপক্ষের হাতে। আমরা তাই একটা সিদ্ধান্তে আসতে অসমর্থ, যে সিদ্ধান্তকে সামগ্রিক ভাবে আমাদের পূর্ব-এশিয়ার সহকর্মী স্বদেশপ্রেমিকদের প্রতিনিধিত্বমূলক মতামত বলে দাবি করা যেতো। সুতরাং আমরা বিরাট এবং অধিকতর প্রতিনিধিত্বমূলক একটা অধিবেশন পরে কোনো এক তারিখে অনুষ্ঠান করতে সিদ্ধান্ত করলাম — যখন টোকিও অধিবেশনের গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি সংশোধন করে নিতে হবে। আজ যে অধিবেশনে আমরা অংশগ্রহণ করছি, সেটা হলো ঐ সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতি।

এই অধিবেশন সংগঠন করার দায়িত্ব দেওয়া হলো আমার কাঁধে, এবং আমাকে বলা হলো এই শহরেই তার অনুষ্ঠান করতে। আমি দুঃখিত যে, ঐ অধিবেশনের অনুষ্ঠান করতে কয়েক সপ্তাহ দেরি হয়ে গেল। আমরা আরো আগেই এখানে আসতে আশা করেছিলাম, কিন্তু যে এক অস্বাভাবিক সময়ের মধ্য দিয়ে চলেছি, এই সময়ে সবকিছু সবদা আশানুরূপ ঠিকমতো করা যাবে না, এবং এই পরিস্থিতি অনুসারে আমাদের মানিয়ে নিতে হবে

আমি জানি, আমি আপনাদের পত্র-নির্দেশাদি পাঠিয়েছি বিগত ছয় মাসেরও বেশি সময়কালের ঘটনা ও কার্যকলাপের বিশদ বিবরণ দিয়ে। কিন্তু ঘটনাবলী কী সংঘটিত হচ্ছে এবং কিভাবে আমরা সেদিকে অগ্রসর হচ্ছি, সে বিষয়ে এবং আমাদের অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় অনুসারে কাজ চালানো এবং সে বিষয়ে স্বতঃপ্রণোদিত সিদ্ধান্ত নেবার আগে আপনাদের অবহিত করানোর জন্যে তার প্রয়োজন ছিল।

বন্ধুগণ, আমরা সকলেই এই পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করি এবং এই ঘটনার গুরুত্বও বুঝি। আমরা ভারতের ইতিহাসের এক জরুরি ও কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে চলেছি। আমি চাই না সে বিষয়ে দীর্ঘ ভাষণ দিয়ে সময় নষ্ট করতে। আমরা সে রকম ভাষণ অনেক শুনেছি বিগত পাঁচ দশকেরও বেশি সময় যাবৎ। আমরা সত্যিই আমাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করতে পারি না — অর্থহীন ভাষণ দিয়ে ও তর্কবিতর্ক করে। যারা সত্যিই মাতৃভূমির সেবা করতে চায়, তারা কখনোই বেশি সময় পায় না ভাষণ দিতে। আমরা যদি কোনো সঠিক সিদ্ধান্তে না এসে কেবল অযথা ভাষণ দিয়ে যাই, সময় আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে না, এবং আমরা পড়ে থাকবো শুধু আমাদের অতীতের দোষত্রুটির জন্যে অশ্রুপাত বা বিলাপ করতে, এবং অবস্থা আয়ত্তে আনার পক্ষে তা খুব দেরি হয়ে যাবে। আমি জানি,

এক্ষেত্রে কিছু জটিল সমস্যাদি আছে যা আপনাদের সামনে আসবে আলোচনার জন্যে, এবং সে বিষয়ে আপনাদের সতর্ক বিবেচনার প্রয়োজন হবে। আমি জানি, এবিষয়ে আপনাদের বহু চিন্তাভাবনা করতে হবে, এবং ভিতর থেকে বহু সন্দেহ-সংশয়ের সম্মুখীন হতে হবে—সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার আগেই। কিন্তু যদি আপনারা কঠিন সংকল্প নিয়ে এসে থাকেন এবিষয়ে একটা ইতিবাচক সঠিক এবং সত্যিকারের প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা ও উপায় খুঁজে বের করার জন্যে, তাহলে আপনারা খুব চটজলদি একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারবেন। আমরা সবাই যেন সম্পূর্ণভাবে আমাদের জন্মভূমির প্রতি আপনাপন দায়িত্বের কথা উপলব্ধি করতে পারি, এবং আমরা সকলেই যেন ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পারি যে, আমাদের নিপীড়িত দেশ এই স্বর্ণ সুযোগ হারাতে পারে না— যে সুযোগ আসে শতাব্দীতে মাত্র একবারই। আমাদের ভাইবোনেরা তাদের শতসহস্র জীবন বিসর্জন দিয়েছে এবং নির্যাতন সহ্য করেছে ও স্বার্থত্যাগ করেছে প্রায় এক শতাব্দীরও বেশিকাল যাবৎ—যাতে আমাদের দেশ আবার মুক্ত স্বাধীন হতে পারে। আসুন আমরা এই উপলক্ষে উঠে দাঁড়াই, এবং সাফল্যের পথে তাঁদের সেই প্রচেষ্টা চালিয়ে নিয়ে যাই, যাতে সেইসব স্বর্গত শহিদদের আত্মা শান্তি পায় ও পরিতৃপ্ত হয়। আসুন, আমরা জেগে উঠি এবং এমনভাবে কাজ করি যাতে সেই বিরাট প্রস্তুতি যা মহাত্মা গান্ধী গ্রহণ করেছেন বিগত দুই দশকেরও বেশি সময় যাবৎ—তা ফলপ্রসূ হয়, এবং আমাদের ছেলেমেয়েরা ভবিষ্যতে আমাদের বিষয়ে ভাবতে পারে উপযুক্ত গর্ব ও মর্যাদার সঙ্গে—যেমন স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিকেরা করে থাকে।

আমি জানি, আপনাদের অনেকেই এসেছেন সংশয় ও সন্দেহ নিয়ে—আমাদের কার্যকলাপের ফলে আমাদের দেশের পরিণামে বা অদৃষ্টে কী আছে সেকথা জানার জন্যে। আমি আপনাদের আশ্বাস দিতে পারি যে, আমি আপনাদের ঐ অনিশ্চিত মনোভাবের কথা এবং নিরাপত্তার অভিপ্রায়ের কথা বেশ বুঝতে পারি, এবং তবুও আমি বিশ্বাস করি ঐসব বিষয়ের ভিত্তি হলো অলীক ও কাল্পনিক। শতাব্দীব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী শোষণের তিক্ততম অভিজ্ঞতার ফলে, আমরা সন্দেহ করতে শুরু করেছি এমনকি আমাদের সৎ বন্ধুদেরও, এবং আমরা যদি এই দৃষ্টিভঙ্গিকেই আঁকড়ে থাকতে জেদ করি, তাহলে দুনিয়া এগিয়ে যাবে, কিন্তু আমরা পিছনে পড়ে থাকবো আমাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার অক্ষমতার বিষয়ে আপশোষ করতে।

আমি এখানে একটা সতর্কবাণী উচ্চারণ করতে চাই। আমাদের শত্রুরা সর্বদাই সফল হয়েছে আমাদের পৃথক করে রাখতে, এবং এইসব উপলক্ষে আমাদের মনে একটা অলীক ধারণার সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে। অতীতে অনেক উপলক্ষেই, ব্রিটিশ প্রোপাগাণ্ডার কবলে পড়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে আমরা আমাদের দেশকে স্বাধীন করার সুযোগ হারিয়েছি। আমি কেবলমাত্র আশা করতে পারি যে,

আমরা আমাদের ঐ ত্রুটির পুনরাবৃত্তি আর করবো না। আমাদের সংশয় ও সন্দেহের অনেকখানিই হলো আমাদের প্রচেষ্টাকে বানচাল করে দেবার কাজে আমাদের শত্রুপক্ষের সুচতুর ও সুচিন্তিত পরিকল্পনার ফলশ্রুতি। আমাদের মধ্যে যাদের যথেষ্ট বুদ্ধি বিবেচনা আছে এবং যারা তথ্য ও ঘটনাবলীর প্রতি অন্ধ নয়, একমাত্র তারাই এরই মধ্যে পথ দেখতে পায় পরিষ্কার ভাবে।

আমাদের কৃতজ্ঞ বোধ করা উচিত—জাপান, জার্মান, থাইল্যাণ্ড ও ইটালি সরকারের প্রতি—যেসর্বাধিক বন্ধুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব তারা দেখিয়েছে আমাদের স্বার্থমূলক স্বাধীনতার বিষয়ে, সেজন্যে। আমাদের অবশ্যই বিশেষভাবে জাপানের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত—আমাদের পবিত্র স্বার্থের কারণে সাহায্যের জন্যে সবচেয়ে উৎসাহজনক, আশাপ্রদ ও সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতির জন্যে। আমরা যেন ভুলে না যাই পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর কথাবার্তা, যখন তিনি বলেন: সাফল্য প্রায়ই আসে তাদের কাছে যারা সাহসী ও সেভাবে কাজ করে: এবং তা কদাচিৎ যায় ভীরু ও কাপুরুষদের কাছে। ("Sucess often comes to those who dare and act : it seldom goes to cowards.")

বন্ধুগণ, আমি আপনাদের প্রত্যেকের কাছেই আন্তরিক আবেদন জানাচ্ছি, আমি এটা দেখতে চাই, যখন আপনারা অধিবেশনের উপসংহার করবেন, ভারতের স্বাধীনতার জন্যে আপনাদের সবচেয়ে বাস্তব ও কার্যকরী কর্মসূচিমূলক পরিকল্পনা রয়েছে, যাতে আমরা অধিবেশন শেষ হবার পরেই আমাদের কার্যকলাপ শুরু করে দিতে পারি এবং এগিয়ে যেতে পারি। আমরা যথেষ্ট ভাগ্যবান যে, আমাদের হাতের মধ্যেই রয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সবচেয়ে মূল্যবান সাহায্য। তারা আমাদের সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধার যোগ্য— যে বিরাট সেবা ও সাহায্য তারা ইতিমধ্যেই করেছে আমাদের মহান স্বার্থের কারণে—আমাদের শত্রুপক্ষের সেবা করতে অস্বীকার করার ফলে। কিন্তু তাদের বৃহত্তর সেবা অপেক্ষা করছে আমাদের সিদ্ধান্তের উপরেই। কিন্তু কেউই আমাদের সেনাদের সাহসিকতায়, এবং সংগত কারণে তাদের সংগত সংগ্রামে সন্দেহ করতে পারে না। আমাদের সহানুভূতি প্রাপ্য সেই সব পরিবার ও বন্ধুদের—তাদের মধ্যে যেসব ভারতীয় সেনারা ইয়োরোপে ও এশিয়ায় যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে এই ভেবে যে তারা সংগত কারণেই, সংগ্রাম করছে। তারা ব্রিটেনের সেই একই মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডার কবলে পড়ে ভুল পথে চালিত হয়েছে, যে মিথ্যা ধারণা তারা আমাদের অনেকের মনেই ঢুকিয়ে দিয়েছিল ভিত্তিহীন ভাবেই। আমি আমাদের সেইসব সেনাদের সাহসিকতার প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত করছি, এবং আমাদের কোনো সন্দেহই থাকা উচিত নয় যে, তাদের সর্বান্তঃকরণে সমর্থনের ফলেই আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চরম সংগ্রামে এখন জয়লাভ করতে চলেছি। আসুন, আমরা কাঁধে কাঁধ দিয়ে দাঁড়াই, এবং আমরা হাতে হাত ধরে এগিয়ে যাই

সাফল্যের দিকে। আমরা যেন স্মরণ রাখি, আমাদের আছে এক ও অবিভাজ্য রাষ্ট্র — ভারত, এক শত্রু ইংল্যাণ্ড, — এক লক্ষ্য পূর্ণ স্বাধীনতা।

[সূত্র : রাসবিহারী বোসের আর্কাইভস, তাঁর কন্যা মিসেস তেৎসু হিগুচির (Mrs. Tetsu Higuchi) হেপাজতে রক্ষিত। মিসেস হিগুচির সৌজন্যে সংকলিত।]

পরিশিষ্ট – ৩

জাস্টিস ড. রাধাবিনোদ পাল এবং মিঃ হ্যাসাবুরো শিমোনাকার সংক্ষিপ্ত জীবনকথা।

জাস্টিস ড. রাধাবিনোদ পাল ॥ পরলোকগত বিপিনবিহারী পালের পুত্র জন্ম – ২৭ জানুয়ারি ১৮৮৬, স্থান – সালিমপুর, জেলা নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ। ১৯০৭ সনে তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বিজ্ঞানে অনার্স নিয়ে স্নাতক হন, এবং তারপর এম.-এস-সি ডিগ্রি লাভ করেন ১৯০৮ সনে। তারপর তিনি আইন নিয়ে পড়াশোনা করেন, এবং আইনে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন ১৯১১ সনে। তিনি কর্মজীবন শুরু করেন একজন অঙ্কের অধ্যাপক হিসেবে, কিন্তু আইনে ডিগ্রি লাভের পরে তিনি যোগদান করেন কলকাতা হাইকোর্ট বারে একজন অ্যাড্‌ভোকেট হিসেবে। আইনে তাঁর ক্লাসে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে স্নাতকোত্তর মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন ১৯২০ সনে। তারপর তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল' কলেজে আইন অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন ১৯২৩ সনে, এবং ঐ পদে কাজ করেন ১৯৩৬ সন পর্যন্ত। ১৯২৫ সনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডক্টর অফ ল' ডিগ্রি প্রদান করে; তাঁর ডক্টোরাল থিসিস ছিল: দি হিন্দু ফিলজফি ইন দি প্রি-মনু কোড বেদ অ্যান্ড দি লেটার বেদ পিরিয়ড (The Hindu Philosophy in the Pre-Manu Code, Veda and the later Veda Period), সংক্ষেপে — জুরিসপ্রুডেন্স ইন বেদাস্ত, অর্থাৎ বেদান্তে আইনশাস্ত্রের কথা।

তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের টেগোর মেমোরিয়াল প্রফেসর অফ ল' হিসেবে নিযুক্ত হন ১৯২৪ সনে, এবং পরে আবার ১৯৩০ ও ১৯৩৮ সনে; সম্ভবত একমাত্র তিনিই এরকম পদে তিনবার নিযুক্ত হবার বিশেষ সম্মানলাভ করেন। অতঃপর তিনি ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ কমপারেটিভ ল'-এর (International Academy of Comparative Law) জয়েন্ট প্রেসিডেন্ট এবং যুক্তরাজ্যের ইন্টারন্যাশনাল ল' অ্যাসোসিয়েশান-এর (International Law Association, UK) একজন সদস্য হন, ১৯৩৭ সনে। ঐ একই বছর তিনি কংগ্রেস অফ দি ওয়ার্ল্ড ল' সোসাইটিজ-এর (Congress of the World Law Societies) প্রেসিডেন্টদের প্যানেলে কাজ করেন।

কলকাতা হাইকোর্টের জজ ছিলেন ১৯৪১-৪৩ সনে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

ভাইস-চ্যানসেলার, ১৯৪৪-৪৬। টোকিওর ইন্টারন্যাশনাল মিলিটারি ট্রাইবুনাল ফর দি ফার ইস্ট-এর (Tokyo International Military Tribunal for the Far East), জজ ছিলেন, ১৯৪৬-৪৮ পর্যন্ত, যখন তিনি যুদ্ধবন্দীদের বিচারে তাঁর বিখ্যাত সেই মতান্তরবোধ রায় দেন – জাপানি যুদ্ধবন্দীদের তথাকথিত 'যুদ্ধাপরাধী' না বলে তিনি তাদের আন্তর্জাতিক আইনে নিরপরাধ বলে ঘোষণা করেন।

ইউনাইটেড নেশনস কমিশন অন ইন্টারন্যাশনাল ল'-এর (United Nations Commission on International Law) তিনি সদস্য হন, ১৯৫২-৬৭ পর্যন্ত। (এই সংস্থার প্রেসিডেন্ট হিসেবেও তিনি কাজ করেন, ১৯৫৮ সনে ও ১৯৬২ সনে।)

জাপান সফর করেন ১৯৫২ সনে, – এশিয়া কনফারেন্স অন ওয়ার্ল্ড ফেডারেশান এর (Asia Conference on World Federation) অধিবেশনে যোগ দিতে, এবং কয়েকটি লেকচার-ট্যুর পরিচালনা করেন ইন্দো-জাপান ফ্রেন্ডশিপ অ্যাসোসিয়েশান-এর (Indo-Japan Friendship Association) আনুকূল্যে। মিঃ ওয়াসাবুরো শিমোনাকা, হেইবোনশার (Heibonsha) বিখ্যাত প্রকাশন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা এবং ভারতের একজন প্রকৃত বন্ধু, তাঁর সঙ্গে স্থায়ী ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলেন। তাঁরই আমন্ত্রণে ড. পাল জাপান সফর করেন আবার ১৯৫৩ সনে, এবং জাপানের বিভিন্ন অঞ্চলে বুদ্ধিজীবীদের সমাবেশে তিনি কয়েকটি ভাষণ দেন।

ভারতে আইনশাস্ত্রের জাতীয় অধ্যাপক (National Professor of Jurisprudence in India) নিযুক্ত হন, ১৯৫৯ সনে, বিশ্ব আদালতের জজ (Judge, World Court) নির্বাচিত হন, ১৯৬০ সনে।

বিগত ২৬ জানুয়ারি ১৯৫৯ তারিখে তাঁকে ভারতের জাতীয় পর্যায়ে দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ সম্মান 'পদ্মবিভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন– ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতি। [প্রথম শ্রেষ্ঠ সম্মান 'ভারতরত্ন']

আবার তিনি জাপান সফর করেন চতুর্থবার, ১৯৬৬ সনে, এবং জাপান সম্রাটের কাছ থেকে জাপানের প্রথম শ্রেণীর সম্মান 'ফার্স্ট অর্ডার অফ মেরিট' (First Order of Merit of the Sacred Heart) উপাধিতে ভূষিত হন।

আইন বিষয়ক, বিশেষত হিন্দু আইন বিষয়ক (Law, Hindu Law) কয়েকখানি বইয়ের লেখক – যে বিষয়ে তাঁকে সম্ভবত সর্বশ্রেষ্ঠ একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে গণ্য করা হয়।

কলকাতায় ১০ জানুয়ারি ১৯৬৭ তারিখে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁর ৪ পুত্র এবং ৩ কন্যা।

খ. **মিঃ ইয়াসাবুরো শিমোনাকা** ।। জন্ম ১২ জুন ১৮৭৮, স্থান— হিয়োগো অঞ্চলের শিমোতাচিকুই, কোনদা-মুরা / তাই-গুন এলাকায় (Shimota-chikui, Konda-Mura, Tai Gun, Hyogo Prefecture)। শিক্ষক, ছিলেন—উনচু প্রাইমারি ইস্কুলে, কোবে (Unchu Primary School, Kobe), ১৭-৯৮ সনে। পরে যোগদান করেন ছোটদের সংবাদপত্র 'জিডো শিমবুন' (Jido Shimbun) পত্রিকায়, টোকিও, ১৯০২ সনে। লেখাপড়া শেখেন সাইতানা অঞ্চলের নর্মাল ইস্কুলে (Normal School, Saitana prefecture), ১৯১১-১৮ সময়কালে।

হেইবোনশা নামক স্থানে একটি প্রকাশন সংস্থা স্থাপন করেন তিনি, ১৯১৪ সনে। প্রকাশ করেন একখানি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পকেটবই, নাম তার—'পকেট কমন ইয়া-কোরেওয়া বেনরি-দা' ('Pocket Komon Ya-Korewa Benri-da': A Pocket All-round Handy Book)।

'কিমেই-কাই' নামে একটি সংস্কারমূলক শিক্ষাব্রতী সংস্থা (Keimei Kai, a Reformist Association of Education) সংগঠনও স্থাপন তিনি করেন, ১৯১৯ সনে, এবং 'নমিন জিচি-কাই' নামে একটি চাষীদের স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা (Nomin Jichi-kai, a Farmers' Autonomous Association) সংগঠন ও স্থাপন করেন, ১৯২৫ সনে। 'শিন নিহন কোকুমিন দোমেই' (Shin Nihon Kokumin Domei / New Japan National League) নামেও একটি সংস্থা তিনি স্থাপন করেন, ১৯৩২ সনে, এবং এই সংস্থার প্রশাসনিক কমিটির তিনি ছিলেন চেয়ারম্যান।

'দাইয়াজিয়া কিয়োকাই' (Daiazia Kyokai) নামে গ্রেটার এশিয়া অ্যাসোসিয়েশান-এর সংগঠনের কাজে, এবং জাপানের 'গান্ধী অ্যাসোসিয়েশান'-এর (The Gandhi Association Japan) সংগঠনের কাজে তিনি অগ্রগতি সাধন করেন।

'শিনমিন ইনশোকান' নামে একটি প্রকাশন সংস্থা (Shinmin Inshokan/ New People's Publishing Co.) তিনি স্থাপন করেন পিকিঙে, ১৯৩৮ সনে, এবং তিনি সেই সংস্থার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

১৯৪৭ জানুয়ারিতে তাঁর সাক্ষ্য নেওয়া হয় আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধী ট্রাইবুনালের শুনানি পর্বে (International War Crimes Tribunal for

the Far East), আইওয়ানে মাৎসুই-এর (Iwane Matsui) সম্পর্কে। ঐ বছরেই আগস্ট মাসে, তিনি স্থাপন করেন—টোকিও ইনশোকান প্রিন্টিং কোম্পানি লিমিটেড (Tokyo Inshokan Printing Co. Ltd.)।

তোয়োহিকো কাগাওয়ার (Toyohiko Kagawa) সহযোগে তিনি একটি বিশ্ব সংস্থা — 'ওয়ার্ল্ড ফেডারেশান' (World Federation) স্থাপনের জন্যে আন্দোলন শুরু করেন, ১৯৫১ নভেম্বরে।

জাস্টিস ড রাধাবিনোদ পালকে কাগাওয়া জাপানে আসার আমন্ত্রণ জানান, ১৯৫২ অক্টোবরে, এবং তাঁরা উভয়েই সারা দেশের বিভিন্ন স্থানে সফর করে বেড়ান ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ব্যাপকভাবে ভাষণ দেন।

ঐ বছরের নভেম্বর মাসে তিনি 'ওয়ার্ল্ড ফেডারেশান' নামক বিশ্ব সংস্থার এশিয়া অধিবেশনের (Asia Conference of World Federation) অনুষ্ঠান করেন হিরোশিমায়,—যে অধিবেশনে 'হিরোশিমা ঘোষণা' মূলক (Hiroshima Declaration) সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

জাস্টিস ড রাধাবিনোদ পালকে আবার আমন্ত্রণ জানান, ১৯৫৩ সেপ্টেম্বরে, এবং তাঁর জন্যে একটি লেকচার-ট্যুর সংগঠিত করেন— বুদ্ধিজীবী শ্রোতাদের স্বার্থে এবং ভারত-জাপান বন্ধুত্বের (Indo-Japan Friendship) স্বার্থে।

১৯৫৫ সালে তিনি 'সেকাই রেনপো' কেনসেৎসু দোমেই (Sekai Renpo, Kensetsu Domei) নামে এক বিশ্ব সংস্থার (Alliance for the Construction of a World Federation) প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ঐ বছরের নভেম্বর মাসে, তিনি সংগঠন করেন সাত-সদস্যের এক কমিটি—বিশ্বশান্তির উন্নতি বিধানে (Seven-man Committee for Promotion of World Peace), এবং তার কাজ শুরু করে দেন।

তিনি ছিলেন, ১৯৫৭ অক্টোবরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে তাঁর জাপান সফরকালে স্বাগত জানানোর জন্যে গঠিত জাতীয় কমিটির (National Committee to Welcome Pandit Jawaharlal Nehru, PM of India) সভায় চেয়ারম্যান।

তিনি ছিলেন ওয়ার্ল্ড ফেডারেশানের নবম বিশ্ব কংগ্রেসে (Ninth World Congress Of World Federation) যোগদানের জন্যে জাপান থেকে মনোনীত চিফ ডেলিগেট, ১৯৫৯ আগস্ট। তিনি চিঠিপত্রের মাধ্যমে পরিচিত ছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জে. এফ. কেনেডির (J. F. Kennedy, President, USA) সঙ্গে, ১৯৬১ সালে। ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬১ তারিখে তিনি পরলোকগমন করেন।

এইসব নামী ব্যক্তিবৃন্দ যাঁরা ভারত-জাপান বন্ধুত্বের (India-Japan Friendship) উন্নতি বিধানের কাজে নিযুক্ত আছেন, তাঁরা একটি সংস্থা গঠন করেছেন (যাঁর মধ্যে বর্তমান লেখক [এ. এম. নায়ার] একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য বা 'ফাউণ্ডার মেম্বার'), এবং তাঁরা এই সংস্থায় উদারভাবে দান করেছেন — জাস্টিস ড. রাধাবিনোদ পাল ও মিঃ ইয়াসাবুরো শিমোনাকার সম্মানে একটি উপযুক্ত স্মারক নির্মাণের জন্যে। 'পাল-শিমোনাকা মেমোরিয়াল হল' (Pal-Shimonaka Memorial Hall) নামে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়েছে — জাপানের হাক্কোনে অঞ্চলের আশিনোকু হ্রদের উপকূলে (Lake Ashinoku, Hakkone), এবং তার উদ্বোধন হয়েছে ১৯৭৪ সনে। এই স্মৃতিসৌধটি একটি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ সংস্থা, যা নির্মিত হয়েছে একজন মহান ভারতীয় এবং একজন মহান জাপানি ব্যক্তিত্বের স্মরণে — যাঁরা উভয়ে উভয়কে ভাইয়ের মতো সম্মান করতেন।

পরিশিষ্ট - ৪

ভারত-জাপান দ্বিপাক্ষিক চিরস্থায়ী শান্তি ও মিত্রতার চুক্তি (The India-Japan Bilateral Treaty of Perpetual Peace and Amity), ৯ জুন ১৯৫২ ।

যেহেতু ভারত সরকার (দি গভর্নমেন্ট অফ ইনডিয়া) দ্বারা ৯ জুন ১৯৫২ তারিখে প্রচারিত পাবলিক নোটিফিকেশান-এর (Public Notification, 9 June 1952) দ্বারা ভারত ও জাপানের মধ্যে যুদ্ধাবস্থার অবসান ঘটিয়েছেন—

এবং যেহেতু ভারত সরকার (দি গভর্নমেন্ট অফ ইনডিয়া) ও জাপান সরকার (দি গভর্নমেন্ট অফ জাপান) উভয় দেশের জনসাধারণের একই সাধারণ কল্যাণকর উন্নতি বিধানার্থে বন্ধুত্বপূর্ণ ভাবে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে এবং ইউনাইটেড নেশান্স-এর (রাষ্ট্রসংঘ) নীতি-নির্দেশ অনুসারে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার স্বার্থে একমত হয়েছেন--

ভারত সরকার এবং জাপান সরকার সুতরাং এই শান্তি চুক্তি (Treaty of Peace) সম্পন্ন করতে কৃতসংকল্প, এবং এই মর্মে তাঁদের পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তিকে (বা রাষ্ট্রদূতকে) নিযুক্ত করেছেন :

যাঁরা উভয়ে পরস্পরের কাছে তাঁদের সংশ্লিষ্ট পূর্ণ ক্ষমতার কথা প্রকাশ করেছেন এবং দেখেছেন তা উত্তম ও উপযুক্ত, তাই তাঁরা নিম্নলিখিত ধারাগুলি সম্পর্কে একমত। *

[ভারত জাপান দ্বিপাক্ষিক চিরস্থায়ী শান্তি ও মিত্রতার চুক্তি একটি আন্তর্জাতিক দলিল। তাই, পাঠক-সাধারণের স্বার্থে দলিলটি মূল ইংরেজিতেই এখানে সংকলিত হলো।--অনু.]

APPENDIX 4

The India-Japan Bilateral Treaty of Perpetual Peace and Amity, 9 June 1952

Whereas the Government of India have by public notification issued on the ninth day of June, 1952, terminated the state of war between India and Japan :

And Whereas the Government of India and the Government of Japan are desirous of cooperating in friendly association for the promotion of the common welfare of their peoples and the maintenance of international peace and security in conformity with the principles of the Charter of the United Nations :

The Government of India and the Government of Japan have therefore determined to conclude this Treaty of Peace, and to this end have appointed their plenipotentiaries :

THE GOVERNMENT OF INDIA
and
THE GOVERNMENT OF JAPAN

Who, having indicated to each other their respective Full Powers, and found them good and in due form, have agreed on the following Articles :

ARTICLE I

There shall be firm and perpetual peace and amity between India and Japan and their peoples.

ARTICLE II

(a) The Contracting Parties agree to enter negotiations for the conclusion of treaties or agreements to place their trading, maritime, aviation and other commercial relations on a stable and friendly basis.

(b) Pending the conclusion of the relevant treaty or agreement, during a period of four years from the date of the issue of the notification by the Government of India terminating the state of war between India and Japan—

(1) the Contracting Parties shall accord to each other most-favoured-nation treatment also with respect to air traffic rights and privileges :

(2) the Contracting Parties shall accord to each other most-favoured-nation treatment also with respect to customs duties and charges of any kind and restrictions and other regulations in connection with the importation and exportation of goods or imposed on the international transfer of payments for imports or exports and with respect to the method of levying such duties and charges and with respect to all rules and formalities in connection with importation and exportation and charges to which customs clearing operations may be subject ; and any advantage, favour, privilege or immunity granted by either of the parties to any product originating in or destined for any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the like products originating in or destined for the territory of the other party :

(3) Japan will accord to India national treatment, to the extent that India accords Japan the same, with respect to shipping, navigation and imported goods and with respect to natural and juridical persons and their interests—such treatment to include all matters pertaining to the levying and collection of taxes, access to the courts, the making and performance of contracts, rights to property (tangible and intangible), participation in juridical entities constituted under Japanese law, and generally the conduct of all kinds of business and professional activities :

Provided that in the application of this Article, a discrimina-

tory measure shall not be considered to derogate from the grant of national or most-favoured-nation treatment, if such measure is based on an exception customarily provided for in the commercial treaties of the party applying it, or on the necessity of safeguarding that party's external financial position or balance of payments, or on the need to maintain its essential security interests, and provided such measure is proportionate to the circumstances and is not applied in an arbitrary or unreasonable manner ·

Provided further that nothing contained in Sub-paragraph (2) above shall apply to the preferences or advantages which have existed since before the 15th August, 1947, or which are accorded by India to contiguous countries :

(c) No provision of this Article shall be deemed to limit the undertakings assumed by Japan under Article V of this Treaty.

ARTICLE III

Japan agrees to enter into negotiations with India, when India so desires, for the conclusion of an agreement providing for the regulation or limitation of fishing and the conservation and development of fisheries on the high seas.

ARTICLE IV

India will return or restore in their present form all property, tangible and intangible, and rights or interests of Japan or its nationals which were within India at the time of the commencement of the war and are under the control of the Government of India at the time of coming into force of this Treaty; provided that the expenses which may have been incurred for the preservation and administration of such property shall be paid by Japan or its nationals concerned. If any such property has been liquidated, the proceeds thereof shall be returned, deducting the above-mentioned expense.

ARTICLE V

Upon application made within 9 months of the coming into force of this Treaty Japan will, within 6 months of the date of such application, return the property, tangible or intangible, and all rights or interests of any kind in Japan or India and her nationals which was within Japan at any time between the 7th December 1941 and 2nd September 1945 unless the owner has freely disposed thereof without duress or fraud.

Such property will be returned free of all encumbrances and charges to which it may have become subject because of the war, and without any charges for its return.

Property the return of which is not applied for by or on behalf of its owner or by the Government of India within the prescribed period may be disposed of by the Japanese Government in its discretion.

If any property was with Japan on the 7th December 1941, and cannot be returned or has suffered injury or damage as a result of the war, compensation will be made on terms not less favourable than the terms provided in the Allied Powers Property Compensation Law of Japan (Law number 164, 1951).

ARTICLE VI

(a) India waives all reparations claims against Japan.
(b) Except as otherwise provided in this Treaty, India waives all claims of India and Indian nationals arising out of action taken by Japan and its nationals in the course of the prosecution of the war as also claims of India arising from the fact that it participated in the occupation of Japan.

ARTICLE VII

Japan agrees to take the necessary measures to enable nationals of India to apply within one year of the coming into force of this Treaty to the appropriate Japanese authorities for

review of any judgment given by a Japanese Court between December 7, 1941, and such coming into force, if in the proceedings in which the judgment was given any Indian national was not able to present his case adequately either as plaintiff or as defendent. Japan further agrees that where an Indian national has suffered injury by reason of any such judgment, he shall be restored to the position in which he was before the judgement was given or shall be afforded such relief as may be just and equitable in the circumstances of the case.

ARTICLE VIII

(a) The Contracting Parties recognise that the intervention of the state of war has not affected the obligation to pay pecuniary debts arising out of obligations and contracts (including those in respect of bonds) which existed and rights which were acquired before the existence of the state of war, and which are due by the Government or nationals of Japan to the government or nationals of India, or are due by the government or nationals of India to the government or nationals of Japan, nor has the intervention of the state of war affected the obligation to consider on their merits claims for loss or damage to property or for personal injury or death which arose between the existence of a state of war, and which may be presented or re-presented by the Government of India to the Government of Japan or by the Government of Japan to the Government of India.

(b) Japan affirms its liability for the pre-war external debt of the Japanese State and for debts of corporate bodies subsequently declared to be liabilities of the Japanese State, and expresses its intention to enter into negotiations at an early date with its creditors with respect to the resumption of payments on these debts.

(c) The Contracting Parties will encourage negotiations in

respect to other pre-war claims and obligations and facilitate the transfer of sums accordingly.

ARTICLE IX

(a) Japan waives all claims of Japan and her nationals against India and her nationals arising out of the war or out of actions taken because of the existence of a state of war, and waives all claims arising from the presence, operations or actions of forces or authorities of India in Japanese territory prior to the coming into force of this Treaty.

(b) The foregoing waiver includes any claims arising out of actions taken by India with respect to Japanese ships between September 1, 1939, and the coming into force of this Treaty, as well as any claims and debts arising in respect to Japanese prisoners of war and civilian internees in the hands of India , but does not include Japanese claims specifically recognised in the laws of India enacted since September 2, 1945.

(c) Japan recognises the validity of all acts and omissions done during the period of occupation under or in consequence of directives of the occupation authorities or authorised by Japanese law at that time, and will take no action subjecting Indian nationals to civil or criminal liabitity arising out of such acts or omissions.

ARTICLE X

Any dispute arising out of the interpretation or application of this Treaty or one or more of its Articles shall be settled in the first instance by negotiations, and, if no settlement is reached within a period of six months from the commencement of negotiations by arbitration in such manner as may hereafter be determined by a general or special agreement between the Contracting Parties.

ARTICLE XI

This Treaty shall be ratified and shall come into force on the

date of exchange of ratifications which shall take place as soon as possible at New Delhi (or Tokyo).

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty.

Done in duplicate at Tokyo this Ninth day of June, 1952 in the English language, Hindi and Japanese texts of this Treaty will be exchanged by the two Governments within a month of this date.

FOR JAPAN, (Katsuo Okaza

FOR INDIA (K.K. Chettur

Text of announcement made by the Japanese Foreign Minister at the time of issue of the text of the Treaty.

"The spirit of amity and goodwill of India towards Japan is abundantly shown throughout in the Treaty. It is particularly exemplified by the provisions waiving all reparations, claims and returning Japanese property located in India."

Sd/- Katsuo Okazaki,
Japanese Foreign Minister. June 9, 1952.

(Source : Lok Sabha Secretariat, New Delhi : "Foreign Policy of India" : Texts of Documents : 1947-59).

শব্দসূচি